







স্পেনের গৃহযুদ্ধ : পঞ্চাশ বছর পরে

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত

দে'জ পাবলিশিং । কলকাতা ৭৩



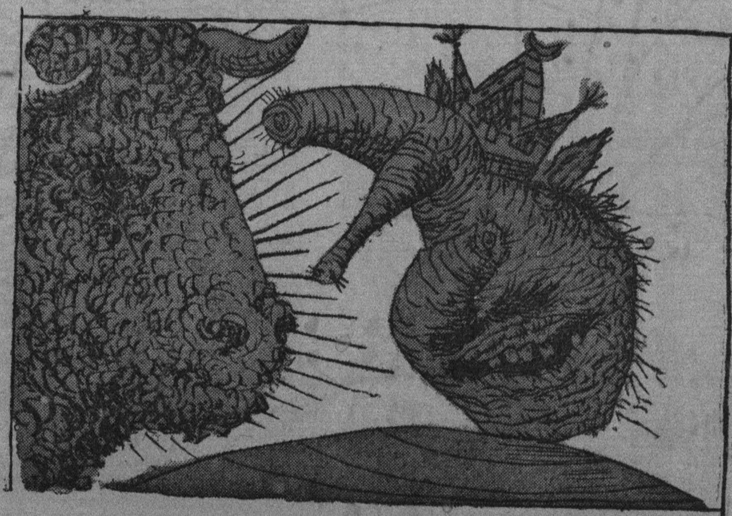
প্রকাশ : ১৮ জুলাই ১৯৬০ । ২ শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত (পিকাসোর 'গের্নিকা' অবলম্বনে)
গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ছবি : সামোরানো, পিকাসো ও রবীন্দ্রনাথ

CIVIL WAR OF SPAIN : AFTER FIFTY YEARS
An anthology Ed. by Manabendra Bandopadhyay

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : অরিজিৎ কুমার । টেকনোপ্রিণ্ট
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৬



উৎসর্গ

স্পেনের গৃহযুদ্ধের অগণিত শহিদদের উদ্দেশে

যেন ভুলে না-যাই



সংকলন প্রসঙ্গে

প্রজাতন্ত্রকে উৎখাত ক'রে আবার পুরোনো ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে জুলাই ১৯৩৬-এ যখন ফ্রাঙ্কো তার মরোক্কোর সেনাবাহিনী নিয়ে স্পেনে পৌঁছেছিলো, তখন গোড়ায় ভাবা গিয়েছিলো ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিবাদী দস্যুদের পক্ষে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে হারানো মোটেই সম্ভব হবে না। শুধু-যে স্পেনের মধ্যে চাষী ও শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের অধিকারকে রক্ষা করবার জন্যে একজোট হয়েছিলেন তা নয়—এ-রকমও ভাবা গিয়েছিলো যে পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রগুলো—বিশেষ ক'রে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স—কিছুতেই মুখ বুজে ফ্রাঙ্কোর এই স্পর্ধাকে বরদাস্ত করবে না। কিন্তু প্রথম উত্তেজনাটা কেটে যেতেই যখন দেখা গেলো নন-ইণ্টারভেনশনের খোলশের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে (অন্য-কোনো দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলানো ঠিক হবে না—এ-রকম একটা ধান্দা তৈরি ক'রে) এরা বরং পরোক্ষভাবে ফ্রাঙ্কোরই সাহায্য করেছে—এবং ফ্রাঙ্কোকে মদত দেবার জন্যে ইতালি ও জর্মানি সরাসরি রণাঙ্গনে নেমে পড়েছে তখন প্রাথমিক আশা ও উচ্ছ্বাস কীভাবে ধ্বংস হয়ে গেলো, আজ তা ইতিহাস। স্পেন যে আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই মহড়া এটাও আর কারু কাছেই অগোচর রইলো না। দেশ-বিদেশের সরকার যা-ই করুক, তবু সারা বিশ্বের বিবেকবান ব্যক্তিদের পক্ষে এটা মেনে নেয়া সম্ভব ছিলো না—আর এইভাবেই পত্তন হয়েছিলো আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের—যেখানে যোগ দিয়েছিলেন কবি-শিল্পী-সাংবাদিক-সাংগীতিক-চিত্রকর থেকে শুরু ক'রে এমন-সব মানুষ, যাঁরা স্যাণ্ডহার্স্টে, ওয়েস্টপণ্টে বা অন্য-কোনো সামরিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং পাননি, কিন্তু ন্যায়নীতি ও বিবেকের জোর যাঁদের বলীয়ান করেছিলো। আজ আমরা জানি প্রজাতন্ত্রপন্থীদের পক্ষে যুদ্ধে জেতা মোটেই সম্ভব ছিলো না—নিছক পশুশক্তির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র ন্যায়নীতি দিয়ে সব-সময় জেতা যায় না। কিন্তু স্পেনের গৃহযুদ্ধ আজও কতগুলো জলন্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে: যে-কোনো আন্তর্জাতিক সংকটই—সময়মতো সে-সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণ না-করলে—অন্যদেশেরও সমূহ বিপত্তি ঘটাতে পারে। এই কথা ভেবেই আমরা যখন স্পেনের গৃহযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি সংকলন প্রকাশ করার কথা ভেবেছিলাম, তখন স্থির করেছিলাম স্পেন যে কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার



ছিলো না, সেটা আবার মনে ক'রে নেবার জন্যে, সংকলনের শেষ লেখা ইঙ্গিত দেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের আণ্ডারগ্রাউণ্ড প্রতিরোধ-আন্দোলনের। অর্থাৎ সংকট ও তার প্রতিরোধ দুইই সমভাবে চ'লে আসছে। স্পেন মোটেই একটি মাত্র বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন ঘটনা নয়। সাম্প্রতিককালে চিলে, গ্রেনাদা, নিকারাগুয়া, এল সালভাদোর, দক্ষিণ আফ্রিকা, প্যালেস্টাইন, গুয়াতেমালা প্রভৃতি প্রত্যেকটি দেশের অবস্থা সেই একই চিত্রনাট্য অনুসরণই ক'রে চলেছে। মুসোলিনি হিটলারের ইতালি-জর্মানি এখনও অন্য নামে বিদ্যমান।

রচনাগুলো সাজানোর মধ্যে সাধারণ পরিকল্পনার একটা ইঙ্গিত আছে, সেটা আশা করি অনায়াসেই বোঝা যাবে। শ্রীঅরুণ মিত্র অনূদিত পল এল্যুয়ারের "গের্নিকা" রচনাটি চিত্রনাট্যের ধারাভাষ্য হিশেবে রচিত হয়েছিলো, সেটা এখানে বলা উচিত।

স্বভাবতই এমন-কোনো সংকলন কারু একজনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সম্ভব হ'তে পারতো না। সংকলনের পরিকল্পনা থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীঅশোক মিত্রর সাহায্য ও পরামর্শ আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। চিন্মোহন সেহানবীশ প্রথম থেকেই দুষ্প্রাপ্য বই ও দলিল দিয়ে আমাদের সহায়তা করেছিলেন—তাঁর বিশেষ ইচ্ছা ছিলো এই সংকলনের জন্য একটি প্রবন্ধ লিখে দেবেন ; তিনি লিখতে শুরুও করে-ছিলেন, কিন্তু রচনাটি অসুস্থতার জন্যে শেষ অব্দি আর শেষ ক'রে যেতে পারেননি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো কিছু পুরোনো লেখার সঙ্গে এই উপলক্ষে নতুন-ক'রে তৈরি কিছু রচনাও দেয়া হবে। আমরা এখন আমাদের পশ্চাৎদৃষ্টি লাভ ক'রে কী ভাবছি না-ভাবছি, না-হয় সেটাও খানিকটা বোঝা যাক। আমরা যখনই যাঁর কাছে লেখার দাবি নিয়ে গিয়েছি, কেউই আমাদের বিমুখ করেননি। তবে নতুন ক'রে লেখার জন্যে অনেক সময় লেগেছে—তাই ১৯৮৬র জুলাইতে, পরিকল্পনা সত্ত্বেও সংকলনটি, বার করা যায়নি।

আগেই বলেছি এ-সংকলনের পরিকল্পনা থেকেই আমরা এতজনের কাছে এত-রকম সাহায্য পেয়েছি যে অভিভূত হ'য়ে গিয়েছি। শ্রীসুবীর ভট্টাচার্য, শ্রীসৌরীন ভট্টাচার্য, শ্রীসুবীর রায়চৌধুরী, শ্রীশঙ্খ ঘোষ, শ্রীঅশোক সেন, শ্রীশিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুজিত পোদ্দার আমাদের নানাভাবে অবিরল সাহায্য করেছেন। শ্রীশিপ্রা সরকার, শ্রীসঞ্জিত বসু, শ্রীমালিনী ভট্টাচার্য, শ্রীমিহির ভট্টাচার্য, শ্রীরত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৌশল্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ সাহায্য এ-প্রসঙ্গে স্বীকার করি। বিশেষত শ্রীসুবীর ভট্টাচার্য পরিকল্পনার প্রথম থেকে একেবারে শেষ মুহূর্ত অব্দি এতভাবে সাহায্য



করেছেন যে এটাকে প্রায় তাঁরই বই বলা যায়। বই ছাপার সময় অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন শ্রীস্বপন মজুমদার, শ্রীঅরিজিৎ কুমার, শ্রীশিবনাথ পাল ও শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। আর সর্বোপরি দে'জ পাবলিশিং-এর শ্রীসুধাংশুশেখর দে যদি পরিকল্পনা-মাত্রই সংকলনটি প্রকাশের দায়িত্ব না-নিতেন, তাহ'লে কোনো কাজই এগুতো না। রবীন্দ্রনাথের আঁকা মুসোলিনির ব্যঙ্গচিত্রটি যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে পাওয়া গেছে, সেটা অশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। আগেই বলেছি এ-কাজ কারু একার প্রচেষ্টায় সম্ভব হ'তো না—সকলেই এই জন্যেই আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন যে স্পেনের দুর্গতি ও গৃহযুদ্ধের স্মরণ আমাদের এখনকার অবস্থা বোঝবার পক্ষেও জরুরি।

বিদেশী নামের প্রতিবর্ণীকরণ এ-রকম কোনো সংকলনের পক্ষে বিস্তর অসুবিধা সৃষ্টি করে। আমরা এক্ষেত্রে লেখকদের অভীষ্ট পদ্ধতিই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি। সুষ্ঠুভাবে কাজ করার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও যদি তবু সংকলনের ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখে পড়ে, দায়িত্ব বলাই বাহুল্য সম্পাদক ছাড়া আর-কারু নয়। আরো অনেক পুরোনো লেখা হয়তো দেয়া যেতো, কিন্তু আজকের দুর্মূল্যের দিনে বইয়ের আয়তনের কথা ভেবে আমাদের সে-ইচ্ছা অপূর্ণ রাখতে হয়েছে।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



সূচিপত্র

এ খ ন স্ম র ণ

র ক্তা ক্ত স্পে ন ও আ ম রা

যু দ্ধে র দা মা মা

গে র্নি কা ! গে র্নি কা

হৃদয়ে আমার স্পেন

পাবলো পিকাসোর ছবি

এস্পানিয়া, আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও এ-পানপাত্র

প্রতিরোধে! প্রতিরোধে!

এখন স্মরণ



জ্যোতি বসু

স্পেনের গৃহযুদ্ধ : কিছু স্মৃতি

আমি ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য ইংলণ্ডে গিয়েছিলাম ১৯৩৫ সালে। এর আগে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজিতে বি.এ. পড়েছি। কিন্তু তারও আগে, ১৯৩০-৩১ সালে, আমি যখন সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে সিনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, তখন বাংলার সর্বত্র বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট খুন, নানা স্থানে সশস্ত্র আক্রমণ ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ—এ-সব খবরে সারা দেশ তখন তোলপাড় হচ্ছিল। আমাদের পরিবারেও এর প্রভাব পড়েছিল, একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। গান্ধিজির অনশন, সুভাষ বসুর আন্দোলন—এইসব চলছিল। এর আগে যখন ইংরেজ সরকার শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি'কে নিষিদ্ধ করে দেয়, তখন আমি সেটা গোপনে জোগাড় করে পড়ে ফেলি। আমার জেঠতুতো দাদারা দেশের এইসব বিক্ষোভ, চাঞ্চল্য ও অস্থিরতায় বেশ উৎসাহ দেখাতেন। এই অবস্থার মধ্যেই আমি ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গিয়েছিলাম। বাবার ইচ্ছে ছিল আই. সি. এস. পরীক্ষাও যেন দিই ; আমি সে-পরীক্ষা দিয়েছিলাম, তবে কৃতকার্য হতে পারিনি। ব্যারিস্টারি পড়ার দিকেই মন দিই।

সে-সময় সারা ইউরোপেই প্রচণ্ড রাজনৈতিক আলোড়ন চলছে। ফাসিস্ত মুসোলিনি ইতালিতে ক্ষমতা দখল করে ফেলেছে, জার্মানিতে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই হিটলারের নাৎসি দল সারা পৃথিবী দখল করে নেবার জিগির তুলে দিয়েছে ; মুসোলিনি আবিসিনিয়ায় হামলা চালাতে শুরু করেছে ; জাপান চীনের ওপর চড়াও ; স্পেনেও গৃহবিবাদ শুরু হয়ে গেছে।

আমি বিলেতে গিয়েই কমিউনিস্টদের সংস্রবে আসি ; সেই সময়ে সেখানে আরো কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র ছিলেন, যেমন মোহন কুমারমঙ্গলম ; কেউ-কেউ নতুন এসে পৌঁছোন, যেমন স্নেহাংশুকান্ত আচার্য ও ভূপেশ গুপ্ত এসেছিলেন ১৯৩৬ সালে। আমাদের আগে হীরেন মুখার্জি, সাজ্জাদ জহির, ড. জেড. এ. আহ্‌মেদ, নীহারেন্দু দত্তমজুমদার ইংলণ্ডে কাজ করছিলেন। কিন্তু তাঁদের দলটা বিলেত থেকে ফিরে আসার পরই আমরা গিয়ে ঐ আন্তর্জাতিক আলোড়নের মধ্যে পড়ি। সে-সময় লণ্ডন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হলো, আমিই ছিলাম তার প্রথম সেক্রেটারি।

লণ্ডন মজলিশের একটা উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে কাজ করা। সাধারণ লোক অনেক ছিল। সিলেট থেকে যেত; সওদাগরি জাহাজে কাজ নিয়ে বিলেতে এসে অনেকে থেকে যেত; ভাষা জানে না, কিছু জানে না, অথচ মেম-সাহেব বিয়ে করে ওখানে সংসার পেতে বসেছে। এদের জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম হয়েছিল। এরা নিজেরাই এসে বলত তাদের জন্য কাজ করা উচিত। তাদের যদি ভাষা শেখানো যায়, একটু রাস্তার নামধাম যদি ঠিকঠাক পড়তে পারে, কতগুলো চালচলন যদি শিখে নিতে পারে, তবে কাজ জোটাতে সুবিধে হয়, রুজি-রোজগার বাড়ে; তাছাড়া মেম বিয়ে করেছে, ছেলেপুলে হয়েছে, কিন্তু দুর্গতির শেষ নেই। তাদের জন্য আমরা নিয়মিত ক্লাস নিতাম, পড়াতাম। উড়িষ্যার একজন ছিল, সে সি.পি.জি.বি.-র (কমিউনিস্ট পার্টি অভ গ্রেট ব্রিটেন) সদস্য, ভালো বক্তৃতা দিত, লেখাপড়া শিখেছিল, সে খুব আসত; তার খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। সে এই ক্লাস নেবার সময় রাজনীতি বিষয়ে সচেতন হতে বলত; আমরাও ভাষা ইত্যাদি শেখাবার সঙ্গে-সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এই লণ্ডন মজলিশ ছাড়াও আমাদের একটি কমিউনিস্ট গ্রুপ ছিল। কেমব্রিজে একটা, লণ্ডনে একটা, আরো নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, ভারতীয় ছাত্ররা সে-সব জায়গায় কমিউনিস্ট মতবাদের সংস্রবে এসেছিল। সি.পি. জি. বি.-র সঙ্গে তাদের নিয়মিত মিলিত আলোচনা হত; মেশানো দল, সবাই যে পুরোপুরি মার্কসিস্ট তাও নয়, তবে মেলবার জায়গা ছিল প্রগতিশীল একটা দৃষ্টি-ভঙ্গি। তাছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি তখন ভারতে বেআইনি, সেজন্য অনেকে এখানে প্রকাশ্যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে মেশামিশির কথা বলত না। তবে জন-সংগঠন হিসেবে আমাদের দুটো প্রতিষ্ঠান ছিল; একটা তো এই লণ্ডন মজলিশ, যার কথা আগেই বলেছি—১৯৩৬ সালে গড়ে উঠেছিল, পরে অবশ্য ভেঙে গিয়েছিল; আর ছিল স্টুডেণ্ট ফেডারেশন, সেখান থেকে 'স্টুডেণ্ট ফেডারেশন' নামেই আমরা একটা কাগজ বার করতাম। তাছাড়া ইণ্ডিয়া লিগ তো ছিলই; সেখানেও আমরা কাজ করতাম।

ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের সঙ্গে-সঙ্গেই ব্রিটেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাপক ও তীব্র রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্র হয়ে পড়ে। অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কির ফ্যাসিবাদবিরোধী বক্তৃতা শোনবার জন্য রীতিমতো ভিড় জমে যেত। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন অন্য অনেকের মতোই আমাকেও প্রচণ্ড আলোড়িত করে; আমি সে-সময় থেকেই ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে বইপত্র জোগাড় করে পড়তে আরম্ভ করি। তখন ইণ্ডিয়া লিগের নেতৃত্বে ছিলেন কৃষ্ণ মেনন; ভারতের স্বাধীনতার

জন্য তাঁর নেতৃত্বে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে ইণ্ডিয়া লিগ বিস্তর প্রশংসনীয় কাজ করেছিল। কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে আমার পরিচয় হবার পর থেকেই আমি ইণ্ডিয়া লিগের কাজকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে এসেছি। আরো অনেক ভারতীয়ও তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলেন, ফিরোজ গান্ধি, ভূপেশ গুপ্ত বা এ-রকম আরো দু-চারজন। পূর্ব আফ্রিকা থেকেও কেউ-কেউ এসেছিলেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় আমাদের একটা প্রধান কাজ ছিল অক্সফোর্ড-কেমব্রিজে ছাত্রদের সংগঠিত করে সভা করা, সাধারণ লোককে ফ্যাসিবাদের দুর্বিপাক সম্বন্ধে অবহিত ও সচেতন করা। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন প্রগতিশীল ছাত্ররা খুব সক্রিয় ও তৎপর ছিল, সংগঠনও বলিষ্ঠ ছিল। সেরা ছাত্ররাই তখন সভায়-সভায় স্পেনের গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে যেত, কবিতা আবৃত্তি করতে যেত। আন্তর্জাতিক বাহিনী যেটা তৈরি হয়েছিল, তাতে সারা পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীরা যোগ দিয়েছিলেন—আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স থেকে তো বটেই, ত্রিনিদাদ-টোবেগোর মতো ছোটো-ছোটো জায়গা থেকেও অনেকে এসেছিলেন; তাঁরা সরাসরি যুদ্ধ করতে ফ্রণ্টে গিয়েছিলেন।

কিন্তু হিটলারের ফ্যাসিবাদের আদলে ততক্ষণে গ্রেট ব্রিটেনে ছোটো একটা ফ্যাসিস্ত দলও গড়ে উঠেছিল। একদিকে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় ফ্যাসিস্তরা—এ-সব নিয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন হয়েছিল;- সভাসমাবেশ হত, অধিবেশন হত; স্পেনের গৃহযুদ্ধের জন্য আমরা টাকা তুলতাম; লণ্ডন মজলিশের তরফ থেকে আমরা শো ও বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতাম; 'নো পাসারান' এই ধ্বনি দিয়ে সাংস্কৃতিক সমাবেশ বা জলসা হত; স্পেন থেকেও কেউ-কেউ আসতেন, নাচ-গান হত, কবিতা পাঠ হত, প্রদর্শনী হত; এভাবেই বেশকিছু টাকাপয়সা উঠত। শুধু-যে টিকিট বিক্রি করেই টাকা ওঠানো হত তা নয়; আমরা ভারতীয় ছাত্রদের কাছ থেকে—অন্যদের কাছ থেকেও—চাঁদা তুলতাম। তাছাড়া প্রচার... এইসব অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে প্রচারের কাজ চলত। ইংরেজদের লেবার পার্টির বিভিন্ন গোষ্ঠীও তাতে যোগ দিত। তারা নিজেরা মাঝে-মাঝে যে-সব সভার আয়োজন করত, তখন বলত যে তোমরাও এসো, আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও জানতে চাই। স্পেনের গৃহযুদ্ধকে উপলক্ষ করে আমাদের দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন—সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা হত না। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সঙ্গে হয়তো প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি কোনো সংযোগ নেই, কিন্তু আমাদের সাপ্তাহিক কাজ ছিল আলাপ-আলোচনা সভার আয়োজন করা; বাইরে থেকে

লোক আসত, আমরাও নানা জায়গায় যেতাম ; বড়ো নয়, খুব ছোটো-ছোটো জমায়েৎ হত, হয়তো সবসুদ্ধ্ পঞ্চাশজন এসেছে, কোনো চার্চের মধ্যে বা কারু কম্পাউণ্ডে। আর, এ-সব থেকে, আগেই বলেছি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় খুব সাড়া পড়ে গিয়েছিল : অক্সফোর্ড-কেমব্রিজই শুধু নয়, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডন স্কুল অভ ইকনমিকস—এ-সব প্রতিষ্ঠানেও আলোড়ন দেখা দিয়েছিল।

এই সময়ে জওহরলাল নেহরু সেখানে গিয়েছিলেন, একাধিকবার ; লণ্ডন মজলিশের তরফ থেকে আমরা তখন তাঁকে সম্বর্ধনা জানাই। নেহরুর সঙ্গে তখন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও ছিলেন। নেহরু অবশ্য দু-বার সরাসরি স্পেনে চলে গিয়েছিলেন। লণ্ডন মজলিশে আমাদের সঙ্গে তাঁর অনেক আলোচনা হল, তিনি তখন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইকে সমর্থন করছেন, কাজেই ইণ্ডিয়া লিগ থেকে ব্যবস্থা করেই তিনি স্পেনে গিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে তাঁর সঙ্গে ফিরোজ গান্ধিও গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বারে ইন্দিরাও বাবার সঙ্গে স্পেনে গিয়ে দলোরেস ইবারুরি অর্থাৎ লা পাসিওনারার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ইন্দিরার তখন শরীর খারাপ ছিল। সে-সময়েই কোনো একজনের ফ্ল্যাটে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়, তার আগে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। ইণ্ডিয়া লিগের পক্ষ থেকে তাঁরা যে স্পেনে গেলেন সেটা একটা বড়ো ঘটনা। খুব ছবি-টবি উঠেছিল, ফলাও করে সে-সব প্রচার করা হয়েছিল। কোন-একজন জেনারেল ছিলেন, নামটা আমার ঠিক মনে নেই, নেহরু তাঁর সঙ্গে করমর্দন করছেন— এ-রকম সব ছবি।

তারপর প্যারিসে একটা সমাবেশ হয়। আর তখন ফ্রান্সে কমিউনিস্টদের স্লোগান হচ্ছে : সীমান্ত খুলে দাও, ওপন দি ফ্রন্টিয়ার্স। মানে, ঐ যে ফরাসি সরকার অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছে না, খোলাখুলি জাহাজ যেতে দিচ্ছে না, বরং ফ্যাসিস্তদের প্রকাশ্যে স্পেনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে দিচ্ছে, আর তলে-তলে ফরাসি সরকারেরও যে তাতে সমর্থন আছে—তার বিরুদ্ধেই এই স্লোগান উঠেছিল : সীমান্ত খুলে দাও। নেহরু সে-সময় একবার প্যারিস গেলেন, লা পাসিওনারার সম্বর্ধনাসভায় যোগ দিতে। আমার যতদূর মনে পড়ে, গোড়ায় লা পাসিওনারার ওপর ফরাসি সরকারের নিষেধাজ্ঞা ছিল, কিন্তু চাপে পড়ে পরে তারা বলল, ঠিক আছে, তোমরা সম্বর্ধনাসভা করতে পারো, তবে লা পাসিওনারার তাতে বক্তৃতা দেয়া চলবে না। একটা মস্ত হলে সভা হল। ফিরোজ গান্ধি ছিলেন, রেণু চক্রবর্তী ছিলেন, ছিলেন মোহিত ব্যানার্জি (তিনি আমাদের পার্টির ছিলেন ; তিনিই বাংলায় আমরা যেটা গাই সেই 'আন্তর্জাতিক' অনুবাদ করেন, এটা অনেকেই

জানেন না ; অবশ্য নজরুলেরও একটা অনুবাদ ছিল)। স্বেচ্ছাসেবক এসেছিল অজস্র, সবসুদ্ধু কয়েক হাজার লোক। লা পাসিওনারার তো বক্তৃতা দেয়া সম্বন্ধে সরকারি নিষেধাজ্ঞা ছিল, কিন্তু তাঁকে মঞ্চে আসতে দেয়া হয়। অন্যরা বক্তৃতা দিলেন। সেখানে জওহরলাল নেহরুও বক্তৃতা দেন। নেহরু এখানে লা পাসিও-নারাকে একটা লাল গোলাপের তোড়া উপহার দিয়েছিলেন।

স্পেন সম্বন্ধে এইরকমই কাজ চলেছিল আমাদের। যতদিন গৃহযুদ্ধ চলেছিল, সভাসমাবেশ করা, সমর্থন জানানো, চাঁদা তোলা, ফ্যাসিবাদের নিন্দা ও ধিক্কার, ফরাসি ও ইংরেজ সরকারের নীতির বিরোধিতা ও নিন্দা—ছাত্রদের প্রধান কাজ ছিল এইসব। বিশেষ করে ভালো-ভালো ছাত্ররা, সত্যিকার স্কলার সব, ক্রমেই সি.পি.জি.বি.-র কাছে এসে পড়ে। 'স্টুডেন্ট ফেডারেশন' কাগজে বেশ কিছু লেখাও বেরিয়েছিল।

ফ্যাসিস্তরা রটাচ্ছিল যে স্পেনের ঘরোয়া ঝগড়ায় আন্তর্জাতিক বাহিনী অযথা নাক গলাচ্ছে। এই ছুতোয় ফরাসি বা ইংরেজ সরকার খোলাখুলি অস্ত্র আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করতে দিত না। অথচ ইতালি ও জার্মানি কিন্তু সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়েছিল—যে-কথাটা অনেকেই চেপে যান। যাঁরা রক্ষণশীলদের বা প্রতি-ক্রিয়াশীলদের পক্ষ থেকে বই লেখেন, তাঁরা সবসময়েই দেখাবার চেষ্টা করেন, কমিউনিস্টরা বাইরে থেকে লোকজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছিল। অথচ আসলে ইতালি বা জার্মানি সরাসরি সীমান্ত খুলে দিয়েছিল। আমাদের সভায়-সমিতিতে আমরা এটাই জোর দিয়ে বলতাম, আর তাই সীমান্ত খুলে দেবার জন্য ধ্বনি তুলতাম—যাতে ইংরেজ বা ফরাসি সরকারও সীমান্ত খুলে দেয়। বলতাম, তোমরা তো অবরোধ করেই যাচ্ছ, এদিকে মুসোলিনি যে বৈধভাবে নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে খোলাখুলি লড়াই করছে, তার বেলা ? তাতে তোমাদের টনক নড়ছে না ? কাজেই অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হত লুকিয়ে, পাহারার চোখে ধুলো দিয়ে। সীমান্ত খুলে দিলে অন্যান্য জায়গা থেকেও সাহায্য আসতে পারে। না-হলে মস্কো-টস্কো ঘুরে, যে-সব অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে আনা হত, তা অনেক দেরিতে গিয়ে পৌঁছুত, কিছু হয়তো খোয়াও যেত। ব্রিটিশ সরকার যেহেতু স্পেনকে কিছুই সাহায্য করেনি, সেজন্যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তখন আমাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুদ্ধ আর স্পেনের গৃহযুদ্ধ ওতপ্রোত জড়িয়ে গিয়েছিল। আমরা অনেক সভায় বক্তৃতা দিতাম—তখন তো এত কাগজ বা রিপোর্টার ছিল না—থাকলে আজ সে-সব ছাপা পাওয়া যেত। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন, স্পেনের গৃহযুদ্ধ—এইসব বিষয় নিয়ে যে-সব

লেখা আমাদের কাগজে বেরুত, তা টাকাকড়ির অভাবে ইণ্ডিয়া লিগ থেকে সাইক্লোস্টাইল করে প্রচার করা হত। নেহরুও আমাদের সমর্থন করতেন। যে-সব লেখাপত্র বেরুত, সব আমরা নিজেরাই সাইক্লোস্টাইল করতাম।

আমি বিদেশ যাবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় আর আমি বিদেশ থেকে ফিরে আসার আগেই মোটামুটি ফ্রাঙ্কো জিতেই গেল এক-রকম। অর্থাৎ তখন আমার বয়স বাইশ থেকে চব্বিশ-পঁচিশ বছর। আমার রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটেছিল ইউরোপের একটা প্রচণ্ড অস্থিরতার সময়। এই অস্থির পরিস্থিতিটাই আমাদের সাহায্য করেছিল—বিলেতে গিয়ে এই হুলুস্থুল দেখেই আমরা প্রগতিশীলদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ হই। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে লেবার পার্টির ভূমিকা ছিল নেহাৎই লোক-দেখানো, যৎ-সামান্য; কিন্তু সি.পি.জি.বি. ছোটো দল হয়েও আমাদের অনবরত সাহায্য করে যেত। স্টুডেণ্ট ফেডারেশন, লণ্ডন মজলিশ, ইণ্ডিয়া লিগ যারা করত, তারাই সবসময় ভারতের স্বাধীনতার কথা বলত। সি.পি.জি.বি. সেটা সমর্থন করত। তারপর যখন ফ্যাসিবাদের উৎকট উদ্ভব হল, স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হল, তখনও সি.পি.জি.বি.-ই নেতৃত্ব দিয়েছে, আন্তর্জাতিক বাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। আর সেই সময়েই আমরা কমিউনিস্ট হয়েছি, মার্ক্সবাদ নিয়ে পড়াশুনো করেছি। আবার সেই সঙ্গে কাজের মধ্যেও ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আর কত ছেলেমেয়ে কত গ্রুপ যে আসত, আমাদেরই মতো কাজ করতে চাইত, তারও সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না।

হাইড পার্কে কতগুলো কর্নার ছিল, সেখানে সভা হত; সোমবার হয়তো লেবার পার্টি, মঙ্গলবারে অমুক সোশ্যালিস্ট পার্টি, তমুক দিন ফ্যাসিস্ত পার্টি, তার-পর দিন কনজারভেটিভ পার্টি—গণতন্ত্রের ধারা বজায় রাখার জন্য হিটলার মুসোলিনির সাক্ষাৎ-তাঁবেদারদের জন্যও একটা দিন ধার্য করা ছিল। কেউ বাধা দেয় না, পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে, ফ্যাসিবাদীরা বিষোদ্গার করে বক্তৃতা দেয়। তা একদিন ভূপেশ আর আমি ঘরে ফিরছি, শুনি এক জায়গায় ফ্যাসিস্তরা গরম-গরম বক্তৃতা দিচ্ছে। রক্ষণশীল সরকার নাকি কমিউনিস্টদের সব আব্দার মেনে নিচ্ছে, এই বলে সরকারকে খুব গালাগাল দিচ্ছে, আর হিটলারের বেজায় তারিফ করছে, বাহবা দিচ্ছে। আমরা খানিকটা শুনলাম। তারপর তারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কুৎসা করতে লাগল, জাতিবিদ্বেষ বর্ণবিদ্বেষে ভরা যা-তা কথা বলতে শুরু করল; আরো-কিছু লোক জুটে গিয়েছে তখন, পঞ্চাশ-ষাটজন হবে হয়তো সব মিলিয়ে। তা আমরা ঐ ভারতবিদ্বেষ শুনে বললাম: তোমরা

তোমাদের নিজেদের যা কথা, ফ্যাসিবাদের যা কথা, যা বলার তা বলো—কিন্তু ভারত সম্বন্ধে কথা বলছো কেন? তুমি তো ভারতীয় নও, তোমাকে ভারত সম্বন্ধে আবোল-তাবোল বকবার অধিকার কে দিল? বাস, অমনি গোলমাল লেগে গেল। তারপর আর-কিছু উত্তর দেয় না। আমি তাকিয়ে দেখি প্রায় সব লোকেই আমাদের কথায় সায় দিচ্ছে। সভা পণ্ড হয়ে গেল। সাধারণত এ-রকম কিন্তু হয় না। কাছেই পুলিশ দাঁড়িয়েছিল, তারাও কিছু বললো না। আসলে কুৎসাটা ভব্যতার সীমা এতটাই ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে কনজারভেটিভদেরও তা পছন্দ হত না। বক্তা অবশ্য চটে গিয়েছিল। আমি তাকে বললাম: ভারতকে তো তোমরা পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখেছো, ফ্যাসিবাদের আর বাকি কী রইলো! লোকের দুঃখদুর্দশা কষ্টের অবস্থা তো কিছুই বলছো না—ফ্যাসি-বাদে লোকের দুর্গতি তো আরো বাড়ে বৈ কমে না।

রজনী প্যাটেল, মোহন কুমারমঙ্গলম, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, পি. এন. হাকসার, রেণু চক্রবর্তী, এন. কে. কৃষ্ণাণ, অরুণ বসু, নিখিল চক্রবর্তী—এঁরা তখন খুব নাম করেছিলেন; অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ লণ্ডনে ছাত্রসংগঠনের মধ্যে এঁরা কাজ করতেন। এঁরা সকলেই কমিউনিস্ট ছাত্র গ্রুপে ছিলেন।

স্পেনের পপুলার ফ্রন্টের অন্য-সব চাপা বিরোধ তখন একটু-আধটু টের পাওয়া যেত। সেটা ছিলো থার্ড ইণ্টারন্যাশন্যালের আমল। ট্রটস্কিপন্থীরা নানারকম গোল পাকিয়ে তুলত; তারা একটা জিগির তুলেছিল যে এই গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে একটা বিপ্লব সংঘটিত করতে হবে, শুধু ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতাই যথেষ্ট নয়—যদিও ফ্যাসিবাদই তখন ছিল সবচেয়ে বড়ো সমস্যা; আর এরা সব-সময়েই অব্যবহিত সমকালীন ব্যাপার বাদ দিয়ে অন্য-সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাত, বড়ো-বড়ো বুলি কপচাত। এইসব বাধাকে তত্ত্বের দিক থেকে আদর্শের দিক থেকে বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা করা হত, সি.পি.জি.বি.-র এদিকে বেশ নজর ছিল।

কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের মধ্যে তবু কিন্তু ট্রটস্কিপন্থীদের বিরোধিতায় বেশ খিটিমিটি বেধে গিয়েছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধ শেষ হতে না-হতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেল। তবে আমরা সবাই বুঝলাম যে ভারতবর্ষে যখন ফিরে যাব, স্বাধীনতার আন্দোলন করব, তখন এই ইউনাইটেড ফ্রন্টকে নিয়েই কাজ করতে হবে। ১৯৩৬-৩৯ ছিল ইউনাইটেড ফ্রণ্টেরই যুগ। ভারতবর্ষে কী লেখালিখি হচ্ছে তা আমরা পেতাম, এখানে কী হচ্ছে না-হচ্ছে দেখতাম, তার ওপর এখানে আমাদের বলা হত: তোমরা যখন ভারতবর্ষে ফিরে যাবে, সবাই এক

সঙ্গে কাজ করবার চেষ্টা করবে⋯এখানে তখন কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ছিল। আমাদের সঙ্গে মিলেমিশেই কাজ করত। কিন্তু তবু কোথাও একটা চিড় ধরে যাচ্ছিল। আমরা বিলেতে থাকতে-থাকতেই এইসব ঘটনা ঘটছিল। কংগ্রেসের নেতারাও তখন বিলেত যেতেন। তাঁদের অনেকের শঙ্কা ছিল কমিউনিস্টরা তাঁদের গ্রাস করে ফেলবে। এমনিতে একসঙ্গে কাজকর্ম করছে, অথচ ভেতরে-ভেতরে সন্দেহ করছে। এঁদের সঙ্গে অনেক আলোচনা হত, সভা হত; কারণ এঁরাই তো দেশে ফিরে গিয়ে রাজনীতি করবেন, এঁদের সঙ্গে তাই সদ্ভাব রাখাটা জরুরি—যদিও বোঝা যাচ্ছিল যে মতপার্থক্য বেড়েই চলেছে।

ভারতবর্ষে তখন কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ফ্যাসিবিরোধী একটা আন্দোলন শুরু হয়েছিল, লেখকশিল্পী বুদ্ধিজীবীরা তাতে অংশ নিয়েছিলেন। সি.পি.জি.বি.-র মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ঘটেছিল। আমরা তো আর সরাসরি তৃতীয় আন্তর্জাতিকে ছিলাম না—তার যাবতীয় ইঙ্গিত পরামর্শ নির্দেশ সি.পি.জি.বি.-র মারফৎ আসছিল। যুদ্ধ লাগবার পর তা বদলে যায়। ইংলণ্ডের সঙ্গে মিলে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়া হবে কি না—এটা বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ইংলণ্ড তো তখনও সাম্রাজ্যবাদী দেশ। সি.পি.জি.বি. থেকে তর্কের আয়োজন হয়। হ্যারি পলিট, রজনী পাম দত্ত ও আরো অনেকে সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ শুরু হলে পার্টির উদ্যোগে একটা সভা করেন। হ্যারি পলিট তুখোড় বক্তা ছিলেন। কী করা উচিত, সে নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সেনট্রাল কমিটির অধিবেশন; হ্যারি পলিট দারুণ ভাবে বললেন: আমরা তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমাদের ছেলেরা ট্রেঞ্চে-ট্রেঞ্চে যুদ্ধ করছে—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধ ছিল পরবর্তীকালে কীভাবে ফ্যাসিবাদ প্রবর্তন করা হবে, তারই মহড়া; আবিসিনিয়ার যুদ্ধও তাই। ব্রিটিশরা তাতে কিছু করেনি, চুপ করে থেকে ফ্যাসিবাদকেই সাহায্য করছিল। কিন্তু এখন তো তাদেরও লড়াইতে প্রত্যক্ষভাবে নেমে পড়তে হয়েছে।⋯ সে-বক্তব্য অবশ্য পুরোপুরি গ্রাহ্য হয়নি। তারপর ১৯৪১-এ যুদ্ধ অন্য মোড় নিল। কিন্তু সারাক্ষণ তর্ক চলছিল। ভারতবর্ষের ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনও মোটামুটি ঐ মহাযুদ্ধের সময়কার ব্যাপার। প্রথম অধিবেশন হয়েছিল ১৯৩৬-এ, মুনসি প্রেমচন্দ তাতে সভাপতি ছিলেন। আজ যখন সেদিনগুলোর কথা ভাবি, তখন মনে পড়ে যে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের স্লোগান ছিল, 'উই শ্যাল নট ফাইট ফর আওয়ার কিং অ্যাণ্ড কানট্রি', তখন একটা মস্ত প্রগতিশীলতার ধারা ছিল। শুধু ইউরোপ আমেরিকা বা ইংলণ্ডেই নয়, আমাদের দেশেও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে,

শিল্পীসাহিত্যিকদের মধ্যে একটা মস্ত আলোড়ন উঠেছিল—এঁরা জগতের বিবেক হিসেবে কাজ করছিলেন। ছাত্রদের যে একটা বড়ো ভূমিকা ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ছাত্র-অধ্যাপক, লেখক-শিল্পী, বুদ্ধিজীবী—এঁরা সবাই কমিউনিস্ট না-হলেও ছিলেন অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট—ফ্যাসিবাদবিরোধী। রুখে দাঁড়াবার একটা জঙ্গি চেতনা ও মনোবল ছিল। কোনো বড়ো ঘটনা ঘটলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই খানিকটা সাড়া জাগে, কিন্তু তাকে বাড়াবার জন্য, এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বুদ্ধিজীবীদের একটা ভূমিকা আছে, সেটা সচেতনভাবে করতে হবে। অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি—কত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতে পারে, কাজ হতে পারে। এখনও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কমিউনিস্ট না-হোক প্রগতিশীলতার একটা আদর্শ কাজ করে যায়; মানবিক-বিদ্যাগুলোয়, বিজ্ঞানে, কারিগরিবিদ্যায়, চিকিৎসা-বিদ্যায়—অনেকেই একটা প্রগতিশীল আদর্শের পক্ষপাতী—কাজের মধ্যে দিয়ে সমাজের বিভিন্ন বলয়ে তাঁদের নিয়ে আসার কথাই ভাবা উচিত। স্পেন একবার সবাইকে জড়ো করেছিল, সবাইকে দিয়ে কাজ করিয়েছিল; খানিকটা স্বতঃস্ফূর্ত ধিক্কার ও বিবেকপীড়ন তখন সাড়া তুলেছিল। এখনও শিল্পীসাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা সেভাবে একজোট হয়ে কাজ করতে পারেন। শুধু স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ বা উচ্ছ্বাস থাকলেই চলে না—ভেবেচিন্তে সচেতন ভাবে তাকে সংগঠিত করতে হয়। পঞ্চাশ বছর পরে স্পেনের গৃহযুদ্ধের স্মৃতি এই চিন্তাটাই বিশেষভাবে জাগিয়ে দিচ্ছে।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্পেনের গৃহযুদ্ধ (১৯৩৬-৩৯) স্মরণে

"চিলির জঙ্গল যে দেখেনি সে এই গ্রহটাকেই জানে না, আর সেই নিসর্গব্যাপ্তি আর কর্দম আর নীরবতা থেকে বেরিয়ে গোটা ছুনিয়াতে গান গেয়ে আমি বেড়িয়েছি", বলেছিলেন পাবলো নেরুদা যার স্মৃতিকথায় একটি অধ্যায়ের আখ্যা হল "স্পেন আমার বুকের মধ্যে"। এটা স্বাভাবিক। কারণ চিলি তাঁর জন্মভূমি হলেও দক্ষিণ আমেরিকার অন্য বহু অধিবাসীর মতো স্প্যানিশ ছিল নেরুদার মাতৃভাষা। এ-কথাও ঠিক যে ঐ ভাষার নিবিড় কবিকুঞ্জে যে স্বচ্ছন্দ মধুরিমা তার তুলনা বিরল। ১৯৩৬ সালের ১৯শে জুলাই তারিখে কবিবন্ধুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নেরুদা "কবিতার সবুজ ঘোড়া" সংকলনের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ সম্পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু ঠিক তখনই বেধে গিয়েছিল 'স্পেনের গৃহযুদ্ধ', পঞ্চাশ বছর পরেও যাকে জগৎবাসী স্মরণ করবে বর্তমান ইতিহাসের এক যুগান্তকারী অধ্যায়রূপে। আজকের প্রজন্ম জানবে না, জানার কথাও নয়। কিন্তু বাস্তবিকই নানা ঐতিহাসিক কারণে 'স্পেনের গৃহযুদ্ধ' সব দেশের মুক্তিকামী আর শুভবুদ্ধি-পরায়ণ মানুষের মনে বিরাট একটা আলোড়ন এনেছিল আর সেই আলোড়নের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষে আমাদের মতো কেউ-কেউ কখনও ভুলতে পারব না— ইতিহাসও তার বিপুল তাৎপর্য কখনও বিস্মৃত হবে না।

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের সংসদীয় নির্বাচনে স্পেনের ফাসিস্ত দল 'ফ্যালাঙ্ক্‌স্‌'-কে প্রায় নিঃশেষ করে জনগণের সংযুক্ত মোর্চা ('পপুলার ফ্রন্ট') বিজয়ী শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। সাম্রাজ্যবাদের আনুকূল্যে ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিবাদের পরিপোষক যারা নানা দেশে ছড়িয়ে ছিল তাদের কাছে এমন পরিস্থিতি হল একেবারে অসহনীয়। তাই ১৭/১৮ জুলাই সেদিনের অখ্যাতনামা সেনাপতি ফ্রাঙ্কো আফ্রিকার মরক্কো (যা ছিল স্পেনের দখলে) থেকে বিদ্রোহের ধ্বজা ওঠাল, আর স্পেনের ভূখণ্ডে, বিশেষত উত্তরাঞ্চলে আর বার্সেলোনা, সেভিঈয়ে, সারাগোসা প্রভৃতি শহরে ফ্যাসিবাদীরা গণ্ডগোল বাধাল। এভাবেই আরম্ভ হল রক্তবন্যা আর জনতার যন্ত্রণা যা থামতে বত্রিশ মাস সময় লেগেছিল। সাংবিধানিক পথে বামপন্থার বিজয় যে বরদাস্ত করা হবে না, এটাই হল সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন- ও সহায়তা-পুষ্ট ফ্যাসিবাদের নির্লজ্জ সংকল্প। হিংস্র আক্রমণ থেকে গণতন্ত্র

সংরক্ষণের সংগ্রামে তাই স্পেন হল এক বিরাট বলি। ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে স্পেন আর পর্তুগাল ছিল বহুকাল ধরে সাম্রাজ্যশক্তি হিসাবে যেন সবচেয়ে "বনেদী", আর সেখানে জনশক্তির আবার মাথা তুলে দাঁড়ানো হল গত এক দশকের মাত্র কিছু বেশিকালের ঘটনা।

বত্রিশ মাসের এই 'গৃহযুদ্ধে' স্পেনের অন্তত দশলক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে। দশ লক্ষ দেশবাসী ঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় আর মনে হয় যে বামপন্থা বুঝি বিলুপ্ত হল। নেরুদার কথায় বলা যায় যে মানুষের বিবেক থেকে সেই রক্তাক্ত কণ্টককে হয়তো কখনও ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে না। গর্বের কথা শুধু এই যে গোটা পৃথিবীর সমব্যথী জনগণের রক্ত তখন মিশেছিল স্পেনের বুকে লড়াইয়ের মাটিতে। বহু দেশের সদ্‌বুদ্ধি মানুষ এবং বিশেষ করে সমাজবাদী সাম্যবাদী জনতা স্পেনের এই সংগ্রামের ভাগ নিয়েছিল গভীর বিপুল উন্মাদনা নিয়ে। অন্য বহু দেশের সজাগ জনতা আর যেন তাদেরই অগ্রণী হয়ে কবি-শিল্পী প্রভৃতি সংবেদনশীল মানুষ তাই এগিয়ে এলেন। আবার বলতে চাই নেরুদার কথা যে কবিতার হৃৎপিণ্ড এখন যেন উত্তাল হয়ে উঠেছিল এমনভাবে যে তার তুলনা ১৯৪১-৪৫ সালে সোভিয়েটের অসমসাহসিক মুক্তিযুদ্ধের মতো বহুগুণ-বেশি রক্তক্ষয়ী সময়ে কিংবা জাপানী ফ্যাসিবাদের বিপক্ষে চীনের সুদীর্ঘ নিদারুণ সংগ্রামকালেও দেখা যায়নি।

ইয়োরোপের ইতিবৃত্তে মুক্তিরণে কবিকুলের ভূমিকা অবশ্য প্রোজ্জ্বল। উনিশ শতকে গ্রীসের স্বাধীনতাকল্পে বায়রন-এর আত্মাহুতি, হাঙ্গেরির মুক্তিযুদ্ধে তরুণ অনিন্দ্য নায়ক পেটোফি কিংবা বুলগারিয়াতেও আর-এক তরুণ বোটেভ্-এর মতো মহাকবির প্রাণদান সুবিদিত। ফ্যাসিবাদের অন্তর্নিহিত কলঙ্কের সঙ্গে যেন সামঞ্জস্য রেখেই স্পেনের গণতন্ত্রকে উৎখাত করার জঘন্য দৌরাত্ম্যে নেমে বিদ্রোহীরা প্রথমেই তাই প্রাণ নিল সেদিনের সর্বজনমান্য এবং শ্রেষ্ঠ কবি ফেদেরিকো গারথিয়া লোর্কা-র। কারাবাসে মৃত্যু হল মিগুয়েল এর্নান্দেথ্ এবং অন্যান্য অগণিত কবি গুণী দেশভক্তের। রাফায়েল আলবের্‌তি কোনোক্রমে পলাতক হয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে কবিতার 'গেরিলা' লড়াইয়ের এক অপূর্ব ধারার প্রবর্তন করলেন। কবি তখন জনারণ্যে নির্জন ছিলেন না; যোদ্ধার রসদের মধ্যে তখন কবিতা—এটা রূপক নয়, বাস্তব সত্য, যার অজস্র সাক্ষ্য রয়েছে।

"এবার মোরা পণ করেছি। কলম ছেড়ে ধরবো অসি"—স্বদেশী যুগেই বাঙালি কবির (দেবব্রত বসু কি?) কণ্ঠ থেকে শোনা গিয়েছিল। স্পেনের 'গৃহযুদ্ধ' কালে বাস্তবিকই দেখা গেল কবিরা ছুটে এসেছেন ফাসিস্ত অমঙ্গলের ক্রূর অমানুষিকতার

গ্রাস থেকে সমাজ আর সভ্যতাকে বাঁচাবার যুদ্ধে। স্প্যানিশ লেখকদের কথা বাদ দিলেও দেখা যাবে ফ্রান্সে পল্ এলুয়ার আর লুই আরাগঁ-র উদ্যোগে আর তখনকার দিনে সাম্যবাদে বিশ্বাসী আঁদ্রে মাল্‌রো-র মতো বহু গুণান্বিতের একাগ্র প্রয়াসে লেখকশিল্পীর ভূমিকা ; অডেন, স্পেণ্ডর, ডে ল্যুইস্, ম্যাক্‌নীস্ ও তরুণতর বহুজন সেদিন ফাসিস্ত পৈশাচিকতার আক্রমণ রোধে সাহিত্যের সহযোগিতার সাক্ষ্য দিলেন সতেজে। সুখের বিষয় তখন ছিলেন পশ্চিম জগতে রম্যাঁ রলাঁ এবং আমাদের ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের মতো মরমী মহাভাগ, জীবনের ও সৃষ্টির শিখরে অবস্থান করেও যাদের মনন ছিল "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" (উপনিষদের এই বাক্যটি রবীন্দ্রনাথের একান্ত প্রিয়)। বিশ্বমানবতার পরম প্রতিভূরূপে তাঁরা সে-যুগে জগজ্জনের মুক্তিনির্ঘোষ শোনালেন আর সাম্রাজ্যবাদেরই সহায়তাপুষ্ট ফ্যাসিবাদের "শিশুঘাতী নারীঘাতী কুৎসিত বীভৎসা" 'পরে ধিক্কার হানতে পারলেন।

নেরুদা লিখে গেছেন যে "ফাসিস্তদের বুলেটগুলো যখন স্পেনের 'গীতার'-কে চূর্ণ করতে থাকল, স্বরের বদলে যখন রক্তের উচ্ছ্বাস ফিন্‌কি দিয়ে উঠল, তখন মানুষের যন্ত্রণাদীর্ণ রাজপথে ভূতের মতো আমার কবিতা স্তব্ধ হয়ে গেল আর হঠাৎ যেন একাকিত্বের মেরু থেকে জনতার সান্নিধ্যে আমার উত্তরণ ঘটল। দেখলাম সেই জনতাকে, যার তলোয়ার আর রুমাল হতে চায় আমার বিনম্র কবিতা, যাতে মুছে দিতে রাজি মানুষের বিপুল বিষাদের ঘর্ম আর তুলে দিতে পারি বাঁচবার লড়াইয়ের হাতিয়ার।"

স্পেনে ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে 'পপুলার ফ্রন্ট'-এর জয় এমনই হয়েছিল যে ফ্যাসিবাদীরা সংসদে (Cortes) একটিও আসন পায়নি। কিন্তু হিটলার-মুসোলিনির সহায়তায় সমরবাহিনীতে 'বিদ্রোহ' বাধাল, পৈশাচিকতার পরিচয় দিল অসামরিক জনতার উপর তারা অকথ্য আক্রমণ চালিয়ে। ফাসিস্ত কেতায় 'সামূহিক' (total) যুদ্ধের মহড়া দিল বাদাজজ-এর মতো জায়গায় এক রাত্রে ষাঁড়ের লড়াইয়ের ('বুল্-ফাইট') প্রাঙ্গণে আটকে-পড়া ১৮০০জন সাধারণ নাগরিককে খুন করে। জার্মানি আর ইতালি প্রচুর বিমান সরবরাহ করল, যাতে আফ্রিকা থেকে স্পেনের ভূখণ্ডে সর্বত্র ফাসিস্ত তাণ্ডব ছড়িয়ে পড়ে। নাৎসি জার্মানি আর ফ্যাসিবাদী ইতালির সর্ববিধ সামরিক ও আর্থিক সহায়তা আসতে লাগল ; আর নির্লজ্জভাবে আন্তর্জাতিক বিধি লঙ্ঘন করে স্পেনের আইনসঙ্গত সরকারকে বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ সালের নভেম্বরে তখন প্রায় অজানা ফ্রাঙ্কোকে 'রাষ্ট্রপ্রধান' বলে 'স্বীকৃতি' দেওয়া হল।

১৯৩৬ সালেই রলাঁ-বারবুস্ পারিসে যে-বিশ্বসম্মেলন আহ্বান করেন সেখানে রবীন্দ্রনাথের বাণী গেল। যাতে তিনি বললেন যে আবিসিনিয়া (বর্তমানে ঈথিয়োপিয়া) আক্রমণ করে মুসোলিনি যে "শান্তি" প্রতিষ্ঠা করেছে তার "বুক-ফাটা আওয়াজ"-এর মতোই স্পেনে "যুদ্ধের হুঙ্কার" সারা বিশ্বে "বিভীষিকা" ছড়াচ্ছে। ত্রিশের দশকের প্রথম দিক থেকে ফ্যাসিবাদী জাপান জাগরণোন্মুখ মহাচীনকে বিধ্বস্ত করার যে-দুষ্কর্মে নেমেছিল তা আরো ঘোরতর চেহারা নেয় ১৯৩৭ থেকে। এবং ভারতবর্ষের জনতার শীর্ষমণিরূপে রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠে ও সতেজে সেই জঘন্য দৌরাত্ম্যকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। আশ্চর্য নয় যে স্পেনের 'গৃহযুদ্ধ' শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভারতবর্ষের জনচেতনা জগৎসমক্ষে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জওয়াহরলালের নেতৃত্বে কংগ্রেসও সোচ্চার হল।

সেদিনের লীগ অভ নেশন্স্-এ 'গণতান্ত্রিক' ব্রিটেন ছিল চীনের বিপক্ষে জাপানের অমানুষিক 'আগ্রাসন'-এর সবচেয়ে জোরালো উকিল। স্পেনের 'গৃহযুদ্ধ' আবার জাহির করে দিল এই নির্লজ্জ 'গণতান্ত্রিক' প্রবঞ্চনা। জার্মানি-ইতালির প্রত্যক্ষ সামরিক সহায়তা ও আর্থিক সাহায্য বিনা স্পেনের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক শাসনকে ফ্রাঙ্কোর দস্যুবাহিনী উৎখাত করতে পারত না। শুধু তাই নয়, ব্রিটেন ও ফ্রান্স-এর শাসকদের মধ্যে 'সোসালিস্ট' নামধারী অনেকে থাকলেও (যেমন ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী লিয়ঁ ব্লুম্), স্পেনের আইনসঙ্গত সরকারকে সাহায্য দেওয়া দূরে থাক, ফাসিস্ত পক্ষকে জেতাবার মতলবেই তারা বার করল এক উদ্ভট 'নীতি', অর্থাৎ বলল আমরা কোনো পক্ষকেই সাহায্য দেব না, হস্তক্ষেপ করব না ('non-intervention')। দুরভিসন্ধির এই মুখোশ পরে তারা 'গণতান্ত্রিকতা' (!) বজায় করতে চাইল, কিছুকাল বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করতে পারল, কিন্তু বদমায়েশির এই ছদ্মবেশ অচিরেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ল। আমেরিকাও এই কুকর্মে যোগ দিল সাগ্রহে; স্পেনের নির্বাচিত গণতন্ত্রকে উৎখাত করাই ছিল সেদিনের সমস্ত পাশ্চাত্য শক্তির ঐকান্তিক সংকল্প।

অপরিমেয় বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে সোভিয়েট ইউনিয়ন তখন নেমেছিল সমুজ্জ্বল ভূমিকায়। 'Non-intervention'-এর বুজরুকি ধরে ফেলতে তার দেরি হয়নি। ১৯৩৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত স্পেনের বিধিসঙ্গত সরকারকে সকল সম্ভাব্য সহায়তা দিয়ে যখন সোভিয়েট দেখল যে ব্রিটেন-ফ্রান্সের সমর্থনপুষ্ট ফাসি-বাদীদের সীমাহীন দৌরাত্ম্য সহ্যের সীমা পার হয়ে যাচ্ছে তখন স্পেনের জাগ্রত জনতাকে সোভিয়েট সাধ্যাতিরিক্ত সহায়তা দিতে থাকল, এরোপ্লেন-সমেত সর্ববিধ যুদ্ধোপকরণ পাঠাল। যা না-পেলে আড়াই বছর ধরে অসমসাহসিক সংগ্রাম

স্পেনের পক্ষে সম্ভব হত না। এরই সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল স্পেনের জনতার পাশে দাঁড়িয়ে লড়ল ৪২,০০০ স্বেচ্ছাসৈন্য যারা এসেছিল ৫৪টি দেশ থেকে—আর এদের মধ্যে সোভিয়েট নাগরিকের সংখ্যা হল তিন হাজার। মস্ত লেখা ফাঁদতে হয় সেদিন জগৎ জুড়ে যে-উন্মাদনা জেগেছিল স্পেনের লড়াইকে উপলক্ষ করে, কিন্তু তা সম্ভব নয়। হয়তো অন্যত্র এ-বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লেখার সুযোগ মিলবে। 'স্পেনের জন্য এরোপ্লেন চাই' বলে তখন দেশে-দেশে সাধারণ মানুষ আওয়াজ তুলেছিল। নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়ে ফাসিস্ত এরোপ্লেন যখন নারী-শিশু নির্বিশেষে নিরস্ত্র মানুষের ওপর বোমা বর্ষণ করছিল, তখন ব্রিটেনের মতো দেশেও বয়স্কেরা বলতে চাইছিলেন ছেলেভুলোনো ছড়ার ভাষায়: "Rain, rain, go to Spain!"—আকাশ থেকে ফাসিস্ত মৃত্যুশেল যেন সেই রৌদ্র-করোজ্জ্বল দেশের সাধারণ মানুষকে অবাধে হত্যা না-করতে পারে!

একদিকে ফাসিস্ত জাপান আর অপরদিকে হিটলার-মুসোলিনির অমানুষিকতার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এমনই স্বকীয় ভারত-অভিমান ও বিশ্ববীক্ষাবলে, যে আশ্চর্য হতে হয়। ১৯৩২ সালে ইরান-ইরাক ঘুরে এসে তিনি লেখেন "পারস্যে", যাতে দেখি অবিস্মরণীয় উক্তি: "এশিয়া যদি সম্পূর্ণ না জাগতে পারে তা হলে য়ুরোপের পরিত্রাণ নেই। এশিয়ার দুর্বলতার মধ্যেই য়ুরোপের মৃত্যুবাণ।" এর পাশেই মন উদ্ধৃত করতে চায়, ১৮৫৮ সালে মার্কস্-এঙ্গেল্স্-এর পত্রালাপ, যাতে বলা হয়েছে যে পশ্চিম জগতের "ছোটো এক প্রান্তে" শুধু বিপ্লব ঘটলে তা তো শত্রুর আঘাতে চূর্ণ হয়ে যাবে যদি দুনিয়ার অন্যান্য বিরাট অঞ্চলে তাদের শক্তি অব্যাহত হয়ে থাকে। পূর্ব পশ্চিম সর্বত্র বিপ্লবের জয়যাত্রাকে একসূত্রে গাঁথা তা রবীন্দ্রনাথের ঋষিনেত্রে স্পষ্ট ছিল সন্দেহ নেই।

ত্রিশের দশকে জগৎ জুড়ে ধনতন্ত্রের সংকট সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছিল। মরিয়া হয়ে সাম্রাজ্যতন্ত্র জনশক্তির জয়যাত্রারোধে ফ্যাসিবাদের মতো জঘন্য অমানুষিকতাকে তোষণ করে চলেছিল (এরই উদাহরণ স্পেনের 'গৃহযুদ্ধে' 'non-intervention'-এর কলঙ্ককলুষিত কপটতা)। ১৯৩৫ সালে কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের সপ্তম কংগ্রেস থেকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জনতার মোর্চা সব দেশে গড়ার আহ্বান গিয়েছিল। হিটলারী বদমায়েশির মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে ফাসিস্ত কারাগার থেকেই ১৯৩৪ সালে কম্যুনিস্ট দিমিত্রভ্ বিপ্লবী সাহস ও চারিত্র্যের পরিচয় জগজ্জনকে জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেনই ভারতবর্ষের ভাস্কর প্রতিভার প্রোজ্জ্বল প্রকাশ রূপে। সঙ্গে-সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতির

অঙ্গন থেকে এদেশের পক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল জওয়াহরলাল নেহরুর কণ্ঠস্বর। আর অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত ভাবেই কম্যুনিস্টরা সর্বত্র তখন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকলকে একত্রিত করার বিপুল প্রয়াসে লিপ্ত।

গণতান্ত্রিক স্পেনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সোভিয়েট দেশ ছিল অগ্রণী; দুই দেশের সহমর্মিতা ঘোষিত হচ্ছিল স্পেনের 'লা পাসিওনারিয়া'-র আবেগদীপ্ত ভাষণে আর জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে সোভিয়েট সহযোদ্ধাদের শৌর্যকাহিনীতে। পাশ্চাত্ত্য 'গণতন্ত্র' ছিল ফ্যাসিবাদেরই সহায়; মার্কিন টাকা, তেল, যুদ্ধসম্ভার বিনা ফ্রাঙ্কোর দস্যুবাহিনী পশুবলে স্পেনের গণতন্ত্রের শ্বাসরোধে সমর্থ হত না; ব্রিটেন-ফ্রান্সের সোসালিস্ট নামধারীদের পক্ষ থেকে 'হস্তক্ষেপ না-করার' মুখোশ পরে ফ্যাসিবাদীদের আনুকূল্য বিনা ও আন্তর্জাতিক দুর্বৃত্তির অগ্রগতি সম্ভব হত না। স্পেন আর সোভিয়েটের সৌহার্দ্য দেদীপ্যমান্ হয়ে উঠেছিল যুদ্ধকালের নানা ঘটনার মধ্যে; বৈমানিক গারথিয়া আকাশযুদ্ধে জীবনদাতা রুশবন্ধু জেরাসিমভ্-এর নাম পর্যন্ত নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। আর সারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের চেতনায় তখন প্রোথিত হল নূতন সংকল্প—'No passaran', স্পেনের জনগণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফ্যাসিবাদীদের কিছুতেই অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না। মনে পড়ছে অন্যায়ের অগ্রগতিরোধে এই ধ্বনি স্মরণ করেছি একাধিক-বার সংসদে ভারতবর্ষের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রতিপালনের ব্যপদেশে।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে (মার্চ ১৯৩৬) সভাপতি জওয়াহরলাল উদাত্ত আবেগ সহকারে ফ্যাসিবাদের বিপক্ষে ভারতবর্ষের ঐকান্তিক প্রতিভা সর্বসমক্ষে প্রচার করেছিলেন। এদেশের মুক্তির লড়াইকে গোটা জগতের সংগ্রামেরই অঙ্গীভূত বলে তিনি বিশ্লেষণ করেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধকালে তাই ভারতবর্ষের প্রতিনিধি-রূপে তিনি সেখানে ছুটে যান। সঙ্গে সম্ভবত কৃষ্ণ মেনন ছিলেন। বোধ হয় সাকলাৎওয়ালার নামে যে-স্বেচ্ছাবাহিনী স্পেনের গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তাতে ছিলেন গোপাল মুকুন্দ হুদ্দার নামে একজন ভারতবাসী। এ-দেশের লেখক-শিল্পীদের মনে যে-আলোড়ন এসেছিল তারই প্রকাশ দেখা গেল সদ্যস্থাপিত প্রগতি লেখক আন্দোলনের একজন প্রধানস্থপতি মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দের উপস্থিতি স্পেনের রণক্ষেত্রে। গণতন্ত্রের শিবিরে কিছু পরিমাণে অনৈক্য, দৌর্বল্য এবং বিকৃতি ছিল সন্দেহ নেই; স্পেনের পরম্পরায় নৈরাজ্যবাদীদের যে-ভূমিকা তার ক্লেশকর প্রতিচ্ছায়া পড়েছিল, কম্যুনিস্টদের মধ্যে যারা 'অত্যুগ্র' তাদের নিয়েও সমস্যা জাগছিল; 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেড' পরিচালনা এবং আনুষঙ্গিক কাজে যে-

ধরনের গণ্ডগোল প্রায় অনিবার্য ছিল তার কিছু খবরও মেলে আজীবন স্পেন-প্রেমী হেমিংওয়ে-কৃত *For Whom the Bell Tolls* কাহিনীতে। আড়াই বছরেরও বেশি যুদ্ধ চলে ও শেষ পর্যন্ত অশুভ শক্তির আপাত-অগ্রগতি রুদ্ধ করা গেল না। কিন্তু 'No passaran'. ঘোষণা সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও জগৎ জুড়ে ফ্যাসিবাদী আর সাম্রাজ্যবাদীদের মিলিত দৌরাত্ম্য যে জনশক্তির হাতেই হার মানতে বাধ্য তার বহ্নিময় আভাস তখনই দেখা গিয়েছিল।

স্পেনে হল বিশ্বযুদ্ধেরই মহড়া, যে-বিশ্বযুদ্ধ স্তালিনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিতে ১৯৩৭-৩৮ থেকেই আরম্ভ হয়েছে বলা হল। চীনের ওপর জাপানি হামলা আর ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণে যার সূচনা তা স্পষ্টতর হল স্পেনের গৃহযুদ্ধে, আর অস্ট্রিয়া, চেখোস্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড প্রভৃতি-সম্পর্কিত ক্রমান্বিত ফ্যাসিবাদী দুষ্কর্মে সাম্রাজ্যবাদী আনুকূল্যে ঘোরতর কদাকার নিতে থাকল।

নিজের কথা লিখতে সংকোচ আসছে। ১৯৩৬ সালে প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপনের কিছু পরেই স্পেনের গৃহযুদ্ধ, আর তখন সমাজ-চেতনাকে দূরে রেখে শিল্পী-সাহিত্যিকরা যে কিছুতেই উদাসীন থাকতে পারলেন না তার সব চেয়ে জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য হল রবীন্দ্রনাথের মনের প্রতিক্রিয়া। তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হল অনিবার্য এবং সহজ। মনে আছে তখনকার অ্যালবার্ট হল-এ মস্ত সভা, যেখানে প্রগতি লেখক আন্দোলনে প্রাতঃস্মরণীয় সুরেন গোস্বামী ছিলেন, আর সরোজিনী নাইডু-র মতো যশস্বিনীর সঙ্গে একমঞ্চ থেকে আমাকে বক্তৃতা দিতে হল। তখন যথাসম্ভব সকলকে নিয়ে আমাদের কাজ। একদিকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং 'পরিচয়'-গোষ্ঠী, অন্যদিকে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে চলেছি তখন। 'পরিচয়' পত্রিকায় নামে এবং ছদ্মনামে লিখেছি ; ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত 'প্রগতি' আখ্যা দিয়ে যে-সংকলন সুরেন গোস্বামীর সঙ্গে সম্পাদনা করেছিলেন তাতেও বেনামে আমার স্পেন-বিষয়ক লেখা রয়েছে। সেদিনের দীপ্তিময় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র স্বনামধন্য সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সতেজ সক্রিয় সহায়তায় অগণিত প্রবন্ধ রচনায় লেগেছি যা তখন 'বর্মন স্ট্রিট' থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং অন্যত্র বেরিয়েছে। আর আমাদের সাহিত্যিকদের মনে সেদিনের উন্মাদনার একটা বিশেষ হেতু ছিল—বিলাতের মতো দেশের লেখকদের চিন্তায় ও কর্মে এক বিস্ময়কর আবেগের বহ্নিমান প্রকাশ . স্পেনের রণাঙ্গনে প্রাণ দিল র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্‌স্‌, ক্রিস্টফার কডওয়েল, জন কর্নফোর্ড, ডেভিড গেস্ট্‌-প্রমুখ প্রোজ্জ্বল তরুণ (এদের মধ্যে ফক্‌স্‌-ই বয়সের দিক থেকে একটু এগিয়ে)। কর্নফোর্ডের পিতা কেমব্রিজে অধ্যাপক ছিলেন; জন্‌কে জানতাম না কিন্তু ডেভিড গেস্ট-কে (আর তার বোন্‌কে)

জানতাম, লেবর এমনকি ডক্টর হেডস্ গেস্টের এই দুই সন্তানের সঙ্গে বহু ভারতী-য়েরই হৃদ্যতা ছিল ওদেশে। বাস্তবিকই তখন 'কলম ছেড়ে অসি' ধরার পণ করে-ছিলেন কবি-শিল্পীকুল। পিকাসো যখন আঁকলেন 'গের্নিকা'-র ছবি, তখন ক্রূর, কদর্য, মানবতাধ্বংসী, কলুষকলঙ্কিত ফ্যাসিবাদ (যার উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছিল 'গণতন্ত্র'-এর মুখোশ-পরা সাম্রাজ্যবাদেরই পোষণ এবং তোষণে) ধিক্কৃত হল, যুগ-যুগ ধরে যে-ধিক্কার মানুষকে সাবধান করবে—'No passaran'!

"নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস" বলেই ক্ষান্ত হননি রবীন্দ্রনাথ—ডাক দিয়েছিলেন সবাইকে "দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে / প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে"। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে অকুণ্ঠে রবীন্দ্র-নাথের ঘোষণা প্রচারিত হয়েছিল: "স্পেনের গণফ্রন্ট আর তার সরকারকে দিতে হবে সকলের সহায়তা!" প্রতিক্রিয়া রোধে কোটি-কোটি মানুষের সমাবেশ ঘটুক, গণতন্ত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতেই হবে! চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার যে-উদ্দীপনা দেশে-দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ এবং জওয়াহরলাল নেহরু শুধু নয়, ব্যাপক, বিচিত্র, বিস্তৃত জনচেতনায় যার স্বাক্ষর ছিল প্রোজ্জ্বল, সেই মানসিক আবেশ যেন সময়োচিত রূপে আজকের বিশ্ব-পরিস্থিতির সর্বনাশা যুদ্ধায়োজন-জনিত সংকটের সমাধানে সক্রিয় ও সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

অরুণ বসু

স্পেনের সংকেত

ত্রিশদশকের স্পেনের কথা এবং স্পেনকে কেন্দ্র করে ইউরোপের কথা হয়তো আজকালের ব্যস্ত মানুষের মধ্যে খুব কম লোকই মনে রাখেন। প্রায় ত্রিশ বছরে হয়তো বার পাঁচেক ত্রিশ দশকের স্পেন নিয়ে আমার কারুর সঙ্গে কথা হয়েছে। নোয়াম চমস্কি—যিনি ভিয়েতনামের সফল বিপ্লবের সময় তত্ত্বগতভাবে মার্ক্সবাদ এবং নৈরাজ্যবাদের সমন্বয়ের ভিত্তি খুঁজেছিলেন—বোধকরি একমাত্র আধুনিক লেখক যিনি ত্রিশদশকের ঘটনাবলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাছাড়া স্পেনের কথা হয়তো মনে রাখবেন তাঁরা যাঁরা *Penguin Book of Socialist Verse* বইতে ইংরাজ কবি এবং কমিউনিস্ট জন কর্নফোর্ডের কবিতাটি পড়বেন।

এই বিস্মৃতির কারণ কী? জেরা করলে নানান ধরনের উত্তর পাওয়া যায়। কেউ হয়তো বলবেন স্পেনের লড়াই হয়েছিল আন্তর্জাতিক ও স্পেনের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর হল আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের পতন ঘটেছে। অবশ্য এ-কথা প্রায় সবাই মানবেন যে আজকের পটভূমিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা কিছুটা স্পেনে এবং পরে সমগ্র ইউরোপে ইতালীয় ফ্যাসিস্টের এবং জার্মান নাৎসিদের সমতুল্য। কিন্তু নানান সাদৃশ্য থাকলেও এ-কথা বলা চলে না যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিস্ট এবং ফ্যাসিস্টের পতন থেকে অধুনাতন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিছুই শিক্ষালাভ করেনি। অতএব স্পেনের ত্রিশদশকের লড়াই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? এই কথাটিই ঘুরিয়ে আরেকদল বলেন স্পেনের ১৯৩৬-১৯৩৯ এর ফ্যাসি-বিরোধী লড়াই-এর পূর্বেই ইথিওপিয়ায় আন্তর্জাতিক ফ্যাসিস্ট বিরোধী যুদ্ধ শুরু হয়। সেই ইথিওপিয়া আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কবলের বাইরে, কিন্তু স্পেন আজও গণভোটের ভিত্তিতে মার্কিন পরিচালিত অ্যাটলান্টিক সামরিক জোটের মধ্যে। অতএব…। উপরিউক্ত বক্তব্যগুলি সহজেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে একটু তলিয়ে দেখলে হয়তো এই সিদ্ধান্তেও পৌঁছনো যায় যে স্পেনে সেই প্রায় বিস্মৃত ঘটনাবলির থেকে আজকের অবস্থাতেও কিছু তাৎপর্য-পূর্ণ শিক্ষা আমরা খুঁজে বের করতে পারি।

২

প্রথম শিক্ষা হল সমাজ পরিবর্তনের রাজনীতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার সমস্যা। এই প্রসঙ্গে স্পেনের শিক্ষা হল: নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলেও ক্রমাগত সমাজ ব্যবস্থায় ছোটোবড়ো রকমের সংস্কার করতে থাকলে বামপন্থী শক্তিসমূহ এগিয়ে যেতে পারে। এ-কাজে হাত দিলে শোষিত শ্রেণীর কৃষক শ্রমিকদের সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার আগেই তাদের রাজনৈতিক অগ্রগতির ও সংগঠনের ভিত্তিতেই নিজস্বার্থে এবং শ্রেণীস্বার্থে উৎপাদন করার সঞ্চয় করার কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে পড়ে। তারা একবার এই কাজে হাত দিলে শোষকশ্রেণীর পক্ষে তাদের পরাস্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

১৯৩৬-১৯৩৮ সালে স্পেনের বেশির ভাগ শ্রমিক দীর্ঘ ১০০ বছরের অ্যানার্কিস্ট মতবাদের ও সংগ্রামের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল। কৃষকরা অসংগঠিত অবস্থায়, হঠাৎ জমিদাররা পালিয়ে যাওয়ায়, জমির দখলদার হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় কিছুটা তাদের নিজেদের চেষ্টায় কিছুটা অ্যানার্কিস্ট এবং বামপন্থী সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির উদ্যোগে কৃষক-শ্রমিকরা খেতখামার এবং কলকারখানায় উৎপাদন কথার দায়িত্ব নিজেদের জাতে তুলে নেয়। এর ফলে যে-অর্থনৈতিক অচল অবস্থার ওপর ভরসা ক'রে ফ্যাসিস্ট সামরিক বাহিনী যুদ্ধে জেতবার স্বপ্ন দেখছিল তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

যদিও কাগজে-কলমে প্রমাণ পাওয়া যায় না, হয়তো ইলিয়া এরেনবুর্গের উপন্যাসে ছাড়া, এ-কথা মনে করা যেতে পারে যে স্পেনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে পূর্ব-ইউরোপে কোনো-কোনো দেশে—যেমন চেখোস্লোভাকিয়ায়—আরো সক্ষম ভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল। স্পেনের রিপাবলিকের পতনের দশ বছর পরে এই দেশগুলিতে নির্বাচনে বিজিত গণ যুক্তফ্রন্ট অল্প সময়ের মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে। বিপরীত ঘটনা দেখা যায় ৩০ বছর পরে চিলিতে। সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর একাংশ তাদের নির্বাচিত বামপন্থী সরকারের ভবিষ্যৎ বিপন্ন ক'রে উৎপাদন কমিয়ে দেয় এবং শেষ অবধি নিরাশ জনসাধারণের নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতার সুযোগ নিয়ে নিষ্ঠুর সামরিক হুন্তা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের সাহায্য নিয়ে ক্ষমতা দখল করতে সাহায্য করে।

৩

দ্বিতীয় শিক্ষাটি হল সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করতে গেলে শুধু যারা নির্বাচনে

সপক্ষে ভোট দিয়েছে তাদের উপর নির্ভর করলে চলে না। সঙ্গে-সঙ্গে যারা নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনায় অবিশ্বাস করে তাদের অবিশ্বাস করলেও চলে না।

স্পেনে সংখ্যালঘু কমিউনিস্টদের সংখ্যাগুরু অ্যানার্কিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, এবং কিছুটা মন মিলিয়ে, কাজ করতে হয়েছিল। অ্যানার্কিস্টরা নির্বাচনের ভাঁওতাবাজি একেবারেই এড়িয়ে চলতে চাইত। নির্বাচনের মাধ্যমে এমনকী কোনো রকমের রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে থেকে অথবা কোনো নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলেও সমাজ পরিবর্তনের কাজ করা সম্ভব ব'লে মনে করত না। আবার স্পেনের কমিউনিস্টরা ও যারা নির্বাচনে বিজিত গণফ্রন্ট সরকারে অংশগ্রহণ করেছিল—তারাও মনে করত ধনতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে ফ্যাসি-বিরোধী রাজনীতি করতে গেলে সম্পত্তিগত নিয়মকানুনের কোনো আমূল পরিবর্তন করার চেষ্টা করা ভুল, অথচ স্পেনের কয়েকটি অঞ্চলে—বিশেষ করে কাতালোনিয়ায়—বড়ো খেতখামার এবং কিছু বড়ো কলকারখানার উৎপাদন করতে থাকেন কৃষক-শ্রমিকরা নিজেদের হাতে খেতখামারের পরিকল্পনার ভার তুলে নিয়ে।

৪

নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এলেও মিলিটারি কায়দায় সংগঠন গড়ার কাজ, সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবার কাজ, এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য শান্তিময় রক্তপাতবিহীন সংগ্রামে যেমন বাম-বেবামের খেলা আছে, সফল বা বিফল হওয়া যায়—এক্ষেত্রেও তাই বলা চলে। ভুল করার ভয়ে চোখ বুজে থাকা চলে না।

এ-দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে বিশেষ অবস্থায় হয়তো নির্বাচনের রাজনীতিতে বারে-বারে জেতা যায়, কিন্তু তার মধ্যেই সফলতা সীমাবদ্ধ থাকে। সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় থাকলে অথবা সে-পথে যেতে বাধ্য হলে—যেমন স্পেনে ত্রিশদশকে হয়েছিল—মিলিটারি প্রস্তুতি অনিবার্য। এটি হল স্পেনের ত্রিশদশকের তিক্ত অভিজ্ঞতার তৃতীয় শিক্ষা।

পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর দশকে একাধিক দেশে নির্বাচন লড়ার কৌশলের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের কৌশলের সমন্বয়ের মধ্যে বামপন্থী নেতৃত্বে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের কাজ সফল ভাবে করা সম্ভব হয়েছে। অপর দিকে চিলিতে—যেখানে দুই কৌশল একে-বারে আলাদা এবং পরস্পরের বিপরীত মনে করা হয়েছিল—দুই কৌশল একেবারে ভিন্ন করে দেখার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই বিনা যুদ্ধে বামপন্থী সরকারের পতন হয়।

৫

আধুনিক যুগে যে-দেশগুলিতে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রচেষ্টাগুলি সফল হয়েছে তাদের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে সে-সব ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতীয়তা-বাদের সফল সংযুক্তি হয়েছিল।

১৯৩০এর দশক স্পেনে এই দুই মতবাদের সংমিশ্রণে একাধিক কারণে আন্ত-র্জাতিকতার পরিমাণটা যেন একটু বেশি ছিল এবং জাতীয়তাবাদের পরিমাণটা প্রায় ছিল না বললেই চলে। অ্যানার্কিস্টরা জাতীয়তাবাদে আদৌ বিশ্বাস করতেন না। তখনকার স্পেনের কমিউনিস্টরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সংগঠন অর্থাৎ কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের তাত্ত্বিক এবং সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ একটু বেশি মেনে চলতেন। ফলে স্পেনের ফ্যাসিস্টরা স্প্যানিশ স্বদেশপ্রীতিকে কিছুটা নিজেদের কাজে লাগাতে পেরেছিলেন।

যুদ্ধ শুরু হবার পর স্পেনের রিপাবলিকান সরকার সোভিয়েত ব্রিটেন এবং ফ্রান্স থেকে অস্ত্র আমদানি এবং বিশেষ ক'রে ফ্রান্সের সমসাময়িক সদ্য-নির্বাচিত গণ-ফ্রন্টের সরকারের সমর্থনের ওপর একটু বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। ফ্রান্সের বাম সরকারের পতন ঘটার পর এবং ব্রিটিশ সরকারের ফ্যাসিস্টদের পক্ষে তথাকথিত নিরপেক্ষ ভূমিকার ফলে শেষ অবধি তিন বছরের লড়াইএর পর স্পেনের রিপাবলিকের পতন হয়। আরো আত্মনির্ভরশীল হ'তে পারলে হয়তো চীনের কমিউনিস্টদের মতো স্পেনের বামপন্থীরাও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁদের ফ্যাসি বিরোধী সংগ্রামে চালিয়ে গিয়ে বিজয়ী হ'তে পারতেন।

৬

১৯৩৯ সালে স্পেনের বামপন্থী রিপাবলিকান সরকার যুদ্ধে হেরে যায়। বিদ্রোহী জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত ফালাঞ্জিস্ত (Falangist) পার্টির সরকার ক্ষমতা দখল করে।

এহেন যুদ্ধে বিজয়ী ফ্যাসিস্ট সরকার কিন্তু তারপর দীর্ঘকাল ধ'রে যুদ্ধ এড়িয়ে বলে। এমনকি ১৯৪২ সালে যখন জার্মান নাৎসিরা সমগ্র ইউরোপ তাদের দখলে এনে ফ্যালে, তখনও ফ্যাসিস্ট স্পেনের ফ্যালাঞ্জিস্ট সরকার বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়নি, ফ্যাসিস্ট ইতালি ১৯৪০ সালে যুদ্ধে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও। অথবা উল্লেখ্য যে স্পেনেই সর্বপ্রথম ফ্যাসিবাদ যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে ক্ষমতা দখল করে। বিশ দশকে ইতালিতে, এবং ত্রিশদশকে জার্মানিতে নির্বাচনে জিতে এবং যুদ্ধ না-ক'রেই ফ্যাসিবাদ ক্ষমতা দখল করে। স্পেনের ফ্যাসিবাদের এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

স্পেনের ফ্যাসিবাদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হল যে একমাত্র স্পেনেই শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে, বিনা যুদ্ধে, প্রথমে ফ্যালাঞ্জিস্ত পার্টির, তার পরে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর একনায়ক সরকারের, পতন ঘটে। এই দুই বৈশিষ্ট্যের কারণ বোধহয় একটিই। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ অবধি যুদ্ধ ক'রে স্পেনের ধূর্ত শোষক শ্রেণী বুঝতে পেরেছিল যে স্পেনের পরাজিত জনসাধারণ আবার যুদ্ধ বরদাস্ত করবে না এবং ফ্যাসিস্ট সৈনিকরাও কঠিন যুদ্ধে জয়লাভ ক'রেও ক্লান্ত। তাছাড়া স্পেনের জনসাধারণকে আবার যুদ্ধে ভিড়িয়ে দিলে তারা হয়তো আবার সমাজ পরিবর্তনের পথ খুঁজে নেবে।

তাই আজ স্পেনে নির্বাচনের রাজনীতি আবার ফিরে এসেছে, কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের কাজ নতুন ক'রে শুরু হয়নি। ত্রিশদশকের গণফ্রন্টের শরিক সোশ্যালিস্ট পার্টির এক অংশ আজকাল নির্বাচন জিততে ব্যস্ত, কিন্তু সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের কাজে হাত দিতে নারাজ।

অপর দিকে স্পেনের ইউরোকমিউনিস্টরা স্পেনে এইভাবে শান্তিময় পরিবেশে ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে ব'লে মনে করছেন ; এ থেকে প্রমাণ হয় যে শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে থেকেই সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব। কিন্তু স্পেনের গত ৫০ বছরের ইতিহাস শুধু সাক্ষ্য দেয় যে স্পেনের শোষকশ্রেণী ১৯৩৬-১৯৩৮ সালের ঘটনাবলি থেকে বুঝেছে যে প্রয়োজন হ'লে স্পেনের জনসাধারণ সশস্ত্রসংগ্রাম ভালোভাবেই করতে পারে এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের কাজেও হাত দিতে পারে। তাই তারা শুধু ক্ষমতার দখলের লড়াই করতে গিয়ে যুদ্ধে নামতে ভয় পায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে শোষকশ্রেণী তার শোষণ করার অধিকারে বাধা পড়লে যুদ্ধে নামবে না।

আজকাল ত্রিশ-চল্লিশ দশকের তুলনায় সব দেশের শোষকশ্রেণীরা আগের মতো সহজে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় না। তাছাড়া তারা পারতপক্ষে যে-কোনো এক এবং অদ্বিতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের উপর নির্ভরশীল হ'তে চায় না। নির্বাচন এবং বিকল্প সরকার গঠন করার সুযোগ বজায় রেখে তারা তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের বদলাতে থাকে। কিন্তু এর সঙ্গে-সঙ্গে তাদের শোষণ করার অধিকার রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করতে পিছু-পা হয় না। নাম বা শ্রেণীর এই অভিনব নীতির সঠিক উত্তর দেওয়া যায় শান্তিময় পরিবেশে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে নয়—সঠিক জবাব যুদ্ধ এবং নির্বাচনের রাজনীতি করার ব্যবস্থা রাখা এবং করা। যেমন নিকারাগুয়ায় সান্দিনিস্তারা করছে। তারাই হয়তো স্পেনের ত্রিশ দশকের সংকেত সঠিক বুঝতে পেরেছে।

সুশোভন সরকার

ফ্যাশিবাদের পশ্চাৎপট

১

মুসোলীনি ও ইল্ ফাশিস্‌মো

সাম্যবাদীরা যে-সময় রাশিয়ায় কর্তৃত্বস্থাপনে ব্যস্ত, তখন ইটালিতে ফাশিজম নামে এক নূতন আন্দোলনের উদয় হয়। পরে এই ফাশিস্ট মতই সকল প্রকার সমাজ-তন্ত্রবাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে; মার্ক্সপন্থার প্রতিক্রিয়াই তার মূল প্রেরণা। এতে ক'রে যে-আদর্শ ও চিন্তাধারার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তার পিছনে বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থার সংঘাত সূচিত হচ্ছে, উত্তরসামরিক ইতিহাসের প্রধান বিষয়বস্তু তারই বিবরণ। প্রতিক্রিয়ার প্রথম অবস্থাতে মুসোলীনির দেশে তার নামকরণ হয় ইল্ ফাশিস্‌মো। প্রাচীন রোমে একসঙ্গে বাঁধা কতকগুলি দণ্ডকে রাজশক্তির চিহ্নরূপে ব্যবহার করা হ'ত—তার লাতিন নাম থেকেই ফাশিস্‌মো কথাটির উৎপত্তি। এই প্রতীকটির থেকে নূতন আন্দোলনের দুটি মূলসূত্র আবিষ্কার করা যায়—রাষ্ট্রশক্তির প্রতিভূ নেতাদের কর্তৃত্ব স্বীকার এবং সকলের সম্মেলন রূপ-বন্ধনের মধ্য দিয়ে জাতির অখণ্ড ঐক্যকামনা।

এই প্রতিক্রিয়ার ইটালিতে প্রথম উদয় হবার কারণ অবশ্য সে-দেশের বিশেষ অবস্থা। উনিশ শতকের পুনরুজ্জীবন-আন্দোলনে ইটালিতে এল ঐক্য আর মুক্তি, ১৮৭০ পর্যন্ত তার সাফল্য দেশকে উদ্দীপিত ক'রে রেখেছিল। তার পরের অর্ধ-শতাব্দীতে কিন্তু ইটালীয়দের ভাগ্যে জুটল অবসাদ ও আশাভঙ্গ। এর প্রকৃত কারণ বোধ হয় ইটালির আর্থিক, ও তার ফলে রাষ্ট্রিক দুর্বলতা এবং অনুন্নত অবস্থা; মহাশক্তি হ'লেও নব্য ইটালি সামর্থ্য ও প্রতিপত্তিতে অন্যদের অনেক পিছনে রইল। আফ্রিকায় এই সময় সাম্রাজ্যস্থাপনের চেষ্টায় আশানুরূপ সাফল্যের অভাব এই দুর্বলতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। মহাযুদ্ধের আগেই ইটালিতে অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছিল যে এ-ব্যর্থতার জন্য দায়ী দুর্বল নেতৃত্ব, এবং তারও মূলে রয়েছে ইংরাজ ও ফরাসিদের অনুকরণে গঠিত পার্লামেণ্টীয় শাসনপদ্ধতি। অসন্তোষ এইভাবে ক্রমে-ক্রমে দেশের মধ্যে জ'মে উঠছিল। আর বস্তুতই এ-যুগে ইটালির গণতান্ত্রিক শাসকেরা কোনোদিকে কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। রাজনীতি কতকগুলি লোকের ব্যবসায় কিংবা খেলা হ'য়ে উঠেছিল। গোঁড়া ক্যাথলিক ও সাধারণ লোকের

বিরোধে দেশ তখনও বিভক্ত, তার উপর প্রাদেশিক মনোভাবের জন্য আর সমাজতন্ত্রের আন্দোলনে ঐক্য হ'ল আরো সুদূরপরাহত। দেশে লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছিল—অথচ নিজেদের উপনিবেশের অভাবে বিস্তর লোক বিদেশে বসতি ক'রে বিদেশীদের মধ্যে মিশে যাচ্ছিল। আর্থিক উদ্যমের অভাবে অন্যদের তুলনায় ইটালি দরিদ্র থেকে যায়, আর সেইজন্য রাষ্ট্রমহলে তার বিশেষ প্রতিপত্তিও ছিল না। সাম্রাজ্য গড়তে গিয়ে আবিসিনিয়ায় হল দারুণ পরাজয় (১৭৯৬)—সম্প্রতি তারই প্রতিশোধ নেবার উত্তেজনা মুসোলীনির আফ্রিকায় অভিযানকে জনপ্রিয় করতে পেরেছিল। এরও আগে, ইটালির মুখের গ্রাস টিউনিস্ ফ্রান্স হঠাৎ নিজে দখল ক'রে বসে (১৮৮১) এবং অনেকটা সেইজন্যই ইটালি জার্মানির দলে যোগ দেয়। তাতে বিশেষ সুবিধা না-হওয়াতে ইটালি স্বেচ্ছাবিহার আরম্ভ করে। তুরস্কের কাছ থেকে ট্রিপোলি (লিবিয়া) অধিকার (১৯১১) কিন্তু জার্মানদের কাছে প্রীতিপদ হয়নি। এভাবে খানিকটা ভাসতে-ভাসতে শেষে ইটালি মিত্রপক্ষে যোগ দেয় (১৯১৫)— তার কারণ অবশ্য লণ্ডনের গুপ্ত চুক্তিতে অনেক লাভের আশ্বাস।

মহাযুদ্ধের আগে এই ছিল ইটালির অবস্থা। দেশের মধ্যে বহুদিন একমাত্র প্রাণবান্ প্রচেষ্টা ছিল সোশ্যালিস্ট-আন্দোলন, কিন্তু সে-মতবাদে দেশ অপেক্ষা শ্রেণী-স্বার্থের উপরেই বেশি জোর পড়ত। এ-অবস্থায় মুসোলীনির আগেও কতকগুলি ছোটো-ছোটো দল নব-জাগরণের অগ্রদূত হিসাবে দেখা দিল। মারিনেত্তির ফিউচারিস্ট-মণ্ডলী এক অভিনব ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখল যেখানে অতীতের আবর্জনা দূর এবং গণতন্ত্রের স্থানাভাব হবে ; যুদ্ধবৃত্তিকে মারিনেত্তি বলেছিলেন জগতের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়। জেন্টিলের আদর্শবাদ চিন্তাশীল লোকদের বোঝাতে লাগল যে স্টেটের একটা নৈতিক সত্তা আছে, রাষ্ট্রশক্তি উদারনীতির শান্তিরক্ষক মাত্র কিংবা মার্ক্স-কথিত নিষ্পেষক নয়। কোরাডিনি লিবিয়াতে যুদ্ধবিগ্রহের সময় এক জাতীয়-দল গঠন করলেন, যার মূলমন্ত্র হল দেশের জন্য আত্মত্যাগ ; তিনি বললেন যে ইটালি দরিদ্র ব'লেই তাকে সাম্রাজ্যতন্ত্রে ব্রতী হ'তে হবে আর সে-উদ্যমে গণতন্ত্রের দ্বারা কোনো কাজ হবে না। জনৈক শ্রমিক নেতা রসোনি এক জাতীয়-শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ করেন—শ্রমিক-স্বার্থের সঙ্গে অন্যদের স্বার্থের অভিন্নতা প্রচার ক'রে তিনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন যে বঞ্চিত শ্রেণীর থেকে বেশি সত্য হ'ল বঞ্চিত জাতি, আর ইটালির স্থান তাদেরই মধ্যে। সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রসার ইটালীয়দের মনে যে-ঝঙ্কার তুলছিল, মুসোলীনির অগ্রগামীরা এইভাবে তার প্রকাশেরই চেষ্টা করছিলেন।

মুসোলীনি তখন চরমপন্থী সোশ্যালিস্ট। তার পরে তাঁর অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু নির্ভীক সক্রিয় স্বভাবে আগেকার সঙ্গে এখনকার মুসোলীনির সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ইটালি অবশ্য নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু তখন মুসোলীনির মনে হ'ল যে অগ্নিস্নানের মধ্য দিয়েই দেশের পুনর্জীবন লাভ এবং সমাজের পুনর্গঠন সম্ভবপর হবে। অনেকখানি তাঁরই আন্দোলনে জনমত শাসকদের যুদ্ধে পাঠাল। কিন্তু সমরকালীন অভিজ্ঞতা তাঁকে আরো উত্তেজিত করে। তিনি দেখলেন যে কর্তৃপক্ষের রণচালনায় ও শাসনকার্যে অকর্মণ্যতা আর দেশের মধ্যে খণ্ডস্বার্থের সন্ধান ইটালিকে দুর্বল ক'রেই রাখল। প্যারিস শান্তি সভায় ইটালি তার ন্যায্য পাওনা পেল না ব'লে দেশে এবার তুমুল হুলুস্থুল প'ড়ে গেল। প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন কিছুতেই ফিউম্‌ নগরী ইটালির রাজ্যভুক্ত হ'তে দেননি। তখন যুদ্ধান্তের নির্দেশ অমান্য করার পথ প্রথম দেখালেন ইটালির কবি দানুন্‌ৎসিও—একদল স্বেচ্ছাসৈনিক নিয়ে তিনি হঠাৎ ফিউম্‌ দখল ক'রে বসলেন। সমরশেষের উত্তেজনার সময় মুসোলীনি তাঁর প্রথম ক্ষুদ্র দল গড়লেন—এই সময় ও এর আগেও ১৯১৫তে মুসোলীনির অনুচরদের ফাশিস্ট নাম ব্যবহার আরম্ভ হয়। তাঁর সঙ্গে সোশ্যালিস্টদের পার্থক্য এর আগেই তাঁকে সে-দলছাড়া করেছিল।

১৯১৯এ কিন্তু ইটালিয়ান সোশ্যালিস্টদেরই ছিল প্রবল প্রতিপত্তি—তাদের দ্রুত দলবৃদ্ধি হচ্ছিল এবং রুশ-বিপ্লবও তখন এদের মধ্যে নূতন আশার সঞ্চার করে। নির্বাচনে তাদেরই তখন প্রভূত সাফল্য হয়েছিল (১৯১৯)। এমনকি এক সময় (১৯২০) ফ্যাক্টরি ও বড়ো জমিদারিগুলি প্রায় শ্রমিক-সংঘদের আয়ত্তে এসে পড়ে। কিন্তু জার্মানির মতন এখানেও সোশ্যালিস্টরা আস্ফালন করলেও প্রকৃত-পক্ষে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল না—রাষ্ট্রশক্তি তাদের মুষ্টির মধ্যে এসেও হস্তচ্যুত হ'ল। সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি আর সাহসের অভাবে তারা ইতস্তত ক'রে এ-সময় রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করার সুযোগ হারাল। তারপর ১৯২১ থেকে তারা পরস্পরের নিন্দায় রত নানা দলে বিভক্ত হ'য়ে পড়ে। সুযোগ থাকলেই যে রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পন্ন হয় না, যুদ্ধের অব্যবহিত পরে জার্মানি ও ইটালির অভিজ্ঞতা তার পরিচয় দেয়।

সোশ্যালিস্টদের এই সুযোগ শেষ হবার পর এল প্রতিপক্ষীয় ফাশিস্টদের অভিযান। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নানা নেতার কর্তৃত্বে ফাশিস্ট দলগুলি নিকটবর্তী সোশ্যালিস্টদের তখন সবলে দমন করতে আরম্ভ করল। ১৯২০এর আতঙ্কের প্রতিশোধ নেবার জন্য আর ভবিষ্যৎ কণ্টকোদ্ধার করতে, ফাশিস্টরা নিজেদের ইচ্ছামতো সমাজতন্ত্রীদের শিক্ষা দিতে লাগল। একদল কর্তৃক অন্যদলের এই

নিপীড়নে ইটালির দুর্বল শাসকেরা কোনো বাধা দিলেন না, পক্ষান্তরে ধনিকদের অবশ্য সম্পূর্ণ সহানুভূতি পায় এই ফাশিস্ট-মণ্ডলীগুলি। ফাশিস্টদের অনেক স্থানীয় নেতা থাকলেও সারাদেশে ফাশিস্ট-কর্তা হিসাবে মুসোলীনিই অভিনন্দিত হলেন। ধনতান্ত্রিক স্টেট যেখানে দুর্বল সেখানে দল গঠন ক'রে প্রহারের সাহায্যে শ্রমিক-দের শান্ত করার উপায় মুসোলীনি ও তাঁর পার্শ্বচরেরা উদ্ভাবন করেন। মুখে ফাশিস্টেরা যাই বলুক কার্যত এতে ধনিকদেরই প্রভুত্ব সুরক্ষিত হ'ল।

এর পরও কিছুদিন দেশে অরাজকতা চলল। অন্য রাষ্ট্রিক দলগুলি এবং পলিটিক্স-ব্যবসায়ী শাসকেরা পদে-পদে অকর্মণ্যতা দেখাতে লাগলেন। অন্যদিকে ১৯২১ থেকে মুসোলীনি ফাশিস্টদের একটা সুসম্বদ্ধ দলে পরিণত করেছিলেন। ১৯২২-এর অক্টোবরে চারিদিক থেকে ফাশিস্ট দলবল রাজধানী রোমে সমবেত হ'ল—ইটালির রাজা তখন শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় মুসোলীনিকেই প্রধানমন্ত্রীর পদাভিষিক্ত করলেন। এইভাবে ফাশিস্ট-দলের হাতে রাজ্যভার আসে। অবশ্য এর আগে থাকতেই সোশ্যালিস্ট-দমনের ফলে ফাশিস্ট-মণ্ডলীগুলিই বহু অঞ্চলে সর্বেব কর্তা হ'য়ে উঠেছিল। ১৯২২ থেকে ইটালির নবযুগ আরম্ভ।

প্রথম কিছুকাল রাষ্ট্রশাসনে ফাশিস্টদের সঙ্গে অন্য কয়েকটি দলও সহযোগিতা করেছিল, তাদের ফাশিস্ট-মিত্র আখ্যা দেওয়া হয়। মুসোলীনির কর্তৃত্ব তাই প্রথমদিকে বলশেভিকদের আধিপত্যের মতন স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে ইটলিতেও প্রকৃত একনায়কত্ব আসে। ক্যাথলিক রাষ্ট্রনেতা ডন্ স্টুর্‌জো ১৯২৩ সালে সম্ভবত পোপের নির্দেশেই স'রে দাঁড়ালেন। ১৯২৪এ সোশ্যালিস্ট-নেতা মাটিয়টি নিহত হন; এই হত্যাকাণ্ডে ফাশিস্টনেতাদের কেউ-কেউ লিপ্ত থাকায় প্রথমে মুসোলীনির প্রতিপত্তির কিছু ক্ষতি হয়, কিন্তু পরবৎসর থেকে ফাশিস্টরা খোলাখুলিভাবে নিজেদের বিপ্লবী ব'লে পরিচয় দিতে আরম্ভ করল—নূতন ইটালি গড়বার রবও তখন থেকে আরম্ভ হয়। আরো কিছুকাল পরে নূতন শাসনপদ্ধতির উদ্ভব হ'ল এবং নূতন কর্‌পোরেটিভ-রাষ্ট্রের আদর্শে ইটালির পুনর্গঠন সেই থেকে ফাশিস্‌মোর লক্ষ্য ব'লে গণ্য হ'য়ে আসছে।

ফাশিজম প্রথম থেকেই একটা বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতির রূপ নেয়। কিন্তু তার পিছনে সাম্যবাদের মতন কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ ছিল না। মুসোলীনি নিজেই থিওরির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন যে তাঁর আন্দোলন কর্মপ্রধান ও সজীব, তার মধ্যে বাঁধা মতবাদের সন্ধান বৃথা। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল যে মুসোলীনির কর্মপদ্ধতি অন্যত্রও সঞ্চারিত হচ্ছে আর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর ঝোঁক দেওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের ফাশিস্টদের মধ্যে একটা আন্তরিক মিলও

আছে। আজকের দিনে তাই একটা সাধারণ ফাশিস্ট-দৃষ্টিভঙ্গির অস্তিত্ব সর্বসম্মত। ফাশিস্ট রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সমর্থনও ক্রমে একটা বিশেষ মতবাদের বিজ্ঞাপন হ'য়ে পড়ছে। নাৎসি-বিপ্লবের পর অবশ্য মুসোলীনি তাঁর তথাকথিত নেপোলিয়ান্-সদৃশ ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছেন। হিটলারি-আন্দোলন এখন বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার বৈধ কারণ আছে—ইটালির থেকে জার্মানির স্বাভাবিক শক্তিসামর্থ্য অনেক বেশি। তবুও ফাশিস্ট-মতবাদের ইতিহাসে মুসোলীনি নিশ্চয়ই পথপ্রদর্শকের আসন দাবি করতে পারেন।

ফাশিস্মোর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য—সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধাচরণ। এই-খানেই সকলজাতীয় ফাশিস্ট-দলের মূলগত ঐক্য। ইটালি ও পরে জার্মানিতে উদীয়মান ফাশিস্টদের শ্রমিকদমন ও ধনিকদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য আকস্মিক ব্যাপার নয়। শুধু মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিকস নয়, মার্ক্সের প্রধান বিশ্বাস সবগুলিই ফাশিস্টেরা সগর্বে ত্যাগ করেছে। শ্রেণী-প্রত্যয়ের প্রভাব, শ্রেণী-সংঘর্ষে বিশ্বাস, শ্রেণীবিহীন সমাজের আদর্শ, ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা, আর্থিক শোষণের ধারণা, স্টেটের প্রকৃতি সম্বন্ধে মত—এককথায় মার্ক্সবাদের সকল অঙ্গই ফাশিস্টদের কাছে ভ্রান্তি ও প্রমাদ মাত্র। নিরীহ সোশ্যাল-ডেমক্রাটদের সম্বন্ধেও ফাশিস্টদের কোনো আস্থা নেই, কারণ সমাজতন্ত্রের সকল শাখার মূলগত ঐক্য অর্থাৎ সাধারণস্বত্বের ভিত্তির উপর ভবিষ্যৎ-সমাজ গঠনের উদ্যম ফাশিস্টদের সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য—ব্যক্তিগত সম্পত্তির পূর্ণ-অধিকার ফাশিজম কার্যত স্বীকার ক'রেই নিয়েছে। এ-পর্যন্ত সুতরাং ধনতন্ত্রের পুরাতন সমর্থকদের থেকে ফাশিস্টেরা বিভিন্ন নয় এবং তাদের নূতন-সমাজ গঠনের কথা বলার সার্থকতা নেই। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মাঝামাঝি কোনো অবস্থা কল্পনা করাও সহজ নয়। কিন্তু ফাশিজমের মধ্যেও কিছু নূতনত্ব আছে। সেই নতুন ভাব উদারনীতি ও গণতন্ত্রের বর্জনে দেখা যায়। ধনতন্ত্রের জয়যাত্রার সময় উদার-গণতন্ত্রেরও দিগ্বিজয় হয়েছিল—ধনিকপ্রভুত্ব প্রসারের সঙ্গেই ডেমক্রাটিক আদর্শ সর্বত্র স্থাপিত হয়। তার পর তাই ধনতন্ত্রের সংকোচন ও সাম্রাজ্যবাদের চাপে আসন্ন বিপদের দিনে ডিমক্রাসির বাধাপ্রাপ্তিও আশ্চর্য নয়। ফাশিস্ট-থিওরিতে প্রথমত মার্ক্সের শ্রেণীর সম্বন্ধে ধারণাকে ধ্বংস করবার জন্য জাতীয়-ঐক্যের আরাধনা করা হয়; শ্রমিকদের সাম্যবাদ থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে রেস্ বা নেশনের মাহাত্ম্যের উপর জোর পড়ে; দেশের মধ্যে আর্থিক চাপ এড়াবার নিমিত্ত সাম্রাজ্য-গঠন, রাজ্যবিস্তার ও যুদ্ধের গুণগান ওঠে। দ্বিতীয়ত, ফাশিস্টদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে গণতন্ত্রের ফলে শুধু বিপ্লবের আশঙ্কাই সর্বত্র মাথা তুলতে পেরেছে। অতএব ডিমক্রাসি বর্জনীয়, রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের সাক্ষাৎ-

কর্তৃত্ব রাখা ভুল, ব্যক্তিস্বাধীনতারও সীমা থাকা উচিত। তাই তখন শোনা যায় সমগ্রগ্রাসী স্টেটের বন্দনা, রাষ্ট্রের নৈতিক রূপ বর্ণনা আর কর্ণধার নেতার প্রয়োজন ব্যাখ্যা। ফাশিস্‌মোর প্রকৃত স্বরূপ এই হ'লে বোঝা সহজ কিসের জন্য ইটালি ও জার্মানির মতন দেশে যেখানে ধনতন্ত্র বিপন্ন হ'য়ে পড়ে সেখানেই ফাশিস্টদের অভ্যুদয় হয়েছিল।

২

হিটলার ও নাৎসি-প্রকোপ

লক্ষ্য এক থাকলেও অন্যের উপর কর্তৃত্বের লোভ ছাড়া সহজ না। তাই সোশ্যালিস্ট-দের আটকে রাখার কাজে নাৎসিদলের কৃতিত্ব বহু-স্বীকৃত হ'লেও, প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গের পার্শ্বচরেরা সহজে হিটলারকে প্রধান মন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিতে রাজি হন-নি। হিটলার চান্সেলার্ হবার পরও হুগেনব্যর্গ্ প্রভৃতি ন্যাশনালিস্ট নেতারা ভেবেছিলেন যে তাঁকে হাতে রাখতে পারবেন। কিন্তু হিটলারের পিছনে তখন প্রভূত শক্তি— নাৎসি-দলের অগ্রগতি তখন অপ্রতিহত। অন্তর্বিভক্ত নিশ্চেষ্ট জার্মান শ্রমিক-সমাজ কর্তব্য স্থির করবার আগেই রাষ্ট্রিক ক্ষমতা হিটলারি-দলের হাতে সম্পূর্ণভাবে এসে পড়ল। নূতন আভ্যন্তরিক-সচিব নাৎসিনেতা ডক্টর্ ফ্রিক্ শাসনযন্ত্রের সর্ববিভাগে নাৎসি-কর্তৃত্ব স্থাপন করলেন। গোয়রিং প্রাশিয়ার অধ্যক্ষ হ'য়ে পুলিশ-বিভাগকে নিজেদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত ক'রে ফেলেন। নাৎসি-দলের ঝঞ্ঝাবাহিনী একেবারে সরকারি সৈন্যদলের পদমর্যাদা ও অধিকার লাভ করল; সমাজতন্ত্রী কাগজগুলির প্রকাশ নানা অছিলায় বন্ধ করা হ'ল। অনেক শ্রমিক-নেতা বিনা বিচারে আটক হলেন। মার্চে সাধারণ নির্বাচনের ঠিক আগে (১৯৩৩) ব্যবস্থাসভা রাইশস্টাকের বাড়ি হঠাৎ ভস্মীভূত হয়। রব উঠল যে এর কারণ সাম্যবাদী চক্রান্ত—সে-উত্তেজনাতেই হিটলারের দল লক্ষ-লক্ষ ভোট সংগ্রহ ক'রে নূতন পরিষদে নিজেদের সংখ্যাধিক্য জোগাড় করতে পারল। ইংল্যাণ্ডের ১৯২৪-এর নির্বাচনে দক্ষিণপন্থীরা রুশ-বিপ্লবী জিনোভিয়েভ-এর নামে এক জাল চিঠি হঠাৎ প্রচার ক'রে শ্রমিকদলকে অপদস্থ ও পরাস্ত করেছিল। রাইশস্টাকে অগ্নি-কাণ্ড আসলে তারই অনুরূপ ব্যাপার। বিচারে এক অর্ধোন্মাদ লোকের আগুন লাগাবার অপরাধে প্রাণদণ্ড হ'লেও, সাম্যবাদীদলের দায়িত্বের কোনো প্রমাণই পাওয়া গেল না। বিদেশী জনমত উত্তেজিত হওয়ায় লাইপজিগে বন্দীদের প্রকাশ্য বিচার করতে হয়েছিল—আদালতে অভিযুক্ত সাম্যবাদীরা তখন ডিমিট্রভের নেতৃত্বে সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; এমনকী শেষ পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডটি নাৎসি-

দলেরই গুপ্ত কীর্তি এ-সন্দেহ অন্তত বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ততদিনে নাৎসিদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছিল। ষড়যন্ত্রের সন্দেহ মাত্র সাম্যবাদী-দল বেআইনী ঘোষিত হয়, জার্মানির প্রতি অঞ্চলে এক-একজন নাৎসি অভিভাবকের পূর্ণকর্তৃত্বও এই উপলক্ষে স্থাপিত হয়েছিল। মার্চের শেষে নূতন রাইশস্টাক্‌ চার বৎসরের জন্য শাসনকার্যের সমস্ত অধিকার হিটলারের হাতে সমর্পণ ক'রে অবসর গ্রহণ করল। প্রতিনিধি-সভার এইভাবে নির্বাণলাভ হয়—বলা বাহুল্য যে তারপর হিটলারি কর্তৃত্বের মেয়াদ বিনা বাক্যব্যয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

নাৎসি-কর্তৃত্ব স্থাপনের ইতিহাস হ'ল এই। এর পরবর্তী কালের নাৎসি-শাসনের কথা বোধহয় সুবিদিত। সাম্যবাদীদের উচ্ছেদ সাধনের পর নিরীহ সোশ্যাল-ডিমক্রাসিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল। এই দলের এতদিনকার নিয়মানুগত্য ও বিপ্লবে পরাঙ্মুখতা দক্ষিণপন্থীদের হাতে কোনো পুরস্কারই পায়নি। বিশাল শ্রমিক-সংঘগুলি এদের আয়ত্তে থেকে এতদিন নিশ্চেষ্টভাবে হিটলারের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হ'তে দিয়েছিল। এখন সংঘগুলি সব সহসা ভেঙে দেওয়া হ'ল। মার্ক্সের মতবাদ তাঁর স্বদেশে এইভাবে দণ্ডনীয় হ'য়ে পড়ে, কোনো মার্ক্সীয়-মণ্ডলীর প্রকাশ্য অস্তিত্ব আজ সেখানে অসম্ভব। শ্রমিক-বিপ্লবের ধারণা পর্যন্ত দমন করাই জার্মান ফাশিজম-এর প্রধান উদ্যম। শক্তিশালী সশস্ত্র দলের সাহায্যে শাসনযন্ত্রের উপর পূর্ণকর্তৃত্ব স্থাপন, সেই ক্ষমতা ব্যবহারের ভিতর দিয়েই বিরোধীদের উচ্ছেদসাধন, দেশব্যাপী প্রোপাগাণ্ডার উত্তেজনায় জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণ—নাৎসি-বিপ্লবের স্বরূপ হ'ল এই। এর পর যে-উগ্র বৈদেশিক-নীতি অবলম্বিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য খানিকটা জনপ্রিয়তার অর্জন, আর বাকিটা বিস্তারের মধ্য দিয়ে আর্থিক দুরবস্থা কাটিয়ে ধনিকদের লাভের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। নাৎসি-অভিযানের মূলরূপকে অবশ্য আবৃত ক'রে রেখেছে অনেক অবান্তর উত্তেজনা; জার্মানির মতন উন্নত দেশকে দাবিয়ে রাখা কষ্টসাধ্য ব'লেই, সেখানে ডক্টর্‌ গোয়বল্‌স্‌-এর একনিষ্ঠ নাৎসি-প্রোপাগাণ্ডার এত প্রয়োজন। নূতন জার্মানির বৈদেশিক-নীতিতে তাই এত ন্যায়ধর্ম, আত্মসম্মান ও জাতিপ্রীতির ছড়াছড়ি; ভের্সায়ির অবিচার আজ প্রায় অতীতের কথা হ'য়ে দাঁড়ালেও তাই নিয়ে এইজন্য এত অভিযোগ ও আস্ফালন চলেছে। ইউরোপে নানা দেশের মধ্যে য়িহুদিদের প্রতি বিদ্বেষ মধ্যযুগ থেকে লোক খেপাবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে; জনসাধারণের মজ্জাগত সেই বিদ্বেষে আহুতি দিয়ে জার্মানিতে এখন প্রচারিত হ'ল যে মার্ক্সবাদ আসলে শ্রমিকদের ঠকাবার জন্য য়িহুদি ষড়যন্ত্র মাত্র। বলা হ'ল যে নাৎসিদের মতামতই নাকি খাঁটি সোশ্যালিজম, যদিও মূলসূত্র ধরলে দুয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্র মিল নেই। কয়েকটি য়িহুদি ধনিক

ও ততোধিক য়িহুদি দোকানদারকে নির্যাতিত করতে পারলেই প্রমাণ হ'ল যে নাৎসি-আমল ধনিকতন্ত্র নয়। আর্যামির অহংকার য়িহুদিবিদ্বেষবুদ্ধির অপরদিক। নগণ্য জনসাধারণ পর্যন্ত যে বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি এই স্তোকবাক্য হিসাবেই নর্ডিক মাহাত্ম্যকীর্তনের সার্থকতা। ইটালি ও জাপান নর্ডিক নয়—তবে সেখানকার ফাশিস্টদেরও গৌরব করবার উপলক্ষের অভাব সহজে হবে না; ইটালির আছে প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্য, জাপানের আছে মধ্যযুগের ক্ষত্রিয় (সামুরাই) গুণাবলি। অনুরূপ অবস্থায় সকল দেশেই অতীতগৌরবকাহিনী অথবা বর্তমানবৈশিষ্ট্যপ্রচারিণী এইজাতীয় অহংকারের আশ্রয় পাওয়া যায়।

মুসোলীনির ইটালির মতন হিটলারের আমলে জার্মানিরও অনেক বাহ্যিক উন্নতি হয়েছে। পরাজিতের যে-মনোভাব যুদ্ধান্তে জার্মানদের পেয়ে বসেছিল আজ তার সম্পূর্ণ তিরোধান ঘটেছে। হ্বাইমার্-যুগে যে-দলাদলি দেশকে অভিভূত করেছিল তার বদলে এসেছে নূতন আশা, জাতীয় ঐক্যের আদর্শ, ভবিষ্যতের ভরসা। মহাশক্তিদের মধ্যে জার্মানি আবার প্রবল হয়েছে; অস্ত্রবল সম্ভবত তারই আবার সর্বশ্রেষ্ঠ; আত্মরক্ষা, রাজ্যবিস্তার ও অন্যদের উপর অত্যাচার করবার ক্ষমতা আবার ফিরে এসেছে। কর্মহীন শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ ক'রে দরকারি কাজে লাগানো ও সমস্ত জাতির কর্মকুশলতার বৃদ্ধিসাধন এ-সকলই উপস্থিত শক্তির পরিচায়ক। কিন্তু এ-সমস্তই সাময়িক বিচার মাত্র, ইতিহাসে তার চেয়েও ব্যাপক একটা বিচারের প্রয়োজন এসে পড়ে, যদিও সে-বিচারে সর্বস্বীকৃত মাপকাঠির অভাব আছে। বর্তমান আর্থিক বিধিব্যবস্থা পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন থাকলে স্বীকার করতেই হবে যে জার্মানিতে সে-সমস্যা সমাধানের কোনো চেষ্টাই হয়নি, ইটালির কর্পোরেটিভ-রাষ্ট্রের মতন নাৎসি-আমলে জার্মান-রাইশের তথাকথিত তৃতীয় অবস্থাতেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই সম্পর্কে কোনো স্থায়ী আশার চিহ্নমাত্র নেই। তখন প্রশ্ন ওঠে যে তাহ'লে জার্মান জাতির নাৎসি-প্রভুত্ব সহ্য করবার সার্থকতা কী? অথচ ইউরোপ ও সারা জগতের পক্ষে হিটলারিজার্মানি যে বিষম ভয়ের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সে-কথাও এ-প্রসঙ্গে মনে পড়তে বাধ্য।

শ্রমিকদমন ছাড়াও অবশ্য হিটলারের জার্মানিতে অন্য ব্যাপার চোখে পড়ে। উৎপীড়নের ফলে জার্মানির জগদ্বিখ্যাত সংস্কৃতিরও সমূহ ক্ষতি হ'ল—বহু বিখ্যাত লোককে এজন্য দেশত্যাগী হ'তে হয়। তাছাড়া শত-শত সাধারণ লোক এখন পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক রয়েছে। সর্বগ্রাসী স্টেটের বন্দনা ও নেতার আনুগত্যের আধ্যাত্মিক মূল্যকীর্তন এখন প্রবলতর হয়েছে। ইটালির মতন সমস্ত জার্মানজাতির এক ধর্ম না-থাকায়, ফাশিস্ট-স্টেট ও বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের দ্বন্দ্ব জার্মানিতে দেখা

দেওয়া স্বাভাবিক। একদিকে জার্মান ক্যাথলিক জনসাধারণ খাঁটি নাৎসিদের মতন অতখানি স্টেট-উপাসক হ'তে পারেনি—অন্যদিকে প্রটেস্টাণ্ট যাজকদের মধ্যেও একটা অপ্রত্যাশিত স্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা দেখা গেছে। তার উত্তরে ফাশিস্ট-নেতারা কেউ-কেউ এক নূতন ধর্মের প্রশ্রয় দিচ্ছেন—প্রাচীন টিউটন-ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে এত শতাব্দীর পরে তার যোগের চেষ্টা অবশ্য নিতান্তই হাস্যাস্পদ। কিন্তু হিটলারি-আমলে নূতন-নূতন সাফল্য ও বিজয়ের নেশা জার্মানিকে পেয়ে বসেছে—ঐতিহাসিকের চোখে তাই প্রাক্‌সামরিক জার্মানির চিত্র যেন আজ আবার সজীব হ'য়ে উঠছে। সেই সঙ্গেই মনে পড়া স্বাভাবিক যে সাম্রাজ্যবাদের পরিচালনায় জার্মানির অদৃষ্টে সে-বার দুর্গতিই জুটেছিল। এই নেশায় জার্মান জাতি হিটলারকে এখন পর্যন্ত পূর্ণ সমর্থন করছে। হিটলার তাই মাঝে-মাঝে ভোট নিয়ে জগৎকে তাঁর ক্ষমতার প্রভাব দেখান। এই জনপ্রিয়তার জন্য হিটলার ও তাঁর অনুচরদের প্রতাপ হ'য়ে উঠেছে অপ্রতিহত।* পুরাতন ন্যাশনালিস্টদের অবস্থা এখন খানিকটা হঠাৎ-নবাবদের গরিব আত্মীয়ের মতন। হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর হিটলার প্রেসিডেণ্ট ও চান্সেলার উভয় পদ নিজের হাতে রেখে রাষ্ট্রনেতা আখ্যায় পরিচিত হন। ফন্‌ পাপেন্‌ এখন নূতন শাসকদের অনুগত ভৃত্য। কিন্তু প্রভুত্ব যেই করুক, ধনিকতন্ত্র অব্যাহতই থাকছে; ধনিকপ্রবর, জমিদারগোষ্ঠী ও রাইশওয়েরের সেনানীবৃন্দের প্রকৃত কোনো স্বার্থহানির লক্ষণ এখনও দেখা যায়নি। ১৯৩৪-এর জুনে যে-আকস্মিক হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, তার কোনো প্রকৃত অর্থ থাকলে সংস্কারচেষ্টার দমনের মধ্যেই তাকে খুঁজতে হবে। রোয়েম্‌, আর্ন্‌স্ট, হাইন্‌স্‌ প্রভৃতি নিহত নাৎসি-নেতারা ঝঞ্ঝা-বাহিনীর মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কারক হিসাবেই গণ্য হতেন—তাঁদের কেউ-কেউ হয়তো ভাবছিলেন যে নাৎসি-আমলে কোনো প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হচ্ছে না। স্ট্রেসার্‌ ১৯৩২-এর আগে পর্যন্ত নাৎসি-দলকে ঘোর সংস্কারক ব'লে বরাবর বর্ণনা করতেন; এখন তাঁর হত্যায় সংস্কার-সংকল্পই শক্তি হারাল। হিটলার যখন তাঁর কোনো-কোনো সঙ্গীকে এমন নির্মম ভাবে ধ্বংস করেন, তখনকার গণ্ডগোলের সুবিধা নিয়ে হয়তো ব্যক্তিগত কারণেও কারো-কারো প্রাণনাশ হয়। কিন্তু সেনাপতি শ্লাইশারের অপঘাত মৃত্যুতে হিটলারেরই এক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর লোপ হ'ল। এর পর সম্প্রতি রাইশওয়েরের কোনো-কোনো নেতার পদচ্যুতি হিটলারের ব্যক্তিগত প্রতাপের পরিচয় হ'লেও তাতে নাৎসি-শাসনের প্রকৃতির কোনো বদল হয়েছে মনে করবার বৈধ কারণ নেই।

হিটলারের আত্মসাধনার স্বরচিত বিবরণের সম্পূর্ণ ভাষান্তর বিদেশে পাওয়া দুর্লভ—সমগ্র গ্রন্থের ফরাশি অনুবাদের প্রচলন জার্মান-সরকার বন্ধ করবার চেষ্টা

পর্যন্ত করেন। অথচ এই বই জার্মানিতে এখন নাকি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। হিটলারের মতে জার্মানির প্রধান কর্তব্য অন্য সকলের চাইতে বেশি সামরিক শক্তি অর্জন, অস্ত্রবলে সমকক্ষ কারো অস্তিত্ব জার্মানির সহ্য করা উচিত নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী বিনাশের প্রধান উপায় যুদ্ধ, আর যুদ্ধ নাকি কিছু অমঙ্গলের আকর না। রাজ্য-বিস্তার জার্মানির ধর্ম, কিন্তু লক্ষ্য শুধু ১৯১৪ সালের সীমান্ত ফিরিয়ে পাওয়া নয়। প্রসারের উদ্দেশ্য এমনকী শুধু সকল জার্মানভাষীদের একত্র করাও না, উদ্দেশ্য জার্মান জাতির আর্থিক ও রাষ্ট্রিক পূর্ণ পরিণতি সম্ভব ক'রে তোলা। মধ্য ও পূর্ব-ইউরোপে বিস্তারলাভ নাকি জার্মানির ভাগ্যলিপি ও বিধাতার বিধান। তাই রাশিয়ার কাছ থেকে জার্মানদের এ-অঞ্চলে ভূখণ্ড কেড়ে নেওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর জন্য আবশ্যক ফ্রান্সকে একক অবস্থায় দুর্বল ক'রে রাখা—অতএব ইটালি ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রথমে সখ্যবন্ধন প্রয়োজন। কিন্তু সে-ব্যবস্থাও সাময়িক—পরিণামে সারা জগতে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে জার্মানির প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়াই স্বাভাবিক।—এই প্রত্যেকটি মতই হিটলারের গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে, এবং হিটলার নিজে এখন পর্যন্ত এর কোনোটি প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করেননি। তাছাড়া ফেডার বলে-ছিলেন যে বিদেশে প্রত্যেক জার্মানকে জার্মানির প্রজা করতে হবে—সেইসঙ্গে যে সহস্র-সহস্র বিদেশী জার্মানির পদানত হ'য়ে পড়বে সে-কথা তুচ্ছ ভেবেই তিনি উল্লেখ-যোগ্য মনে করেননি। রোজেনব্যর্গের মতে নর্ডিকদের ভোগের জন্য নিকৃষ্ট জাতির জমি ছেড়ে দিতেই হবে।

এই দুর্দম প্রসার-প্রবৃত্তির পিছনে সাম্রাজ্যতন্ত্রের চালক শক্তিই রয়েছে মনে হয়—তারও প্রকৃতি এইভাবে কূল ছাপিয়ে পড়া। নাৎসি বৈদেশিক-নীতি এই প্রবৃত্তির অনুসরণ ক'রে চলেছে, আর এক্ষেত্রেও ইংরাজ মন্ত্রীরা অনাগত ভবিষ্যৎকে অবজ্ঞা ক'রে শুধু মুহূর্তের সুবিধা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। শুভাদৃষ্টে বিশ্বাস ইংরাজদের বোধহয় মজ্জাগত। তাই অধ্যাপক কেন্‌স্ পর্যন্ত লিখেছেন যে কোনোক্রমে এখন যুদ্ধের আশঙ্কা এড়াতে পারলেই হ'ল—অর্থাৎ ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যৎই ভাববে। শান্তিবাদীদের আবার এক স্থির নীতি, যে কোনো ক্রমেই যুদ্ধ করা উচিত না। অতএব এদের মতে ইটালির উপর আবিসিনিয়া-প্রসঙ্গে আর্থিক চাপ দেওয়া অন্যায় হয়েছিল, আর জার্মানি যা চায় তাই তাকে ছেড়ে দিলেই গোল চোকে। কয়েক বৎসর ধ'রে ইংল্যাণ্ডের আচরণ এবং এই চমৎকার যুক্তির নানাদিকে প্রচলন সংকটকে বাড়িয়েই চলেছে। সম্মিলিত চেষ্টায় শান্তিরক্ষার সকল ব্যবস্থা তাই আজ ধূলিসাৎ। এতে ক'রে জগতে শান্তির সম্ভাবনা বেড়েছে এ-বিশ্বাসের সমর্থক এত প্রচণ্ড শুভবাদী বোধহয় কেউ নেই।

ইংল্যাণ্ডে শাসকশ্রেণী, এবং এমনকী ফ্রান্সেও লাভাল্, টার্দিউ, ফ্লাঁদ্যা প্রভৃতি নেতারা, অর্থাৎ উভয় দেশেই প্রচ্ছন্ন-ফাশিস্টগণের মনে হিটলারি-আন্দোলনের সঙ্গে একটা গোপন সহানুভূতিই নাৎসি-অগ্রগতির সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। সে-অগ্রসর নীতির সংক্ষিপ্ত উল্লেখই শুধু এখানে সম্ভব। কিন্তু তার স্বরূপ বোঝার পক্ষে সেই বিবরণটুকুই যথেষ্ট। নাৎসি-আমলের আগেই জার্মানি অস্ত্রবর্জনের সভা ত্যাগ করেছিল, হিটলারের হাতে রাজ্যভার আসা মাত্র জার্মানির সমরসজ্জার বিস্তৃত আয়োজন আরম্ভ হ'ল। তারপর জাপানের অনুসরণে জার্মানিও বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ থেকে পদত্যাগ স্থির করে (১৯৩৩)। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জার্মানির যুদ্ধান্তে বিস্তর অসদ্ভাবের কারণ ঘটে, কিন্তু পোল্যাণ্ডে প্রবীণ নেতা পিল্‌সুডস্কির কল্যাণে এক অর্ধফাশিস্ট শাসকসম্প্রদায় গ'ড়ে উঠেছিল। এই ঝোঁক বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে এখানে ফ্রান্সের উপর আগের মতন নির্ভর করার চাইতে জার্মানির সঙ্গে একটা আপসে নিষ্পত্তির ইচ্ছার উদয় হয়। হিটলার তাই সহজেই পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সখ্যস্থাপন করলেন (জানুয়ারি, ১৯৩৪), যদিও পোলেরা বুদ্ধিমান ব'লে এখনও সম্পূর্ণ ধরা দেয়নি। পূর্ববৈরীদের এই মিলন অবশ্য সাধারণ-শত্রু রাশিয়ার বিরুদ্ধেই চক্রান্ত।—১৯৩৪-এর জুলাই মাসে নাৎসিরা চেষ্টা করল অস্ট্রিয়া-দখলের। এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিতে কিছুদিন আগে সোশ্যালিস্ট-প্রাধান্য সম্ভবপর হওয়াতে ফাশিস্ট-প্রতিক্রিয়ার উদয় হয়। তখন কিন্তু সোশ্যালিস্ট-নেতা বাওয়ারের সুবিদিত শান্তিপ্রিয় সোশ্যাল-ডিমক্রাটিক কার্যপদ্ধতি দক্ষিণপন্থীদের বিনা বাধায় শক্তি বৃদ্ধি করতে দিয়েছিল। ক্রমে খর্বাকৃতি ডক্টর্ ডল্‌ফুস্ অস্ট্রিয়ায় একনায়কত্ব স্থাপন করলেন (মার্চ, ১৯৩৩)। পর বৎসর (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪) শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংঘর্ষ উপস্থিত হয়; সোশ্যালিস্টেরা তখন বিধ্বস্ত ও ভিয়েনার নবনির্মিত বিখ্যাত শ্রমিকনিবাসগুলি গোলাবর্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল। কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের মধ্যেও বিবাদ ছিল—তাই বিদেশী অর্থাৎ জার্মান-নাৎসিদের বিরুদ্ধে স্বদেশী পিতৃভূমি দল গ'ড়ে ওঠে। ডল্‌ফুস্ এই সংঘর্ষে নাৎসিদের হাতে প্রাণ হারান (জুলাই, ১৯৩৪); কিন্তু ইটালির সাহায্য প্রতিশ্রুতি পেয়ে তাঁর বন্ধু শুস্‌নিগ তখনকার মতো জার্মানির হাত থেকে অস্ট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন।—নাৎসিদের এর পরবর্তী কীর্তি হ'ল, পূর্ব-ইউরোপে লোকার্নোর অনুযায়ী শান্তিরক্ষার এক চুক্তিতে যোগ দিতে অস্বীকার করা (১৯৩৫)। হিটলার বললেন (মে, ১৯৩৫) যে যুদ্ধকে ছড়াতে দেওয়া উচিত না, অতএব পরস্পরকে সাহায্যের কোনো অঙ্গীকার না-করাই মঙ্গল। এর প্রকৃত অর্থ অবশ্য সহজেই বোঝা যায়। এই বৎসরের প্রথমে সার্-অঞ্চল, পনেরো

বছর পর, জনগণের মত গ্রহণের ফলে, জার্মানির সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়। ১৯৩৫-এর মার্চ মাসে হিটলার ভের্সায়ির সন্ধি অগ্রাহ্য ক'রে উপযুক্তবয়স্ক সকল জার্মানকেই অস্ত্রশিক্ষা নিতে আইনত বাধ্য করলেন। নাৎসিদের সন্ধিভঙ্গের সাফাই হিসাবে মাঝে-মাঝে বলা হয় যে ভের্সায়ির ব্যবস্থা জার্মানি স্বেচ্ছায় স্বীকার করেনি। কিন্তু এ-যুক্তি অবান্তর, কারণ পরাজিত পক্ষ কখনোই স্বেচ্ছায় সন্ধি স্বাক্ষর করে না। স্ট্রেসার-বৈঠকে জার্মানির এ-আচরণ অন্য শক্তিদের দ্বারা মুখে নিন্দিত হ'ল বটে, কিন্তু ইংরাজ মন্ত্রীরা তারপর জার্মানিকে প্রকারান্তরে উৎসাহ-ই দিলেন। নৌবল নির্ধারণের এক ইংরাজ-জার্মান চুক্তিতে (জুন, ১৯৩৫), ইংল্যাণ্ড স্বীকার করে যে জার্মানি ইংরাজ নৌ-বহরের শতকরা ৩৫ ভাগ পর্যন্ত রণতরী রাখতে পারবে। এই চুক্তিও এক হিসাবে ভের্সায়ির ব্যবস্থা ভঙ্গের বন্দোবস্ত—সুতরাং ইংরাজদের এ-আচরণকে নাৎসিদের প্রশ্রয় দেওয়াই বলা চলে। ফরাশিরা এতে উদ্বিগ্ন হ'য়ে আবিসিনিয়ার ব্যাপারে ইটালির বিরুদ্ধে ইংরাজদের পূর্ণ সহায়তা করল না, অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডও তখন কোনো দেশ জার্মানদের দ্বারা আক্রান্ত হ'লে তৎক্ষণাৎ সাহায্য পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করে।

১৯৩৬-এর মার্চে জার্মানি লোকার্নো-চুক্তি অগ্রাহ্য ক'রে রাইনল্যাণ্ডে আবার সৈন্যস্থাপন করল। লোকার্নো-সন্ধি অবশ্য জার্মানি স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করেছিল, কিন্তু এতদিনে সন্ধিভঙ্গ যেন একটা অভ্যাসে পরিণত হ'য়ে পড়ে। এই সময় হিটলার এক শান্তির প্রস্তাব আনেন। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে জার্মানি পশ্চিমে কোনো দেশ আক্রান্ত হ'লে তার সাহায্যে প্রস্তুত থাকলেও পূর্বের দেশগুলির বেলায় (অস্ট্রিয়া, চেখোস্লোভাকিয়া, লিথুয়ানিয়া ইত্যাদি) সে-অঙ্গীকার দিতে রাজি নয়। এই পার্থক্য মনে সন্দেহই আনে, এবং তাছাড়াও যে নাৎসি-জার্মানির পক্ষে কোনো সন্ধির শর্তপালন ক্রমে দুরাশায় পরিণত হচ্ছে। ১৯৩৬-এর শেষের দিক থেকে জার্মানি স্পেনে ফ্রাঙ্কোর সাহায্যে প্রবৃত্ত হয়েছে, আর সেখানে অল্প দোষে গণতান্ত্রিক পক্ষের উপর মাঝে-মাঝে চণ্ডনীতির প্রয়োগ জার্মান জাতির সুনাম বাড়ায়নি।

এরপর জার্মানি ও ইটালির মধ্যে সখ্যস্থাপন হয়েছে, বার্লিন ও রোমের এই সদ্ভাবকে এখন বিশ্বরাষ্ট্রলীলার মেরুদণ্ড হিসাবে কল্পনা করা হচ্ছে। স্পেনে এ-সখ্যই ফ্রাঙ্কোকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে সাম্যবাদের বিরোধী দলসংগঠনের প্রয়াস হিসাবে জাপানের সঙ্গেও এই দুই শক্তির মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীর এই তিনটি ফাশিস্ট-ভাবাপন্ন মহাশক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব

আন্তর্জাতিক শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাস্থল, কারণ তিনটি রাজ্যই প্রসারোন্মুখ। তারপর হিটলার ও মুসোলীনির সহযোগে অস্ট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্যলোপ হ'ল। অস্ট্রিয়াতে সোশ্যাল-ডিমক্রাট ও সাম্যবাদী-দলের মিলনের পরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে নাৎসি-প্রভাবও বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত শুস্‌নিগকে সরিয়ে অস্ট্রিয়াকে জার্মান-রাজ্যভুক্ত করা সহজেই সম্পন্ন হ'ল (১৯৩৮)। তারপর থেকে নাৎসিরা চেখোস্লোভাকিয়ার উপর দৃষ্টি দিয়েছে—এ-রাজ্যের স্থদেৎ প্রদেশে অনেক জার্মানের বাস। চেখ-রাজ্য আজ তাই সমূহ বিপন্ন।

বুদ্ধদেব বসু

সভ্যতা ও ফ্যাশিজম

রাজনীতি আমার জীবনে কখনো আলোচ্য বিষয় ছিলো না। বাল্যকাল থেকে জেনেছি আমি কবি, আমি সাহিত্যিক, আমার মধ্যে যা-কিছু ভালো যা-কিছু খাঁটি তা রচনাচর্চাতেই একান্তে প্রয়োগ করেছি। এ-ব্যাপারে যেমন প্রবল আন্তরিক উৎসাহ অনুভব করেছি এবং আজ পর্যন্ত করি, তেমন আর-কিছুতেই করি না এ-কথা স্বীকার করতে আমার বাধা নেই। ভালো লিখবো, আরো ভালো লিখবো—আমার সমস্ত জীবনের মূল প্রেরণাশক্তি এই ইচ্ছার মধ্যে নিহিত। এই রসের রাজ্যে অধিষ্ঠিত হ'য়ে রাজনীতির কোলাহল কখনো ভালো ক'রে আমার কানে পৌঁছয়নি। তার 'পরে আমার অন্তরের অবজ্ঞাই অনুভব করেছি। তার কারণ রাজনীতি বলতে বুঝেছি কপটাচরণ, ক্রূরতা, ধূর্ততা, ক্ষণিকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধ্রুব আদর্শের অবমাননা। শিল্পী-মনের পক্ষে ও বস্তু বিশেষ লোভনীয় হ'তে পারে না।

রাজনীতির যে একটা বড়োরকমের সংজ্ঞা আছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পরাধীন দেশে পাওয়া সহজ নয়। আমাদের অ্যাসেমব্লি সভার বিতর্ক, আমাদের মন্ত্রীদের বক্তৃতা সবই যেন একটি অনুষ্ঠান মাত্র, তার পিছনে যথার্থ শক্তি নেই আর তাই এর অবাস্তবিকতা এক-এক সময় দুঃসহ হ'য়ে ওঠে। যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগ এত ক্ষীণ তার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের উদাসীন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তবু এই পরাধীন দেশেই কখনো-কখনো এমন একটি-বিরাট আন্দোলন আবর্তিত হ'য়ে ওঠে যা সমগ্র দেশবাসীকে বিদ্যুৎস্পর্শে সচকিত ক'রে তোলে, এবং জাতির জীবনে স্থায়ীভাবে তার চিহ্নও রেখে যায়। এমন-একটি আন্দোলনের দিন এসেছিলো বঙ্গভঙ্গের সময়, তখন আমাদের জন্ম-কাল। সে-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার কিছু নেই; কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের গানে ও প্রবন্ধে যে-ফসল তা ফলিয়েছিলো তা থেকে তার তীব্র উদ্দীপনাটি হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করতে পারি। তার পরের বড়ো আন্দোলন গান্ধিজির অসহযোগ, তখন আমি নিতান্ত বালক। সে-হুজুগে মেতেছিলাম, চটের মতো মোটা খদ্দর পরেছিলাম, যে-সব যুবকেরা সাত দিন, এক মাস কি তিন মাসের জন্য জেলে গিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ও ঈর্ষায় মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে

ছিলো, এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে না এমন অসম্ভব কথা যে বলে তাকে মনে-মনে মূঢ় বলতে প্রস্তুত ছিলাম—কিন্তু আজ পিছনে তাকিয়ে দেখছি বালক-বয়সের অন্যান্য অনেক উত্তেজনার মতোই সে-হুজুগ আমার মন থেকে নিঃশেষে ম'রে গেছে, কোনো চিহ্ন রাখেনি। আমার গঠনে অসহযোগ আন্দোলনের কোনো হাত নেই।

তারপর মহাত্মার দ্বিতীয় আন্দোলন, তখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বছর। আর সেই সঙ্গে পূর্ববঙ্গে সন্ত্রাসীদের রক্তাক্ত অভ্যুদয়। ছিলেম ঢাকায়; একদিকে ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহের তুমুল বিপর্যয়, অন্যদিকে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ হত্যার উন্মত্ততা—চাটগাঁর অস্ত্রাগার লুঠ, খবরের কাগজ ও সিগারেট বন্ধ, গাঁজাখুরি গুজবে সমস্ত দেশের মাথা খারাপ হবার দশা—সব মিলিয়ে ১৯৩১-এর সেই গ্রীষ্মকাল আমার মনে নিদারুণ একটি স্মৃতি হ'য়ে আছে। লজ্জার বিষয় হ'লেও স্বীকার করবো দেশব্যাপী এই দু-মুখো আন্দোলনে আমি অবিচলিত ছিলেম, আমার প্রাণে কোনো সাড়া জাগেনি। আমি তখনো ব'সে-ব'সে একান্তচিত্তে সাহিত্যচর্চা করেছি, হয়তো সেটা খুবই লজ্জার কথা, কিন্তু সত্য গোপন করবো না। মহাত্মাজি আমাদের সকলেরই প্রণম্য, কিন্তু তাঁর আন্দোলনে কোনো উদ্দীপনা অনুভব করেনি এমন লোক আমি ছাড়াও দেশে হয়তো আছে। এদিকে সন্ত্রাসবাদের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে যেটাকে বলা যেতে পারে রোম্যান্টিক, শিল্পী-মন তা থেকে যে সহজে অব্যাহতি পায় না তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথও 'চার অধ্যায়' না-লিখে পারেননি। সন্ত্রাসবাদ জিনিশটাই রোম্যান্টিক; রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি হিশেবে তা যতই ভ্রান্ত হোক, নৈতিক বিচারে যতই দুষ্য হোক, এর মধ্যে একটা প্রচণ্ড নাটকীয়তা আছে যা সাহিত্যিকের পক্ষে লোভনীয়। সাহিত্যের উপাদান হিশেবে এর অভিনবত্ব আছে এবং এ নিয়ে যে অসংখ্য গল্প-উপন্যাস বাংলা ভাষায় লেখা হয়নি তার কারণ অবশ্য বাইরের বাধা।

এখানে একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করা অবান্তর হয় না। স্বদেশী আন্দোলন কেন বাংলা সাহিত্যে সোনার ফসল ফলালো, আর গান্ধিজির আন্দোলন কেন আমাদের সাহিত্যে আঁচড়ও কাটতে পারলো না এ-প্রশ্ন অনেকের মনকেই অনেক সময় নাড়া দিয়েছে। এ-যুগের লেখকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিলে সমস্যার সমাধান খুব সহজেই হ'য়ে যায়, কিন্তু প্রশ্নটি এত সহজ নয়। স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথের যে-বীণা রুদ্রস্বরে বেজেছিলো, অসহযোগের ঝোড়ো হাওয়ায় তার তারগুলি একবার কেঁপেও উঠলো না এর কি কোনো কারণ নেই? যে-হাওয়া হৃদয়ে এসে ঘা দেয় সাহিত্যে তা প্রতিফলিত হবেই, লেখক সেখানে যন্ত্রী নন,

যন্ত্র। প্রশ্নের উত্তর পেতে হ'লে এই দুই আন্দোলনের জাতের তফাৎ বুঝতে হবে। স্বদেশী আন্দোলনের মূলে ছিলো বাংলাদেশের হৃদয়-শতদলের উন্মীলন। তার মধ্যে শুধু স্বায়ত্তশাসনের, শুধু অখণ্ড বঙ্গভূমির কথা ছিলো না, শিল্পে-কর্মে জ্ঞানে-বাণিজ্যে সমস্ত দেশে তা নবজীবন এনেছিলো। তখনকার দিনের দিশি কাপড়, দিশি জিনিশ ব্যবহারে স্বদেশের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগের কথাটাই বড়ো ছিলো, অসহযোগে তা হয়েছিলো ল্যাঙ্কাশিয়রের ভাত মারবার পলিসি। রাজনৈতিক পদ্ধতি হিশেবে শেষেরটাই হয়তো কার্যকরী, এবং কার্যকরী হবার জন্যেই অসহযোগ আন্দোলনকে বড়ো বেশি না-ধর্মী হ'তে হয়েছিলো। বিলেতি কাপড় পোরো না, ইংরেজের স্কুলে যেয়ো না, তাড়ি খেয়ো না, ট্যাক্সো দিয়ো না—চারদিকে 'না' দিয়ে ঘেরা ব'লেই এই আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে তার স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। এত বেশি 'না' সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের একটা ইতিহাস জড়িত, কিন্তু সংস্কৃতির প্রতি অসহযোগের সহযোগিতা ছিলো না, স্বরাজ লাভের জন্য শিক্ষা স্থগিত রাখতে হবে এও, তার পলিসির অন্তর্গত ছিলো। বিলেতি পণ্য বয়কটের হিড়িকে যখন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও দেশে প্রতিকূল মনোভাব গ'ড়ে উঠতে লাগলো তখনই রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদ জানাতে হ'লো 'শিক্ষার মিলন' লিখে। সংস্কৃতি জিনিশটাই আন্তর্জাতিক, তা দেশ-কালের বেড়া মানে না; সুতরাং যে-আন্দোলন কার্যোদ্ধারের খাতিরেও সংকীর্ণ অর্থে ন্যাশনাল তা সাহিত্যের উপাদান সহজে হয় না। একটা জিনিশ আছে মানুষের স্বাভাবিক স্বদেশপ্রেম: সে যেমন তার নিজের গৃহটিকে নিজের মাকে ভালোবাসে, তেমনি তার দেশকেও ভালোবাসে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সেই স্বদেশপ্রেমেরই উচ্ছ্বাস। তাই তার ব্রত উদ্‌যাপনে এত গান এত ছন্দ এত কাব্য। কিন্তু অসহযোগের বাণী স্বদেশপ্রেমের নয়, সর্বাঙ্গীণ বিদেশীবর্জনের; তার মধ্যে এমন-একটি শক্তি ছিলো যা দেশের জনসাধারণকে স্পর্শ করেছে কিন্তু তাতে হৃদয়ের এমন-একটি শুষ্কতা ছিলো যা সাহিত্যের প্রেরণা জোগাতে পারে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, স্বদেশী আন্দোলন আবেগপ্রবণ আর অসহযোগ কর্মপ্রধান। যা নিছক কাজ তা সাহিত্যের এলাকার বাইরে, কাজের পিছনে যে-আদর্শ যে-ভাবাবেগ সঞ্চিত থাকে সেটাই সাহিত্যের উপজীব্য। অসহযোগে ভাবাবেগের প্রাবল্য ছিলো না, তার পিছনে যে-আদর্শ ছিলো তা বড়ো জোর শুষ্ক বৈরাগ্যের আদর্শ, সাহিত্যিকের পক্ষে তার কোনো আকর্ষণ নেই। এই কারণেই সাহিত্যের অনুপ্রেরণা হিশেবে তার ব্যর্থতা—বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের কথাই বলছি।

গান্ধিজির লবণ আন্দোলন যে-সময়ে সে-সময়েই শুরু হ'লো বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য-মন্দা। কী অসম্ভব শস্তা সমস্ত পণ্য, অথচ দেশব্যাপী দারুণ অনটনের হাহাকার। কাগজে পড়তে লাগলুম, মার্কিন দেশে রাশি-রাশি কফি পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, স্তূপীকৃত শস্য দেয়া হচ্ছে জলে ভাসিয়ে, এদিকে ঘরে-ঘরে অন্নাভাব। বাংলাদেশের বেকারবাহিনী জোয়ারের জলের মতো ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগলো। নিজের জীবনে উপলব্ধি করলুম কী তুচ্ছ, কী অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যিকের মূল্য, সুজলা সুফলা বাংলা দেশে তার অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা হয় কি না-হয়। কোনো-কোনো দিকে হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে গেলো, মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে সেই প্রথম সচেতন হলুম। ইকনমিক্সের জটিল পথ আমার অধিগম্য নয়, কিন্তু একটা সন্দেহ মনে উঁকি দিলে যে ঐ শাস্ত্রটাই হয়তো ভুয়ো,আমাদের দেশের রাজনীতির মতোই তা বাস্তবের সম্পর্করহিত। কেননা যে-শাস্ত্র শুধু বলে যে কোনো-কোনো অবস্থায় লক্ষ-লক্ষ নর-নারীকে ক্ষুধিত রেখে শস্য জলে ভাসিয়ে দিতে হয়, আর কিছু বলে না, একেই নিয়ম ব'লে স্বীকার ক'রে নেয়, তার প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাখা সহজ নয়। যাকে বলি অর্থনীতি তা তো পদার্থবিজ্ঞানের মতো প্রাকৃতিক শাস্ত্র নয় : আলো এবং উত্তাপ যখন যে-ভাবে ব্যবহার করবার তা করবেই, তার উপর মানুষের হাত নেই; কিন্তু মানুষের কেনা-বেচা খাওয়া-পরা তো মানুষেরই হাতে, অতএব যে-শাস্ত্র পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের দুঃসহ দারিদ্র্যদুঃখকেই 'নিয়ম' ব'লে মেনে নেয়, তার সমস্ত যুক্তিতর্কের আড়ালে কোথাও না-কোথাও প্রচণ্ড ফাঁকি আছেই এ-সন্দেহ বেশিদিন চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

বাণিজ্য-মন্দার জোয়ারে যখনই ভাটা প'ড়ে এলো তখনই দেখলুম ইটালি আবিসিনিয়ার গলা কাটবার জন্য ছুরি শানাচ্ছে— বর্তমান মহাযুদ্ধের সেই তো আরম্ভ। সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ হ'লো জর্মানিতে হিটলারের অভ্যুদয়, অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখলুম একটা সুসভ্য উন্নত মহৎ জাতি নিজেদের যুগ-যুগ-সঞ্চিত অমূল্য উত্তরাধিকার পায়ে ঠেলে ফেলে বর্বরতার কাঁটাওলা বর্ম প'রে বীভৎস মূর্তিতে দাঁতে দাঁত ঘসছে। জর্মানির যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানব, যাঁদের নামে জগতের কাছে জর্মানির পরিচয়, নাৎসি-শাসন সদ্য-ঘুম-ভাঙা কুম্ভকর্ণের মতো তাঁদেরই চিবিয়ে খেতে উদ্যত—এ-দৃশ্য যখন দেখলুম; যখন দেখলুম আধুনিক জর্মানির দুই মহামানব—আইনস্টাইন আর ফ্রয়েড—তাঁদের মধ্যে একজন হ'লেন চৌর্যের অপবাদ নিয়ে বিতাড়িত, আর একজন বার্ধক্যের শেষ অবস্থায় পাহারাওলা ঘেরাও হ'য়ে শেষ নিশ্বাস ছাড়লেন; যখন দেখলুম জর্মানির সব বড়ো-বড়ো লেখক, শিল্পী, সাংগীতিক নির্বাসনে দুর্দশাগ্রস্ত কিংবা মাতৃভূমিতে বন্দী; যখন কানে এলো ইহুদিদের উপর

অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী, মেয়েদের স্বাধিকারহরণের ইতিহাস, সমস্ত জাতির চলা-ফেরায় আচারে-ব্যবহারে চিন্তায়-রচনায় সর্বপ্রকার স্বাধীনতা যখন ইস্পাতের হাতে লুণ্ঠিত হ'লো, তখন বুঝলুম পৃথিবীতে খুব বড়োরকমের একটা গোলমাল লেগেছে। আর তার প্রমাণের জন্যও বেশিদিন অপেক্ষা করতে হ'লো না, আফ্রিকার শেষ কালো ছায়াটুকু শোষিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই লাগলো স্পেনের গৃহযুদ্ধ। এই স্পেনের যুদ্ধে যেটুকু আমার চোখ খোলবার বাকি ছিলো সেটুকুও খুলে গেলো; বোঝা গেলো, পৃথিবীতে লোভ উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে; বিশেষ একটি শ্রেণীর স্বার্থ সম্পূর্ণ বজায় রাখবার জন্য শুধু-যে দুর্বল বিদেশী জাতির উপরেই অত্যাচার চলে তা নয়, স্বজাতিকেও রক্তস্রোতে ভাসানো হয়; শুধু-যে বিদেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন ক'রে নিজেদের 'উন্নতি' সাধন করা হয় তা নয়, নিজের দেশের মধ্যে যাঁরা মুক্তির আদর্শ মানেন, যাঁরা সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্রে দীক্ষিত তাঁদের বধ করতে লুব্ধতার ছুরি সর্বদাই উদ্যত।

অন্যদিকে আমাদের চোখের সামনে ছিলো সাম্যবাদী রাশিয়া— রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি পড়েছিলুম। জারের আমলে যে-দেশ ছিলো দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ভয়াবহ অন্ধকারে মগ্ন, মাত্র কুড়ি বছরের সাধনার ফলে সে-দেশের কী আশ্চর্য নবজন্ম! ফরাশি বিপ্লবের পরে মানুষের মুক্তির ইতিহাসে এত বড়ো ঘটনা আর ঘটেনি। ইংরিজি অনুবাদে রুশ সাহিত্য প'ড়ে ছেলেবেলা থেকেই ঐ দেশের উপর আকর্ষণ জন্মেছিলো, রুশ গল্পে-উপন্যাসে বঞ্চিত উৎপীড়িত বুভুক্ষু বিশ্বমানবের হৃৎস্পন্দন যেমন শুনতে পেয়েছিলুম তেমন আর-কোথাও শুনতে পাইনি। সেই দেশ সকল মানুষকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে, অন্নে-বস্ত্রে শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে সকলের মনুষ্যোচিত অধিকার স্বীকার করেছে, এই খবর একটি গভীর অনুপ্রেরণা হ'য়ে আমার হৃদয়ে বাজলো। মুক্তির বাণী, সাম্যের বাণী— এ তো কবিরই বাণী, যুগে-যুগে কত কবির মুখে এই বাণী জলন্ত সুরে বেজেছে, এর কোনো বিশেষ স্থান কি কাল নেই; এ সমগ্র বিশ্বমানবের চিরকালের সংগীত। এই বাণী শেলির, এই বাণী দেশবিদেশের সকল মহৎ কবির : মানুষকে মুক্তি দাও, মানুষকে ভালোবাসো, কঠোরের বদলে সুন্দরের পূজা করো, পাষাণহৃদয় উৎপাটিত ক'রে রক্তমাংসের হৃদয়কে স্বীকার করো। তাই যখন নবীন রাশিয়ার মূল মন্ত্র আমার কানে এলো—'যে কাজ করবে না, সে খাবেও না'— তখন এই বাণীতে যেন বিরাট মহাকাব্যের কল্লোল শুনতে পেলুম। এত বড়ো কথা কে আর কবে বলেছে! পৃথিবীতে অনেক সুন্দর সভ্যতা জেগেছে এবং ডুবেছে, কিন্তু চাঁদের একটি দিকই যেমন পৃথিবী থেকে দেখা যায় তেমনি সকল সভ্যতার একটি দিকই

আমরা দেখেছি এবং সে-দিকটি চাঁদের মতোই মনোহর। চাঁদের উলটো পিঠ আমরা কখনো দেখবো না, হয়তো তা ঘোর কালো, হয়তো তা দুঃস্বপ্নের মতো ভয়ানক। কিন্তু সভ্যতার উলটো পিঠটি একটু নাড়া দিলেই বেরিয়ে পড়ে—সেই একতলার ঘরে বোবা অন্ধকারে নরকঙ্কালের সারি, সেখানে দাসপ্রথা, দারিদ্র্য, অত্যাচার, রক্তপাত—তা অতি ভয়ানক। কোটি-কোটি লোকের জীবনের মূল্যে কয়েকটি মানুষ সুরভিত অবসরে ব'সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ক'রে সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবে এটাই ছিলো নিয়ম। ভিতরে-ভিতরে প্রতিবাদ জমেছে, এ-নিয়ম বিশ শতকে এসে টলেছে, কিন্তু একেবারে ভাঙেনি। সভ্যতার এই অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব যখন সব দেশেই মনীষীর ও শ্রমিকের মনে-মনে দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে, তখন রাশিয়া বজ্র-স্বরে ঘোষণা করলে, 'যে কাজ করবে না, সে খাবেও না।' শুধু যে মুখে বললে তা নয়, কাজেও খাটালে। সভ্যতার একতলার ঘরে আলো জললো—শুধু তা-ই নয়, নিচের তলা ব'লে কিছু আর রইলোই না। সভ্যতার ছন্দোহারা বেঢপ বেশামাল চেহারা দূর হ'লো, তা সর্বাঙ্গীণ শ্রীতে উঠলো মুঞ্জরিত হ'য়ে। আমি বলি না রাশিয়াতে সেই নিখুঁত ছন্দের সুষমা আজই গ'ড়ে উঠেছে, হয়তো তা হয়নি, না-হ'য়ে থাকলে দোষও দেবো না কারণ বাধা বিস্তর, কিন্তু এ-পর্যন্ত রাশিয়া যেটুকু করেছে সেটুকুই আশ্চর্য এবং সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে মানবজীবনে ছন্দের সেই সুষমাই রাশিয়ার লক্ষ্য, তারই জন্যে সেই বিরাট বিচিত্র দেশের অক্লান্ত সাধনা। রাশিয়া নবীন একটি সভ্যতার জন্মভূমি।

একদিকে জর্মানি-ইটালিতে মনুষ্যত্বের অবমাননা ও সভ্যতার বিনাশ; অন্য-দিকে রাশিয়াতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা দান ও সভ্যতার পূর্ণবিকাশের সাধনা: এই জুড়ি দৃশ্য যখন দেখলুম তখন রাজনীতির বড়োরকমের একটা অর্থ মনে ধরা দিলো। তখন বুঝলুম রাজনীতি শুধু অ্যাসেমব্লি হলের বক্তৃতা নয়, মাছ ও পাঁউ-রুটির বিতরণ নিয়ে নোংরা কলহ নয়, আমাদের প্রত্যেকের জীবন যাপন, ব্যক্তি-গত সুখ-দুঃখ রাজনীতির উপর নির্ভরশীল, এবং সেইজন্য তার আলোচনায় আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। শান্তির সময়, সুখের সময় নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব, হয়তো সে-অবস্থাই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, কিন্তু চারদিকে যখন অশান্তির আগুন লেলিহান হ'য়ে জ্ব'লে ওঠে তখন কবি বলো শিল্পী বলো ভাবুক বলো কারো পক্ষেই মনের মধুর প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা আর সম্ভব হয় না, যার প্রাণ আছে তার প্রাণেই ঘা লাগে। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও আমরা দেখেছি তাঁর ধ্যানী আত্মস্থতাকে বহি-র্জগতের পীড়ন বার-বার ভেঙে-ভেঙে দিয়েছে, তীব্রস্বরে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন হত্যাকারী অত্যাচারীকে: জাপান যখন চীনকে গ্রাস করতে উদ্যত হ'লো, জাপানের

বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র বিক্ষোভের প্রমাণ রয়েছে অনেক কবিতায় আর নোগুচিকে লেখা চিরস্মরণীয় পত্রাবলিতে। লোভ জিনিশটা অতি কুৎসিত এবং কবি কুৎসিতকে সইতে পারেন না। তাই আজ পৃথিবী ভ'রে লোভ যখন তার বীভৎসতম মূর্তিতে প্রকট তখন আমরা কবিরা, শিল্পীরা স্বভাবতই, নিজের প্রকৃতির অদম্য টানেই, ঐ বীভৎসতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো—এর মধ্যে রাজনীতির কোনো গূঢ়তত্ত্ব নেই, আমাদের মনুষ্যত্বের, কবিচরিত্রের, এটা ন্যূনতম দাবি।

বর্বরতার বিরুদ্ধাচরণ মনুষ্যধর্ম মাত্র, কিন্তু লেখকদের পক্ষে এর বিশেষ একটু তাৎপর্য আছে। পশুত্বের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতেই হবে, নয়তো আমাদের অস্তিত্বই যে থাকে না। জর্মানি থেকে মনীষীরা যখন একে-একে বিতাড়িত হ'তে লাগলেন, জাপানের বোমাবর্ষণে চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যখন বিধ্বস্ত হ'তে লাগলো, তখন ঘৃণায় শিহরিত হ'য়ে এ-কথাই ভাবলুম যে দু-দিন পরে এইরকম কোনো পৈশাচিক শক্তি যদি ভারতবর্ষের দিকে বিষাক্ত ফণা উদ্যত করে তাহ'লে আমরা যারা কবি-শিল্পী-বিদ্যানুরাগী আমরা আমাদের স্বাধিকার থেকে সকলের আগে বঞ্চিত হবো, এই দুর্গত পরাধীন দেশেও চিন্তার ও আত্মপ্রকাশের যেটুকু স্বাধীনতা আমাদের আছে সেটুকুও আর থাকবে না ; শুধু-যে আমাদের জীবিকা কিংবা জীবন যাবে তা নয়, যা কিছু আমাদের কাছে মূল্যবান, যে-সব জিনিশ আছে ব'লে আমরা বাঁচতে চাই এবং যা না-থাকলে আমাদের জীবনের কোনো মানে থাকে না, সব একেবারে ছারখার হ'য়ে যাবে। স্প্যানিশ যুদ্ধে, চীন-জাপানের যুদ্ধে এটুকু আমাদের শিক্ষা, বৃহত্তর রাজনীতিতে সেই প্রথম দীক্ষা।

তারপর সেদিন যুদ্ধ বাধলো। বর্বরতার শেষ সূক্ষ্ম মুখোশ খ'সে পড়লো, ভণ্ডামির ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত কোনোখানে আর রইলো না। জলে-স্থলে-আকাশে হত্যা আজ স্বেচ্ছাচারী : শুধু যোদ্ধহত্যা নয়, নারীহত্যা, শিশুহত্যা, জনতার সামগ্রিক বিনাশ, তাছাড়া সত্যের, সুন্দরের সমস্ত আদর্শের হত্যা। এই হত্যার ঢেউ আজ ভারতের উপকূলে এসে পৌঁছেছে। আজ এ-কথা অতি নিষ্ঠুরভাবেই উপলব্ধি করতে হচ্ছে যে জগতের রাজনীতির ফেনিল আবর্তের সঙ্গে অতি তুচ্ছ এই-যে আমি, আমার অত্যন্ত তুচ্ছ সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই জড়িত। আমি তো অতি ভালোমানুষ, সাতেও নেই পাঁচেও নেই, নিরিবিলি ঘরের কোণে ব'সে পড়াশুনো করতে চাই আর মাঝে-মাঝে এক-আধটা কবিতা লিখতে চাই, কিন্তু আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে কে? যে-কোনো অতর্কিত মুহূর্তে আমার বাস-স্থান, প্রিয়জন, আমার সমস্ত আশা-ভালোবাসা শুদ্ধু আমি একেবারে লোপাট হ'য়ে যেতে পারি। কিংবা কোনো আসুরিক শক্তি হয়তো কেড়ে নেবে আমার

কলম, থামিয়ে দেবে আমার সমস্ত কর্মোদ্যম, পাথর চাপা দেবে আত্মপ্রকাশের আবেগে—তাহ'লেই বা আমার অস্তিত্ব থাকে কোথায়? অতএব দেখা যাচ্ছে এই-যে আমার ঘরে ব'সে আপন কাজ করবার অধিকার, যার উপর আলো-হাওয়ার মতোই মানুষের জন্মগত দাবি, এও বিশ্বের রাজনীতির জটিল গ্রন্থিতে বাঁধা। আমার পক্ষে—এবং অনেকের পক্ষেই—এ-উপলব্ধি অতি মর্মান্তিক। কখনো ভাবিনি মানুষের বাঁচবার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি এ-অধিকার থেকে যুগে-যুগে তারাই বঞ্চিত হয়েছে যারা বীজ বোনে যারা তাঁত চালায় যারা ধান কাটে, যারা তাদের পেশীবহুল দৃঢ় স্কন্ধে সমস্ত জীবনের ভার বহন ক'রে আসছে। আজকের দিনে এমন-এক রাষ্ট্রশক্তি প্রবল হ'য়ে উঠেছে যারা এই ব্যবস্থাকেই স্থায়ী করবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় লিপ্ত, এবং সকল মানুষকেই লৌহশাসনের যন্ত্রে পিষ্ট না-করলে যাদের চলে না। তাদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি এমনই যে সকলের আগে কবির মুখ বন্ধ করা তাদের দরকার কেননা কবি সত্য ও সুন্দরের উপাসক।

এরই নাম ফ্যাশিজম। অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে ফ্যাশিজম-এর ব্যাখ্যায় মধ্যে আমি যাবো না, আমি দেখতে পাচ্ছি এটা সংস্কৃতির প্রতিশ্রুত শত্রু, সভ্যতার ইতিহাসে এ একটা তীব্র বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া। সেইজন্যে আমরা যারা সংস্কৃতিতে, বিশ্বমানবের ঐতিহাসিক প্রগতিতে আস্থাবান, আমাদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে। এটা কোনো চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণের কথা নয়, কোনো পরাক্রান্ত মূঢ় যদি রবীন্দ্রনাথকে দুয়ো দেয় তাকে সহ্য করা যেমন আমাদের পক্ষে অসম্ভব, এও তেমনি। রবীন্দ্রনাথ পূজ্য নন, এ-কথা যেমন ম'রে গেলেও বলতে পারবো না, তেমনি অপমানিত, লাঞ্ছিত কিংবা নির্বাসিত হ'লেও এ-কথা মানতে পারবো না যে দেশের তথাকথিত 'উন্নতির' জন্য সভ্যতার সর্বনাশ যদি দরকার হয় সর্বনাশই করতে হবে। আমাদের কাছে আগে সভ্যতা, আগে মনুষ্যত্ব, তারপর অন্য সব-কিছু।

তাছাড়া ভেবে দেখতে হবে যে ফ্যাশিজম শুধু একটা সামরিক নীতি কিংবা রাজনৈতিক পদ্ধতি নয়, ফ্যাশিজম একটা মনোভাব। মনোভাব মাত্রই অত্যন্ত ব্যাপক, জীবনের সমস্ত ছোটোখাটো ব্যাপারে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এটা আজকের দিনে অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে উপলব্ধি করছি যে কোনো ব্যক্তির যদি রবীন্দ্রনাথের গান কি যামিনী রায়ের ছবি ভালো না-লাগে, সেই রুচির কিংবা রুচির অভাবের সঙ্গে জড়িত আছে তার রাজনৈতিক মতামত। হয়তো সে-মতামত সম্বন্ধে সে নিজে খুব বেশি সচেতন নয়, কিন্তু খোঁচা দিলেই মনের কথা

বেরিয়ে পড়ে, এবং যে-সব কথা সে অবলীলাক্রমে ব'লে যায় তার ভয়াবহ তাৎপর্য সে নিজেও বোঝে না। স্ত্রীপুত্রের প্রতি, বন্ধুর প্রতি, একদিকে ভৃত্য ও অন্যদিকে বড়ো সায়েবের প্রতি ব্যবহারে, বিদেশী ও বিধর্মী সম্বন্ধে ভঙ্গিতে, তার প্রতিদিনের তুচ্ছতম আচরণে ও আলোচনায় তার মূল মনোভাব নানাভাবে প্রকট হ'য়ে ওঠে। আমাদের দেশেও আজকের দিনে এমন লোকের অভাব নেই যারা যা-কিছু প্রগতিশীল তারই বিরোধী, যা-কিছু নতুন সে-সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, যারা স্ত্রীজাতিকে সন্তানবাহী ক্রীতদাসী বানিয়ে রাখবার পক্ষপাতী, নিজের স্ত্রীকে প্রহার করতে ও পরস্ত্রীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে যারা নিয়ত উৎসুক, এদিকে সামাজিক জীবনে স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীন মেলামেশার কথা শুনলে যারা মূর্ছা যায়, যারা যে-কোনোরকম বিদেশী কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বী সম্বন্ধে বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে, অথচ পরস্পরের কুৎসারটনায় যাদের জিহ্বা চিরচঞ্চল, যারা নিছক গুণ্ডামির একান্ত ভক্ত—অবশ্য সে-গুণ্ডামির যতক্ষণ জিৎ হ'তে থাকে। গুণ্ডামিকে তারা পৌরুষ মনে করে, হৃদয়হীন কঠোরতাকে শক্তি ব'লে বাহবা দেয়। তাই যখনই যে-জাত পশুশক্তিতে দুর্দান্ত হ'য়ে ওঠে তারা অন্য-কিছু বিচার না-ক'রে তারই ভজনা করে। এ-সব লোক বাইরে থেকে দেখতে দিব্যি লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক, কিন্তু যে-কোনো বিষয়ে দু-একটা কথা বললেই বোঝা যায় তাদের মনোভাবটা কী। চোখ বুজে ব'লে দেয়া যায় যে এটাই ফ্যাশিস্ট মনোবৃত্তি—হয়তো সচেতন নয়, অচেতন—কিন্তু শেষ হিশেব মেলাবার দিনে এদের সমস্ত অচেতন ইচ্ছা বাঁধন-ছেড়া ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো ছুটে বেরিয়ে এসে তাদেরই কামড়াতে যাবে মুক্তির সাধনায় জীবন যাদের উৎসর্গিত। দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে এই লড়াইতে আপাতত ফ্যাশিস্টদের জিততে দেখে আমাদের দেশের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি প্রবল উৎসাহে ফেঁপে উঠছে; এতদিনে সমাজজীবনে আমরা যেটুকু অগ্রসর হয়েছি এক দলের মনের ইচ্ছা তার সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত ক'রে দিয়ে সেই যুগে ফিরে যায় যখন মনের সুখে বৌ ঠ্যাঙানো যেতো এবং ছোটোলোকদের পায়ের তলায় পিষে রাখলে তারা সেই শ্রীচরণযুগলকে জড়িয়ে ধ'রে ভক্তিভরে সেখানে মাথা ঠেকাতো। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকের মনেই এই প্রতিক্রিয়া আজ বন্দী সর্পের মতো ফোঁসফোঁস করছে, একবার ছাড়া পেলে তার বিষ সমস্ত জাতির দেহে সঞ্চারিত হবে এমন আশঙ্কা আছে ব'লেই আজ আমরা যারা প্রগতিতে বিশ্বাসী তাদের একত্র হ'য়ে দাঁড়াতে হবে, জোর ক'রে বলতে হবে যে এই কুৎসিত মনোবৃত্তির আমরা বিরোধী, এর বিরুদ্ধে যা-কিছু করবার সব করবো, তার জন্য যত নির্যাতন সইবার সব সইবো। এটা বীরত্বের কথা নয়, পেশাদার

যোদ্ধার ফাঁকা বুলি নয়, এটা আমাদের প্রাণের কথা—কারণ সভ্যতার সুষমা যদি ধ্বংস হ'য়ে যায় তাহ'লে পেটে খেতে পেলেও জীবনের কোনো মানে থাকে না, এই আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস।

আমি জানি আমার এ-সব কথা অনেকের কাছে সেন্টিমেণ্টাল্ লাগবে। অনেকে বলবেন, প্রগতি ব'লে কিছু নেই, পরিবর্তনের নিত্যচক্রে পৃথিবীর ইতিহাস ঘুরছে। সভ্যতার গতিপথ চক্রাকার—এটা ফ্যাশিস্ট দর্শনেরই কথা, কিন্তু সে-কথা ছেড়েই দিলুম। বাস্তবিক পক্ষে সভ্যতার বিবর্তনের ছবিটা ঋজু না গোল না সর্পিল আকারের, সে-আলোচনার এখানে সময় নেই। আমি বলতে চাই যে আমি প্রগতিতে বিশ্বাস করি শুধু এই কারণে যে তা না-করলে জীবন একেবারে নিরর্থক হ'য়ে যায়। সভ্যতাকে মাঝে মাঝে বর্বরতা এসে গ্রাস করবেই এ-কথা যদি নিয়ম ব'লে মেনে নিতে হয়, তাহ'লে কোনো কর্মে আমার আর উৎসাহ থাকতে পারে না, বেঁচে থাকবার মূল তাগিদটাই যায় ম'রে। তাছাড়া ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে সভ্যতার আলো কখনোই জগৎ থেকে একেবারে নিবে যায়নি—কখনো চীনে কখনো রোমে, কখনো ভারতে কখনো আরবে, কখনো-বা ইওরোপে সে-আলো উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটেছে, তার রশ্মি বিকীর্ণ হয়েছে সমস্ত জগতে। ইতিহাস যেদিন থেকে আরম্ভ, সেদিন থেকে পৃথিবীর এক প্রান্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'লেও আর একদিকে আলো জ্বলেছে, এবং পর-পর এতগুলি সভ্যতার ওঠা-পড়ার মধ্যে কোনো মিলনগ্রন্থি কি নেই? আছে বইকি, সমস্ত ইতিহাস এক সূত্রে বাঁধা। প্রাচীন গ্রীস রোম মিশর ভারত চীনের উত্তরাধিকার জগৎ থেকে তো হারিয়ে যায়নি, তারা যা ক'রে গেছে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার কাজ আরম্ভ হয়েছে তার পর থেকে। এমনি ক'রে-ক'রেই মানবজাতির ইতিহাস গাঁথা হ'য়ে চলেছে, বংশের পর বংশ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। একেই তো বলি প্রগতি। অতীত এসে বর্তমানে মিলিত হয়, বর্তমান ধাবিত হয় ভবিষ্যতের দিকে। এর মধ্যে কত পরিবর্তন, কত বিপ্লব, কত ভাঙা-গড়া, কিন্তু সব মিলিয়ে এর অন্তরালে একটি ঐক্যের সুর বাজছে, তারই নাম প্রগতি। আরো মুক্তি, আরো সৌন্দর্য, আরো সভ্যতা, পৃথিবীর সমস্ত জাতিতে বর্ণে শ্রেণীতে সভ্যতার উৎসাহ সঞ্চালিত ক'রে দেয়া—সমস্ত ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন বাণী তো এই। আজকের দিনে নতুন আলো জ্বলেছে রাশিয়াতে; পাশ্চাত্য সভ্যতায় ভাঙন ধরেছে তা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাই ব'লেই কি তাকে আজ নিন্দে করতে বসবো? তাই ব'লেই কি বলতে শুরু করবো, ঢের ভালো ছিলো আমাদের জাতিভেদ, সতীদাহ, ঢের ভালো জাপানের শিন্তোবাদ, যেহেতু এ-সভ্যতায় আর কাজ চলছে না সেইজন্যই ব'লে বসবো যে বর্বরতাই

ভালো ? কক্ষনো না। এই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জগৎকে যা দিয়েছে তার মূল্য অসীম, কিন্তু তার দিন ফুরিয়ে এসেছে, সব সভ্যতারই একদিন মরণদশা ঘটে। তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, তার মধ্যে যেটা মূল শক্তি, অর্থাৎ বিজ্ঞানের লৌকিক ব্যবহার সেটা থাকবেই, কিন্তু এ-সভ্যতার যেটা দুর্মানুষিক দিক সেটা কালের কবলে ঝ'রে পড়বে। এ-সভ্যতা রূপান্তরিত হ'য়ে যে নতুন মূর্তি নেবে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে রাশিয়াতে। আমরা তাকিয়ে আছি সে-যুগের দিকে যখন সমস্ত পৃথিবী এক হবে, শান্তি হবে স্থায়ী, জগতে শোষিত জাতি কিংবা শোষিত শ্রেণী আর থাকবে না, বিজ্ঞানের অলৌকিক কীর্তির ফলভোগ করবে সকল মানুষ, অন্নবস্ত্র শিক্ষা-স্বাস্থ্য-স্বাধীনতা থেকে কেউই বঞ্চিত হবে না, শিল্পকলা জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ হবে সর্বতোভাবে অপ্রতিহত। অনেকেই বলবেন এটা পরিকল্পনা মাত্র। এ-কখনো সম্ভব নয়, হিউম্যান নেচারই এ-রকম নয় যে···কিন্তু এই কাল্পনিক হিউম্যান নেচারের দোহাই দিয়ে অনেক অসত্যই এতদিন আমাদের বিশ্বাস করানো হয়েছে, আর আমরা ঠকবো না। মানুষ স্বভাবতই হীন, লোভী, ঈর্ষাকাতর কি দাম্ভিক নয় ; অবস্থার বিপাকেই সে ও-রকম হয়, এবং অবস্থা বদলালে তার স্বভাবও যে বদলায় তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তাছাড়া, যাঁরা বলেন যে পৃথিবী কখনো স্বর্গ হবে না তাঁদের জিগেশ করি যে এইভাবেই কি চলবে চিরকাল ? পৃথিবীর এত ঐশ্বর্য, বিজ্ঞানের এত শক্তি নিয়ে এই অভাব এই হাহাকার কুড়ি বছর পর-পর খণ্ডপ্রলয়, একেই কি চুপ ক'রে মেনে নিতে হবে ? একবার চেষ্টা ক'রে দেখাই যাক না হয় কিনা। যে-কারণে পৃথিবীতে আজ ঐশ্বর্যের অন্ত নেই, সেই কারণেই যুদ্ধ আজকাল এমন ঘোর দানবিক যে জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধের স্পৃহা কিংবা প্রয়োজন যদি দূর করা না-যায়, পৃথিবীর সব দেশ সব জাতি এক প্রীতির বন্ধনে যদি যুক্ত না-হয় তাহ'লে দুশো বছরের মধ্যে মনুষ্যজাতিই হয়তো আর থাকবে না। কেউ-কেউ এমনও আছেন যাঁরা বলবেন না-যদি থাকে না-ই থাকবে, মনুষ্যজাতিকে থাকতেই হবে তারই বা কী মানে আছে ? আমি স্বীকার করবো ও-কথা বলবার মতো প্রকাণ্ড দার্শনিক এখনো আমি হ'তে পারিনি ; জীবনের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা, মানুষের প্রতি আমার স্বাভাবিক মমত্ববোধ ; আমি কোনোরকমে সন্ধ্যা-আহ্নিক ক'রে ব্যাঙ্কের টাকা গুছিয়ে যে-কোনো অবস্থায় নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা ক'রে দিন গুজরান করতে চাই না, আমি নিবিড়ভাবে বাঁচতে চাই, আমি সেই মহৎ স্বার্থ রক্ষা করতে ইচ্ছুক যা আমার একলার নয়, সকলেরই স্বার্থ। আমি আমার সেই ভালো চাই যাতে অন্য সকলেরই ভালো। আমি মনুষ্যজাতিকে শ্রদ্ধা করি, তার সাধনার মহিমায় আমি মুগ্ধ ; তাই আমি শান্তি চাই, প্রীতি চাই,

মুক্তি চাই, যাতে এই মানুষ তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি অর্জন করতে পারে। যা চাচ্ছি তা শিগগির হয়তো হবে না, সহজেও হবে না, কিন্তু সেইজন্যই তো আরো উদ্যোগ আরো নিষ্ঠা আরো সাহস দরকার, আগে থেকেই হার মানলে চলবে না, ভীরু হ'লে চলবে না, নৈরাশ্যের আবছায়ায় নিজের কাপুরুষতা লুকিয়ে রাখলে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি আমার নিজেরই এ-কথা আমরা প্রত্যেকেই যেন প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করি।

একটা ছোটো ঘটনার উল্লেখ করে এ-প্রবন্ধের শেষ করি। একবার একটি কলেজের ছাত্র আমাকে বলছিলো, 'হিটলারের আমলে জর্মানির কী আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে তা তো দেখছেন। আমাদের দেশে এইরকমই দরকার।' আমি তাকে বললুম, 'ওরা আইনষ্টাইনকে তাড়িয়েছে—' সে বাধা দিয়ে বললে, 'জ্যুরা ভয়ানক খারাপ লোক, তাদের তাড়ানোই উচিত।' আমি তাকে জিগেশ করলুম, 'আচ্ছা ধরো, আমাদের স্বদেশী হিটলার যদি রবীন্দ্রনাথকে তাড়াতে চান, তুমি তাতে রাজি আছো?' সে একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'দেশের উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথকে যদি তাড়াতে হয়ই তবে তাড়াতেই হবে।' আমি বললুম, 'যে-উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথকে তাড়াতে হয় সে-উন্নতি আমি চাই না, কারণ মনে-মনে আমি নিশ্চয়ই জানি যে সেটা উন্নতি নয়, ঘোর অবনতি।' এই কথাই আমার শেষ কথা।

অশোক মিত্র

ন্যায়ের রাজ্য স্থাপনের দিকে

স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের অর্ধস্ফুট সূচনা যখন, আমার তখন সবে ন-বছর বয়স। আমাদের জন্ম যে-ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের নিগড় সে তখন থেকে মুক্তি খুঁজছে। বছরটা ১৯৩৬ সাল, খবরের কাগজ জুড়ে শ্রীমতী সিমসন প্রস্তাবিত গান্ধর্ব বিবাহ, অথবা প্রায় অবশ্যম্ভাবী রাজসিংহাসন ত্যাগের সংবাদ। পাশাপাশি অবশ্য থাকতো কিছু-কিছু তথাকথিত 'জাতীয়তাবাদী' খবরও : যথা, ১৯৩৫ সালের গভর্নমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, মহাত্মা ও তাঁর সাবরমতী আশ্রম, ফৈজাবাদের কংগ্রেস সম্মেলন, নেতাজি সুভাষের এরোপ্লেনে দেশে প্রত্যাবর্তন, আরো-কিছু 'সন্ত্রাসবাদী'র আন্দামানে নির্বাসন। জগৎসংসার জুড়ে ছিল ব্রিটিশসাম্রাজ্য এবং তার বৈপরীত্যে স্থিত আমাদের পিতৃপুরুষেরা, যাঁরা ঐ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিদের হাত থেকে কিছুটা আত্মসম্মানবোধের সঙ্গে কিছুটা স্বাধিকার বোধ ছিনিয়ে আনতে চাই-ছিলেন। তার বাইরে আর-কিছুরই তেমন অস্তিত্ব ছিল না তখন। এই নিস্তরঙ্গের মধ্যে স্পেনের জায়গা হওয়া কঠিন ছিল, কিন্তু স্পেন কী ক'রে যেন জায়গা ক'রে নিয়েছিল। গড়ে প্রতি সপ্তাহে দুটি অনুচ্ছেদের বেশি নয়, কিন্তু ঐভাবেই স্পেনে যা ঘটছিল তার ছিটেফোঁটা খবর গড়িয়ে আসছিল আমাদের দিকে। বাবা-কাকাদের মুখে হয়তো আচমকা কোনো মন্তব্য; কিংবা দেয়ালমানচিত্রে বার্সিলোনা বা মাদ্রিদ দেখিয়ে ভূগোলস্যার হয়তো সেখানকার উল্লেখ করলেন। কীসে আমরা শিশুরা নাড়া খেয়েছিলাম, বুঝিয়ে বলতে বললে নিশ্চয়ই বোকা ব'নে যেতাম। কিন্তু নাড়া খাওয়াটা ছিল বাস্তব। শিশুরা সবকিছুকেই খেলার স্তরে নামিয়ে আনে, নিজেদের উপলব্ধির উপযোগী পরিভাষায় যে-কোনো অভিজ্ঞতাকে অনুবাদ ক'রে নেয়। স্পেন আমাদের কাছে ছিল এক নিরেট ভালোমন্দের খেলা : রিপাব্লিকানরা সৎ, ন্যায়পরায়ণ, ফ্রাঙ্কো-সমেত ফালাঞ্জিস্টরা অসৎ-দুশমন। রোজ সকালে স্কুল শুরু হবার মুখে ক-জন চ্যাংড়া চালু করত এক নতুন সমাজবিধি। ক্লাসে ঢোকার মুহূর্তে প্রতিটি ছেলেকে আটকে দিয়ে প্রশ্ন করা হত : শত্রু না মিত্র, রিপাব্লিকান না ফালাঞ্জিস্ট? কোনো ছেলে ফালা-ঞ্জিস্টদের প্রতি অনুকম্পা দেখালে তার প্রবেশ নিষেধ। মজাটা চলত পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট, যতক্ষণ-না ফাস্ট পিরিয়ডের ঘণ্টা বাজত, শ্রেণীশিক্ষক গটগট

ক'রে ঢুকতেন ; এবং বন্ধু শত্রুনির্বিশেষে সবাই ক্লাসঘরে জমায়েত। টিফিনের ঘণ্টায় স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু।

এইসব খেলা ছিল সারল্যে মধুময় ; তার মধ্যে রক্তপাত ও অত্যাচার, বোমা ও মর্টার, ট্যাঙ্ক আর আগুন-উগরোনো এরোপ্লেন, মতাদর্শ আর বিশ্বাস-ঘাতকতার কোনো আবছা আভাসও ছিল না। তবু অবচেতনায় কিছু-না-কিছু নিশ্চয়ই চুঁইয়েছিল। আমরা, ভারতীয়রা, চাইছিলাম বিদেশী শাসনের নিগড় থেকে মুক্তি। আর ওরা, স্পেনীয়রা, স্বাধীন, কিন্তু সে-স্বাধীনতা কিছু দস্যুর হাতে বিপন্ন। এটা অন্যায়, এ হ'তে পারে না, তাই আমাদের শৃঙ্খলিত ভারতের শিশুদেরও আওয়াজ তুলতে হবে : 'নো পাসারান', 'হাত ওঠাও, স্পেনকে বাঁচতে দিতে হবে'।

শিশুরা খেলা করে, কখনো-বা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলাও। আমরাও তাই করতাম, এবং হয়তো এটা নিছক আকস্মিকতা যে আমাদের খেলার সঙ্গে জড়িয়ে যেত ভালেন্সিয়া, কর্দোবা, জারাগোজা, গের্নিকা এই নামগুলি। স্পেনের পতন ঘটল অল্পদিন পরেই, কিন্তু আরো ঘটনা ঘটছিল, পর-পর কতগুলি নাম : মেমেল, ডানজিগ ও ম্যুনিখ। অস্ট্রিয়া সেনাবাহিনীর ভূতপূর্ব করপোরাল এবং ইতালির সোশালিস্ট পার্টির ভূতপূর্ব কর্মকর্তা—দু-জনেরই পাগলামির মধ্যে নিহিত এক-ধরনের ভয়াবহ নিয়মপরায়ণতা। একটু বাদে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু, আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলাম। জ্ঞানস্পৃহার ঊর্ধ্ব রেখাটির পিঠে সওয়ার তখন আমরা, জাতীয় চেতনার স্তর থেকে আস্তে-আস্তে এগোচ্ছি সামাজিক বাস্তবের ভাবনায়। ঠিক এই সময়েই কি আমাদের মফস্বল শহরের প্রায় ভেঙে-পড়া পুরোনো ছবিঘরে আমরা *For Whom the Bell Tolls* ছবিতে ইন্‌গ্রিড বার্গম্যানকে দেখি? তখনও আমরা যথেষ্ট প্রজ্ঞালব্ধ নই, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার স্বর্ণকেশ সৌন্দর্যের নির্যাস ইন্‌গ্রিড নিশ্চয়ই বিপ্লবী লাতিন যুবতী মারায়ার ভূমিকায় অত্যন্ত বেমানান ছিলেন ; তাহ'লেও কিন্তু আমাদের জাদু করেছিলেন তিনি।

আমরা কি জানতাম যে আমাদের এই চেতনা তবু ছিল নেহাৎই হাল্‌কা পল্‌কা, ঠুনকো? স্পেনের দুরদৃষ্ট তো ইতিমধ্যেই অতীতের ঘটনা, তা নিয়ে ভাববার মতো সময় ছিল না আমাদের। কারণ ঐ একই সময়ে তো আমাদেরও চলছিল চরম অগ্নিপরীক্ষা : যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ আর বিয়াল্লিশের বিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিজয়কাহিনী, অব্যবহিত পরে বোম্বাইয়ে নৌসেনাদের গৌরবময় অভ্যুত্থান, কলকারখানায় ক্রমপ্রসারমান শ্রমিক অসন্তোষ, গারো পাহাড়ে আর মালাবারে কৃষকরা চঞ্চল, অবৈকল্যে অধিষ্ঠিতা গোদাবরী পারুলেকর থানে-অঞ্চলে

আদিবাসী নারী-পুরুষদের সংগঠনের কাজে বিভোর, নিখিল ভারত ফেডারেশনের পতাকাতলে ছাত্রছাত্রীরা আস্তে-আস্তে জড়ো হচ্ছে, কৃষণ চন্দর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্নিগর্ভ ছোটোগল্পগুলিতে প্রগতি সাহিত্য ক্রমশ স্পষ্টতর চেহারা পাচ্ছে। পরিস্থিতি দিনের পর দিন আরো গভীর অর্থবহ হ'য়ে উঠছিল, তার আদলটা ধরা পড়ছিল আমার চেতনায়, কোন্‌দিকে আমার দায়বদ্ধতা তা একটু-একটু ক'রে বুঝতে পারার মধ্যে যে-প্রশান্তি তারই দিকে যেন এগোচ্ছিলাম। অকস্মাৎ দেশভাগ ও সরকারি স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে আমার চেতনার আকাশটিও অতীতের পটভূমিকা থেকে গুণগতভাবে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল।

এই বিভ্রান্তিকর সময়, অস্থিরতা, এরই মধ্যে ফের আমি স্পেনকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করি, এই প্রথম প্রবিষ্ট হ'তে পারি ঐ মহান্ জাতির যন্ত্রণা কন্দরে। সঙ্গে আমার এই নব আশ্লেষ ঘটেছিল কবিতার মধ্যবর্তিতায়। আমার প্রজন্মের আরো অনেকেরই হয়তো একই অভিজ্ঞতা। যখন স্পেনে সব শেষ হ'য়ে গেছে, স্পেন পরাভূত পরাজিত, তার অন্তত বছর ছয়েক বাদে কবিতার সহায়তায় আমি পরিচিত হই স্পেনে সংঘটিত পাপ ও বর্বরতার সঙ্গে, সেই সঙ্গে শৌর্য ও আত্মত্যাগের সঙ্গে। একটি বিশেষ কবিতা অন্য-সব কবিতাকে ছাপিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, একটি বিশেষ কবিতা হ'য়ে ওঠে স্পেনের প্রতীক। ডব্লিউ. এইচ্. অডেনের এই কবিতাটি ছিল মাটি-ঘেঁষা, স্বাভাবিক কথোপকথনের সুরে বাঁধা। আবেগের উত্তুঙ্গতা কবিতাটিতে বর্জিত; অডেনের কুশলতা ফেদেরিকো গার্সিয়া লোর্কা বা ডিলান টমাসের থেকে একেবারেই আলাদা। কিন্তু এমন স্বাভাবিক সুরে বলা ব'লেই যেন কবিতাটি ঠিক জায়গায় গিয়ে ঘা দেয়—যেমন অনেক সময়ে হয় যখন কোনো ইতিহাসের শিক্ষক ঢুকে পড়েন সাহিত্যের রাজ্যে, অথবা অলংকার শাস্ত্রের চেয়ে ছন্দশাস্ত্রে নিপুণ সাহিত্যের অধ্যাপক যখন শিল্পের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করতে শুরু করেন। অর্ধেকটা মাস্টারির ভঙ্গিতে মক্সো করা, ক্বচিৎ কখনো আবেগমন্থনের দিকে ঝোঁকে কবিতাটি। কিন্তু আমাদের মন জয় ক'রে নেয় তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত স্বচ্ছতা। চূড়ান্ত ভাবালুতা হয়তো এটা, কিন্তু আমার কাছে অন্তত, স্পেনের গৃহযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরেও, ঐ কবিতাটিই স্পেন, স্পেনই ঐ কবিতা।

কবিতাটির শুরু ফেলে-আসা দিনগুলির কথা দিয়ে। গতকাল 'তাসের খেলা থেকে নিশ্চিন্তির নির্ধারণ', 'জলে ভবিষ্যৎ দেখা', 'চাকা ও দোলকঘড়ি'র সৃষ্টি; গতকাল 'পোষ মানল ঘোড়ারা', গতকাল 'দুনিয়াটা ছিল শশব্যস্ত নাবিকদের'। গতকাল 'পাথুরে থামের ফাঁকে ধর্মদ্রোহীদের বিচারসভা', পানশালায় শ্রুতি শা

নিয়ে তুলকালাম, আর ঝরনার জলে অলৌকিক রোগমুক্তি', গতকাল 'ডাকিনীচক্র' বসেছিল, 'উদ্বোধন হল বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ঘূর্ণযন্ত্রের', 'ঔপনিবেশিক সাহারায় খুলল রেলসড়ক', 'গতকাল হয়ে গেল মানবজাতির অভ্যুত্থান নিয়ে ধ্রুপদী বক্তৃতা'। অডেন অলস-মন্থর গতিতে তালিকা দিচ্ছেন মানবসভ্যতার উদ্বর্তনের। আমরা অর্ধেক কান দিচ্ছি, এখনও আমরা ছন্দটাকে ঠিক ধরতে পারছি না। কিন্তু হঠাৎ থমকে যায় তাঁর কণ্ঠ, আসে হাতুড়ির অভিঘাত: 'আজ লড়াই'। একবার যদি লড়াই এসে দাঁড়ায় দোরগড়ায়, তুমি-আমি তা থেকে পালাতে পারি না। সভ্যতার নিয়তিস্বরূপ এই লড়াই আমাদের প্রত্যেককে অমোঘভাবে টেনে নেয়। 'গতকাল বিশ্বাস ছিল গ্রীসের পরম মূল্যবত্তায় / যবনিকা নেমে এসেছিল নায়কের মৃত্যুদৃশ্যের ওপর / গতকাল সূর্যাস্তের কাছে স্তব / ও উন্মাদদের উপাসনা। আজ কিন্তু লড়াই।' হঠাৎ জীবন নেয় দুঃসহ অর্থ। শোনো, জীবন নিজের সঙ্গে কথা কইছে, কথা কইছে বিবেকের অস্মিতা। জীবনের অর্থই হল মহড়া নেওয়া, লেগে-থাকা, দায়-বদ্ধতা। 'আমি তা-ই তুমি যা করো।' 'আমি তোমার ভালো হবার শপথ / তোমার মজার কিস্‌সা, তোমার আনুষ্ঠানিক কণ্ঠস্বর, তোমার বিবাহ।' এই ঘনিষ্ঠ স্বগতোক্তি থেকে কারো বাদ থাকার উপায় নেই। স্পেন তোমাকে বাদ থাকতে দেবে না। 'কী তোমার প্রস্তাব? ন্যায়ের রাজ্য স্থাপন করা? তাই হবে / মঞ্জুর। না তুমি চাও আত্মহত্যার চুক্তি, এক রোমান্টিক মৃত্যু? / তাই শ্রেক, মেনে নিলাম; কেন না আমিই তোমার / নির্বাচিত পথ, তোমার সিদ্ধান্ত। হ্যাঁ, আমিই স্পেন!'

আমিই তোমার নির্বাচিত পথ, তোমার সিদ্ধান্ত। হ্যাঁ, আমিই স্পেন। না, এটা ফাঁকা দম্ভোক্তি নয়। ত্রিশের দশকের যুক্তিবাদী মন এই একটি সিদ্ধান্তেই আসতে পারত, আর তা থেকে ফেরার কোনো রাস্তা ছিল না। দূর উপদ্বীপ, ঘুমন্ত সমভূমি ও পথভোলা জেলেদের চর, আর শহরের ঘুণধরা হৃদয় থেকে, অসৈরণের দেশ, আর রাত্রি আর আল্‌পস্-ফোঁড়া সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে, সমুদ্রপথে আর গিরিবর্ত্মে, আমাদের চিন্তা শরীর পায়, আমরা বিভীষিকার ব্যাপ্তিটাকে বুঝতে পারি। মুখোমুখি হ'তে হয় হামলাবাজ সৈন্যদের সঙ্গে, নিশ্চিহ্ন করতে হয় তাদের, গতকালের এবং আগামীকালের স্বার্থে।

'আগামীকাল অতি সম্ভব ভবিষ্যৎ।' কাল 'ক্ষয়ের মাত্রা ও মোড়ক-বানানো / শ্রমিকদের গতিবিধি নিয়ে চর্চা', 'তেজস্ক্রিয়তার অষ্টকের সবক'টির আবিষ্কার', 'সুসমঞ্জস খাদ্য ও বিধিমতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে' চেতনা আরো প্রসারিত হতে পারে আগামীকাল।' 'আগামীকাল নতুন ক'রে আবিষ্কৃত হবে দূরাশ্রয়ী প্রেম', 'ছবি তোলা হবে দাঁড়কাকদের', গম্বুজের নিচে 'বৃন্দগানের অপরূপ গর্জন' শোনা

যাবে আর সভাপতি নির্বাচিত হবে 'হঠাৎ উত্তোলিত হাতের অরণ্যে'। 'বোমার মতো ফেটে-পড়া তরুণ কবিদের জন্য আগামীকাল'; 'হ্রদের ধারে হাঁটার অবকাশ' আর 'গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে মফস্বল জোড়া সাইকেল প্রতিযোগিতা' আগামীকালের জন্যই। কিন্তু, আবার সময় এসেছে হস্তক্ষেপ করার : আগামীকালকে যদি গড়তে চাও অনবদ্য কবিতার পঙ্‌ক্তির মতো ক'রে, তবে 'আজ লড়াই'। হাতুড়ির অভিঘাতে শোনো : 'আজ লড়াই'। 'আজ সুনিশ্চিতভাবে বেড়ে যায় মৃত্যুর মাত্রা, / অমোঘ খুনের পর মেনে নিতে হয় সজ্ঞান অপরাধবোধ, আজ আয়ুক্ষয় / আলুনি তাৎক্ষণিক ইস্তাহার ও দীর্ঘসূত্রী আলোচনা সভার পিছনে।'

এটা কি ইতিহাসশিক্ষকের উক্তি, বিষয়বস্তু থেকে পিছু হঠে গিয়ে 'অমোঘ খুনে'র ওপর আপ্তবাক্য? না, কারণ এখানে তো ইতিহাস মানেই বর্তমান। যে-সৈনিক সে-ই কবি এখানে, তেমনি যে-কবি সে-ই সৈনিক। কবিই হোক, ইতিহাস শিক্ষকই হোক আর ক্রিকেটের পোকাই হোক, জনগণের বাহিনীর সে এক কর্মী। সে জনগোষ্ঠীর সদস্য, তাই তার বিবেককে অস্বীকার ক'রে সে চ'লে যেতে পারে না, ন্যায়ের রাজ্য নির্মাণের কাজে হাত তাকে লাগাতেই হবে। তাই, আজকের প্রয়োজনে, আহত করার ঠিক আগেই, 'এলোমেলো, অসমাপ্ত আলিঙ্গন'।

না, কোনো ভাবাতুর মৃত্যুবিলাস নয়। এটা আবশ্যিক সিদ্ধান্ত, একমাত্র গতি। কারণ, ধ্রুব সত্য এটা। 'আমাদের দিন হাতে ক'রে আমরা নিঃসঙ্গ, সময় সংক্ষিপ্ত, আর ইতিহাস পরাজিতদের জন্য দীর্ঘশ্বাস / ফেলতে পারে, কিন্তু তার সাধ্য নয় সাহায্য বা ক্ষমা।'

এই কি ছিল না একমাত্র শোনাবার মতো বার্তা : হয় ইতিহাসের গতির সঙ্গে নিজেকে মেলাও, নয়তো সে তোমাকে পথের পাশে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়ে যাবে। হয়তো কখনো সে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, কিন্তু তাহ'লেও ক্ষমা করবে না তোমার ব্যক্তিগত কাপুরুষতা। অডেনের কবিতাটির সংহত শৈলী আমাদের আরো-কিছু বলে। জমিয়ে রাখবার জিনিশ নয় তোমার অতীত বা ভবিষ্যৎ। প্রথমটিকে বাঁচাতে, দ্বিতীয়টিকে গড়তে গেলে অহমিকা ঝেড়ে ফেলে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে হবে, অ্যাম্বুলেন্স চালানো ও বালির বস্তা স্তূপ করার কাজে হাত লাগাতে হবে। হাজার-হাজার মানুষ এই বার্তায় সাড়া দিয়েছিল : 'তারা গিরিপথ অতিক্রম করল পায়ে-পায়ে'। 'অঞ্জলিতে তুলে দিল তাদের জীবন'। তুমি যদি একা পিছিয়ে থাকো, দেখছো না কী, তোমার গতকালও নেই, নেই আগামীকালও। যোগ দিতেই হবে তোমাকে, করতে হবে সেই 'অমোঘ খুন', নইলে ন্যায়ের রাজ্যে পৌঁছুবে কোন্ পাথেয়র উপর নির্ভর ক'রে?

অদৃষ্টের পরিহাস এটা যে আমি যখন এই কবিতায় অবগাহন করছিলাম, অডেন ঠিক তখনই প্রতীপ পথে হাঁটতে শুরু করেছিলেন। ন্যায়ের রাজ্যের স্বপ্নে তাঁর আগ্রহ তখন অস্তমিত। কিন্তু 'স্পেন' কবিতাটি তো, তাহ'লেও আমাদের মাংসে-মজ্জায় থেকেই গেল। আমরা মাঝে-মধ্যে বিপথগামী হই, এলোমেলো কাজে ছড়িয়ে দিই নিজেদের, খোয়াব দেখি; কখনো হই অসহনীয়, কখনো বা-বীর। একাদিক্রমে বহু বছর, কবিতাটিতে আর ফিরে যাই না, আমাদের বিবেককে আক্রমণ করে না কবিতাটির বিধ্বংসী শান্ততা, ক্রমশ আমরা প্রবেশ করি শ্মশানবৈরাগ্যের উপত্যকায়। তারপর স্ফুলিঙ্গের মতো কোনো কথা বা কোনো ভাবের সূত্রে আগুন জ্ব'লে ওঠে, হ্যাঁচকা টানে ফিরে আসি 'রৌদ্রপ্রধান দেশে ছায়াবিদ্যা'র স্মৃতিতে। ঘা খেয়ে জেগে উঠতে হয় মানুষের অন্ধকার প্রদেশের বাস্তবতায়। একবার সেখানে পৌঁছলেই ফিসফিসানির দূরত্বে ধ্বনিত হয় সেই প্রস্তাব : 'এসো, যোগ দাও, তোমাকে যোগ দিতেই হবে, আর কোনো পথ নেই, আমাদের সবাইকে হাত লাগাতে হবে সেই ন্যায়ের রাজ্য গড়ার কাজে।'

অডেন দূরে স'রে গেলেন, কিন্তু রেখে গেলেন সেই কবিতাটি যা আমাদের উত্তরাধিকার। আমি যে-মুহূর্তে কবিতাটিতে অনুপ্রবেশ করেছিলাম তার পর আরো চল্লিশ বছর লেগেছিল স্পেন থেকে ফ্যালাঞ্জিস্টদের উৎখাত করতে। ততদিনে 'স্পেন' কবিতাটি তার আদি প্রাসঙ্গিকতা থেকে বহু দূরে স'রে এসেছে। ১৯৩৬ বা ১৯৭৬ বা ১৯৮৬ সালের স্পেনের সঙ্গে তার সম্পর্ক অল্পই। অডেনের সঙ্গেও তার বাড়ির যোগ ছিন্ন। কবিতাটি, এখন, ইতিহাসের অঙ্গ হ'য়ে গেছে। সময়ের সঞ্জীবনী স্রোতের এমনিই জাদুশক্তি।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ফ্যালাঞ্জিস্টদের কুচকাওয়াজ শুরু হয়। কবিতাটি রচিত হয়েছিল তাও পঞ্চাশ বছর হ'তে চলল। আজ কি অবারিত সততায় আমার বলার সাহস আছে : আমি আজ যা, তার জন্য আমি সম্পূর্ণ ঋণী স্পেনের কাছে, আমার সামগ্রিক সত্তা স্পেনের সৃষ্টি?

অনুবাদ : মালিনী ভট্টাচার্য

রক্তাক্ত স্পেন ও আমরা



অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী

নিহত বিপ্লব

প্যারিস কমিউনের পর এতো সুন্দর দৃশ্য পৃথিবী আর দেখেনি। এই কথাগুলো বলেছিলেন রঁম্যা রলাঁ। ১৯৩৪-এর অক্টোবারের আস্‌ট্রুয়ারিয়্যাস্‌-এর বিপ্লবের পর। সে-বিপ্লবকে কেউ-কেউ তুলনা করেছেন ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবের সঙ্গে। এই আস্‌ট্রুয়ারিয়্যাস-এর বিপ্লবকে তাঁরা মনে করেন ১৯৩৭-১৯৩৯-এর স্পেইনের বিপ্লবের সূচনা, কেউ-বা মনে করেন পুরোদস্তুর মহড়া। জনগণের এমন ব্যাপক সশস্ত্র বিপ্লব দিয়ে যে-বিপ্লবী অধ্যায়ের শুরু তার পরিণাম মাড্রিডের পতনে—বিপ্লবের করুণ পরাভবে। এই মাড্রিডকে ফ্যাশিস্ট ফ্র্যাঙ্কোর বাহিনী যখন ১৯৩৬-এর জুলাইতে আক্রমণ করে তখন জনতার আশ্চর্য প্রতিরোধে ফ্যাশিস্টরা হঠে যেতে বাধ্য হয়। আর ১৯৩৯ এর মার্চে মাড্রিডের পতনের সময় সেই জনতাই ছিল নীরব, নিষ্ক্রিয়। সূচনা এবং পরিণামের এই ব্যবধান কেন?

বিশ্বব্যাপী মন্দার আক্রমণে ত্রিশের দশকের শুরুতেই স্পেইনের অর্থনীতি ভেঙে পড়ল এবং প্রাইমো দ্য রিভেরা-র একনায়কত্ব শেষ হল। রাজাও অল্প দিনের মধ্যে পালিয়ে গেলেন। ১৯৩১-এর ১৪ই এপ্রিল স্পেইনের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার রিপাবলিকান বা প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পত্তন হল। বুর্জহোয়ারা এই প্রজাতন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারবে বলেই এই পরিবর্তনে রাজি হল। অবশ্য পরিবর্তনটা ওপর-ওপর। সাবেকি শোষণ-ব্যবস্থা অব্যাহত রইল। জনগণের জীবনে সংকট বাড়তে লাগল। ১৯৩৩-এ সে-সংকট চরমে পৌঁছল। অধৈর্য হয়ে অসহ্য জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হল—শ্রমিক শ্রেণীর এবং নিঃস্ব চাষীদের। কোথাও নিরস্ত্র প্রতিবাদ, কোথাও শসস্ত্র। প্রজাতন্ত্রী সরকার এমনই প্রজাবৎসল যে প্রজারা অত্যাচারে অতিষ্ঠ হল। অতীতের রাজতন্ত্র এবং বর্তমানের প্রজাতন্ত্র অত্যাচার উৎপীড়নে সমান নির্দয় বলে প্রমাণিত হল। প্রজাদের সহ্যের সীমা বারবার ভেঙে পড়ছিল। ১৯৩৪-এর ৫ই অক্টোবর গণবিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটল। এই হল আস্‌ট্রুয়ারিয়্যাস্‌-এর 'অক্টোবার বিপ্লব'। এই বিপ্লবের পরিচালনা করেছিল সেই অঞ্চলের রাজনীতি-সচেতন খনিশ্রমিকেরা। যখন স্পেইনের অন্যান্য শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলোর মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যাপারে অনৈক্য ছিল তখন আস্‌ট্রুয়ারিয়্যাস্‌-এ নৈরাজ্যবাদী, সমাজবাদী কমিউনিস্ট ইত্যাদি সবার মধ্যে

একটাই আওয়াজ উঠেছিল, "শ্রমিকশ্রেণীর ভায়েরা, একজোট হও।" নানা জায়গায় যৌথ শ্রমিক সমিতি গড়ে উঠল। কারণ তারা চেয়েছিল পুরোদস্তুর শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব ঘটিয়ে মাদ্রিড সরকারে ফ্যাশিস্ট প্রাধান্য ধ্বংস করতে।

অসামরিক সশস্ত্র পাহারাওয়ালাদের ওপর, গির্জা, খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনীদের আশ্রম, টাউন হল ও অন্যান্য সরকারি ভবনের ওপর আক্রমণ হল—শহরে ও গ্রামে। প্রজাতন্ত্রী সরকারের কার্যকাল শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে এ-অঞ্চলে ধর্মঘটের সংখ্যা খুব বেড়ে যায়। কারণ আস্টুরিয়ারিয়াস্-এ সুসংগঠিত, নিয়মানুবর্তী ও দৃঢ়চরিত্র ৫০,০০০ খনিশ্রমিক ছিল। ১৯৩১ থেকে বেকারের সংখ্যা খুবই বাড়ছিল, দুর্ঘটনার হারও যেমন বেশি আর এদিকে পশ্চিম ইউয়ারাপ্-এর তুলনায় শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা দুর্বল। তাছাড়া শ্রমিকদের অনেকেই তরুণ এবং কমিউনিস্টরা এখানে সংঘবদ্ধ এবং সু-প্রতিষ্ঠিত। অভ্যুত্থান আরম্ভ হবার তিন দিনের মধ্যেই আস্টুরিয়ারিয়াস্-এর বেশির ভাগ অঞ্চলই খনিমজুরদের দখলে চলে এল। যে-যে গ্রাম বা শহর দখল হল তার প্রত্যেকটিতেই একটি করে বিপ্লবী সমিতি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল। এই সমিতিগুলোই দায়িত্ব নিল অঞ্চলের সকলের খাবার জোগান দেবার ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবার। একটি রেডিও স্টেইশ্‌ন্ স্থাপন করে জনগণের মনোবল রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রচার চালানো হল। আবেগময় সুন্দর ভাষায় বলা হল যে দুঃখ সহ্য ক'রে লড়তে হবে, কারণ, "যে-জগৎ আমরা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি তার জন্যে রক্ত, নিদারুণ ও গভীর দুঃখ এবং চোখের জল খরচ করতেই হবে।" ট্রুরিয়া এবং লা ভেগা-র অস্ত্র নির্মাণ কারখানা সেখানকার শ্রমিক সমিতি দখল করে নিয়ে দিনরাত অবিরাম অস্ত্র তৈরির কাজে লেগে গেল। অন্যত্র কারখানা এবং খনির কাজ ছেড়ে দিয়ে শ্রমিকরা বেরিয়ে এল। সৈনিকসংগ্রহ সমিতি দাবি করল যাদের বয়স ১৮ থেকে ৪০-এর মধ্যে সেই শ্রমিকদের সবাইকে "লাল ফৌজ"-এ যোগ দিতে হবে। মাত্র দশ দিনে ৩০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ হল। কিছু গির্জা, সন্ন্যাসিনীদের আশ্রম, প্রধান ধর্মযাজকের প্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলা হল এবং বারো জন পাদ্রিকে গুলি করে মারা হল। টাউন হলগুলো দখল হল, অনেক জায়গায় লাল নিশান ওড়ানো হল, 'সোভিয়েট' গঠন করা হল, চেষ্টা হল স্থানীয় সেনাবাসের সৈনিকদের বিপ্লবী অভ্যুত্থানে যোগ দেওয়াবার।

পর-পর কয়েকটা ছোটো-ছোটো বিদ্রোহের এটা হল চূড়ান্ত পরিণাম। ছোটোগুলো ত্রিশের দশকের প্রথম দিকের। স্পেইনকে সেগুলো নাড়া দিয়েছিল দারুণ ভাবে। চৌত্রিশের অক্টোবরের বিদ্রোহ ঐ ধারার চরম বিকাশ। এই

অক্টোবার এমন একটি আন্দোলনের স্রোত বইয়ে দিল যে সেটা বয়ে চলল কুড়ি মাস ধরে এবং দেশকে পৌঁছে দিল ছত্রিশের গৃহযুদ্ধের মুখে। যারা এই সংগ্রামে মেতেছিল তাদের অধিকাংশের মনে "বুর্জহোয়া গণতন্ত্রের" বুর্জহোয়া স্লোগান কাজ করেছিল কিন্তু কিছু রাজনীতি-সচেতন যোদ্ধারা ভেবেছিল এটা ক্ষমতা-দখলের লড়াই—সমাজতন্ত্রের ভিৎ গড়ার লড়াই। সেই চেতনা ব্যাপকতর হল না এবং সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য হল না—এর জন্যে দায়ী কে? সৌশ্যালিস্ট পার্টির বাম অংশ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা ভাবেইনি যদিও নেতৃত্ব তাদের হাতে ছিল। শুধু আস্‌টুয়ারিয়্যাস্‌-এই প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল, অন্যত্র অল্প যুদ্ধের পর বিপ্লব ধসে পড়ল। সৌশ্যালিস্ট ও বাম প্রজাতন্ত্রী নেতারা আন্দোলনকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার কোনও পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেননি। পি. সি. ই. (পার্টিদো কমিউনিস্তা দ্য এস্‌পানিয়া) বা স্পেইনের কমিউনিস্ট পার্টি সংখ্যার দিক থেকে দুর্বল হলেও আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। আগেই বলা উচিত ছিল যে আস্‌টুয়ারিয়্যাস-এর বিপ্লবের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল সি. ই. ডি. এ-র (ক্যাথালিক্‌ পার্টির) নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে মাড্রিডের মন্ত্রীসভায় নিয়ে নেওয়া এবং তার মাধ্যমে তাদের সর্বোচ্চ কুখ্যাত নেতা গিল্‌ রোব্‌লে-কে তার অভ্যস্ত প্রতিক্রিয়াশীল কার্য-কলাপের বেশি সুযোগ পাইয়ে দেওয়া, কারণ সি. ই. ডি. এ- হচ্ছে গির্জার ও ফ্যাশিস্টদের পৃষ্ঠপোষিত দল। মাড্রিডের মন্ত্রীসভায় ফ্যাশিস্ট ঢোকানো যেন ফ্যাশিজমের দিকে একটি পরিকল্পিত পদক্ষেপ।

দুঃখের কথা এই যে যদিও পি.সি.ই. ও বাম সৌশ্যালিস্টরা সশস্ত্র সংগ্রামে নামল তবু তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আদর্শ অনুযায়ী কাজ করল না।

সি.ই.ডি.এ.-কে মন্ত্রীসভার বাইরে রাখতে হবে, প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বদলানো চলবে না—এগুলো কি কোনো বামপন্থী আদর্শ? সেই দলটা যদি ঘাড়-ধাক্কা খেয়ে বেরিয়েই যায় তাতে কী হবে? প্রজাতন্ত্র তো প্রজাদলনযন্ত্র—গণতন্ত্রের মুখোশ-পরা বুর্জহোয়া একনায়কতন্ত্র। এই সরকারকে গদিতে রাখা কি কোনো সৌশ্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য হতে পারে? ভালো হত যদি নেতারা এই বিপ্লবকে ক্ষমতা-দখলের প্রস্তুতি হিশেবে নিতে পারতেন। এবার না-হয় হার হল কিন্তু ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার প্রস্তুতি তো হল। পরের বার বা তার পরের বার না হয় আখেরি জং হবে। বামপন্থীদের কি উচিত এমন প্রচার এবং কাজ করা যার ফলে জনসাধারণের মনে বুর্জহোয়া গণতন্ত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত ভরসা বাড়ে? কিন্তু আস্‌টুয়ারিয়্যাস্‌-এর লড়াইর ফল তো তাই হল। বুর্জহোয়ারা মোটেই দমল না বরং পালটা আঘাত হানল বিপ্লবী আন্দোলনের ওপর। স্পেইনের কমিউনিস্টদের

সবচেয়ে বিখ্যাত নেতা তাঁর আত্মজীবনীতে প্রতিক্রিয়ার এই আক্রমণের কথা এই-ভাবে বর্ণনা করেছেন : বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে প্রজাতন্ত্রী সরকার রাজতন্ত্রী সেনানায়ক ফ্র্যাঙ্কোকে পাঠালেন। ইনি আফ্রিকার মারাকৌতে জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। আস্‌টুরিয়াস্‌-এর শ্রমিকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল সবচেয়ে নৃশংস ও অত্যাচারী সৈন্যদের।···খনি অঞ্চলে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত বিদ্রোহীদের তেড়ে গেল সাতটি বাহিনী। সৈন্যদের পাঠানো হল আস্‌টুরিয়াস্‌-এর ওভিয়েডো, পৌলা দ্য সিয়েরো, গ্রাডো সামা দ্য লাংগ্রিয়ো, মিয়েরেস্‌ শহর এবং নাসিয়া উপত্যকাকে 'শান্ত' করবার জন্যে।··· সবচেয়ে ভয়ংকর উৎপীড়ন হল আস্‌টুরিয়াস্‌-এ ; তাকে গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হল···৪,০০০-এর বেশি লোক নিহত হল···১৯৩৪-এর অক্টোবরে।[২] বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেন যে প্রজাতন্ত্রী সরকার বিদ্রোহীদের ওপর নির্মম প্রতিহিংসামূলক ব্যবহার করেছিল। অনেক হত্যা বিদ্রোহ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ঘটেছিল। কারণ ফ্র্যাঙ্কোর 'বিদেশী বাহিনী' (ফরান্‌ লীজান্‌) বিদ্রোহীদের 'চরম শিক্ষা' দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। ৩০,০০০ লোক বন্দী হয়েছিল। মাড্রিডের প্রজাতন্ত্রী সরকার গডেড্‌ ও ফ্র্যাঙ্কো, দুই শয়তান সেনানায়ককে 'প্রজাতন্ত্রের ত্রাণকর্তা' বলে অভিনন্দন জানালেন।[৩]

বিপ্লবের এমন পরিণতিতে গ্রামাঞ্চলের জমি-মালিকদের পোয়াবারো হল। কৃষি-সংস্কারের কোনও প্রস্তাব এলে তারা সেটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিত। চাষীদের জমি থেকে উৎখাত করার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলল। যে-সোশ্যালিস্টরা সৈন্যের হাতে মরল না বা বন্দী হল না তাদের চাকরির ব্যাপারে অসুবিধা হতে লাগল।[৪]

আস্‌টুরিয়াস্‌-এর বিপ্লবকে ভাবী বিপ্লবের মহড়া যাঁরা বলেন তাঁরা জানেন না যে সেটা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মহড়া। আস্‌টুরিয়াস্‌-এর খনির অন্ধকার থেকে যে বিপ্লবী অগ্নিসেনারা বেরিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে আমরা স্পেইনের ইতিহাসে এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় দেখিনি কি? বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে স্পেইনের জনসাধারণের আশ্চর্য প্রতিরোধের কথা মাআক্‌স্‌ তাঁর 'বিপ্লবী স্পেইন' নামের প্রবন্ধমালায় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ-কথাও বলেছেন যে সমাজের ওপর মহলের কর্তারা আত্মসমর্পণ করলেও জনগণ প্রতিরোধে রুখে দাঁড়িয়েছে।[৫] ইতিহাসের গতিপথে আস্‌টুরিয়াস্‌-এর ক্ষেত্রে শ্রমিক-শ্রেণী কিন্তু এক শক্তি হিশেবে দাঁড়িয়েছে—আগের চাইতে পূর্ণতর রূপে। বাম-সোশ্যালিস্ট ও পি.সি.ই. এই শক্তিকে বিপ্লবের কাজে লাগায়নি।

আস্‌টুরিয়াস্‌-এর পরে প্রতিক্রিয়ার শক্তি তাই বেড়ে গেল। মাড্রিডের মন্ত্রীসভায় গিল্‌ রোবলের লোক তিন থেকে বেড়ে পাঁচ হয়েছে। তাঁর দলের অন্যান্য প্রতিনিধি যাঁরা উচ্চপদে আসীন তাঁরা সেনানায়ক, রাজতন্ত্রী। গিল্‌ হিটলারের সঙ্গে দেখা করে আশীর্বাদ নিয়ে এসেছে। ইতালির ফ্যাশিস্ট সরকারের সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ হয়েছে। সাহায্য লাভের পরিকল্পনা প্রস্তুত। কিন্তু তখনই সে পরিকল্পনাকে কাজে লাগানো গেল না।

...

ত্রিশের দশকের কাছাকাছি এসে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে সব রকমের বিরোধ বা দ্বন্দ্ব শুরু হয়। স্পেইনে তার প্রতিক্রিয়ার অনিবার্য কারণ স্পেইন প্রধানত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শোষণ-ক্ষেত্র। স্পেইনের পুঁজিবাদীরা দেখল যে তারা বিশ্বের বাজার এবং স্বদেশের সীমাবদ্ধ বাজার থেকে গলাধাক্কা খেয়ে কোণঠাসা হচ্ছে। এটা হল সমস্যার অর্থনৈতিক দিক। রাজনৈতিক দিক থেকে লক্ষ করবার বিষয় হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন এক বিশ্বযুদ্ধের জন্যে দুটো শক্তিজোটের প্রস্তুতি। স্পেইনের ভেতরে রুশবিপ্লবের প্রভাবে শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রবল-ভাবে উদ্দীপিত কারণ শ্রমিক শ্রেণীর ও গরিব চাষীদের চরম দুরবস্থা চলছে—ফলে সংকট ক্রমেই বাড়ছে।

শ্রমিকশ্রেণীর বেশির ভাগ এবং গরিব চাষীরা সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। স্পেইনের শাসকশ্রেণী আত্মরক্ষার জন্যে এই বঞ্চিতদের ও নিজেদের মধ্যে বাধার দেয়াল হিশেবে ছোটো এক পেটিবুর্জহোয়া শ্রেণী গড়ে তুলতে পেরেছে। এই হল দেশের ভেতরকার অবস্থা। ব্রিটিশকে মুরুব্বি ধরায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্পেইনের ধনীরা শোষিত হচ্ছে ব্রিটিশ পুঁজিবাদীদের দ্বারা আর সেই বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে একটু উন্নতির চেষ্টা করলেই ইংরেজ প্যাঁচ কষে কারণ স্পেইনের আভ্যন্তরীণ অর্থ-নীতিতে ইংরেজের প্রবল প্রতাপ। তাছাড়া সে-ব্যাপারে বাধা আসে ইংরেজ-ঘেঁষা ছোটো-ছোটো শিল্পের মালিকদের ও বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকেও এবং এদের দ্বারা প্রভাবিত জনসাধারণের অন্যান্য অংশ থেকে—তার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর একটা অংশও আছে। এদেরই প্রতিনিধিত্ব করে প্রেজিডান্ট আজানিয়ার নেতৃত্বে বাম-প্রজাতন্ত্রীরা। এই জন্যে এই দলটার অর্থনৈতিক গুরুত্ব বা সংখ্যার দিক কম হলেও সে-অনুপাতে রাজনীতিতে ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। স্পেইনের পুঁজিবাদীদের এতো টাকা নেই যে এই জনসমষ্টিকে টাকা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ঘুষ দিয়ে তারা হাত করতে পারে। আরো একটা লক্ষ করার বিষয় হল যে এই সামাজিক স্তরের মানুষ এবং শ্রমিকশ্রেণীর একটা বড়ো অংশ

উৎপীড়িত জাতিগোষ্ঠীগুলোর (বাস্ক, ক্যাটালান, ইত্যাদি) মধ্যে রয়েছে বেশি সংখ্যায়। আরও লক্ষ করতে হবে যে প্রজাতন্ত্র জনগণকে উৎপীড়ন করবার যথেষ্ট উপযুক্ত যন্ত্র নয়। সুতরাং এ থেকে এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে স্পেইনের শাসকশ্রেণীর দিক থেকে প্রয়োজন প্রজাতন্ত্রকে বাতিল করা—অন্তত তখনকার মতো—এবং সে-কাজটা করতে হবে সোজা খোলাখুলি মিলিট্রি লেলিয়ে দিয়ে—গোপন কোনো কৌশলে, রেখে ঢেকে, তা সম্ভব হবে না। তাছাড়া স্পেইনের আন্তর্জাতিক অবস্থানের উন্নতি করতে হলে ব্রিট্‌ন্ ও তার মিত্রদের বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে হবে। অন্য পথ নেই। বিদেশের সাম্রাজ্যবাদীশক্তির সাহায্য নিয়ে স্বদেশের জনগণকে কাবু করে ফেলতে হবে রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, নইলে শোষণ চালানো ও বাড়ানোর অন্য উপায় নেই। জনগণকে তাদের দাবি আদায়ের আন্দোলন থেকে নিরস্ত করবার একমাত্র উপায় ব্যাপক খুন-জখম স্বদেশী এবং বিদেশী গুণ্ডাদের সাহায্য নিয়ে।

...

আস্‌টুরিয়ারিয়্যাস্-এর বিদ্রোহ পি.সি.ই.-র ভিৎ রচনা করল, প্রতিপত্তি বাড়াল। সেই সঙ্গে স্পেইনে কমিন্‌টান্-এর প্রভাবও বাড়ল। ঐ বিদ্রোহ ও পরবর্তী আলোড়ন ও সংগ্রামে পি.সি.ই. একটি প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে এই পার্টির একক প্রভাব প্রজাতন্ত্রের ওপর অন্য পার্টির চেয়ে বেশি হল।

১৯২১-এ পি. সি. ই.-র শুরু। প্রায় ১০,০০০ তরুণ বিপ্লবীকে নিয়ে। তারা ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল নৈরাজ্যবাদী ও সোশালিস্টদের দল থেকে। কুড়ির দশকের খুব কড়া বে-আইনি অবস্থার মধ্যে দিয়ে পি.সি. ই.-র দিন কাটে এবং সংখ্যা কমে সম্ভবত ৮০০-র কাছাকাছি দাঁড়ায়। ১৯৩১-এ কমিন্‌টান্ পার্টিকে যে-পথের নির্দেশ দেয় অন্তত ১৯৩৩ পর্যন্ত চলার, তাতে শ্রমিকশ্রেণীর বেশির ভাগের ওপর নেতৃত্ব লাভ করা যাবে তাৎক্ষণিক সংগ্রামগুলোর মধ্যে দিয়ে। এই সংগ্রাম, বিশেষ করে অর্থনৈতিক সংগ্রাম, সোজা তাদের নিয়ে যাবে পুঁজিবাদী সামন্তবাদী সরকারের অবসানের লক্ষ্যে—চাষী ও মজুরের একনায়কত্বের দিকে।

পি. সি. ই.-র বিপ্লবসৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল ১৯২৭-এর কাটাবেনা নৌবিদ্রোহে। পরিচালনা করেছিল পি. সি. ই.-র শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা। উদ্দেশ্য মারাকৌর যুদ্ধের বিরোধিতা করা। কিন্তু পার্টি সেই অবস্থান থেকে সরে এসে ক্রমে নিছক অর্থনৈতিক আন্দোলনের পাঁকে আটকে গেল। জনগণের প্রচণ্ড সংগ্রামে পার্টি হল লেজুড়। লক্ষ্য—কিছু সংস্কার এবং উৎপীড়নের অবসান। আশা—এই পথেই বিপ্লবে পৌছানো যাবে। এই পথ পি. সি. ই.-কে মুগ্ধ করল। দৈনন্দিন

সংগ্রামে পি. সি. ই.-কে নেতৃত্বে দেখে অন্য-সব শক্তি সংগ্রামরত জনগণকে বাধা দেবে এবং তাদের চরিত্র লোকের চোখে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে। সুতরাং বুর্জহোয়া সরকারের নাভিশ্বাস উঠবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল ইংরেজ-ঘেঁষা আজানিয়ার দল বাড়ল, সি. ই. ডি. এই.-র প্রভাবও বাড়ল চাষী ও ওপরদিককার পেটিবুর্জহোয়াদের মধ্যে। সোশালিস্টরাও পিছিয়ে থাকল না। নৈরাজ্যবাদীদের প্রভাবে তাদের চিরদিনের ঘাঁটি ক্যাটালোনিয়ায় শক্তি কমলেও অন্যত্র বাড়ল, এমনকি পি. সি. ই.-র দুর্গ মাড্রিডের ট্রেইড ইউনিয়নেও নৈরাজ্যবাদীদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটল। পি. সি. ই. লক্ষ করেনি যে স্পেইনের বুর্জহোয়া শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সাহায্যলাভের একটা উৎস ছিল। প্রয়োজনে তারা আত্মরক্ষার জন্যে অন্য দেশের শ্রেণীমিত্রদের সাহায্য পাবেই। অর্থনীতিবাদের প্রভাবে পি. সি. ই.-র কর্মসূচিতে 'বিপ্লব' থাকলেও সে-আদর্শ আড়ালে চলে গেল, ভবিষ্যতের ব্যাপার বলে তাকে গুদামজাত করা হল।

১৯৩৫-এর জুনে 'পপিউলা ফ্রান্ট' বা গণ-মোর্চা গঠনের ডাক দিল পি. সি. ই.। তার ভিত্তি হবে পাঁচ দফা কর্মসূচি। এই কর্মসূচি যাতে স্পেইনের প্রজাতন্ত্রী দল এবং ব্রিটন্ ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদীদের পছন্দ হয় সেই জন্যে তা থেকে পি. সি. ই.-র আগেকার অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক দাবিগুলো—যেমন মারাকোর স্বাধীনতা এবং কৃষি-বিপ্লব—বাদ দেওয়া হল। থাকল কিছু মোলায়েম সংস্কারের দাবি। অর্থাৎ ঠিক যখন সেই চরম লগ্ন উপস্থিত, যখন জনগণ মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তখন পি. সি. ই. ঠিক করল সে ভোটের পার্টি হবে, সংগ্রাম ছেড়ে সন্ন্যাস নেবে অথচ হাতে থাকবে ফ্যাশিজম-বিরোধী পতাকা।

পরিস্থিতি কিন্তু বৈপ্লবিক সম্ভাবনার বিদ্যুৎ-সংকেত দিচ্ছিল। সেগুলো লক্ষ না-করার দায়িত্ব পি. সি. ই.-র। যেমন : ১৯৩৫-এর শেষের দিকে কর্অটেজ্ বা পার্লামেণ্ট ভেঙে গেল দক্ষিণদের দ্বন্দ্বে! সি. ই. ডি. এ. উৎসাহিত। ভোটের জন্যে পপিউলা ফ্রান্ট গঠিত হল। তার মধ্যে এল কয়েকটা পেটিবুর্জহোয়া প্রজাতন্ত্রী পার্টি। সোশ্যালিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি। একটা দাবি জনগণের মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল: "আস্‌টুরিয়াস্-এর রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই।" নির্বাচনে পি. এফ.-এর বিপুল ভোটে জয় হল। কিন্তু প্রজাতন্ত্রী সরকারের কর্মসূচি মোলায়েম—জনগণের বিপ্লবী মেজাজের ধারে কাছেও এল না। মেজাজের নমুনা দিচ্ছি। নির্বাচনে জেতার পরের দিনই জনতা ভ্যালেনসিয়া-র জেলখানা থেকে জোর করে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিল। আস্‌টুরিয়াস্-এর ওভিইডো শহরে এবং স্পেইনের অন্য অনেক অঞ্চলে সরকারি নির্দেশ পৌঁছবার

আগেই এইভাবে গায়ের জোরে জনগণের দাবি আদায় হল। গরিব চাষী ও খেতমজুরেরা বড়ো-বড়ো জমিদারি দখল করল—জবরদখল। প্রবঞ্চিত ও বঞ্চিতের যুগযুগান্তের ক্ষুধা প্রলয়াভিষানে নেমেছে। সুতরাং জমি কেড়ে নেওয়ার বৈপ্লবিক অধিকার অনেক জায়গাতেই প্রয়োগ করা হল এবং সমবায় চাষ শুরু হল। স্ট্রাইকের সংখ্যাও বাড়ল, তার মধ্যে ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্ট্রাইকও অনেক। রাজনৈতিক সংগ্রাম, বিতর্ক, জনসভা প্রায় প্রতি শহরে, প্রতিটি বড়ো রাস্তার ওপর চলতে লাগল। মূল বক্তব্য এই যে পুঁজিবাদের আয়ু ফুরিয়েছে এবং রুশ বিপ্লবে যা করা হয়েছে স্পেইনেও তাই করা হবে। 'লাল ফৌজ!' 'মজদুর রাজ!' ইত্যাদি স্লোগানে আকাশ মুখর। যে দিবসে মাড্রিডে হাজার-হাজার তরুণ-তরুণীর কুচকাওয়াজ হল—সবাই উর্দি-পরা।

আন্দোলনের জোয়ার পি. সি. ই.-কে ঠেলে নিয়ে চলল। জনতার জমি দখল চলল এবং তারা শহরের কাউন্সিলগুলো দখল করল। পি. সি. ই. যদিও তখনও প্রধান শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি তবু এই সব অভ্যুত্থান সমর্থন করত তবে সেই সঙ্গে বুর্জহোয়া ও পেটিবুর্জহোয়াদের মধ্যে যে ফ্যাশিস্ট-বিরোধীরা আছে, তাদের সঙ্গে, বিশেষ করে আজানিয়ার গোষ্ঠীর সঙ্গে, ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টা শুরু করল; উদ্দেশ্য—ফ্যাশিস্টবিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠন করা। উলটো দিকে প্রতিক্রিয়ার প্রধান হাতিয়ার সামরিক বাহিনীর 'ক্' বা রাষ্ট্রশক্তি দখল করার প্রচার মোটেই গোপন ছিল না। দক্ষিণপন্থীরা মুখে ও লিখে তার ইঙ্গিত ছড়াচ্ছিল। মজার কথা আজানিয়ার গোষ্ঠীরও তাদের সঙ্গে গোপন যোগ ছিল। বিশেষ করে ফ্যাশিস্ট জেনারেলদের সঙ্গে। আজানিয়া তখন ক্ষমতায় আসীন।[৬]

১৯৩৬-এর জুলাই-এর গোড়ার দিকে দক্ষিণী ষড়যন্ত্র বেশ দানা বাঁধল। আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা সৃষ্টির জন্যে ফ্যাশিস্টরা ব্যাপকভাবে খুনজখম শুরু করল—এখানে ওখানে বোমা পড়তে লাগল। জনতার বিপ্লবী আন্দোলন তখন প্রজাতন্ত্রী ও বামদের বাধানিষেধে স্তিমিত। জনতা অস্ত্র চায় কিন্তু কে দেবে? প্রজাতন্ত্রী সরকার দেবে না।

এল ১৭ জুলাই। ফ্র্যাঙ্কোর ফ্যাশিস্টবাহিনী স্পেইনের প্রজাতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। ক্ষমতায় রয়েছেন আজানিয়া। তিনি ইংরেজ-ঘেঁষা পেটিবুর্জহোয়া দলের নেতা। তাঁর চেষ্টা চলল ফ্যাশিস্ট সেনানায়কদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসা যায় কিনা। এদিকে গণ-আন্দোলন প্রজাতন্ত্রী সরকার ও বামপন্থীদের চাপিয়ে দেওয়া বাধা-নিষেধ ভেঙে বেরোতে চায়। ইউনিয়নগুলো এবং প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল মিলিশা গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে পি. সি. ই.-র

নিজস্ব বাহিনী পঞ্চম রেজিমেন্ট সবচেয়ে সুসংগঠিত। দ্রুত বেড়েও উঠছে। জনগণ শ্রেণীসংগ্রামে উদ্যত, আওয়াজ উঠছে, "অস্ত্র চাই!" কিন্তু বাম নেতারা তাদের নিরস্ত করছেন। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে আগে ফ্যাশিস্টরা তাদের দান ফেলুক তারপর খেলা শুরু।

১৭ জুলাই ফ্র্যাঙ্কো এক ব্রিটিশ উড়োজাহাজে করে স্পেইনের ক্যানারি দ্বীপ-পুঞ্জের লাস্ পাল্মাস্ থেকে যাত্রা শুরু করে ফরাসি অধিকৃত মারাকৌতে কিছু সময় থামলেন। তাঁর ঘোষণাপত্র বার হল: 'সেনাবাহিনী স্পেইনে শৃঙ্খলা রক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' শ্রমিক ইউনিয়ন ও পার্টির প্রধান কার্যালয়গুলোর ওপর মিলিট্রি হামলা আরম্ভ হল। হামলা হতে লাগল টাউন হল এবং রণনীতির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য স্থানের ওপরও।

প্রত্যেক শহরে পথে নামল হাজার-হাজার সাধারণ মানুষ—আওয়াজ: 'অস্ত্র চাই!' এবারে কিছু অস্ত্র দেওয়া হল এবং ১৯৩৩-এর কিছু লুকোনো অস্ত্র জনতা মাটি খুঁড়ে বার করল। প্রধানত রাইফ্‌ল্। আর যা হাতের কাছে পেল তাই নিয়ে আক্রমণ চালাল। খালিহাতরাও পেছনে রইল। জনস্রোতে শহর উত্তাল। ফ্যাশিস্ট সৈন্যরা ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘেরাও হল। হল পক্ষাঘাত—বিপক্ষের আক্রমণে।

বার্সিলৌনায় লক্ষ-লক্ষ লোক অনেক বেশি শক্তিশালী অস্ত্রশালী সৈনিকদের হাতে প্রাণ দিতে লাগল—এক দলের পরে আরেক দল মাড্রিডের মণ্টানিয়া ব্যারাকে ফ্যাশিস্ট সৈন্যরা ঘেরাও হয়ে নিশ্চিহ্ন হল। তবে কোথাও-কোথাও ফল অন্যরকম হল। প্রতিক্রিয়াশীল স্পেইন সরকারের লোকেরা কোথাও-কোথাও গড়িমসি করে, কোথাও-বা ষড়যন্ত্রী হয়ে জনতার অভিযানে বাধা দিতে লাগল। যেখানেই জনতা বুর্জহোয়া আইনকে অগ্রাহ্য করবার সুস্থ মানসিকতা দেখাল সেখানেই তারা অবিলম্বে সক্রিয় হয়ে ব্যারাকেই ফ্যাশিস্ট সৈন্যদের কবর দিল। স্পেইনের আটটা অঞ্চলে আটটা ফ্যাশিস্ট বাহিনীর অভিযান হবে—এই পরি-কল্পনাকে জনগণের বিরাট প্রতিরোধ ব্যর্থ করে দিল। তখন ফ্যাশিস্টদের একমাত্র ভরসা মারাকৌতে স্পেইনের দখলদারী সৈন্যবাহিনী, যাকে বলা হত 'আফ্রিকার বাহিনী'। সেই বাহিনীর সৈন্যরা দক্ষিণ স্পেইনের বন্দরগুলোতে নামবে এবং দ্রুত গতিতে উত্তর দিকে এগিয়ে গিয়ে রাজধানী মাড্রিড আক্রমণ করবে। এই হল প্রতিক্রিয়াশীলদের পরিকল্পনা।

কিন্তু সে গুড়ে বালি পড়ল। শ্রমিক পরিবার থেকে আসা স্পেইনের নাবিকরা সংখ্যায় নাবিকদের মধ্যে বেশি। তারা শহরগুলোতে শ্রমিক-বিদ্রোহ দেখে ইতি-

মধ্যেই অনুপ্রাণিত হয়েছে। তারাও নৌ-অফিসারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ নৌবহরের বিপুল অংশ দখল করল। জাহাজগুলোর অস্ত্রাগারে যে-অস্ত্র মজুত ছিল তা নাবিকদের মধ্যে বিলি করা হল। এর ফলে ফ্যাশিস্টদের মারাকোর সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেবার কৌশল বিরাট এক ধাক্কা খেল। বাধ্য হয়ে আকাশ-পথে জিব্রল্টা প্রণালীর ওপর দিয়ে সেনাবাহিনীকে স্পেইনের মূল ভূ-খণ্ডে নামানো হতে লাগল। ইতালি ও জার্মানির উড়োজাহাজ সাহায্য করল। এইভাবে বড়ো রকমের প্রত্যক্ষ ইন্টাভেনশন্ বা হস্তক্ষেপ আরম্ভ হল। 'কু'-র চেষ্টা সফল হল না। বড়ো-বড়ো জনবসতির কেন্দ্র, শিল্পাঞ্চল এবং সবচেয়ে উর্বর শস্যক্ষেত্রগুলো জনগণের দখলেই রয়ে গেল।

মহাকাব্যের মহাযুদ্ধের মতো এই যুদ্ধে মাড্রিড হল কুরুক্ষেত্র—এখানেই হল দুর্ধর্ষ 'আফ্রিকার বাহিনী' এবং প্রজাতন্ত্রের সংঘর্ষ।

মাড্রিড, ৬ নভেম্বর, ১৯৩৮। মাড্রিডের শহরতলিতে দশ হাজার ফ্রাঙ্কো-সৈন্য এগিয়ে আসছে, রাজধানীর হৃৎপিণ্ড তাদের লক্ষ্য। আরো দশ হাজার সহযোগী সৈন্য পেছনে-পেছনে আসছে। যদিও পি.সি.ই. শহরে সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক দল হিশেবে এই মাড্রিড রক্ষার যুদ্ধ শুরু করেনি তবু অল্প সময়ের মধ্যেই সেই দল শহর-রক্ষার নেতৃত্বে চলে এল। দেশের মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে হলে এই যুদ্ধে নেতৃত্ব না-দিয়ে পি.সি.ই.-র উপায় ছিল না। 'পীপল্‌জ্ ওঅ' বা জনযুদ্ধের সাহায্যে রাজধানীকে রক্ষা করতে হবে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত-ফ্যাশিস্ট বাহিনীর মোকাবেলা করতে শুরুতে মাড্রিডের দশ লক্ষ অধিবাসীর ইচ্ছাশক্তি ছাড়া আর-কিছু ছিল না। মন্ত্রীসভা পালিয়ে গেছে। তখন প্রধানমন্ত্রী ক্যাবালেরো। ইতিমধ্যে পি.সি.ই.-র নিজস্ব পঞ্চম রেজিমেন্টের সৈন্য সংখ্যা বেড়ে ষাট হাজারের মতো হয়েছে। চারটি বড়ো-বড়ো দলে ভাগ হয়ে ফ্যাশিস্টরা মাড্রিডের দিকে এগোচ্ছে আর শহরের মধ্যে আছে এক বিভীষণ-বাহিনী বা দেশদ্রোহী বাহিনী—পঞ্চম বাহিনী। তার কাজ ভেতর থেকে শত্রুকে সাহায্য করা চোরাগোপ্তা আক্রমণ, সংবাদ ইত্যাদির সাহায্যে। বাইরের শত্রু এবং ভেতরের শত্রু—দুয়ের বিরুদ্ধে পি.সি.ই.-কে লড়তে হল। শত্রুবাহিনীর গতিরোধ করবার জন্যে অন্তত পঞ্চাশ হাজারের এক মিলিশা, নারী ও পুরুষ, তাদের শরীর দিয়ে যেন এক প্রাচীর গড়ে তুলল। এইসব ইউনিয়ন থেকে লড়িয়েরা এল—রেলকর্মী, নাপিত, রাজমিস্ত্রি ও মজুর, শিল্পী, খেলোয়াড় ইত্যাদি। একটি মেয়েদের ইউনিয়ন অসাধারণ লড়াই করল। এল আস্‌টুরিয়ারিয়্যাস্-এর পোড়খাওয়া বিপ্লবী খনি-শ্রমিকেরা, গড়ল ট্যাংক-বিরোধী সেনাদল।

মারাকৌর 'ফরান্‌ লীজান্‌' বা বিদেশী বাহিনী হিংস্রতার জন্তে কুখ্যাত। তারা আশ্চর্য গণ-প্রতিরোধের মুখে শহরের সীমান্ত পার হয়ে আর ভেতরের দিকে এগোতে পারল না। হাতাহাতি যুদ্ধ। মিলিশা পিছু হঠবার নয়। ফ্যাশিস্ট-দের ট্যাংক, প্লেইন ও কামান মিলিশার পক্ষে দারুণ মৃত্যুবাণ। কমিনটান-এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক বাহিনীগুলো এসে পড়ল। অভিজ্ঞ লড়িয়েরা তাদের কাছ থেকে শিখল ট্রেঞ্চ খুঁড়তে এবং অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক উপায়ে শত্রুর ট্যাংক ও কামানের মোকাবেলা করতে। আন্তর্জাতিক বাহিনীগুলো আসাতে মাড্রিড্‌-বাসীরা দারুণ উৎসাহ পেল। নানা দেশের এই স্বেচ্ছা-সৈনিকেরা রাস্তায় মার্চ করতে লাগল—জঙ্গি ভঙ্গিতে হাত ওপরের দিকে তুলে এবং আন্তর্জাতিক সংগীত গাইতে-গাইতে। পাহাড়ের নানা জায়গায় লেনিন ও স্তালিনের বড়ো-বড়ো ছবি। ওঁরাই যেন ফ্যাশিস্টবিরোধী এই প্রতিরোধ-যুদ্ধ পরিচালনা করছেন !

৭ নভেম্বর এল। মহানন্দে নভেম্বর দিবস পালন করা হল। তখন ফ্যাশিস্ট আক্রমণ তুঙ্গে।

আগে ট্রেঞ্চ খোঁড়া শেখার কথা বলেছি। আন্তর্জাতিকরা আসার ফলে মিলিট্রি ট্রেইনিং-এর সুবিধে হল। অধিকাংশই এসেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুনে পোড়া দেশগুলো থেকে। সে-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা স্পেইনের ছিল না কারণ স্পেইন সে-যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল। আন্তর্জাতিক বাহিনীর অনেকেই ছিল অভিজ্ঞ সৈনিক। আরেক রকমের অভিজ্ঞ ছিল ১৯১৯-এর হাংগারির বিদ্রোহের লড়িয়ে, কেউ-বা জার্মানির পথ-যুদ্ধের যোদ্ধা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। একটি ব্রিগেইডের নাম ছিল কমিউন দ্য পারি, তার একটি ছোট্টো অংশ ছিল অক্‌স্‌ফাড্‌ ও কেইম্‌ব্রিজ-এর। ওপরতলার ব্রিটিশ কলেজে এরা শিক্ষার অংশ হিশেবে কিছু সামরিক শিক্ষণ পেয়েছিল। সেটা স্পেইনে কাজে লাগল। তারা সৈনিক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। তবে তাদের বিশেষজ্ঞ হিশেবে যে-জ্ঞান ছিল তার চরিত্রটা বুর্জোয়া মিলিট্রি লাইনের। পি.সি.ই. পরে এই লাইন অনুসরণ করল এবং বিপ্লবের ক্ষতি করল। সে-কথা পরে হবে।

নভেম্বরের এই সংঘর্ষময় দিনগুলোতে এবং পরের বড়ো-বড়ো যে-সব যুদ্ধে প্রজাতন্ত্র সরকার রাজধানী ঘেরাও করা থেকে শত্রুকে বিরত করতে পেরেছিল তাতে জনগণের উৎসাহ ও আশ্চর্য সৃজনশীল প্রতিভা জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের মতো আত্মপ্রকাশ করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্র শেষ পর্যন্ত শহরের সীমান্তরেখায় স্থিরতা লাভ করল। পরবর্তী যুদ্ধ হারামা ও গুয়াদালাহারায় এক নিশ্চল অবস্থায় পৌঁছল। জনগণই ছিল পি.সি.ই.-র একমাত্র সম্বল। সেই সম্বল নিয়ে পি.সি.ই. প্রতিরোধ যুদ্ধে যথেষ্ট কৃতিত্বের সম্মান অর্জন করল।

কিন্তু পি.সি.ই.-র এই বিপ্লবী নেতৃত্বের এখানেই অবসান। বুর্জহোয়া রাজনীতিতেই তার আস্থা বলে অতঃপর দলটিকে দেখা যাবে বুর্জহোয়া রণনীতি ও রণ-কৌশল অনুসরণ করে চলতে। পি.সি.ই.-র লক্ষ্যেই ছিল ভুল। তার ফ্যাশিস্টদের সঙ্গে যুদ্ধের লক্ষ্য কী ছিল?—প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষা করা, সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করা। তার যুদ্ধের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত ছিল?—শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। পি.সি.ই. যে-প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করবার লড়াই করছিল তার ক্ষমতা কতটুকু? তার ওপরমহলের কর্তারা কেউ রাজতন্ত্রী গির্জাপন্থী, কেউ ইংরেজ-ঘেঁষা ভূয়ো সৌশ্যালিস্ট আর এই তথাকথিত গণতন্ত্রে আসল ক্ষমতা বুর্জহোয়াদের হাতে; কারণ অস্ত্রশস্ত্র, পুলিশ ও আমলাতন্ত্র বুর্জহোয়াদেরই দখলে। যুদ্ধ বাধতেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

পপিউলা ফ্রান্ট এমন কিছু বৈপ্লবিক ছিল না। তার কর্মসূচি বৈপ্লবিক ছিল না। এমনকী গণতান্ত্রিক দাবির ব্যাপারেও দুর্বল ছিল—যেমন ক্যাটালান বা বাস্ক জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির ব্যাপারে, মারাকোর স্বাধীনতার প্রশ্নে। তবু ফ্যাশিস্টরা পপিউলা ফ্রান্টকে সহ্য করতে পারল না। নির্বাচিত সরকারকে, সংসদীয় গণতন্ত্রকে সশস্ত্র আক্রমণে উৎখাত করল।

ফ্যাশিস্টরা তো রাষ্ট্র উৎখাত করতে চায়নি। রাষ্ট্র তো বুর্জহোয়াদের হাতেই ছিল। তারা চেয়েছিল রাষ্ট্রযন্ত্রকে আরও কঠোর ও নির্মম শোষণ-যন্ত্রে পরিণত করতে। চেয়েছিল বুর্জহোয়া শাসনের ধরনটা বদলাতে।

স্পেইনের ও অন্যান্য সব দেশের নিপীড়িত জনগণের স্বার্থে গৃহযুদ্ধের উচিত ছিল শ্রেণীসংগ্রামের রূপ নেওয়া। স্থানীয় বিশ্বপরিস্থিতি ছিল অনুকূল। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ তখন তীব্র সংকটের সম্মুখীন, স্পেইনের বুর্জহোয়ারা প্রজাতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রেখে আর সংসদীয় শাসন চালাতে পারছে না। ফ্যাশিজম্‌ও চালু করতে পারছে না। সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তোড়জোড় চলছে তাই স্পেইনে যদি শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই খোলাখুলি হত তাহলে জোট বেঁধে হামলা করবার মতো অবস্থা তখন সাম্রাজ্যবাদীদের ছিল না। অন্য সময় হলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। কিন্তু স্পেইনের শ্রমিকশ্রেণী গৃহযুদ্ধকে সফল করতে পারতই এ-কথা কেউ হলফ করে বলতে পারে না।

পরাজিত বিপ্লব আর নিহত বিপ্লব তো এক নয়। সঠিক পথে সংগ্রাম করে হারলে সারা পৃথিবী তা থেকে নতুন লড়াইয়ের প্রেরণা পেত। রাজনৈতিক আব-হাওয়া তার বিদ্যুৎ-স্পর্শে নতুন প্রাণ পেত। আগামী দিনের পূর্ণতর বিপ্লবের

মহড়া হিশেবে তার দারুণ মূল্য হত। সঠিক পথে চললেও গৃহযুদ্ধে জনগণের ও সত্যিকার বামপন্থার পরাজয় হতই এ-কথা আমরা বলছি না। জিৎও হতে পারত। বিপ্লবে স্পেইন যদি বিজয়ী হত তাহলে পৃথিবীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্যরকম হত।

পি.সি.ই.-কে আমরা একাকী এগিয়ে যাবার কথাও বলছি না। যুক্তফ্রন্ট গড়া তো বিপ্লব-বিরোধী কিছু নয়। বুর্জহোয়াদের সঙ্গে সাময়িক সমঝোতার চুক্তি করে খানিক দূর এগোনো যেত, কোনো-কোনো গোষ্ঠীকে হয়তো নিষ্ক্রিয় বা নিরপেক্ষ হিশেবে নিরাপদ দূরত্বে রাখা যেত। আমার সঙ্গে যে থাকবে না তাকে শত্রুর পক্ষে যেতে সাহায্য করব কেন? অর্থাৎ ফ্র্যাঙ্কোর বিপক্ষে সাময়িকভাবে শর্তাধীনে মৈত্রী চুক্তি করা যেত। সে-চুক্তির মেয়াদ শেষ হত গৃহযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে।

প্রশ্নটা সোজাসুজি এই দাঁড়াচ্ছে : শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব কি সাময়িক মিত্রদের নিয়ে সোশ্যালিজম্ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হবে, না সংগ্রামকে সীমাবদ্ধ রাখবে শুধু বুর্জহোয়া প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করবার লক্ষ্যের সীমার মধ্যে যাতে মিত্ররা ক্ষুব্ধ না হয়?

শ্রমিক-শ্রেণী নেতৃত্ব করবে, না অন্যের নেতৃত্ব মেনে নেবে? অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি পি.সি.ই. বিপ্লবী সংগ্রামে নেতৃত্ব করবে না বুর্জহোয়া এবং অন্যান্য মিত্রদের দ্বারা পরিচালিত হবে? অর্থাৎ পি.সি.ই. যাদের ঐক্যবদ্ধ করা যায় তাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে কি সেই শোষণ ও উৎপীড়ন বিরোধী সংগ্রামের দিকে নিয়ে যাবে যে-সংগ্রাম শ্রমিক-শ্রেণী ও উৎপীড়িত জনগণের আন্তর্জাতিক সংগ্রামের অংশ, না সেই গণতন্ত্রের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে যা শোষণের আরেক রূপ মাত্র —যে "গণতন্ত্র" ইতিমধ্যেই লক্ষকোটি মানুষের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছে?

স্পেইনের তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেন ডাক দিয়েছিল : "কে ক্ষমতা দখল করবে এসো!" সে ডাকে পি.সি.ই. তো সাড়া দিলই না, তার "বাম" সমালোচকরাও না। যেমন, নৈরাজ্যবাদীরা অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়েই থাকল—জমি দখল, কারখানা দখল, সমবায় সমিতি স্থাপন ইত্যাদি। যুদ্ধের প্রশ্ন তাদের কর্মসূচিতে চূড়ান্ত গুরুত্ব পেল না। অন্যরকমের দখলে তারা ব্যস্ত, ক্ষমতা দখল উপেক্ষিত। ধনীদের ধন কব্জা করা ভালো, কাজটাও বৈপ্লবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু নির্বিচারে সব ধনীকে শত্রু করা কি ঠিক? কাউকে-কাউকে তো ফ্র্যাঙ্কো-বিরোধী মোর্চায় পাওয়া যেতেও পারত অথবা না-পাওয়া গেলেও না-এদিক না-ওদিক অবস্থায় নিষ্ক্রিয় করে রাখা যেত। নৈরাজ্যবাদীদের আওতার মধ্যে যে গ্রামের

গরিব·বা শহরের শ্রমিকরা এসেছিল তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে ছিল এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আদর্শের ভুলে ক্ষমতা দখলের লড়াইতে তাদের সামিল করা হল না। এও উল্লেখযোগ্য যে বেশ কিছু নৈরাজ্য-বাদীদলের সভ্য প্রকৃত বিপ্লবের জন্যে কাজ করতে চেষ্টা করেছিল—দলকে তারা মানেনি। গৃহযুদ্ধের অসাধারণ গুরুত্ব উপলব্ধি করলেও পি.সি.ই. রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চায়নি। এ-ব্যাপারে তারা নৈরাজ্যবাদীদের মতোই তবে পি.সি.ই. বৈপ্লবিক চেতনার দিক থেকে নৈরাজ্যবাদীদের চেয়ে দুর্বল ছিল।

আর পি.সি.ই.-র কর্মসূচি ছিল বেশি সংস্কারপন্থী। তারা গৃহযুদ্ধকে শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবের সৈনিক তৈরির উপায় হিশেবে দেখেনি. শত্রুর সৈনিকদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে এ-লক্ষ্য তাদের ছিল না। দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল এই যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব আপাতত মূলতুবি থাকবে, ফ্র্যাঙ্কোকে হারিয়ে অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পর বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালানো যাবে। পি.সি.ই.-র সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্না নেত্রী ডলরিস্ ইবারুরির বক্তব্য ছিল এই: "এক পুঁজিবাদী দুনিয়ার মধ্যে থেকে—যে-দুনিয়া হিট্‌লারকে খুশি করে যাচ্ছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে—কমিউনিস্ট পার্টি যদি বিশেষ ধরনের গৃহযুদ্ধে বিভক্ত স্পেইনে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করত তাহলে সেটা হঠকারিতার অপরাধ ছাড়া আর-কিছু হত না।"

সান্টিআগো কারিলো—যিনি এক সময় সোশ্যালিস্ট ছিলেন, পরে দ্রুত পি.সি. ই.-র নেতৃত্বে আরোহণ করেন—বলেছিলেন: "কিছু লোক আছেন যাঁরা বলেন যে এই পর্যায়ে আমাদের উচিত সমাজ-বিপ্লবের জন্যে লড়াই করা, যে আমরা এক ধরনের ধাপ্পা দিচ্ছি · তা সত্ত্বেও, কম্‌রেড্‌জ্, আমরা এক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্যে লড়ছি, অধিকন্তু, এক গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের জন্যে। ···আমরা জানি যে আমরা যদি এই সময় আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে লড়াই করি—এমনকী জয়লাভের বেশ-কিছু দিন বাদেও করি, আমরা আমাদের দেশে শুধু ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীদেরই দেখতে পাব না, তাদের পাশাপাশি দেখব পৃথিবীর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকারগুলোকেও যারা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে ইউরোপের বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বরদাস্ত করবে না।"[৮]

সেই সময়কার পরিস্থিতি বিবেচনা করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে আশু লক্ষ্য বলে ঘোষণা না-করে কোনো-না-কোনো রকমের একনায়কত্বে শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগী হিশেবে অন্য শ্রেণীদের নিয়ে প্রধান প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর ওপর আধিপত্য করবার চেষ্টা হতে পারত। অথবা শ্রেণীসংগ্রামকে সাময়িকভাবে খাপ

খাইয়ে নেওয়া যেত ফ্র্যাঙ্কোর বিরুদ্ধে যাদের ঐক্যবদ্ধ করা যায় তাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্তে। কিন্তু কারিলো যে বলছেন জয়লাভের পরও বেশ-কিছু-দিন সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রই থাকবে—এ-দাসখত কেন? যে-ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সরকারকে এই দাসখত দেওয়া তারা যে কতো বড়ো শয়তান তা তো তাদের স্পেইনের প্রতি এই সময়কার ব্যবহারে প্রমাণ হল। নিজেদের সাম্রাজ্য-বাদী স্বার্থেই এরা ইতালি ও জার্মানির সঙ্গে সরাসরি যোগ দেয়নি বটে কিন্তু গণতন্ত্রী স্পেইনের সর্বনাশে সাহায্য করল তাদের তথাকথিত হস্তক্ষেপ না-করার নীতি।

এ-কথা তো সবারই জানা যে 'ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্স স্পেইনে বা অন্য কোথাও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সহ্য করবে না, করতে পারে না,' কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের পছন্দ-অপছন্দ বিবেচনা করেই কি বিপ্লবের কর্মসূচি ঠিক হবে? আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের এক মহাসংকটের ইঙ্গিত বয়ে আনছিল। স্পেইনের মহা-শত্রু ইতালির ফ্যাশিস্ট সরকার যে সর্বশক্তিমান্ নয় তা মহাযুদ্ধের মধ্যে তার পতনেই প্রমাণিত হল। সাম্রাজ্যবাদের চরম বিপদের সম্ভাবনা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের সুযোগ করে দিচ্ছিল। মাও ৎসে-তুং তো এ-রকম পরিস্থিতির মধ্যেই চীন-বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু পি.সি.ই. সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক সংকটকে কাজে না-লাগিয়ে তাকে বিপ্লব না-করার ছুতো হিশেবে ব্যবহার করল! পি.সি.ই. যে-পথ ধরল তা সাময়িক রণকৌশলগত পথ নয়, তা সম্পূর্ণ বিপ্লবের পথ বর্জন, প্রতিক্রিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ। অথচ পি.সি.ই. স্পেইনের শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামও চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে সংগ্রাম আরেক দিকে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বুর্জহোয়া এবং স্পেইনের বুর্জহোয়ার কাছে আত্মসমর্পণ। এ এক ধরনের গোঁজামিল। পি.সি.ই.-র প্রতিক্রিয়াশীল নীতিটা দাঁড়াল এই। ফ্র্যাঙ্কো থেকে ইংল্যাণ্ডকে দূরে সরিয়ে রাখা, ইংল্যাণ্ডকে বুঝিয়ে দেওয়া যে প্রজাতন্ত্রী স্পেইনের দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। স্পেইনে পি.সি.ই.-র দারুণ আধিপত্য হলেও কোনো ভয় নেই।

ইংল্যাণ্ডের কোনো মাথাব্যথা ছিল না স্পেইনে প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করবার। তার প্রধান কৌশল ছিল তার সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানিকে একঘরে বা কোনঠাশা করা এবং পরাজিত করা। ফ্র্যাঙ্কোর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের মৌলিক বিরোধিতা কোথায়? সে তো কমিউনিজমের বিপদ থেকে ইউয়োরাপ্‌কে রক্ষা করছে। তাহলে পি.সি.ই. শত্রু নয়। ফ্যাশিস্টরাও নয়। এই অবস্থায়ও ইংল্যাণ্ড হস্তক্ষেপ না করার নীতি ছাড়তে পারল না, সে-রীতিকে কার্যত এমনভাবে প্রয়োগ

করল যাতে পি.সি.ই.-র পরাজয় হয়। নইলে ইংল্যাণ্ড স্পেইনে যাতে বাইরে থেকে অস্ত্র-শস্ত্র না আনে সেইজন্যে সেখানকার বন্দরগুলোকে যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে ঘেরাও করে রাখল কেন ?

কিন্তু স্পেইনের ফ্যাশিস্টরা ইটালি ও জামানি থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য পেতে থাকল। এই নীতি অনুসরণ করার কারণ হচ্ছে ইটালি জামানির সঙ্গে ইংল্যাণ্ড বিরোধ ঘটাতে চায় না, চায় ক্রমে ইটালিকে জামানি থেকে দূরে সরিয়ে আনতে এবং জামানিকে রাশার সঙ্গে যুদ্ধে লেলিয়ে দিতে। এই জন্যেই ইংল্যাণ্ড ইটালির অ্যাবিসিনিয়া আক্রমণ মেনে নিয়েছিল। ভূমধ্যসাগর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার একটি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ জলপথ। তাই ১৯৩৬-এ ইটালির সঙ্গে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে মৈত্রীর দিকে ইংল্যাণ্ড ঝুঁকছিল। গৃহযুদ্ধ চলাকালীন একটা চুক্তিও হয়ে গেল। জামানি ইটালিকেই করেছিল ফ্যাশিস্টদের প্রধান সাহায্যকারী। উদ্দেশ্য ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বিরোধ বাড়ুক। নিজে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আসতে চায়নি। এই হল সংক্ষেপে রাজনৈতিক দাবা খেলার চেহারাটা।

ফ্রান্সের দাবার চাল সম্বন্ধে একটু বলা যাক। হস্তক্ষেপ না-করার নীতির উদ্যোক্তা ছিল ফ্রান্স। জামান ও ইটালিয়ান হস্তক্ষেপ ঠেকানো ছিল ফ্রান্সের উদ্দেশ্য। ফ্র্যাঙ্কোর জয়লাভ ফ্রান্সের পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ইটালিকে দক্ষিণাঞ্চলের পক্ষে বিপজ্জনক করে তুলবে। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের স্পেইন সংক্রান্ত নীতি ফ্রান্সের পছন্দ ছিল না। কারণ ফ্র্যাঙ্কোর বিজয় জামানি ও ইতালিকে শক্তিশালী করে তুলবে। যদিও তাতে ইংরেজের সুবিধে হবে যদি জামানিকে রাশার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে ফ্রান্সের বিপদ তো কাটে না। এই উপমহাদেশের রুশ-জামান যুদ্ধে তার ওপর আজ হোক কাল হোক প্রচণ্ড ধাক্কা এসে পড়বার কথা। ফ্রান্স ভেবেছিল হস্তক্ষেপ না-করার নীতি অনুযায়ী যে-বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে তাতে ইটালি ও জামানির পক্ষে ফ্র্যাঙ্কোকে সাহায্য পাঠানো কঠিন হবে—অন্তত অক্ষশক্তিদের ঠগবাজি তুলে ধরা সহজ হবে। সেই জন্যে ফ্রান্স মাঝে-মাঝে তার সীমান্ত খুলে দিত যাতে ফ্রান্সের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের সহায়ক জিনিশ প্রজাতন্ত্রের হাতে পৌঁছে যায় এবং মেক্সিকো মারফত কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থাও ফ্রান্সই করেছিল। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসি মৈত্রীর নীতিই ছিল ফ্রান্সের প্রধান নীতি এবং ফরাসি সরকার সেই নীতিই প্রধানত অনুসরণ করেছিল। ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রকে সাহায্য ইংল্যাণ্ড সমর্থন না-করায় ফরাসি সরকার তা বন্ধ করে দেয়। সুতরাং নিরপেক্ষতার নীতি

প্রজাতন্ত্রকে কোণঠাশা করার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। 'নিরপেক্ষ' আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য অপেক্ষায় ছিল কতক্ষণে তার সব সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীরা এবং রাশা যুদ্ধে বেশ দুর্বল হয়ে পড়বে, কারণ তখনই আসবে তার হস্তক্ষেপের শুভ লগ্ন। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমেরিকা ফ্র্যাঙ্কোকে তেল দিয়ে সাহায্য করতে শুরু করেছিল। আমেরিকার তেল কোম্পানিগুলো তেলের বেশ বড়ো রকমের জোগান নিয়ে আক্রমণ ও যান্ত্রিক যুদ্ধ পরিচালনায় ফ্যাশিস্টদের সাহায্য করেছিল। তাদের বাহিনীর দূরদূরান্তের অভিযানে সাহায্য করেছিল অসংখ্য আমেরিকান ট্রাক। এদিকে আবার "নিরপেক্ষ" হয়েও আমেরিকা প্রজাতন্ত্রের পক্ষে লড়তে ইচ্ছুক আমেরিকান নাগরিকদের বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে যুক্তরাষ্ট্র ফ্র্যাঙ্কোর মুরুব্বি হয়ে দাঁড়ায় এবং এখন স্পেইনে যুক্তরাষ্ট্রই সবচেয়ে প্রভাবশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি।" "নিরপেক্ষতা"-র পুরস্কার তার প্রাপ্য ছিল বৈ কি!

...

স্পেইনের গৃহযুদ্ধকে তার বৈপ্লবিক লক্ষ্য থেকে সরিয়ে আনার ইতিহাস অতি করুণ। স্পেইনে কমিনটানের প্রধান প্রতিনিধি তোগলিয়াত্তি ১৯৩৬-এর অক্টোবারে ঘোষণা করেন, "স্পেইনের জনগণের সংগ্রামের চরিত্র হচ্ছে এক জাতীয় বৈপ্লবিক যুদ্ধের চরিত্র। এটা জনগণকে এবং দেশকে বিদেশীর দাসত্ব থেকে উদ্ধার করবার যুদ্ধ, কারণ বিদ্রোহীদের (ফ্যাশিস্টদের) জয়লাভের মানে হবে স্পেইনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধঃপতন, স্বাধীন রাষ্ট্র হিশেবে তার বিলুপ্তি এবং তার জনগণের জার্মানি ও ইটালির ফ্যাশিজমের দাসত্বস্বীকার।"

স্পেইনের প্রজাতন্ত্রের জন্যে লড়াইতে সমর্থন ও সাহায্য সংগ্রহের এই প্রচারণা ভুল। প্রচারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর চেতনাকে উদ্দীপ্ত করা—বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর ও নিপীড়িত জনগণের সাহায্য ও সমর্থন সংগ্রহ করা পৃথিবীর যত্র তত্র সর্বত্র বিশ্ব-বিপ্লবকে এগিয়ে নেবার প্রয়াসের পক্ষে। তা না-করে এই সংশোধনবাদী নেতার প্রচারও পি. সি. ই.-র প্রচার বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্বন্ধে ভ্রান্তি সৃষ্টি করল এবং কমিউনিস্টদের চেষ্টা যেন বিশ্বের জনমতকে বিপ্লবের পক্ষে দাঁড় না-করিয়ে দুটি পরস্পরবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর একটির পক্ষে দাঁড় করালো। ভুল লক্ষ্য থেকেই জন্মালো ভুল আশা—প্রতিদিনই পি. সি. ই. আশা করতে লাগল পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলোর সুবুদ্ধি হবে, তারা স্পেইনের বিপ্লবীদের তাদের কাছ থেকে অস্ত্র কেনবার অধিকার দেবে। বলা বাহুল্য সে-আশা পূর্ণ হল না। পি. সি. ই. যে এইভাবেই সাম্রাজ্যবাদকে

আশ্রয় করেই চলতে লাগল তার আরেকটা বড়ো উদাহরণ তার মারাকো সম্পর্কিত নীতি। একলক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার মারাকান সৈনিক শেষ পর্যন্ত ফ্র্যাঙ্কোর পক্ষে লড়াইতে নেমেছিল। ফ্যাশিস্টদের প্রধানত এদের ওপরই নির্ভর করতে হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই মারাকোর জনগণ সশস্ত্র বিদ্রোহ করে ফ্র্যাঙ্কোর বিরোধিতা করেছে, জাতীয় আন্দোলনের প্রধান-প্রধান নেতারাও ফ্যাশিস্ট সেনানায়কদের বিরোধী ছিলেন। এই অবস্থায় মারাকোর অধিবাসীদের কেন বিপ্লবের পক্ষে আনা গেল না বা নিরপেক্ষ করা গেল না? স্পেইনের প্রজাতন্ত্র কেন বিনাশর্তে ঘোষণা করল না মারাকোর স্বাধীনতা? ফ্যাশিস্ট সেনানায়কদের বিদ্রোহের আগেই মারাকোর জাতীয়তাবাদী নেতা আবদুল করিম-এর শিবিরের কিছু মারাকোর নেতা পপিউলা ফ্রান্ট সরকারের কাছে পরপর কয়েকবার আবেদন করেছিলেন, ১৯৩৬-এর শরৎকালে দুজন নেতা প্রজাতন্ত্রী স্পেইনে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে-ক্যাটালোনিয়া যে-রকম আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পেয়েছে, সে-রকম স্বায়ত্তশাসনের আশ্বাস পেলে তাঁরা মারাকোতে ফ্র্যাঙ্কোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করতে পারেন।

এটা সত্যি যে সোশ্যালিস্ট নেতা প্রিএইটো প্রেজিডাণ্ট আজানিয়ার দলের সঙ্গে জুটে মারাকোর প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এমনকি কঅটেজ্ বা পার্লামেণ্টে তাঁদের বক্তব্য বলতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু পি. সি. ই. মারাকোর স্বাধীনতার দাবি নিয়ে অবিরাম লড়াই করেছিল কি? কমিউনিস্ট পার্টির কিন্তু অন্যরকম ঐতিহ্য ছিল। মারাকোতে সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে পার্টি আন্দোলন করেছিল। এমনকি একসময় মারাকোর ছোটো কমিউনিস্ট পার্টি নিজেই স্পেইনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাছাড়া মারাকোতে জাতীয় মুক্তির এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম তো চলছিলই। ভাবতে কেমন লাগে যে পি. সি. ই.-র বিশ্বাসঘাতকতার পরেও কিছু মারাকোর বিপ্লবী প্রকৃত আন্তর্জাতিকতার ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে পি.সি.ই.-র পঞ্চম রেজিমেণ্টের এবং আন্তর্জাতিক ব্রিগেইডের সৈনিক হয়ে ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। গৃহযুদ্ধের প্রথম দিককার কথা না-হয় বাদ দেওয়া গেল কিন্তু পরের পর্যায়ে যখন পি. সি. ই. প্রজাতন্ত্রের কর্ণধারা প্রধানত নিয়ন্ত্রণ করছে তখন মারাকোর স্বাধীনতার প্রশ্নকে তুলে ধরল না কেন? আসলে প্রিএইটোর মতো সোশ্যালিস্টরা এবং ইংরেজ-ঘেঁষা আজানিয়ারা ইংরেজ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদকে চটাতে চায় না কারণ 'বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা' বজায় রাখাই তো তাদের উদ্দেশ্য। পি. সি. ই. ও তাদের ঘাঁটাতে চায় না তাই পি. সি. ই. কার্যত তাদের এবং স্পেইনের সাম্রাজ্য রক্ষার

সমর্থক হয়ে দাঁড়ালো। এই অবস্থায় মারাকৌর স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াবে কী করে?

আমরা দেখেছি যে ফ্র্যাঙ্কোর আক্রমণ শুরু হয়েছিল এক বিপ্লবী জোয়ারের মধ্যে এবং সেই জোয়ারকে রুখতে। বুর্জহোয়া সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। জনগণ লাখে-লাখে এগিয়ে এল বন্ধন-মুক্তির সংগ্রামে নড়বড়ে শাসকশ্রেণীকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। ফ্র্যাঙ্কোর সৈন্যরা থমকে থেমে গেল এই গণপ্রতিরোধ দেখে। কিন্তু এ-জোয়ার টিকল না। ৩৬-৩৭-এর শীতকাল থেকে পরবর্তী বসন্তে পি. সি. ই. পথ প্রদর্শক হল। বিপ্লবের পথপ্রদর্শক নয়, ভেঙে-পড়া বুর্জহোয়া ব্যবস্থা সংরক্ষণের পথ-প্রদর্শক! পরের শীতকাল না-আসতেই মিলিশা ভেঙে দেওয়া হল এবং সবকিছু চলে গেল বুর্জহোয়া ধাঁচের সেনাবাহিনীর হাতে। এ-কথা অবশ্য ঠিক যে প্রধানত মিলিশা দিয়ে ফ্র্যাঙ্কোকে হারানো যেত না। মিলিশা প্রধান প্রতিরোধ বাহিনী হতে পারে না। কিন্তু পি. সি. ই. কী বিকল্প ব্যবস্থা করল? অগাস্ট মাসে অনেক-গুলো চাষী সমবায় সমিতি উজার করে ভেঙে দিল। একটা গুরুতর সমস্যা অবশ্য ছিল। গরিব চাষীরা জমি দখল করে অনেক অবস্থাপন্ন চাষীকে এবং ছোটো জমি মালিককে বিরূপ করে তুলছিল। তাদের ফ্র্যাঙ্কোর পক্ষে পাঠিয়ে দেওয়ার কোনও দরকার ছিল না। কিন্তু পি. সি. ই.-র বিকল্প ব্যবস্থা হল এই যে ধনী-চাষীরা এবং প্রজাতন্ত্রের পক্ষের জমি-মালিকরা গ্রামাঞ্চলের নীতি-নির্ধারক হবে!

যে-সব কারখানার মালিকরা পালিয়ে গিয়ে ফ্র্যাঙ্কোর কোলে আশ্রয় নিয়েছে সেইসব কারখানার "শ্রমিক সমবায়গুলো" সরকার অধিগ্রহণ করল এবং সেগুলোকে আর রাজনৈতিক সংগ্রামের আখড়া হিশেবে থাকতে দিল না। পি. সি. ই. পুরোনো ম্যানেজার এবং আমলা পাঠিয়ে কারখানাগুলোর শ্রমিক সমিতিগুলোকে শুধু উৎপাদন বাড়াবার কাজের মধ্যে আটকে রাখল। রাজনীতি বাদ!

ক্রমে প্রজাতান্ত্রিক সরকার আরও দক্ষিণপন্থী হল। বাম ভাষাভাষী সোশ্যালিস্ট প্রধানমন্ত্রী কাবালেরোকে সরিয়ে দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট নেগ্রিনকে প্রধানমন্ত্রী করা হল। সে আবার প্রেজিডাণ্ট আজানিয়ার অনুরক্ত। সেই চরম দক্ষিণ সোশ্যালিস্ট প্রিএইটো যিনি মারাকৌর প্রতিনিধিকে কঅটেজ-এর সভার বক্তব্য উপস্থিত করতে দেননি তিনি হলেন দেশরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী। পি. সি. ই.-র চেষ্টাতেই নেগ্রিনও প্রিএইটো মন্ত্রীসভায় এমন পদ নিয়ে ঢুকল। ছুতো হল: যুদ্ধের প্রয়াসকে আরও জোরদার করা। অথচ প্রিএইটো এসেই এমন ফ্র্যাঙ্কো-পক্ষীয় মনোভাব দেখালেন যে পি.সি.ই.-কে অনেক কষ্টে তাকে শামাল দিতে হল। এ-রকম লোককে পি. সি. ই. কর্তৃত্বে বসালো কেন? ইংল্যাণ্ডকে খুশি করবার জন্যে। ফল হল যে

জনগণের মনোবল কমতে লাগল। অসামরিক লোকদের মধ্যে রাজনৈতিক জীবন ও কর্ম-প্রচেষ্টা ক্রমে ক্ষীণ ও দুর্বল হতে লাগল। যুদ্ধটা যেন শুধু সৈনিকদেরই আর এই সৈনিকদের জোর করে সৈনিক করা হয়েছে, এরা কেউ স্বেচ্ছা-সৈনিক নয়। জনযুদ্ধের আবহাওয়া নেই কার দোষে? বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অনেকেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে যা-ই ঘটুক না কেন তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। সেখানে প্রজাতন্ত্র বৈপ্লবিক কর্মসূচি চালাতে পারল না, বৈপ্লবিক কৃষি-নীতিও অনুসরণ করল না। এই পল্লী-অঞ্চলে যে-জায়গা ফ্র্যাঙ্কোর সেনাবাহিনীতে দখলে এসে গিয়েছিল সেখানে সে হাজার চাষী ও অন্যান্য পল্লীবাসীদের জোর করে তার দলের সৈনিক করে নিতে পেরেছিল। পি. সি. ই. কিন্তু এই ফ্যাশিস্ট বাহিনীর পিছনে চাষী ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে কাজ করে যেতে পারত। তাদের দিয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে পারত। পি. সি. ই. কিছু করল না কারণ কৃষি-বিপ্লব জাতীয় আলোড়ন প্রজাতন্ত্রী কর্তাব্যক্তিরা—এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা—আদপেই সহ্য করবো না। গণতান্ত্রিক দাবির ওপর ভিত্তি করে হলেও ও-রকম আন্দোলন বৈপ্লবিক জোয়ার সৃষ্টি করত। পি. সি. ই.-র উচিত ছিল গরিব চাষী ও গ্রাম্য মজুরদের ওপর নির্ভর করা এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগানোর উদ্দেশ্যে এবং প্রধান শত্রুকে কোনঠাসা করবার জন্যে গরিব চাষী গ্রাম্য মজুরদের সঙ্গে মধ্যচাষীদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা। তা না-করে পি. সি. ই. হয়ে উঠল পল্লী-অঞ্চলের ব্যক্তিগত সম্পত্তির সবচেয়ে জোরদার সমর্থক। মধ্যচাষীরা দলে-দলে পি. সি. ই.-তে যোগ দিল। তাদের ও খুদে জমি-মালিকদের সঙ্গে জোট বেঁধে পি. সি. ই. গ্রামের গরিবদের জোর করে জমি দখলে বাধা দিয়েছিল (গৃহযুদ্ধের গোড়ার দিকে)—এমনকি সশস্ত্র আক্রমণ করেও! সুতরাং গ্রামের মানুষদের একটি বড়ো অংশ বিপ্লবের কাজে এল না, এল ফ্র্যাঙ্কোর কাজে। অথচ বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কিন্তু এদের বৈপ্লবিক যুদ্ধে সক্রিয় করে তোলা যেত।

...

রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মধারা ঠিক থাকলেই যে বিপ্লব জয়লাভ করত তা বলা যায় না। একটা দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করা বা হারানোর প্রশ্নের চেয়ে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন সামগ্রিকভাবে অগ্রসর হল না পিছু হঠল সে-প্রশ্ন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই স্পেইনের গৃহযুদ্ধকে দেখতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও স্বীকার করতে হবে যে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি স্পেইনে অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশ পেয়েও বিপ্লব করল না বরং বিপ্লবকে ধ্বংস করল।

পি.সি.ই.-র রাজনৈতিক লাইনের যেমন ভুল ছিল, মিলিট্রি লাইনেও তেমনি ভুল ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে সৈন্যবাহিনীকে বুর্জোয়া কায়দায় গড়ে তোলা ঠিক হয়নি। তাছাড়া ঐ কায়দায় সংগঠিত করতে গিয়ে যে-সময় লাগল তাতে ফ্র্যাঙ্কো অনেক সুযোগ পেয়ে গেল। তারপর পর্তুগিজ, মারাকান ও ইতালীয় সৈনিক হাজারে-হাজারে এসে তার দল ভারি করল। প্রজাতন্ত্রের বাহিনী অনেক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম নিশ্চয়ই করেছে কিন্তু যাকে রণনীতির দিক থেকে পালটা আক্রমণ বলে তা করেনি। সময় কাটিয়েছে এই আশায় যে বিদেশ থেকে অস্ত্র আসবে। যুদ্ধের প্রথম দিকে ফ্র্যাঙ্কোর রণনীতিগত অবস্থান ছিল খুব দুর্বল। উত্তর স্পেইনে তার সৈন্যরা বেশি দীর্ঘ রেখায় ছড়ানো। পি.সি.ই. ও নৈরাজ্যবাদীদের পুরোনো ঘাঁটি সেভিল্-এ ফ্যাশিস্টরা সহজেই ঘেরাও হয়ে আক্রান্ত হতে পারত। তাছাড়া ফ্র্যাঙ্কোর প্রধান জোগানের পথ ছিল জিব্রল্টা প্রণালীর ওপর দিয়ে, সেখানে আক্রমণ করে তাকে ঘায়েল করা সহজ ছিল। কিন্তু আমরা দেখলাম প্রজাতন্ত্রীরা এ-সব আক্রমণের কথা ভাবলই না, পিছু হঠে রাজধানী রক্ষায় মন দিল এবং মিলিশা-গুলোকে শেষ করে দিল। মাড্রিডকে প্রাণপণে রক্ষা করা যে দোষের হয়েছিল তা আমরা বলছি না তবে ওখানেই না-থেমে ফ্র্যাঙ্কোর সেনা-সমাবেশের দুর্বল স্থানগুলোতে হামলা করা হল না কেন ? আক্রমণ না-করাটা অবৈপ্লবিক। ফ্র্যাঙ্কোর দীর্ঘ-প্রসারিত সৈন্যবাহিনীর কোনো এক জায়গায় যদি তীব্র আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত রূপ দেওয়া যেত তার ফলে ফ্যাশিস্টরা গুরুতরভাবে বিপন্ন হত।

মারাকোর স্বাধীনতা ঘোষণার প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সেই বৈপ্লবিক পদক্ষেপও নেওয়া হল না। তাতে উপনিবেশজীবী সাম্রাজ্যবাদ বিপদে পড়ত আর বিশ্বময় নিপীড়িত মানুষের মধ্যে অভাবনীয় বৈপ্লবিক উদ্দীপনা জাগত। ফ্র্যাঙ্কোর সৈন্যসংগ্রহের সবচেয়ে বড়ো উৎস চরম সংকটে পড়ত। কিন্তু মারাকোর স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ফরাসি মারাকোতে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ বিপদে পড়ত এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও চটত। তাদেরই ভয়ে পি.সি.ই. এসব বৈপ্লবিক পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকল। ঐ একই কারণে জিব্রলটা প্রণালী অবরোধ এবং জিব্রলটার উলটো দিকে স্পেইনের বন্দর অ্যাল্যিসিয়ারাস্-এর ওপর কোনও আক্রমণ প্রজাতন্ত্রীরা করল না।

জনযুদ্ধের রীতি-নীতি প্রজাতন্ত্রীরা মেনে চলেনি। পি.সি.ই. যে সে-লাইনে চেষ্টা করেছে এমন প্রমাণ মোটেই নেই। জনযুদ্ধের রীতি অনুযায়ী দখলী জমি ধরে রাখার ব্যাপারে বেশি কড়াকড়ি ভুল। শত্রুসৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করা বিশেষ দরকার। স্থানীয়ভাবে কোনো-কোনো অঞ্চলে নিজেদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার কৌশল

অবলম্বন করতে হয়। শত্রুবাহিনীর ঠিক পেছনের এলাকায় রাজনৈতিক প্রচার চালানোর গুরুত্ব অনেকখানি। আর নিজের এলাকাতেও রাজনৈতিক প্রচার দরকার। প্রজাতন্ত্রের জনবাহিনী জনযুদ্ধের এ-সব আদপেই রীতি-নীতির তোয়াক্কা করেনি। আর ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে গেরিলা যুদ্ধ যেভাবে এবং যতটা করা উচিত ছিল তা মোটেই করা হয়নি। অথচ স্পেইনে গেরিলা যুদ্ধের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য আছে। বিশেষ করে উনিশের শতকে ফরাসিদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে স্পেইনের মানুষ প্রচণ্ডভাবে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল। তাছাড়া পর্বতশঙ্কুল এই দেশ গেরিলাযুদ্ধের খুব উপযোগী। মাআক্স্ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে পর্বতগুলো অনেকগুলো পর্দার কাজ করত।[১০] মাআক্স্ স্পেইনের ফরাসি বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে আরো বলেছেন যে ফরাসিরা দেখে বেশ অবাক্ হয়ে গেল যে স্পেইনীয়-দের প্রতিরোধের কেন্দ্র বলে কিছু কোথাও নেই অথচ সব জায়গাতেই আছে।[১১] এহেন রণকৌশল পি.সি.ই. উপেক্ষা করল তো বটেই, এমনকি মিলিশাতে ভেঙে দিল। স্টালিন, ভোরোশিলভ ও মলোটোভ-এর কথাও শুনল না। ওঁরা তিনজনে এককালীন প্রধানমন্ত্রী কাবালেরোকে সুস্পষ্টভাবে লিখেছিলেন গেরিলা যুদ্ধকে অন্যতম পদ্ধতি হিশেবে (একমাত্র পদ্ধতি হিশেবে নয়) ব্যবহার করতে। পি.সি.ই. সম্ভবত কিছু করতে পারেনি কারণ প্রজাতন্ত্রী নেতাদের লেজুড়বৃত্তিতে সে-পার্টি অভ্যস্ত ছিল এবং সেই নেতারা যুদ্ধ আন্তরিকভাবে চাইতেন না, তাঁরা মনে-মনে আত্মসমর্পণপন্থী, আপোষপন্থী। তাছাড়া একটা বড়ো বাধা ছিল গেরিলা ব্যবহার করার। কারণ গেরিলা হচ্ছে রাজনীতি-সচেতন বিপ্লবী যোদ্ধা এবং সচেতন জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অস্ত্রশস্ত্র ছড়িয়ে না-দিলে গেরিলা যুদ্ধ সফল করা যায় না। তার মানে একটা স্থায়ী রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনের ভিত্তিতেই গেরিলা যুদ্ধ চালানো যায়। শত্রু এলাকার পেছনে, সে-রকম প্রকাশ্য বা গোপন কোনো আন্দোলন পি.সি.ই. করেনি নিজের অর্থাৎ পপিউলা ফ্রাণ্ট এলাকাতেও।

সুতরাং পি.সি.ই.-র সংশোধনবাদী আদর্শ ও কর্মধারার দরুন স্পেইনের বিপ্লব নিহত হল। আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট ক্ষতি হল। এই জন্যই হয়তো সংশোধনবাদ দিগদিগন্ত গ্রাস করে ফেলল। নিহত বিপ্লবের রক্তশয্যার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ও নিক্রিয়তাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না, নতুন করে সংগ্রাম চালাতে হবে স্পেইনের কমরেডদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। জনগণের এ-রকম উদ্যম ও আত্মদানের তুলনা ইতিহাসে কমই আছে। সে আত্মদানের সামনে দাঁড়িয়ে একটি স্পেইনীয় কবিতার ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে :

কিন্তু তোমার মৃত্যু থেকেই আমি শিখেছি
জীবন কী।
আমার চোখ শোকে জল ঝরাতে
প্রায় শুরু করেছিল।
তখন আমি আবিষ্কার করলাম
আমার মধ্যে চোখের জল নেই
আছে নির্মম সব অস্ত্র।
সেগুলোরই অপেক্ষায় থাকো,
আমার অপেক্ষায় থাকো ॥

উল্লেখ-উৎস

১ *The Spanish Civil War* : Hugh Thomas (Penguin, 1974) p. 145

২ *They Shall Not Pass* : Dolores Ibarruri (International Publishers, New York,

৩ *The Spanish Civil War* : Hugh Thomas, pp. 143-44

৪ *Ibid.*

৫ *Revolutionary Spain* : Karl Marx, Collected Works of Marx & Engels, Vol 13 (Progress, Moscow), pp. 398-99

৬ *Revolution*, Chicago, June,

৭ *Ibid.*

৮ *Ibid.*

৯ *Ibid.*

১০ *Revolutionary Spain* : Karl Marx, Collected Works of Marx & Engels, Vol 13, p. 421

১১ *Ibid.*

বি. দ্র. : কিছু নামের উচ্চারণ Daniel Jones অনুসরণে নতুন আকৃতি পেয়েছে। সেগুলি বিকৃতি নয়। যেমন মারাকো (Morocco)।

সৌরীন ভট্টাচার্য

স্পেনের গৃহযুদ্ধ, বিশ শতক ও আমরা

১

"কী তোমার প্রস্তাব? গড়ে দিতে হবে ন্যায্য নগর? তাই দেব।
তাই হোক তবে, না কি এ শর্ত আত্মহননের, অথবা রোম্যান্টিক
মৃত্যুর? বেশ তো, আমি রাজি, কারণ,
আমি তোমার নির্বাচিত, তোমারই সিদ্ধান্ত আমি। হ্যাঁ, আমিই তো স্পেন।"

—ডবল্যু. এইচ. অডেন: 'স্পেন' ১৯৩৭

"...ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের জোয়াল থেকে স্পেনকে মুক্ত করা শুধু স্পেনীয়দের ব্যাপার নয়, সমস্ত প্রগতিশীল মানবিকতার ব্রত।"

স্পেনের কমিউনিস্ট নেতা হোসে দিয়াথের কাছে স্তালিনের তারবার্তা: সময় ১৯৩৬-এর অক্টোবর, আলবাসেতে-বেস-এ যখন আন্তর্জাতিক বাহিনীর যোদ্ধারা জড়ো হতে শুরু করেছেন।

"মানবিকতা! মানবিকতা! তোমায় ডেকে বলছি! আমি তোমাদের ডেকে বলছি, ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণ। স্পেনকে সাহায্য কর! আমাদের সাহায্য কর! নিজেদের সাহায্য কর! তোমরা আমরা, হ্যাঁ, আমরা সবাই বিপদগ্রস্ত!" —রোমাঁ রোলাঁ। [লুমানিতে, নভেম্বর ২২, ১৯৩৬]

"চীনে চিকিৎসক বাহিনী পাঠিয়ে, স্পেনের জনগণের জন্য খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়ে আমরা সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আমাদের বক্তব্যের দিকে ফেরাতে বাধ্য করছি। তাতে করে, আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের ক্রিয়াকর্ম শুরু করতে পারছি, পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে ভারতের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে আজ।"

—জবাহরলাল নেহরু: 'স্পেন! হোয়াই?' ১৯৩৭

"এর পর থেকে নানাভাবে স্পেনের গৃহযুদ্ধ এমন-কি ইউরোপীয় গৃহযুদ্ধেরও চেয়ে বড়ো কিছু হয়ে দাঁড়াবে: ছোটোখাটো বিশ্বযুদ্ধই যেন-বা। কারণ স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল এক বিশেষ সংকট মুহূর্তে, শুধু কূটনীতির নয়... সমরাস্ত্র নির্মাণেরও দিক থেকে।... এইভাবে, জুলাই মাস পর্যন্তও যে দেশ প্রযুক্তির বিচারে ছিল অনগ্রসর সেই দেশেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক শিল্পের সর্বাধুনিক আবিষ্কার

ব্যবহার করা হলো নিধনকর্মে। ১৯৩৬-এর জুলাই বিদ্রোহ এক ধাক্কায় স্পেনকে ঠেলে দিল গত শতকে, ঠিক যেন একেবারে হুড়মুড় করে।"

—হিউ টমাস : 'দ্য স্প্যানিশ সিভিল ওঅর' ১৯৬১

"যে-সময়ে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারগুলো একের পর এক জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে ফ্যাসিবাদকে, আর এইভাবে ফ্যাসিবাদকে সাহায্য করছে পায়ের জোর বাড়াতে, তখন এই জোরালো অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধ সব দেশের প্রগতিশীল শক্তির সহানুভূতি অর্জন করেছিল, বিশেষত ঐসব দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সহানুভূতি, যারা স্পষ্ট ভাষায় তাদের সমর্থন ঘোষণা করেছিল স্পেনের জনগণের প্রতি।"

—দোলোরেস ইবারুরি (লা পাসিওনারিয়া) : 'দ্য ফাইট গোজ অন্' ১৯৭৪

"প্রজাতন্ত্রের সপক্ষে এই সংগ্রাম সর্বোপরি এক গভীর জাতীয় চরিত্র অর্জন করেছিল। জনগণই প্রথম যারা বিদ্রোহী সেনানায়কদের বাধা দিয়েছিল।

স্পেনীয় যুদ্ধের দ্বন্দ্বে একদিকে ছিল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির জোট আর অন্য-দিকে সম্মিলিত জনশক্তি, যে-শক্তি ঐ কালা দু-বছরের শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দানা বেঁধেছিল।"

—লুইজি লঙ্গো (আন্তর্জাতিক বাহিনীর কমিসার জেনারেল, পরবর্তীকালে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান) : 'অ্যান ইম্পরট্যাণ্ট স্টেজ ইন্ দ্য পিপল্‌স্ স্ট্রাগল্ এগেইন্‌স্ট ফ্যাসিজম' ১৯৭৪

"আমরা ক্রীতদাস হবার আগে সব নদী দিয়ে বয়ে যাবে মহান রক্তের স্রোত যাতে সমুদ্র লাল হয়ে যায়।" —বাস্ক সংগীত

"স্পেনে যদি কোনো গাছ থাকে, রক্তে ভেজা,
তবে তা স্বাধীনতার।
একটা মুখও যদি কথা বলার জন্য অবশিষ্ট থাকে স্পেনে,
তবে সে বলবে স্বাধীনতা।" —পল এল্যুয়ার

"আমি এসেছিলাম
এক মহাসমুদ্র পেরিয়ে,
আর এক অর্ধেক মহাদেশ।
সীমান্ত
আর পর্বত, আকাশের মতো উঁচু
আর সেই সব সরকার পেরিয়ে,
যারা বলেছিল : না।
তুমি যেতে পাবে না।

...

একাকার সব :
আমাদের স্বপ্ন !
আমার মৃত্যু !
তোমাদের জীবন !
আমাদের রক্ত !
আগুনের শিখা
সবই তো এক।"

—ল্যাংস্টন হিউজ : 'আন্তর্জাতিক বাহিনীর নিহত আমেরিকান যোদ্ধাদের স্মৃতিতে'

"তিরিশের দশকের আমেরিকা ও স্পেনের বিষয়ে লিখতে যাওয়া মানে এক সেতু পেরিয়ে যাওয়া, প্রায় এক নিষিদ্ধ অতীতের দিকে। কারণ, আজকের আমেরিকায়, দু-একটা ব্যতিক্রম বাদে স্পেনের যুদ্ধের তাৎপর্যময় সমস্ত তথ্য বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম থেকে হয় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে, অথবা এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছে যে, এই যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলোকে মনে হবে 'লাল' সরকারের বিরুদ্ধে এক সাধারণ 'রাজকীয় অভ্যুত্থান'।"

—আর্থার এইচ. ল্যাণ্ডিস (ভেটারান্স অব্ দি অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন ব্রিগেড, ইউ. এস. এ.-র তরফে) ১৯৭৪

"স্পেনের গৃহযুদ্ধ আধুনিক ইতিহাসের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, আর বহু বিস্তৃত গবেষণাও হয়েছে এর উপর। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে ইউরোপীয় ইতিহাসকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে যে-সব ঘটনা ও চিন্তার ধারা সে-সবের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই আমরা এই যুদ্ধে। আরো যা জরুরি, স্পেনের সঙ্গে তদানীন্তন বৃহৎ শক্তিগুলির সম্পর্ক অনেকাংশে আজকের দিনে যাদের তৃতীয় দুনিয়ার দেশ বলা হয় তাদের সঙ্গে সম্পর্কের মতো।"

—নোম্ চম্স্কি : 'অবজেক্টিভিটি অ্যাণ্ড লিবারল্ স্কলারশিপ' ১৯৬৯

"লাতিফুন্দিয়া ও ব্যাঙ্ক মালিকদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে আসবার ভয়েই অবশ্য প্রজাতন্ত্রী সরকার সার্বিক অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচি ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারেনি। এই অত্যধিক ভীরুতা, আর তার সঙ্গে সারা পৃথিবীর অর্থ-নৈতিক অবস্থার অবনতি—১৯২৯-এর বিশ্ব সংকট তার নিম্নতম বিন্দুতে পৌঁছেছিল ১৯৩৩ নাগাদ।"

—এদুয়ার্দ দ্য ব্লায়ে : 'ফ্রাঙ্কো : অ্যাণ্ড দ্য পলিটিক্স অব্ স্পেন' ১৯৭৬

"ঠিক যেমন বিপ্লববাদের ক্ষেত্রে, তেমনি অর্থ নৈতিক সংকটের সময়কার সংস্কারবাদী সমাজতন্ত্রের সাফল্যও পরিণতিতে ফ্যাসিবাদী অথবা সমবায়ী রাষ্ট্রের প্রবর্তনাকে ত্বরান্বিত করে। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শুধু ১৯৩০-এর স্পেন নয়, চিলির আইয়েন্দের পপুলার ইউনিটির ট্র্যাজেডিও। তা ছাড়াও, আজকের ইতালির বামপন্থার সামনে যে-সমস্যা, এবং আবারও একবার স্পেনের যে সমস্যা, এইসব দেশে ইউরোকমিউনিস্ট নীতি গ্রহণ করার যে-কারণ এ-সব দিকেই আরো আলোকপাত হয় এর থেকে। স্পেন ও চিলির শিক্ষা এই কথাই বলে যে, সংস্কারের পথে মধ্যপন্থী দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতা অবশ্য কর্তব্য। প্রজাতন্ত্রী স্পেনের সংস্কারবাদী পরীক্ষার ব্যর্থতা থেকে 'ইউরোকমিউনিজম'-এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু জরুরি প্রশ্ন উঠে পড়ে। এটা এমন এক অভিজ্ঞতা যা আমাদের সমকালেও খুব গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক।"

—পল প্রেস্টন : 'দ্য কামিং অব্ দ্য স্প্যানিশ সিভিল ওঅর' ১৯৭৮

২

আবেগ ও মতামতের কোলাজ আর বড়ো করার দরকার হবে না। খানিকটা এলোমেলোভাবে সাজানো এই-যে উদ্ধৃতির মালা এর থেকে দু-একটা জরুরি কথা বেরিয়ে আসছে। প্রথমে আবেগের কথাটাই ধরা যাক। স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে যে সারা পৃথিবীময় আবেগের সঞ্চার হয়েছিল এ তো জানা কথা। হবে যে এটাও খুব স্বাভাবিক। বস্তুত স্পেনের গৃহযুদ্ধ যেভাবে নানা দেশের লেখক শিল্পী ও কবিদের সংবেদনে সাড়া তুলেছিল তাতে মনে হতেই পারে যে, এটা শুধু স্পেনের সমস্যা ছিল না। অন্তত যাঁরা এই আবেগের অংশিদার ছিলেন তাঁদের অনেকের নিশ্চিতভাবে তা-ই মনে হয়েছিল। রোমাঁ রোলাঁর উদ্ধৃতিতে তার স্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে। অডেনের উদ্ধৃত কবিতাতেও ১৯৩৭-এর স্পেনের আর্তি যেভাবে আত্মীকৃত হয়েছে তাতে লেখক শিল্পীর আবেগে মননে স্পেন নিশ্চয় তার ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অনেকের ক্ষেত্রে অবশ্য এই আবেগের জোয়ারে ভাঁটার টান লাগতে দেরি হয়নি! অডেন তো পরবর্তীকালে এই উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলি বদলেই দিয়েছিলেন। সে বদল কি শুধুই কবিতার দাবিতে? এ-রকম উলটো স্রোতের উদাহরণ অবশ্য বিরল নয়। ফরাসি বিপ্লবের ফ্রান্সও অনেক লেখক শিল্পীর ভাবনায় এমনিভাবে তার ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো রোম্যান্টিকের ক্ষেত্রে অন্তত সে-আবেগের ঋতুবদল ঘটতে দেরি লাগেনি। এ-ব্যাপারটাও হয়তো খুব অপ্রত্যাশিত না, তবে আপাতত সে-কথা আমাদের বিবেচ্য নয়।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে যে-আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল তার রকমফেরটা কিন্তু লক্ষ করবার মতো। কী নিয়ে এই আবেগ? কী মনে হচ্ছিল এই যুদ্ধকে? এর উত্তর হয়তো খুব স্পষ্ট করে আদৌ পাওয়া যাবে না। কারণ, যাঁরা সাড়া দিচ্ছিলেন এই সংকটে তাঁদের কাছেও এর স্বরূপ কতটা স্পষ্ট ছিল তা জানা নেই। অন্তত সবার ক্ষেত্রে যে ভাবনার খুব সমতা ছিল না তা বোধহয় বলা চলে। কেউ একে দেখছিলেন খুব সাধারণ অর্থে একটা মানবিকতার প্রশ্ন হিশেবে, কেউ-বা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রশ্ন, কারুর কাছে জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন বলেও মনে হচ্ছিল হয়তো। নেহরু-পন্থী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কাছে এটা ছিল আন্তর্জাতিকতা অর্জনের অন্যতম সোপান। ১৯২৬-এ বেলজিয়াম-কংগ্রেসে আন্তর্জাতিকতা ও সমাজতন্ত্রে নেহরুর যে প্রাথমিক দীক্ষা হয়েছিল এইসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তা ধীরে-ধীরে এক পরিণতির দিকে এগোচ্ছিল। যদিও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বা তার নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলনে তার প্রভাব কতদূর পড়েছিল সেটা অন্য প্রশ্ন। নেহরুর চিন্তাতেও আন্তর্জাতিকতা ও সমাজতন্ত্রের অবয়ব কতটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল তাও অন্য বিচার। ১৯৩৬-৩৭-এর স্পেন ভাবনায় যে নানা ধরন ছিল আমরা আপাতত শুধু এটুকুই লক্ষ করতে চাই। যেমন, অনেকের কাছে খুব-একটা বড়ো কোনো উদ্দেশ্যে শামিল হতে পারার একটা টান ছিল। পশ্চিমী গণতন্ত্রের 'হস্তক্ষেপ-বর্জন' নীতির বাধা না-মেনে আন্তর্জাতিক বাহিনীতে নাম লেখানোর যে-সম্মোহ তা যে যুবমানসকে টানবে এ তো স্বাভাবিক।

এই স্বাভাবিক কথাটা আমরা আগেও একবার ব্যবহার করেছি। বলেছি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিবেকবান লেখক-শিল্পীর মনে গৃহযুদ্ধের আবেগ সঞ্চারিত হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। এই কথাটা কি একটু অসতর্ক হয়ে গেল? সত্যিই কি খুব স্বাভাবিক? অন্তত সবসময়ে? আমাদের সমসাময়িক পৃথিবীর কথাই ধরা যাক। দক্ষিণ আফ্রিকা, প্যালেস্তাইন, নিকারাগুয়া, অল্প কিছুদিন আগের চিলি ও রাষ্ট্রপতি আইয়েন্দের পতন, বা আরো কিছুদিন আগের ভিয়েৎনাম ও কুবা— এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে চিহ্নিত করতে গেলে তো এইসব ঘটনারই উল্লেখ করতে হবে। এর প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই দেখা গেছে। তবে কোনো ক্ষেত্রে স্পেনের মতো নয়। ঠিক এই মুহূর্তের দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা তার বর্ণবৈষম্য ও স্বাধীনতা আন্দোলন সব মিলিয়ে সেখানে এক উত্তাল অবস্থা চলছে। আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের অনেক সমস্যা আছে জানি, কিন্তু সমস্যার গুরুত্ব মাপতে গেলে ও-কথা উঠতেই পারে। তাই বলছিলাম স্বাভাবিকতার কথাটা অত সরলভাবে বলে ফেলা বোধহয় ঠিক হলো না।

এই স্বাভাবিকতার সূত্রটাকে ধরে এগোতে গেলে আমরা দেখব যে স্পেনের গৃহযুদ্ধের অনুরূপ আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক মনে হবে তখনই যখন ঘটনার বিশ্বতাৎপর্য একটা স্তরে উন্নীত হয়। আমাদের সমকালের যে-পরিস্থিতি-গুলোর উল্লেখ করা হয়েছে তাদের সঙ্গে তুলনা করে কোনো লাভ নেই। তিরিশের দশকের পৃথিবী আর ষাটের সত্তরের আশির দশকের পৃথিবীর চেহারায় অমিল এত বিস্তর যে তিরিশের অনুরূপ প্রতিক্রিয়া আজ কেন দেখতে পাই না এ-প্রশ্ন তোলা চলে না। পারমাণবিক সমরসজ্জা আজ নক্ষত্র যুদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী পৃথিবীর সঙ্গে আজকের পৃথিবীর তুলনা নানা কারণে বৃথা। তাই সে-আলোচনার দিকে যাবো না। তবে স্পেনের ক্ষেত্রে ঐ আবেগ ও প্রতিক্রিয়া কেন স্বাভাবিক মনে হতে পারে তার কিছু ইঙ্গিত পাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। আর এই পথেই স্পেন সমস্যার জটিলতার চেহারা খানিকটা ধরা সম্ভব। প্রথম অংশে সাজানো উদ্ধৃতিমালার মধ্যে একটা দল রয়েছে যেগুলো সেই আবেগের চিহ্ন বহন করছে। আর একটা দলও রয়েছে। এদের মধ্যে ধরা আছে কিছুটা ইতিহাস চিত্রের পরিচয়। ইংরেজিতে যাকে হিস্ট্রিওগ্রাফি বলা হয় আমি তাকেই বলছি ইতিহাসচিত্র। স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে ইতিহাস রচনা কিছু কম হয়নি। চমস্কির উদ্ধৃতিতে তার স্বীকৃতিও রয়েছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে এই-যে ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা এর মধ্য দিয়ে ইতিহাসচিত্রের এক বড়ো রকমের বৈচিত্র্যও ফুটে উঠেছে। গৃহযুদ্ধের স্বরূপ, তার চরিত্র ও বিশ্বতাৎপর্য ইত্যাদি নিয়ে ইতিহাসচিত্রের এই ধারার মধ্যে নানা অবস্থানের দেখা পাওয়া সম্ভব। ধরা যাক স্তালিনের তারবার্তা। মানবিকতার কথা এখানেও আছে, রোমাঁ্যা রোলাঁর উক্তিতেও আছে। নিশ্চয়ই এক অর্থে নেই। স্তালিনের বার্তায় ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের খপ্পর থেকে স্পেনকে বাঁচানোর কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। স্পেনের আভ্যন্তরীণ ফ্যাসিস্ট চক্রের কথাই এখানে সরাসরি ভাবা হচ্ছে নিশ্চয়। তবে মুসোলিনি-হিটলারের ছায়াপাতও যে এই বিপদ আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে সে-কথা প্রায় জোর দিয়ে বলা চলে। আছে বলেই স্পেনের ফ্যাসিজম আর শুধুমাত্র তার আভ্যন্তরীণ সমস্যা থাকে না, এক বিশ্বসমস্যার অঙ্গ হয়ে ওঠে। গৃহযুদ্ধের সংকট অনিবার্যভাবে মিলে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটের সঙ্গে। এ যেন ঐ বিশ্বযুদ্ধেরই এক মহড়া। **'World war in miniature'** বলে একে বর্ণনাও করেছেন হিউ টমাস।

ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ও বিকাশের লাগোয়া আর-একটা চিন্তাও অবশ্য এইসব

ইতিহাসচিত্রের মধ্যে ধরা পড়ে। ফ্যাসিবাদকে যদি রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর শক্ত মুঠিতে দখল বজায় রাখার একটা প্রকরণ বলে ভাবি তাহলে সমাজ অর্থনীতির কিছু-কিছু চরিত্রলক্ষণকে এর সহযোগী হিশেবে চিহ্নিত করা যায়। শুরুতেই মনে রাখা দরকার যে, ফ্যাসিবাদ, স্বৈরাচার, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি ধারণা কিন্তু সমার্থক নয়। এদের মধ্যে সম্পর্ক আছে নিশ্চয়ই, তবে স্বৈরাচারী বা একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থা মানেই ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র তা নয়। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী মুখপাত্র থাকতে পারে, এবং থাকেও, তবে সেটাই এর মৌলিক গোত্রপরিচয় নয়। সামাজিক অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক বিন্যাস হিসেবে ফ্যাসিবাদ নিশ্চিতভাবে বিশ শতকী ধারণা। তুলনায় শিল্পোন্নত দেশে এর উদ্ভবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর এক বিশেষ পরিণতি, যার প্রধান চরিত্র একচেটিয়া মূলধনের বিস্তার ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির প্রসার। এই স্তরে জাতীয় গরিমা, জাতিগত শুদ্ধতা ইত্যাদির ধুয়ো তুলে সমাজের সব রকমের শোষক শ্রেণীর সঙ্গে, এমনকী মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও এক বড়ো অংশের সঙ্গে সমঝোতার মধ্য দিয়ে প্রায় সর্বক্ষম এক রাষ্ট্রযন্ত্রের গোড়া পত্তন করা হয়। এক অন্তরঙ্গ সম্পর্কে গড়ে ওঠে পুঁজির মালিকানা, তার ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্রপ্রশাসনের মধ্যে। আর এই মনোলিথিক গড়নের চাপ এসে পড়ে শ্রমিক শ্রেণীর ন্যূনতম দাবিদাওয়ার ওপর, মধ্যবিত্তের যে-কোনোরকম উদারনৈতিক প্রচেষ্টার ওপর। রাষ্ট্রযন্ত্র যতটুকু প্রশ্রয় দিতে রাজি থাকে ব্যক্তির সামাজিক অধিকার এই স্তরে ততটুকুই মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ১৯৩৬-এর স্পেন কিন্তু এই বর্ণনায় ঠিক খাপ খায় না। তার অর্থনীতি তখন তুলনায় অনগ্রসর। কাজেই এ-সমাজে ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের সঙ্গে এক ধরনের অধঃপতিত অর্থনীতির বিকাশ দেখা দেবে এটা সম্ভব। শিল্প বা প্রযুক্তির স্বাভাবিক বিকাশ হতে পারল না, অথচ নানারকম আধুনিকতম মারণাস্ত্রের ব্যবহার হলো দেশের মাটিতে আকাশে বাতাসে। হিউ টমাসের বিবরণে আমরা পাই যে, ১৯৩৬-এর অক্টোবরে য়ুঙ্কারস ৫২ এবং হাইঙ্কেল ৫১ ছিল স্পেনের আকাশের অতি পরিচিত দৃশ্য। এ-ছাড়াও ছিল ফিয়াট ফাইটার সি. আর. ৩২, ফরাসি 'ফ্লাইং কফিন্‌স্' ডেওয়াটিন্ ও ব্লক ইত্যাদি। অল্প দিনের মধ্যেই দেখা দেবে মেসারশ্‌মিট্ ও দ্রুতগামী হাইঙ্কেল ১১১। মাটিতে চলবে টি ২৬ ও পানৎসার ট্যাঙ্ক। সদ্যপ্রস্তুত জার্মান মেশিন গান এম. জি. ৩৪ টাটকা ব্যবহৃত হয়েছিল স্পেনে। পরবর্তীকালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধখ্যাত 'এইটি এইটি'—জার্মান ৮৮ মিলিমিটার অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান তাও তা-ই। এ-সবের জন্যই হিউ টমাসের সিদ্ধান্ত যে, এই ধ্বংসাত্মক পথ বেয়ে স্পেন প্রবেশ করল বিশ

শতকে। একেই বলছিলাম অধঃপতন। ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের জন্য, প্রতিরোধের চেষ্টা সত্ত্বেও, স্পেন যেন এক ঝটকায় ছিটকে বেরিয়ে এল তার বিকাশের স্বাভাবিক বৃত্ত থেকে। একটা কথা অবশ্য স্মরণে রাখা দরকার যে, স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিশ্বতাৎপর্য আলোচনায় এই শেষের কথাটার ওপর খুব জোর দেওয়া অসংগত হবে। কারণ তখনকার মানুষের চেতনায়, যাঁরা স্পেন সমস্যার আন্তর্জাতিক চরিত্র নিয়ে ভাবিত ছিলেন তাঁদের কাছে, ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের কথাটাই নিশ্চয় বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। স্পেনের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে এই যে চ্যুতি এটা সম্ভবত তাঁদের চোখে তখন অত বড়ো হয়ে ধরা দেয়নি। ফ্যাসিবাদের দাপটের কাছে এ-সব সত্য ছোটো হয়ে পেছিয়ে যেতেই পারে। তবে আজকের দিনে আমরা যখন পেছন ফিরে তাকাব, পঞ্চাশ বছর বাদে, আমাদের চোখে ফ্যাসিবাদের লাগোয়া এই অর্থনৈতিক অধঃপতনের দৃষ্টান্ত যেন ছোটো হয়ে না-যায়।

ফ্যাসিবাদের কথাটাই যে সমকালীনদের কাছে প্রধান ছিল তার সাক্ষ্য বহন করছে দোলোরেস্ ইবারুরির উদ্ধৃতি। লা পাসিওনারিয়া নামে প্রসিদ্ধ এই মহিলা ছিলেন স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির এক অসাধারণ কর্মী ও নেত্রী। খনি শ্রমিক পরিবারের এই কমিউনিস্ট কর্মী, যিনি পরে পার্টির 'চেয়ারম্যান' পর্যন্ত হয়েছিলেন, গৃহযুদ্ধের একেবারে ভেতরের অভিজ্ঞতার অংশিদার। তাঁদের দৃষ্টিতে স্পেনের গৃহযুদ্ধ অবশ্যই ছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ সংগ্রাম। গণতান্ত্রিক দুনিয়ার একের পর এক অংশ যখন ফ্যাসিবাদের পদানত তখন স্পেনে তাকে প্রতিহত করতে পারা কাজটা তাঁদের অত্যন্ত জরুরি বলে মনে হয়েছিল। এই কথা যখন লিখছেন তখন ইতালি ও জার্মানির কথা নিশ্চয়ই দোলোরেসের মনে হানা দিচ্ছে। আর সেই সূত্রে মিলে যাচ্ছে বলেই স্পেনের গৃহযুদ্ধ বিশ্বতাৎপর্য পাচ্ছে, শুধুমাত্র স্পেনের সমস্যা হয়ে থাকছে না।

মনে রাখতে হবে যে, এটা কিন্তু স্পেন যুদ্ধের ইতিহাসচিত্রের অন্যতম অবস্থান, একমাত্র অবস্থান নয়। ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির লুইজি লঙ্গো (তিনিও পরে ইতালীয় পার্টির চেয়ারম্যান) বিদেশি হলেও গৃহযুদ্ধের অংশিদার। তাঁর জবানিতে কিন্তু আমরা ঐ ইতিহাসচিত্রের অন্য কোনো দিকের সন্ধান পাচ্ছি। গৃহযুদ্ধের সময়ে ইতালীয় ফ্যাসিবাদের প্রায় এক দশকের অভিজ্ঞতা তাঁর প্রত্যক্ষ। মুসোলিনির দাপট, কমিউনিস্ট পার্টির নির্যাতন, গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকারের ওপর আক্রমণ এ-সব তো এই এক দশকের পরিচিত তথ্য। গৃহযুদ্ধের শুরুতে গ্রামশ্চি তখনো মুসোলিনির জেলে, আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হবে।

ইতালির বন্দীমুক্তি আন্দোলন, 'গ্রামশ্চি প্রচার' ইত্যাদি ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধের নানা স্তরের তিনি প্রত্যক্ষ কর্মী। ১৯৩৪-এর ৭ মার্চের যে সভায় 'গ্রামশ্চি প্রচার' কর্মসূচি আরো তীব্রতর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তোলিয়াত্তি, বের্তি, মার-কুচ্চি, দে বিত্তোরিয়ো, দোজ্জা ও চিউফোলির সঙ্গে লঙ্গোও সে-সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন। 'ফ্যাসিবিরোধী গণবিপ্লব' ('popular antifascist revolution') কথাটা তাঁরই উদ্ভাবনা—১৯৩৫-এর পর থেকে ইতালীয় আন্দোলনে যে-বাক্যবন্ধ প্রেরণার মতো কাজ করেছিল। মাদ্রিদ যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি স্বেচ্ছাবাহিনীর সামনে ইতালির অবস্থা ও গ্রামশ্চির ভূমিকা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধ প্রায় সরাসরিভাবে ইতালির প্রতিরোধ সংগ্রামের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৩৫-৩৬-এর পর যে-সব ঘটনায় ইতালির আভ্যন্তরীণ আন্দোলন আরো তীব্র হয়ে ওঠে, এবং কিঞ্চিৎ র‍্যাডিকালও বটে, তার অন্যতম হলো ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ ও স্পেনের গৃহযুদ্ধ। এই পরিপ্রেক্ষিতের সম্পূর্ণ সজাগ শরিক হওয়া সত্ত্বেও লঙ্গোর দৃষ্টিতে কিন্তু ফুটে উঠছে ফ্যাসিবাদের প্রতিরোধ ছাড়াও অন্য কথা। একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, পরবর্তী ইতিহাস চিত্রের তিনটে জরুরি কথা অন্তত বেরিয়ে আসছে এর মধ্যে থেকে।

শুধু বহিঃপ্রভাব নয়, শুধু ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ নয়, স্পেনের গৃহযুদ্ধের আভ্যন্তরীণ তাৎপর্যও লক্ষ করবার মতো। লঙ্গো ঠিকই ধরেছিলেন যে, এই যুদ্ধের এক গভীর জাতীয়তাবাদী অর্থ ছিল। সেনানায়কদের বিদ্রোহ ও ফ্রাঙ্কোর অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে যে-সংকট ঘনিয়ে উঠল তা কোনো আঞ্চলিক ঘটনা নয়, সমস্ত দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সংকট এটা, সমস্ত স্পেনের মাথাব্যথার কারণ রয়েছে এতে। নেহাৎ শিল্পোন্নয়নের অর্থনৈতিক বিচারে তুলনায় অনগ্রসর হলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং শ্রমিক আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এক স্পেনীয়তার বোধ ধীরে-ধীরে গড়ে উঠছিল। ১৯২৩-এ যখন প্রিমো দ্য রিভেরার সামরিক একনায়কতন্ত্র কায়েম হলো তখন থেকেই এই পর্বের শুরু এ-রকম ভাবা যেতে পারে। নামে তখনও বুরবঁ রাজবংশের শাসন চলছে বটে তবে কোরতেস (স্পেনের পার্লামেন্ট) নিষ্ক্রিয় এবং প্রিমো শক্ত হাতে গ্রাস করবার চেষ্টা করছেন সমস্ত স্পেনের রাজনৈতিক জীবন। সোশ্যালিস্ট পার্টি (পার্তিদো সোথিয়ালিস্তা অব্‌রেরো এস্‌পানোল—স্প্যানিশ ওয়ার্কার্স সোশ্যলিস্ট পার্টি) নানা রকম রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার মোহে একটু-একটু করে প্রিমো স্বৈরাচারের সঙ্গে সহযোগিতার চক্রে ঢুকে পড়ছে। তাই নিয়ে বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে সোশ্যালিস্টদের বিরোধ যেমন একদিকে দানা বাঁধছে, তেমনি অন্যদিকে সোশ্যালিস্ট পার্টির

ভেতরেও গড়ে উঠছে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব। (১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭-এর ভারতীয় রাজনীতিতেও এর এক সমান্তরাল অবস্থা খুঁজে পেতে পারি আমরা।) সব মিলিয়ে রাজতন্ত্রের শেষ দিক থেকে স্পেনের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছিল তার রাজনীতি। এইভাবে আন্দোলন, প্রতিরোধ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিকতার বদলে ক্রমে গড়ে উঠছিল স্পেনীয় জাতীয়তা। ১৯৩১-এ রাজা ত্রয়োদশ আলফোন্সোর রাজ্যত্যাগের পর যখন দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো স্পেনে, তখন থেকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আরো ব্যাপক প্রসার দেখা গেল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজনীতির যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

ইতিহাসচিত্রের দিক থেকে যে-সব জরুরি ধারণার কথা বলছিলাম তার দ্বিতীয় সূত্রের সন্ধান আমরা এখান থেকেই পেতে পারি। প্রতিরোধ সংগ্রামের আভ্যন্তরীণ জমি একটা তৈরি হচ্ছিল। আর সেজন্যেই এটা সম্ভব হতে পেরেছিল যে, বিদ্রোহী সেনানায়কদের অভ্যুত্থানকে বাধা দিতে এগিয়ে এসেছিল জনসাধারণ নিজের থেকেই। লুইজি লঙ্গোর ভাষায়: **"It was the people who initially offered resistance to the rebel generals."** এই প্রাথমিক বাধা কতদূর কার্যকরী হয়েছিল বা হতে পারত, কতদূর পর্যন্ত এই গণপ্রতিরোধ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল তা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। বস্তুত অ্যানার্কিস্ট এবং কমিউনিস্টদের মতবিরোধের একটা বড়ো কারণ হলো এই সমস্যা। অসংগঠিত গণপ্রতিরোধকে সাংগঠনিক রূপ দিতে পারার কতটা প্রয়োজন ছিল? এই সাংগঠনিক রূপায়ণে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ঠিক কী ছিল? কমিউনিস্ট পার্টির 'মনোলিথিক' কাঠামোর চাপ ঐ স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের ভবিষ্যতের পক্ষে কি আদৌ মঙ্গলজনক হয়েছিল? এ-সব প্রশ্ন নিয়ে এখনো পর্যন্ত তর্কবিতর্ক চলছে। কোনো মীমাংসা সহজে হবার নয়। নোম চমস্কির 'অবজেকটিভিটি অ্যাণ্ড লিবারল স্কলারশিপ' ('আমেরিকান পাওয়ার অ্যাণ্ড দ্য নিউ ম্যাণ্ডারিন্‌স্' ১৯৬৯-এর অন্তর্ভুক্ত) প্রবন্ধের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে এই তর্ক। ইতিহাসচিত্রের এইসব পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে স্পেনের গৃহযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা, সোবিয়েৎ ইউনিয়নের ভূমিকা এর কোনোকিছুই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। (এখানেও এক পরবর্তী সমান্তরালের— কথা আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে। ১৯৬৮-র ফরাসি বিপ্লব এবং তার ছাত্র-শ্রমিক নেতৃত্ব ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা বিষয়ে সার্ত-এর সমালোচনা ঠিক যেন এক অনুরূপ ঐতিহাসিক পরিস্থিতি।) বস্তুত স্পেনের গৃহযুদ্ধে অ্যানার্কিস্ট, কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট এই তিন রাজনৈতিক দল ও তাদের সহযোগী শ্রমিক

সংঘের ভূমিকা নিয়ে খুব বড়ো রকমের বিতর্ক রয়েছে। ভবিষ্যতের ইতিহাস চর্চাতেও এর কোনো মীমাংসা হবে কিনা জানি না।

রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক সঙ্ঘের ভূমিকার কথা বাদ দিয়েও আলোচ্য ইতিহাস-চিত্রের অন্য আর-একটা দিক আছে যা লক্ষ করতে হবে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের বীজ আভ্যন্তরীণ সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির কাঠামোর মধ্যে কি কোথাও নিহিত ছিল না? সমাজের শোষণ-পীড়ন অবিচার-অত্যাচারের কাহিনীর মধ্যে কি এর কারণ খোঁজার কোনো দরকার নেই? আধুনিক ইতিহাসচিত্রের কোনো-কোনো অবস্থানে এইসব কাঠামোগত কারণের দিকে জোরটা বেশি দেওয়া হয়। এই চিন্তা অনুসারে সমরনায়কদের বিদ্রোহ হয়তো প্রত্যক্ষ কারণ হিশেবে কাজ করে থাকতে পারে, তবে এটা মনে করা একেবারে ভুল যে, ঐ বিদ্রোহ ছাড়া স্পেনের বাকি জীবনে যা যেমন চলছিল তা সবই ঠিকঠাক ছিল। বস্তুত ঐ বিদ্রোহ হয়তো গভীরতর কোনো অসংগতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সমাজ-অর্থনীতির কাঠামোগত ভারসাম্য যে অটুট ছিল না সামরিক অভ্যুত্থান হয়তো তারই এক বেয়াড়া বিস্ফোরণ। লুইজি লঙ্গো যে 'Black two years'-এর প্রসঙ্গটাকে ছুঁয়ে যান সে বোধহয় এরই স্বীকৃতি। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৩-এর ১৯ নভেম্বর আর তৃতীয় নির্বাচন ১৯৩৬-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয় নির্বাচনে কোরতেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতায় আসে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল জোট। ১৯৩৬-এর নির্বাচনে পুনরায় ক্ষমতাসীন হয় বামপন্থী মোর্চা, যার পর থেকে স্পেনের রাজনীতি প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের মধ্য দিয়ে ১৮ জুলাইয়ের গৃহযুদ্ধের পরিণতির দিকে এগোতে থাকে। মধ্যবর্তী এই বছর দুয়েক সময়—১৯৩৩-এর নভেম্বর থেকে ১৯৩৫-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর নাগাদ সময়টাকে 'কালা দু-বছর' বলে চিহ্নিত করা হয়। এই সময়ে স্পেনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৩১-এর প্রথম নির্বাচনে প্রজাতন্ত্রী শক্তির জয়ের পর যে-সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের সাংবিধানিক চেষ্টা হতে থাকে সেটুকুতেই দক্ষিণপন্থী শক্তির টনক নড়ে। মনে হতে থাকে সমাজের অর্থনীতির ক্ষমতার কাঠামোয় বুঝি-বা মৌলিক আঘাত উদ্যত। এই দু-বছরে প্রতিক্রিয়া ফ্যাসিবাদী শক্তি ও সামরিক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে তার নিজের জমি জোরালো করবার চেষ্টা চালাতে থাকে। কাজেই ফ্যাসিবাদের উত্থানের পেছনে আসলে কাজ করে যাচ্ছে সমাজের আভ্যন্তরীণ নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও টানাপোড়েন। 'আভ্যন্তরীণ' ইতিহাসচিত্র এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কার্যকারণের দিকে নজর দিতে চায়।

ইতিহাসচিত্র নিয়ে কেন এত কথা বলা হচ্ছে তার বোধহয় একটা কৈফিয়ৎ থাকা দরকার। একটা স্তরে ইতিহাসচিত্র নিশ্চয়ই অ্যাকাডেমিক কৌতূহলের বস্তু। আমরা ইতিহাস জানতে গিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা করতে-করতে তথাকথিত ঐতিহাসিক সত্যে পৌঁছবার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, আর-একটা স্তরে ইতিহাসচিত্র রীতিমতো একটা অস্ত্র। সমাজে অর্থনীতিতে রাজনীতিতে সংস্কৃতিতে ক্ষমতার যে-লড়াই নিয়ত চলছে ইতিহাসচিত্র সে-লড়াইয়ে এক প্রধান অস্ত্র। 'নিরপেক্ষতা', 'ঐতিহাসিক সত্য', 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস' ইত্যাদির আড়ালে অনেক সময়ে এই অস্ত্র-চরিত্রটা লুকোনো থাকে বটে, তবে একটু খেয়াল করলে টের পাওয়া যায় কীভাবে অস্ত্র হিশেবেই এর ব্যবহার হয়ে থাকে। আর ভাবাদর্শগত লড়াইয়ে ইতিহাসচিত্র অস্ত্র হিশেবে যে কতটা শক্তিশালী তার অনেক নমুনা পেশ করা যায়। খুব পরিচিত দুটো-একটার উল্লেখ মাত্র করছি। গোটা আফ্রিকা মহাদেশের জন্য ঔপনিবেশিক ইতিহাস-চিত্রের কথা ভাবা যাক। 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ'-এর ভূত এখনো কি সবার ঘাড় থেকে নেমেছে? আমাদের মতো তৃতীয় দুনিয়ার দেশেও মানুষের মনে এই বিষক্রিয়া কি এখনো কাজ করছে না? আর শুধু আফ্রিকাই বা কেন? ঔপনিবে-শিকতার শিকার হয়েছে তিন মহাদেশের যে-সব সমাজ তাদের সবারই জন্য এই ধরনের কোনো-না-কোনো ইতিহাসচিত্র তৈরি করা হয়েছে, সযত্নে লালিত এইসব ঔপনিবেশিক মডেল চারিয়ে দেওয়া হয়েছে দিনের পর দিন। আমাদের নিজেদের ইতিহাসেও এর ভূরি-ভূরি নিদর্শন রয়েছে। শিল্পসভ্যতার বিকাশ, নৌশক্তি আর সামরিক শক্তির মাধ্যমেই তো শুধু উপনিবেশের বিস্তার ঘটেনি, ইতিহাসচিত্রের এইসব মডেল ঐ বিশ্ববিজয়ে সরাসরি অস্ত্রের কাজ করেছে। আমাদের অতি সাম্প্রতিক ইতিহাসের 'টাইম ক্যাপস্থল'-এর কলঙ্ককাহিনীও এই অস্ত্র-ব্যবহারের এক তির্যক নমুনা।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের ইতিহাসচিত্র খুঁটিয়ে আলোচনা করলেও এ-রকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। আর্থার এইচ. ল্যাণ্ডিসের উদ্ধৃতিতে তাঁরই ইঙ্গিত রয়েছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক পল প্রেস্টন ১৯৮৪-র এক প্রবন্ধে গৃহযুদ্ধের ইতিহাসচিত্র থেকে এ-রকম বেশ-কিছু উদাহরণ আলোচনা করেছেন। ফ্রাঙ্কোর ছত্রিশ বছরের একনায়কতন্ত্রী শাসনকালে স্পেনের বিভিন্ন মহাফেজখানার দলিল দস্তাবেজ শুধু যে গবেষকদের আয়ত্তের বাইরে ছিল তাই নয়, আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, প্রয়োজনমতো অনেক তথ্যের উৎস নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। গৃহযুদ্ধের মধ্যেই কিছু-কিছু দলিল নষ্ট হয়ে থাকবে এটা

তো খুব স্বাভাবিক। তারপর ১৯৭৫-এ ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর পর আবার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হবার পর্যায়ে ধীরে-ধীরে এই ইতিহাস চর্চার কাজে অগ্রগতি দেখা গেছে। ফ্রাঙ্কো একনায়কতন্ত্রের সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে, গৃহযুদ্ধ মূলত এক ধর্মযুদ্ধ। প্রজাতন্ত্রীদের হাতে, খ্রীস্টধর্ম, খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধ ইত্যাদি বিপন্ন। খ্রীস্ট-ধর্মের স্বপক্ষে তাই ফ্রাঙ্কো বাহিনীর লড়াই, প্রজাতন্ত্রী হিদেনদের হাত থেকে ধর্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। এই 'ধর্মযুদ্ধ' মডেলটা অনেকদিন পর্যন্ত চলছিল। ফ্রাঙ্কো-চক্র এবং তার সমর্থনকারী বড়ো খামারের মালিক কিংবা শিল্পপতির তরফে এই মডেলটা জীইয়ে রাখবার আগ্রহ বেশ বুঝতে পারা যায়। তাহলে সমাজের অন্য অনেক শোষণ-পীড়নের দিক থেকে নজর ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হয়। যে-খামার মালিক ও শিল্পপতিদের স্বার্থে এই যুদ্ধটা লড়া হয়েছিল তাঁরা কি খুব চাইবেন যে সমাজে সম্পদের পুনর্বণ্টনের প্রশ্নটা নিয়ে খুব নাড়াচাড়া করা হোক? খনিশ্রমিক ও অন্যান্য শিল্পশ্রমিকের যৎকিঞ্চিৎ মজুরির প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত হোক এটাও তো তাঁদের স্বার্থের প্রতিকূল। আর ১৯৩১-এর বামপন্থী প্রজাতন্ত্রী সরকার যে-ধরনের সংস্কারনীতির লক্ষণ দেখাচ্ছিল সেটাই কি এই শ্রেণীর স্বার্থের খুব অনুকূল ছিল? কাজেই প্রজাতন্ত্রের ওপর, বামপন্থার ওপর আক্রমণ যে সংগঠিত হবে সেটা বিচিত্র কিছু নয়। আর সে-আক্রমণের একটা অস্ত্র নিশ্চয়ই ঐ 'ধর্মযুদ্ধ'-পন্থী ইতিহাসচিত্র।

ইতিহাসচিত্রের ব্যবহারে নানা ধরনের আঁকাবাঁকা মোড়ের সন্ধান পাওয়া যায়। যে-'ধর্মযুদ্ধ' ইতিহাসচিত্রের কথা বলা হলো, স্বাভাবিক যে, সেই পর্যায়ে ফ্রাঙ্কো-পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের সৌহার্দ্য খুব বৃদ্ধি পাবে। হয়েও ছিল তাই। কিন্তু ষাটের দশকে, ফ্রাঙ্কোর জীবদ্দশাতেই, এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ইতিমধ্যে স্পেনের সমাজ সাধারণভাবে আধুনিকতার পথে খানিকটা অগ্রসর হয়েছে, সেইসঙ্গে শিক্ষার বিস্তার ও রুক্ষ মেজাজের ছাত্র-আন্দোলন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে গৃহযুদ্ধের দিকে আবার নতুন দৃষ্টিতে ফিরে তাকাবার এক আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। ফ্রাঙ্কোপন্থী প্রতিক্রিয়ার কলঙ্কিত চেহারা তখন অনেকটা স্বতঃসিদ্ধের পর্যায়ে। এ-অবস্থায় ধর্মযাজকরা ফ্রাঙ্কোর রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে দূরে সরে যাওয়াই সমীচীন বোধ করলেন। এই সরে যাওয়ার পথে সরকারি ইতিহাসচিত্র সম্বন্ধে তাঁদের সন্দেহ সমালোচনা অনেকটাই সাহায্য করেছিল। পঞ্চাশের দশকে ফ্রাঙ্কো-চক্রের তরফেও এ-রকম নজির আছে। সকলেই জানেন গৃহযুদ্ধে প্রজাতন্ত্রী ও বামপন্থী শক্তিকে কাবু করে ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পথে ইতালি-জার্মানির ফ্যাসিবাদী শক্তি ফ্রাঙ্কোর

পক্ষে কতদূর সহায় হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রাঙ্কো নানা টালবাহানা করে যুদ্ধের আঁচ নিজের গায়ে বেশি লাগতে দেননি। যুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয়ের পর ঘৃণিত ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সম্পর্ক মুছে ফেলতে চাওয়া স্বাভাবিক। এক বিশেষ ধরনের ইতিহাসচিত্র রচনা করে এই মুছে ফেলার কাজটা সম্পন্ন করার চেষ্টা হয়েছিল পঞ্চাশের দশকে। ঐ দশক ছিল ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দশক। কমিউনিস্ট বিরোধিতা তখন পশ্চিমের বাজারে খুব জনপ্রিয়। গৃহযুদ্ধের কমিউনিস্ট বিরোধিতাকে বড়ো করে তুলে ধরে যে-ইতিহাসচিত্র রচনা করা হচ্ছিল ঐ সময়ে, তা পশ্চিমী দোসর সংগ্রহে ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করবে, এ-রকম মনে করা হয়েছিল অন্তত। ঐ পর্বে এ-কথাটা বেমালুম চেপে যাবার চেষ্টা হলো যে, গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের লক্ষ্য ছিল শুধু কমিউনিজম নয়, গণতন্ত্রও। যদিও সে-সব জেনে-বুঝেও পশ্চিমী গণতন্ত্রের পক্ষে 'হস্তক্ষেপ বর্জন' নীতি বেশ গ্রাহ্য মনে হয়েছিল তখন।

৩

দ্বিতীয় অংশের আলোচনা থেকে একটা কথা তাহলে পরিষ্কার : ইতিহাসচিত্রের দিক থেকে স্পেনের গৃহযুদ্ধ কোনো সরল ব্যাপার ছিল না। বিভিন্ন সময়ে নানা বিচিত্র অবস্থান দেখা গেছে এই ইতিহাসচিত্রে। ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ, আভ্যন্তরীণ শোষণ-পীড়নের প্রতিবাদ, কখনো স্বতঃস্ফূর্ত, কখনো সংগঠিত, কমিউনিজম এবং প্রজাতন্ত্র বিরোধিতা, জাতীয়তাবাদী শক্তির বিকাশ, ইত্যাদি সবই এই যুদ্ধের পর্বে-পর্বে মিশে ছিল। এবং ইতিহাসচর্চার দিক থেকে এ-রকম অনেক প্রশ্ন আজও প্রাসঙ্গিক : স্পেনের গৃহযুদ্ধের মূল কারণ কী? ঐ যুদ্ধ কি সব অর্থে ব্যর্থ? ব্যর্থতার দায়িত্ব মূলত কাদের? স্পেনের ফ্যাসিবাদ কতদূর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের অঙ্গ? ইঙ্গ-ফরাসি ভূমিকা কি মূলত বিশ্বাসঘাতকতার? আন্তর্জাতিক বাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণ কি উচিত হয়েছিল? অন্য কারুর লড়াই কি ঐভাবে লড়া যায়? আজ পঞ্চাশ বছর বাদে স্পেনের গৃহযুদ্ধের দিকে ফিরে তাকাতে গেলে এইসব প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই হবে। এবং এ-সব প্রশ্নের উত্তর খুব নিবিষ্ট গবেষণাকর্মের ব্যাপার। সে-ধরনের গবেষণার কাজ কিছু-কিছু হয়েছে এবং আরো হবে নিশ্চয়ই। এই ছোটো প্রবন্ধের গণ্ডির মধ্যে তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, আপাতত আমাদের লক্ষ্যও ভিন্ন। এই প্রবন্ধে আমাদের উদ্দেশ্য শিক্ষাগ্রহণ। স্পেনের গৃহযুদ্ধের মধ্যে এমন কোনো-কোনো ঘটনা, মতবিরোধ ও বিতর্ক ছিল যা খানিকটা তাৎক্ষণিক, কিন্তু আরো-কিছু ছিল যা আজও আমাদের

কাছে মূল্যবান। আমরা সে-রকম দু-একটা দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চাইব। সেখানেই আমাদের কাছে ইতিহাসের শিক্ষা। এই 'আমাদের' বলতে কাদের বোঝাতে চাইছি? অর্থাৎ, কাদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে এই প্রবন্ধে? বিভিন্ন স্তরে এই শিক্ষাগ্রহণে প্রাসঙ্গিক হবে সাধারণভাবে তৃতীয় দুনিয়ার প্রতিরোধ সংগ্রাম, ভারতের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, খুব নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে এমনকী পশ্চিমবঙ্গেরও কোনো-কোনো প্রশ্ন। এই তবে বর্তমান প্রবন্ধের দৃষ্টিকোণ আর এখানে দাঁড়িয়ে আমরা হয়তো কখনো শরিক হয়ে উঠতে পারি সত্তর দশকের চিলির কিংবা মধ্য-ষাটের ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতার।

এখানে দুটো পদ্ধতিগত প্রশ্ন সম্বন্ধে পরিষ্কার করে কথা বলে নেওয়া দরকার। ইতিহাসচর্চায় একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে যেখানে ইতিহাসের শিক্ষা বলে কোনো কথা হয় না। কারণ, এই চিন্তা অনুসারে ইতিহাসের প্রত্যেকটি ঘটনা অনন্য, নির্দিষ্ট পরম্পরা ও কার্যকারণের যোগে বিশিষ্ট। কোনো ঘটনাই অন্য-কোনো ঘটনার অনুরূপ কখনো হবে না, তাই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে কোনো লাভ নেই; সে-শিক্ষা কখনোই প্রয়োগ করা যাবে না। এর বিপরীত মেরুর আর-একটা দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব, যেখানে ইতিহাসের সবটুকু অমোঘ নিয়মশাসিত বলে কল্পনা করা হয়। এইসব প্রতিযোগী দৃষ্টিভঙ্গির পুরো ফয়সালা করা এখানে আমাদের লক্ষ্য তো নয়ই, আর সে-কাজ অত সোজাও নয়। কারণ, এ-প্রশ্নের সঙ্গে স্বাধীনতা, আবশ্যিকতা, নির্ধারণবাদ ইত্যাদির মতো জটিল দার্শনিক প্রসঙ্গ জড়িয়ে রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধের অবস্থান হিশেবে শুধু এটুকু বলাই আপাতত যথেষ্ট হবে যে, ঐ দুই মেরুর কোনো প্রান্তে নিশ্চিতভাবে সরে যাবার কোনো দরকার নেই। ইতিহাসে কোনো ঘটনা যথাযথভাবে প্রত্যাবৃত্ত হয় না এ-কথা হয়তো ঠিক, কিন্তু তাই বলে সমান্তরাল কোথাও কিছু নেই তা মনে করারই বা দরকার কী? আর ইতিহাসের শিক্ষা কি শুধুই যান্ত্রিক প্রয়োগমুখী? কোনো নির্দিষ্ট অতীতে কার্যকারণ ও ঘটনাপরম্পরা কী রকম মোড় নিয়েছিল তার একটা মোটামুটি আন্দাজ পেলেও আজকের বর্তমানের জন্য নিজেদের নিশানা ঠিক করতে তাতে সাহায্য হয়। অন্তত কোন্ দিক থেকে বিপদ আসতে পারে সে-সম্বন্ধে সাবধান হওয়া তো চলে। স্পেনের গৃহযুদ্ধ থেকে আমাদের শিক্ষা বলে যা বলতে চাইছি সেটাও এই ধরনের। সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ যেটা তুলতে চাইছি সেটা হলো ইতিহাসচর্চায় ভাষাগত স্তর বিষয়ে। একটু ভাবলে দেখা যাবে যে, যে-কোনো একটা নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে আমরা একটা নির্দিষ্ট ভাষাগত স্তরে কথা বলছি। একই প্রসঙ্গে অন্য সময়ে

অন্য প্রয়োজনে আমরা হয়তো অন্য ভাষাগত স্তরে স'রে যেতে পারি। এই ভাষাগত স্তরের ব্যাপারটা নিয়ে একটু মনস্থির করা দরকার। নইলে অনেক অকারণ ভুল বোঝাবুঝি জ'মে ওঠে। প্রায় পাঠ্যবই গোছের একটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। একজন লোকের জণ্ডিস হয়েছে, ধরা যাক। তার এই অসুখের কারণ কী? সম্ভাব্য উত্তর হ'তে পারে: এলোমেলো বাইরের জল খাওয়া, বি ২ ভাইরাসের আক্রমণ, রক্তে শ্বেত কণিকার ঘাটতি, যকৃতের জন্মগত দুর্বলতা ইত্যাদি। কারণ হিশেবে এর সবগুলোই হয়তো ঠিক। কিন্তু লক্ষ করতে হবে যে, প্রত্যেকটা উত্তর এক-একটা নির্দিষ্ট ভাষাস্তরে। কোন ভাষাস্তরে কখন উত্তর চাইবো সেটা স্পষ্টত প্রয়োজন ও পরিপ্রেক্ষিতের ওপর নির্ভর করছে। ডাক্তারের চিকিৎসার প্রয়োজনে হয়তো দ্বিতীয় কিংবা/এবং তৃতীয়, চতুর্থ উত্তর প্রাসঙ্গিক, রোগীর পরিবারের অন্যদের জন্য সতর্ক হবার বেলায় হয়তো প্রথম উত্তর প্রাসঙ্গিক। শুধু ব্যাখ্যার বেলায় নয়, বর্ণনার বেলাতেও এই ধরনের ভাষাস্তরের ভিন্নতার কথা মাথায় রাখা দরকার। কোনো-একটা দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যখন বর্ণনা দিচ্ছেন তখন আদালত, তদন্ত কমিশন ইত্যাদির প্রয়োজনে তিনি একটা ধরনের বিস্তারে একটা নির্দিষ্ট ভাষাস্তরে কথা বলছেন, আবার ধরা যাক, টেলিগ্রাফে খবরটা পরিবারের লোকজনদের জানাবার জন্য আর-একটা স্তরে তিনি কথা বলবেন। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় এ-কাজ আমরা হামেশাই করছি। ইতিহাসচর্চাতেও কিন্তু এ-কথাটা জরুরি। স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে, আজ পঞ্চাশ বছর বাদে ভাবতে ব'সে, কোনদিকে কতোটা নজর দিয়ে তাকাবো আমরা? প্রজাতন্ত্রী দলগুলোর অন্তর্বিরোধের দিকে? হ'তেই পারে। এটা অত্যন্ত জরুরি প্রসঙ্গ। ঐসব দলের সভাসমিতির মিনিট খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বিচার করা যেতে পারে কার দোষ কতোটা, ব্যর্থতার জন্য কে কতোটা দায়ী। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত নির্বিশেষে এটাই কি আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হ'তে পারে, না হওয়া উচিত? দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কীভাবে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়েছিল আর কীভাবেই বা তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গ'ড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল এটাই যদি আমাদের চিন্তার বিষয় হয়, তাহ'লে তখনো কি আমরা ঐ অন্তর্বিরোধের কথাই ভাববো? সেটা ঐ পরিপ্রেক্ষিতে কতোটা প্রাসঙ্গিক? আবার ষাটের বা সত্তরের দশকের পশ্চিমবঙ্গ বা চিলির বামগণতন্ত্রী সংস্কারপ্রচেষ্টা ও তার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের প্রসঙ্গ যদি আমাদের আলোচনার লক্ষ্য হয়, তাহ'লে ঐ অন্তর্বিরোধ বা ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ এই কোনোটাই আর হয়তো এতো প্রাসঙ্গিক থাকে না। তাই বলছিলাম, যে-কোনো ইতিহাস-ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণে এই

পরিপ্রেক্ষিতের প্রশ্নটা আগে পরিষ্কার ক'রে নেওয়া দরকার। আলোচনার ভাষান্তরও সেই অনুসারে নির্বাচন করতে হবে। প্রবন্ধের শিরোনামে 'বিশ শতক' ও 'আমরা' ব্যবহার ক'রে এই শেষের দুটো দিকে নজর দিতে চাইছিলাম। বিশ শতকী পরিপ্রেক্ষিত থেকে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব নিশ্চয়ই এক মৌলিক ঘটনা। আজকের তৃতীয় দুনিয়ার কথা ভাবলে এই বিপদের কথা সবসময়ে আমাদের মনে রাখতে হয়। তাই স্পেনের গৃহযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সেই ইতিহাস একবার স্মরণ করতে চাই। আর সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে সমাজতন্ত্রের দিকে এগোবার চেষ্টা তো আজকের পৃথিবীতে অনেকেই হয়তো ভাবেন। সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে কোনো চূড়ান্ত রায়ের প্রশ্নই ওঠে না। সেদিক থেকেও স্পেনের দক্ষিণী প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসে আমাদের জন্য কিছু শিক্ষণীয় থাকতে পারে।

স্পেনে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লো ১৯৩১-এ। ১২ এপ্রিলের মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে রাজতন্ত্রের সমূহ পরাজয়ের পর রাজা সপরিবারে দেশত্যাগ করলেন ১৪ এপ্রিলে। এই সময় থেকেই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের শুরু। এর আগের অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধ'রে ক্ষমতার লাগাম ধরা ছিল অভিজাত শ্রেণী ও আর্থিক মূলধনের মালিকদের হাতে। ১৮৭৪-এ রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর থেকে স্পেনের জাতীয় জীবনে এঁরাই ছিলেন ক্ষমতার শীর্ষে। ১২ এপ্রিলের নির্বাচনে এঁদের ক্ষমতার সেই সুঠাম বুনোটে প্রথম জোরালো ধাক্কা লাগল। প্রজাতন্ত্রের মধ্য দিয়ে যে-নতুন জনজাগরণের লক্ষণ দেখা গেল তার নির্বাচন প্রতিফলনও অচিরে পাওয়া গেল ১৯৩১-এর জুনে। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লো ২৮ জুনে। ঐ নির্বাচনের দলগত ফলাফল নিচে দেওয়া হ'লো।

দল	আসনসংখ্যা
বামপন্থী :	
সোশ্যালিস্ট (পি. এস. ও. ই.)	১১৬
র‍্যাডিকাল সোশ্যালিস্ট	৬০
কাতালানের আঞ্চলিক বামপন্থী দল (এস্কুয়েরা)	৩২
রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী আথানার দল (আক্থিওন্ রেপুব্লিকানা)	২৭
গালিসিয়ার জাতীয়তাবাদী দল (ও. আর. জি. এ.)	১৬
বিপ্লবী বামপন্থী দল (ইথ্কুয়েরদিস্তাস্)	১৪
	২৬৫

মধ্যপন্থী :

র‍্যাডিকাল (১৯৩৪-এর প্রধানমন্ত্রী আলেহান্দ্রো গার্থিয়া লেরুর দল)	৯০
প্রগতিশীল	২৭
বাস্ক জাতীয়তাবাদী দল (পি. এন. ভি.)	১৪
লিবারল-বুর্জোয়া	১৪
কাতালানের ব্যবসায়ী সংঘ (লিগা)	৩
	১৪৮

দক্ষিণপন্থী :

বড়ো খামারমালিক	২৬
বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী	২৫
নির্দল	৪
লিবারল-ডেমোক্রাট	৪
রাজতন্ত্রী	১
	৬০

দক্ষিণপন্থীদের এই কোণ-ঠাসা অবস্থা নিশ্চয়ই হঠাৎই একদিনে হয়নি। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লো ব'লে রাতারাতি নির্বাচনী চেহারা বদলে গেল তা-ও বোধহয় ঠিক নয়। এবং দক্ষিণপন্থীরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে গেল এটা মনে করা একেবারে ভুল। দু-বছর পরেই দ্বিতীয় নির্বাচনে ফলাফল আবার উলটে যাবে। দক্ষিণ-পন্থীরা আপাতত পেছিয়ে গেল এই পর্যন্তই। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বামপন্থী, মধ্যপন্থী ও উদারনৈতিক শক্তির নির্বাচনী জয়ের পেছনে অনেকদিনের সংগ্রাম, প্রতিরোধ ও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ঐতিহ্য রয়েছে। সমাজ ও অর্থনীতির ভেতর থেকেই উঠে আসছে এই রাজনৈতিক চেহারা। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকেঁ যা ঘটল স্পেনে তার ইতিহাস কিন্তু তৈরি হচ্ছিল আগের অন্তত শ'-খানেক বছর ধ'রে। প্রথম কার্লিস্ট যুদ্ধের সময়কাল ১৮৩৪-৩৯। তার পেছনে ছিল ১৮৩৩-এ সপ্তম ফের্নান্দোর মৃত্যুর পর সিংহাসনদখলের লড়াই। তবে এটাই কিন্তু সব কথা নয়। ঐ সময়টাতে ধীরে-ধীরে ধনতান্ত্রিক বিকাশের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে। ফলে সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে নানা ওলটপালট ঘ'টে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে সমাজের শ্রেণীবিন্যাস। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই সময়ে শিল্প-বিপ্লব এগোচ্ছে। অনিবার্যভাবে খনিজ দ্রব্যের চাহিদা বাড়ছে ইউরোপের

বাজারে। স্পেনের উত্তর সীমান্তে বাস্ক প্রদেশের খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য ও উচ্চমানের খ্যাতি সুবিদিত। ক্রমে আন্তর্জাতিক নজর পড়ল এদিকে। স্বাভাবিক। সবচেয়ে ভালো বৈদেশিক আকরের ধাতব পদার্থের অনুপাত ছিল বড়োজোর ৪৮ শতাংশ, আর বাস্ক প্রদেশের লোহার আকরে এই অনুপাত ছিল ৫৬ শতাংশ। প্রকৃতির এই আশীর্বাদ ধনতন্ত্রকে টেনে আনবেই। চিরাচরিত পদ্ধতিতে উত্তর স্পেনের বিপুল ধাতব ও খনিজ সম্পদের সামান্যই মাত্র ব্যবহৃত হ'তো। শিল্পের চাহিদা মেটাতে শাসক শ্রেণীর যোগসাজসে বিদেশী মালিকদের হাতে প'ড়ে এখন খননকার্য দ্রুততর হ'লো। সামান্য ছিটেফোঁটার বিনিময়ে স্পেনের তামা, সীসা, দস্তা, টিন, রুপো. পারদ ইত্যাদি সম্পদ বিদেশী শিল্পের করতলগত হ'য়ে গেল। স্পেনের নিজস্ব শিল্পের অগ্রগতি ও বিকাশের ধারায় এখান থেকে গোলমালটা শুরু হ'লো। আমাদের, ও তৃতীয় দুনিয়ার সব দেশেই, ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতায় এই প্রথম পর্বটা খুব চেনা। দেশীয় সম্পদের ওপর কোনো-এক রকমের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সাম্রাজ্যবাদের প্রথম পদক্ষেপ। স্পেন সরাসরি ঐভাবে উপনিবেশ হয়নি বটে, তবে ইউরোপের গরিব দেশ হিশেবে তার যে-পরিচয় তার সূত্রপাত এখানে।

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের ব্লাস্ট ফার্নেসে এইভাবে বাস্ক প্রদেশের আকর জোগান দেওয়া হ'লো। ধনতন্ত্রের টানে এইসব খনিজ দ্রুত নিঃশেষিত হ'তে থাকল। তবে ১৯৬৮-র আগে পর্যন্ত কিছু-কিছু বাধানিষেধের জন্য এই প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন একেবারে বেশামাল হ'য়ে উঠতে পারেনি। রানী দ্বিতীয় ইসাবেলার উত্তরাধিকারী প্রথম আমেদেও যখন সিংহাসন ত্যাগ করলেন, তখন, ১৮৬৮-তে স্পেনে প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লো। এই আমলে ধনতান্ত্রিক বিকাশের ও বহিরাগতের অনুপ্রবেশের সমস্ত চরিত্রলক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল বাস্ক অঞ্চলের মতো। পুরোনো ধাঁচের প্রথাশাসিত সমাজজীবনে।

এই প্রক্রিয়ার অপর পিঠ শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব। শ্রমিকচেতনার বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণাও ক্রমে প্রসার লাভ করছিল। ১৮৬৮-র বিপ্লবের পরেই স্পেনে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেন্‌স্ অ্যাসোসিয়েশনের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মার্কস-এঙ্গেলসের প্রথম আন্তর্জাতিকের অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠন বাস্ক অঞ্চলে এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। 'শ্রমিকের কণ্ঠস্বর' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয় এই সময়ে। বাকুনিন পন্থী অ্যানার্কিস্টদের সঙ্গেও অন্য বামপন্থীদের বিরোধ দানা বাঁধতে শুরু করে। যদিও বাস্ক অঞ্চলে বাকুনিন-পন্থীদের প্রভাব খুব বেশি ছিল না। ১৮৭৯-তে স্পেনের ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং-

মেনস্‌ অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে ফাটল দেখা দেয়। সংগঠন ভাগ হ'য়ে যায়। অ্যানার্কিস্টদের থেকে আলাদা হ'য়ে গিয়ে সোশ্যালিস্ট পার্টি নতুন দল হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৯-তে। আরো বছর দশেক বাদে তৈরি হয় (সোশ্যালিস্টদের শ্রমিক সংগঠন য়ুনিয়ন হেনেরাল দ্য ত্রাবাহাদোরেস (ইউ. জি. টি.)। শ্রমিক চেতনার বিকাশ ও শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠন উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বেশ পরিষ্কার। ১৮৯০-তে ভিস্‌থাইয়ার খনি অঞ্চলে খনিশ্রমিকদের এক বড়ো রকমের ধর্মঘট সংগঠিত হয়: শক্তিশালী ইংরেজ কোম্পানি ওরসোনেরার খনি থেকে পাঁচজন অতি-সংগ্রামী শ্রমিককে ছাঁটাই করার প্রাতিবাদে এই ধর্মঘট। নির্মাণশিল্প, রেলপথ ইত্যাদি অন্যান্য দিকেও সত্বর ছড়িয়ে প'ড়ে ধর্মঘট খুব ব্যাপক আকার নেয়। ফলে বেশ কিছুদিন সংগ্রামের পর সরকারি মধ্যস্থতায় খনিমালিকেরা নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। স্পেনের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই ধর্মঘটের গুরুত্ব অসাধারণ। তিরিশের দশকের প্রতিরোধ সংগ্রামের পেছনেও এইসব সংগ্রামী গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য কাজ করেছিল বৈকি।

শুধু খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যেই নয়, স্পেনের নানা অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীচেতনা ও প্রতিরোধ আন্দোলন ধীরে-ধীরে জোরদার হ'য়ে উঠেছিল। একেবারে টানা সরলরেখায় নিশ্চয়ই ঘটেনি ব্যাপারটা। উত্থান-পতন, আগু-পিছু, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ, শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এ-সবও ছিল। তবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, প্রতিরোধস্পৃহা, শ্রেণীগত ঐক্যবোধ ইত্যাদির ধারা যে প্রবহমান ছিল এটাই আপাতত আমাদের লক্ষ করবার বিষয়। ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়েও উর্ধ্বমুখ এই প্রবণতা স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। একটু দীর্ঘমেয়াদী পরিপ্রেক্ষিতে ভাঙচুর, সাময়িক পিছু-হঠা, ছোটোখাটো ব্যর্থতার নজির এ-সব গৌণ হ'য়ে যায়। সংগ্রামী ঐতিহ্য যে একটা গ'ড়ে উঠছিল এ-কথাটাই বড়ো হ'য়ে ওঠে। এই ঐতিহ্যের পথে এল ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব। শ্রমিক শ্রেণীর কাছে এত বড়ো প্রেরণা তো এর আগে আর আসেনি। অন্যান্য অনেক দেশের মতোই স্পেনের রাজনৈতিক জীবনেও এই বিপ্লবের প্রভাব পড়তে দেরি হয়নি। প্রথম প্রজাতন্ত্রের পতনের পর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র অর্ধশতাব্দী পরে আবার একবার টলোমলো অবস্থায় এসে পৌঁছল। কাতালোনিয়ার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিও এই সময়ে জোরদার হ'য়ে ওঠে। মাদ্রিদের কেন্দ্রীয় শাসনের দিক থেকে এটাও একটা বড়োরকমের প্রতিরোধ। শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনও এই সময়ে আরো সংগ্রামী মনোভাব অর্জন করে। সর্বোপরি, সামরিক বাহিনীতে অসন্তোষ বিক্ষোভের পথে পা বাড়ায়। বিশেষ ক'রে ত্রয়োদশ আলফোন্‌সোর আফ্রিকী বাহিনীতে উচ্চপদস্থ

অনেক অফিসারের প্রতি পক্ষপাতমূলক সুযোগসুবিধা দানের প্রতিক্রিয়ায় সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দানা বাঁধে। মরোক্কোয় স্পেনীয় ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্রমশ জোরালো হ'য়ে ওঠে।

সব মিলিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়টা স্পেনের ইতিহাসে বেশ একটা টালমাটাল অবস্থা। যুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি তো আছেই। বাস্ক অঞ্চলের জাহাজ, কাতালোনিয়ার বস্ত্র, আস্তুরিয়ার কয়লা, দস্তা, তামা ইত্যাদির দাম তখন খুব চড়া। মজুরিও কিছুটা বাড়ছিল ঠিক, তবে অনেকক্ষেত্রেই মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সেটা সমানুপাতিক নয়। এ-সবের মিলিত ফল একদিকে শ্রমিক অসন্তোষ, অন্যদিকে দারিদ্র্যের পাশাপাশি একটা প্রাচুর্যের ছবি। যুদ্ধের ডামাডোলে কেউ-কেউ তো ফুলে-ফেঁপে ওঠেই। সামরিক বাহিনীর মধ্যেকার অসন্তোষের যে-কথা আগে বলা হ'লো, সেটা সত্যিকার একটা বড়ো সমস্যা হিশেবে দেখা দিল। বাহিনীর জুনিয়ার অফিসাররা নিজেদের এক সংগঠন তৈরি ক'রে ফেললেন—হুন্তাস্ দে দেফেন্‌সা। মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা আরো বাড়ানো এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল। অন্যতম প্রেরণা অবশ্যই ছিল মরোক্কো বাহিনীর অফিসারদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদ। বার্সেলোনা থেকে শুরু ক'রে সমস্ত স্পেনেই এই হুন্তাস্ সংগঠন ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে, বিশেষত স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলে রুশবিপ্লবের সংবাদ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাজ করে। এই অঞ্চলে মূলত অ্যানার্কিস্ট-দের নেতৃত্বে অনেক প্রতিবাদ ধর্মঘট ইত্যাদি সংগঠিত হয়। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ এই বোধহয় প্রথম তার সুপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়ে উঠল। এইসব নানারকম চাপের মোকাবিলায় তখনকার রক্ষণশীল সরকার এক কথায় সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়ে কোরতেস (পার্লামেণ্ট) বন্ধ ক'রে দিলেন। এদুয়ার্দো দাতোর নেতৃত্বাধীন এই সরকারের হাতে তিরিশের দশকের ফ্যাসিবাদের কিছুটা অগ্রিম আস্বাদ এখনই পাওয়া গেল। লক্ষ করতে হবে যে, এই ফ্যাসিবাদী আক্রমণ কিন্তু বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া হয়নি। প্রগতিশীল রাজনীতিবিদেরা এক বিকল্প 'অ্যাসেমব্লি' আহ্বান করলেন। স্পেনের সংবিধান পুনরুদ্ধার করা এই অ্যাসেমব্লির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কাতালোনীয় জাতীয়তাবাদীদের বড়ো ভূমিকা ছিল এই অ্যাসেমব্লিতে। এই সময়ে সোশ্যালিস্টরা এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। যদিও ঠিক এই ভূমিকার জন্যই পরবর্তী ঐতিহাসিকদের অনেকের কাছে তাঁরা তিরস্কৃত। এই সময়ে তাঁরা তাঁদের চিরা-চরিত সংস্কারবাদ থেকে অনেকদূর স'রে এসে বিপ্লবমুখী এক সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন। এই সময়কার কর্মসূচির মধ্যে এমন অনেককিছু ছিল যা আবার ১৯৩১-

এর পরবর্তী সংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা ফিরে পাবো। ১৯৩১ তাই কোনো আচমকা ঘটনা ছিল না। তারও প্রস্তুতি একটা ছিল। রাজতন্ত্রের অবসান, সাত ঘণ্টার কাজের দিন, সেনাবাহিনীর পরিবর্তে মিলিশিয়ার প্রবর্তন, রাষ্ট্র ও গির্জার পৃথকীকরণ, জমির জাতীয়করণ ইত্যাদি দাবিও এই সময়কার কর্মসূচির অন্তর্গত ছিল।

১৯১৭-র এই আন্দোলন নিশ্চয়ই সরাসরি সফল হয়নি। তবে জমি তৈরি হচ্ছিল এ-কথা মানতেই হবে। ১৯২২-২৩ সাল পর্যন্ত কোনো স্থায়ী সরকার ক্ষমতায় আসতে পারল না। মরোক্কোর ঝামেলা চলতেই থাকল। আন্দালুসিয়া ও বার্সেলোনা অঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণীর সক্রিয় বিক্ষোভও সহজে দমন করা গেল না। সিভিল গার্ড ও মারকুট্টে শিল্পপতিদের দাপট সত্ত্বেও না। গ্রামাঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার জন্য ১৮৪৪-এ প্রতিষ্ঠিত এই আধা-সামরিক বাহিনীর নৃশংসতা সর্বজনবিদিত। ঔপন্যাসিক রামন সেন্দার এর ভাষায় 'সিভিল গার্ডে যোগ দেওয়া মানেই গৃহযুদ্ধ ঘোষণা করা।' শুধু বিশের দশকে নয়, পরবর্তী তিরিশের দশকেও এই সিভিল গার্ডের দাপট সাধারণ জনজীবনে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। ফ্যাসিবাদের বীজ আসলে এইসব বাহিনী সংগঠনের মধ্যেই নিহিত ছিল। এইসব গোলমালের সঙ্গে মিলে গেল যুদ্ধপরবর্তী কালের মন্দা। যুদ্ধের সময় ব্যাবসাপাতির যে-বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই দেখা গিয়েছিল এখন তা সংকুচিত হবার দিন এল। যুদ্ধের পরেকার এই মন্দার শ্রমিক ছাঁটাই ইত্যাদি প্রত্যাশিত সব লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল। ফলে, পুঁজি ও শ্রমের বিরোধ প্রায় পুরোপুরি শ্রেণী সংঘর্ষের চরিত্র অর্জন করল। দাবিদাওয়া সবসময়ে শুধুই সংকীর্ণ অর্থনৈতিক গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। এদিকে মরোক্কোয় রিফিয়ান উপজাতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্পেনের সামরিক বাহিনীর একটি বড়োরকমের বিপর্যয় ঘটে। ১৫,০০০ স্পেনীয় নাগরিক ও সৈন্যের মৃত্যু হয়, রাজার বন্ধু জেনারেল সিল্‌ভেস্ত্রের হঠকারী অভিযানের ফলে। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এইসব গোলমালের মধ্যে কাতালোনিয়ার ক্যাপটেন-জেনারেল মিগেল প্রিমো দে রিভেরার সামরিক একনায়কতন্ত্রী শাসন প্রবর্তিত হল। রাজনীতিবিদদের প্রতি জেনারেল-এর ছিল অসহিষ্ণুতা, রাজার ছিল অবিশ্বাস। কাজেই সমাজের অর্থনীতির-রাজনীতির যে-অবস্থায় এই ফ্যাসিবাদের বীজ অঙ্কুরিত হ'লো, তখন রাজার পক্ষে আর-কোনো বিকল্প রইল না। কারণ রাজতন্ত্রের সামাজিক শিকড় ততোদিনে দুর্বল। দেশের উৎপাদনী শক্তির থেকে রাজতন্ত্র বিচ্ছিন্ন। প্রিমোর ফ্যাসিস্ট চরিত্র যে রাজার অবিদিত ছিল তাও নয়। রাজার চোখে

তিনি ছিলেন 'মাই মুসোলিনি'। কোনো-কোনো ঐতিহাসিক অবশ্য রায় দিয়েছেন যে, প্রিমো ঠিক ফ্যাসিস্ট ছিলেন না। তিনি অবশ্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন চালাতেন সামরিক বাহিনীর অফিসারদের দিয়ে, তাঁর বিরোধীদেরকে হয় জেলে পুরতেন, নয়তো নির্বাসনে পাঠাতেন, এবং রাজনৈতিক দলগুলোকেও বেআইনি ঘোষণা করেছিলেন। 'মেহগনি বনিতা' (লা কাওবা) কেলেঙ্কারির জের সামলাতে দার্শনিক উনামুনোকেও দ্বীপান্তরে পাঠাতেও তাঁর দ্বিধা হয়নি। বিচারকের রায় তাঁর পক্ষে যায়নি বলে তাঁকে বদলি করা, সুপ্রীম কোর্টের প্রেসিডেণ্টকে বরখাস্ত করা এ-সবই প্রিমোর কীর্তি। উনামুনোর অপরাধ ছিল ক্ষমতার এই অপব্যবহারের প্রতিবাদ করা। তবে তাঁর শাসনকালে নাকি কোনো রাজনৈতিক মৃত্যুদণ্ড হয়নি। সিভিল গার্ডের প্ররোচনায় সংঘর্ষে লিপ্ত জনা তিনেক অ্যানার্কিস্টের নিহত হবার খবর অবশ্য এই সব লেখকের বইয়ের পাদটীকা থেকেই পাওয়া যায়। হোসে আর্তেগা ই গাসেৎ-এর মতো বুদ্ধিজীবী নাকি তাঁর প্রনানূথিয়ামিয়েন্তো (সরকারি ঘোষণা)-কে স্বাগতও জানিয়েছিলেন। এর থেকে কী বোঝা গেল ? বুদ্ধিজীবীদের অনেকের এ-চরিত্র কি একেবারে অজানা ? যাই হোক, প্রিমো ফ্যাসিস্ট ছিলেন কিনা এ নিয়ে পাঠ্যপুস্তকসুলভ সংজ্ঞা বিশ্লেষণে লাভ কী ?

১৯২২-২৩-এর পর থেকে যুদ্ধ-পরবর্তী মন্দা একটু-একটু ক'রে কেটে যাবার লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। প্রিমো সরকারও রাস্তা, বাঁধ, রেলপথ, গ্রামীন বৈদ্যুতীকরণ ইত্যাদি জনহিতকর প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়। এও তো ফ্যাসিবাদের এক চেনা মুখ। স্পেনের বাণিজ্যহারেও কিছুটা উন্নতি দেখা যায়। বাণিজ্যের পরিমাণ ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে তরুণ কালভো সোতেলোর আর্থিকনীতির ফলে প্রিমো সরকার দেশের মূলধন-মালিকদের সমর্থন লাভ করে। সোশ্যালিস্ট দলও এই পর্বে সরকারের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। সোশ্যালিস্ট শ্রমিক সংঘ ইউ. জি. টি. ক্রমে-ক্রমে সরকারি শ্রমিক সংঘে পরিণত হয়। এই সবের মধ্য দিয়ে স্পেনের রাজনীতিতে বড়ো রকমের পট পরিবর্তন দেখা গেল। এ-অবস্থা খুব বেশিদিন চলতে পারা সম্ভব ছিল না, চলেওনি। ১৯২৯-এর বিশ্বব্যাপী মন্দার ধাক্কা স্পেনেও এসে লাগল। স্পেনীয় মুদ্রা পেসেতার মূল্যমান পড়তির দিকে গেল। মন্দার ধাক্কায় সোতেলোর বড়ো-বড়ো আর্থিক প্রকল্প জলাঞ্জলি দিতে হ'লো। মূলধন-মালিকদের সমর্থনের ভিত্তিও এতে ক'রে ট'লে উঠল। স্পেনের তখনকার অবস্থা ছিল বেরেঙ্গার এর ভাষায় : **'a bottle of champagne, about to blow out its cork'**। তাঁর নিজেরই ভাষায়

২৩২৬ দিনের 'ক্রমাগত অস্বস্তি, দায়িত্ব ও পরিশ্রম' এর পর ক্ষমতার থেকে অবসর (রাজারই ইচ্ছানুসারে) নিয়ে প্রিমো দেশত্যাগ করলেন। রাজা কিছুদিনের জন্য এই বেরেঙ্গার এর নেতৃত্বাধীন এক মন্ত্রীমণ্ডলীর সাহায্যে প্রিমোর ধাঁচেই দেশ-শাসনের চেষ্টা চালালেন। দেশের সর্বত্র তখন প্রজাতন্ত্রী আবেগের ঢেউ। ১৯৩০-এর গ্রীষ্মে সান্ সেবাস্তিয়ানে প্রজাতন্ত্রী রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সমাজতন্ত্রী ও কাতালান জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হ'লো। এই সময়ে গ্রেগরিও মারাওন, আর্তেগা ই গাসেৎ, রামন্ পেরেথ্-এর মতো বুদ্ধিজীবীরাও প্রজাতন্ত্রের দিকে স'রে আসেন। রাজতন্ত্রবিরোধী এই শক্তিসমাবেশের কেন্দ্রে ছিল নিশ্চয়ই বুর্জোয়া প্রভাব। হয়তো খানিকটা সেই জন্যেই সামরিক বাহিনীরও একটা অংশের সমর্থন এখন প্রজাতন্ত্রীদের দিকে গেল। রাজতন্ত্রকে আর সামলে রাখা রাজার পক্ষেও সম্ভব হ'লো না। ১৯৩১-এর ১২ এপ্রিলের নির্বাচন ডাকতেই হ'লো। ঐ নির্বাচনের ফলাফল গুনতিতে রাজার পরাজয় হোক বা না-হোক, তিনি-যে পরাজয় মেনে নিলেন তার প্রমাণ ১৪ এপ্রিলের দেশত্যাগ। এরপর দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের পর্ব।

৪

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের দলগত পরিস্থতি আগেই দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের বামপন্থীদের যুক্ত মোর্চার জোর ৪৭৩টি আসনের মধ্যে ২৬৫—অর্থাৎ অর্ধেকেরও অনেক বেশি। স্পষ্ট দক্ষিণপন্থীদের আসন-সংখ্যা সামান্য। ১৯৬৭-র নির্বাচনের পরে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির কথা ভাবা যেতে পারে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রথম রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের মুখে দক্ষিণপন্থী আসনের অনুপাত কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি ছিল এখানে। এমনিতে এই তুলনার বিশেষ কোনো মানে নেই। শুধু যে-কথাটা বলতে চাইছি তা এই যে, এই ধরনের নির্বাচনী পরাজয়ের প্রথম অভিজ্ঞতার মুখে দাঁড়িয়ে দক্ষিণপন্থী শক্তির মধ্যে একটা নার্ভাস ভাব দেখা দেবে এটা স্বাভাবিক। দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গেও, স্পেনেও। হয়ত আইয়েন্দের চিলিতেও। রেজি দেব্রের সঙ্গে এক দীর্ঘ সংলাপে আইয়েন্দের জবানিতে চিলির দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার কথা জানতে পারি আমরা। চিলির সংগ্রামে স্পেনের গৃহযুদ্ধ কীভাবে প্রেরণা হিশেবে কাজ করেছিল সে-কথাও পাই ঐ সংলাপে। ইতিহাসের কোনো পরিস্থিতিই অন্য কোনোটার সঙ্গে সম্পূর্ণ তুলনীয় নিশ্চয়ই নয়। তবে এইসব সমান্তরালগুলোর মধ্যেই আমাদের শিক্ষণীয় কিছু থেকেই যায়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে প্রায় এক নাগাড়ে এ-রাজ্যের শিল্পের অবনতির খবর শোনা গেছে। এ নিয়ে একটা রীতিমতো শোরগোল তোলা হয়েছে। শিল্পের অবনতি, কৃষিতে বিভ্রাট, জমির লড়াই, রাজ্য থেকে পুঁজির অপসারণ, শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদি ছবি আমাদের অতি পরিচিত। স্পেনেও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের শুরুতে পুঁজির মালিক ও দক্ষিণপন্থী রাজনীতি ঠিক এইসব শ্লোগানের হুংকার দিয়ে একেবার ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গণতান্ত্রিক সরকারের ওপর। এই ইতিহাস একটু মন দিয়ে পড়লে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সংস্কারপ্রচেষ্টা ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ টের পাওয়া যায়। সেইসব তথ্যের বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। খুব সংক্ষেপে দু-একটা সূত্র ধরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এডুয়ার্দ দ্য ব্লায়ে ১৯৭৬-এ লিখেছেন : "Nor did the big capital hide its antipathy to the young Republic. As a result of a large scale flight of capital, the peseta fell from 49 to 67 in relation to the pound sterling in the six weeks that followed the departure of the Bourbon dynasty." পুঁজির অপসারণ আসলে রাজনৈতিক আক্রমণের একটা পন্থা মাত্র। শুধুই বাজারের অর্থনৈতিক নিয়মে পুঁজি স'রে যায় এ-রকম একটা মোহ তৈরি করবার চেষ্টা থাকে বটে, তবে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, এ-সবের মধ্যে অনেক কারসাজি থাকে। সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করবার কায়দা এ-সব। আর এই পন্থাতে রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর দখল বজায় রাখতে সুবিধাও হয়। বাজারী মোহ কারসাজির নির্মোক হিশেবে ভালোই কাজে লাগে। এ-সব ভাবলে একটু শঙ্কা হয় যে, পশ্চিমবঙ্গে কিছুদিন হ'লো পুঁজির অপসারণের হৈচৈটা যেন থেমে আসছে।

স্পেনেও শিল্পের অবনতির সমালোচনা উঠেছিল। পরিসংখ্যানী সমর্থনও ছিল তার পেছনে। শিল্পোৎপাদনের সূচকসংখ্যা প্রজাতন্ত্রের প্রথম কয়েক বছর ক্রমাগত নেমে যাচ্ছিল। ১৯৩১-এ ছিল ১০৯'৩৯, ১৯৩২-এ ৯৮'৯৫ আর ১৯৩৩-এ এসে দাঁড়াল ৯২.৬৬। বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতিও ছিল লক্ষণীয়। ১৯৩১-এ মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্যের পরিমাণ ছিল ২১৬.৬ কোটি পেসেতা, ১৯৩২-এ ১৭১.৮ কোটি পেসেতা আর ১৯৩২-এ ১৫১.০ কোটি পেসেতা। সূচক সংখ্যা (১৯২৯=১০০) ছিল যথাক্রমে ৭৩.৮, ৫৪.৫ ও ৫২.৫। বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধিও ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৩২-এর শেষে বেকারের সংখ্যা ছিল ৫০০,০০০। এক বছর পরের সংখ্যা ৬০০.০০০। শ্লথগতি অর্থনীতির চেহারা এইসব সামান্য তথ্যের মধ্যে থেকেও ফুটে বেরোয়। অর্থনীতির এইরকম ভগ্নদশা দক্ষিণপন্থী

আক্রমণের প্রশস্ত সুযোগ ক'রে দেয়। আর সে-রকম উদ্দেশ্যেই অর্থনীতির এই ভাঙাচোরা চেহারাটা প্রথমে বানানো হয়, তারপর প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে সেটাই জনমানসে তুলে ধরা হয়। বড়ো শিল্প ও লাতিফুন্দিয়ার মালিকদের প্রায় সরাসরি হাত ছিল এর পেছনে। দ্য ব্রায়ের ঈষৎ আবেগময় উচ্চারণে এই প্রক্রিয়ার বর্ণনা পাই এভাবে : "What more tempting for the capitalists than to shut down factories, cut wages, irregularly raise rents, artificially prolong social conflict, or deliberately hold back the expansion of their enterprises, with, as the hoped for result, to put successive governments of the already tottering Republic in an untenable position?" এমনকি দক্ষিণপন্থী হোসে মারিয়া জিল্ রোব্‌লেস্‌ও এই প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গে 'আত্মঘাতী অহংমুখিতা' এই বাক্যবন্ধ ব্যবহার করেছেন।

১৯৩১-এর সরকারের সংস্কারপ্রচেষ্টার দু-একটা নমুনা চেখে দেখা যেতে পারে। আমাদের যুক্তফ্রন্ট প্রচেষ্টার ইতিহাসে এই নমুনা খুব পরিচিত মনে হবে। ১৯৩২-এর ১৫ সেপ্টেম্বরের ভূমিসংস্কার আইনে লাতিফুন্দিয়ার বাড়তি জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বণ্টনের কথা বলা হয়েছিল। লাতিফুন্দিয়ার জমির একটা উচ্চসীমা নির্দেশ করা হয়েছিল—সেচপ্রাপ্ত জমি ১০ হেক্টেয়ার, আঙুরখেত ১৫০ হেক্টেয়ার, চারণ-ভূমি ৪০০ হেক্টেয়ার। জমির উচ্চসীমার এই আইনের প্রয়োগে ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল, কৃষকদের মধ্যে তা নিয়ে অসন্তোষও ছিল। এ-সব সরকারি ঢিলেঢালামি আমাদের কাছেও খুব পরিচিত ব্যাপার। কিন্তু আপাতত যেটা লক্ষ করতে চাই তা এই যে, লাতিফুন্দিয়ার কায়েমী স্বার্থের ওপরে এই সংস্কারবাদী আঘাত দক্ষিণপন্থী চক্র খুব সহজে মেনে নেয়নি। এই পর্বে তাদের ক্রিয়াকৌশল চমকপ্রদ। সরা-সরি আঘাত ক'রে প্রজাতন্ত্রকে ভেঙে দেবার একটা চিন্তাধারা ছিল, তবে সেটা বোধহয় খুব জোরালো হ'তে পারেনি। জিল রোব্‌লেসের মতো বিচক্ষণ রাজ-নীতিকদের পরামর্শে দক্ষিণপন্থার প্রায় সব অংশ মিলিতভাবে কোরতেসে অংশ-গ্রহণ ক'রে ভেতর থেকে প্রজাতন্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টা চালিয়ে গেল। এবং তারা অনেক দূর পর্যন্ত সফলও হ'তে পারল। ভূমিসংস্কার বিল পাশ করার ব্যাপারে দক্ষিণপন্থী এই কৌশলের সার্থকতা বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল। ১৯৩২-এর মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোরতেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কৃষিসংস্কার সংক্রান্ত বিল। এই বিতর্কে দক্ষিণপন্থী সদস্যরা অসামান্য পারদর্শিতা দেখান। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকে খুঁটিনাটি টেকনিক্যাল বিষয়ে অজস্র প্রশ্ন তোলেন এবং এই-

সব সদস্যের প্রত্যেকের একটা ক'রে সংশোধনী প্রস্তাব ছিল। আগস্ট মাসের মধ্যে বিলের মোট চব্বিশটি অনুচ্ছেদের মধ্যে চারটি মাত্র পাশ হতে পেরেছিল। সংশোধনী প্রস্তাবের সংখ্যা একটা সময়ে আড়াইশো মতো দাঁড়িয়েছিল। কৃষি ও ভূমি সংস্কারে হাত দেওয়া কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে যে কতো শক্ত এ-সব তারই উদাহরণ। পশ্চিমবঙ্গেও এ-অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। আসলে নির্বাচনীপথে রাষ্ট্রক্ষমতায় এলেও সমাজের মূল ক্ষমতার কেন্দ্রগুলো তো যেমন ছিল তাই থাকছে। ক্ষমতার সামাজিক শিকড় অক্ষুণ্ণ রেখে প্রশাসনিক ও নিয়মতান্ত্রিক পথের এই সংস্কারপ্রচেষ্টা কায়েমী স্বার্থের আক্রমণের মুখোমুখি হ'তে বাধ্য।

আইয়েন্দেও বুঝেছিলেন যে, প্রকৃত ক্ষমতা হাতে-আসা বলতে বোঝায় তামা, ইস্পাত, সোরা ইত্যাদি সম্পদের উপর প্রকৃত কর্তৃত্ব, আমদানি-রপ্তানির উপর রাষ্ট্রীয় অধিকার স্থাপন ও সত্যিকার ভূমিসংস্কার কার্যকরী করতে পারা। কিন্তু আইয়েন্দেকেও এ-সবের জন্য দাম দিতে হয়েছিল। জীবদ্দশাতেই তিনি প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্রের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রেজির সঙ্গে সংলাপে প্রকাশ ক'রে গেছেন। ষড়যন্ত্রে একটা পর্যায় ছিল গেল-গেল রব তুলে দেশের তুলনায় দুর্বলতর অংশের মনে একটা ত্রাসের সৃষ্টি করা। আইয়েন্দে এটাকে বলেছিলেন 'অ্যালার্মিজম'। এই পর্বে ষড়যন্ত্রকারীদের চাঁই যারা তারা ব্যাঙ্ক থেকে বড়ো-বড়ো অঙ্কের টাকা রাতারাতি তুলে নিতে থাকেন। আশা এই যে, অন্যেরাও তাই করলে ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার দিকে যেতে পারে। সকলেই জানে যে, এইসব চক্রান্তের মধ্যে পূর্বতন সরকারের অর্থমন্ত্রী সরাসরি জড়িত ছিলেন। ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় পর্যায় ছিল আরো সহিংস অইয়েন্দের ভাষায়: 'The bombing of public buildings and monuments, private houses, offices, etc...Santiago's international airport was on the point of being blown up.' এই পর্বে আইয়েন্দের প্রাণনাশেরও চেষ্টা হয়েছিল, যেটা সে-বারের মতো সফল হয়নি। ভুলক্রমে সেনাবাহিনীর প্রধান নিহত হন আততায়ীর হাতে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আইয়েন্দেও প্রাণে বাঁচেননি। ১৯৩১-এর প্রজাতন্ত্রী সরকারের আরো-একটা সংস্কারক্ষেত্র ছিল গির্জার আধিপত্য কমানো। রাষ্ট্রের সঙ্গে গির্জার অন্তরঙ্গ যোগাযোগ গির্জার দিক থেকে তো কাম্য বটেই। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা যাজকদের তরফে যে ভালো চোখে দেখা হবে না এ তো স্বাভাবিক। প্রজাতন্ত্রী সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে তাকিয়ে ডজনখানেক সংস্কার প্রচার করেছিলেন। এইসব প্রস্তাবের অন্যতম ছিল:

১. ধর্মযাজকদের মাইনে বন্ধ করা ;

২. পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ করা ;

৩. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে শিক্ষার দায়িত্ব সরিয়ে নেওয়া ;

৪. শ্মশানের উপর থেকে যাজক সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বের অবসান ;

৫. মানবিক একতার গুরুত্ব-বিষয়ে শিক্ষাদান বেসরকারি বিদ্যালয়েও বাধ্যবাধক করা ;

৬. মৃতের শেষকৃত্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিষেধ করা, যদি-না মৃতের শেষ ইচ্ছা সে-রকম থেকে থাকে।

এই ধরনের সংস্কারের অনেকগুলো হয়তো একটু তাড়াহুড়ো ক'রে, সময় প্রস্তুত হবার আগেই, কার্যসূচি হিশেবে হাতে নেওয়া হয়েছিল। হয়তো অনভিজ্ঞতার অত্যুৎসাহও ছিল। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা যেন ব্যাপারটাকে বেশ চিনতে পারি। এবং এ-কথা বুঝতে আমাদের অন্তত অসুবিধা হবে না সে, সংস্কারে এইসব জায়গায় হাত দিতে গেলে ধাক্কা আসবেই। যাজক সম্প্রদায়, রাজতন্ত্রী কারলিস্ট, লাতিফুন্দিয়া ও শিল্পের মালিক একজোট হ'য়ে, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে, ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রজাতন্ত্রের ওপর। ১৯৩৩-এর ১৯ নভেম্বরের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে দক্ষিণপন্থীদের বিপুল জয় হ'লো। মোট ৪৭৩ টি আসনের মধ্যে এবার দক্ষিণপন্থীদের আসনসংখ্যা দাঁড়াল ২৪২, মধ্যপন্থীদের ১৩১ আর বামপন্থীদের মাত্র ১০০। ১৯৩১-এর নির্বাচনে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬০, ১৪৮ আর ২৬৫। মধ্যপন্থীদের আসনসংখ্যা সামান্য কমল, আসল ওলট-পালট হ'লো বামপন্থী আর দক্ষিণপন্থীদের মধ্যেই। বিভিন্ন জোটের অন্তর্গত দলের আসনসংখ্যায় কিছু কিছু অদলবদল হ'লো, কিন্তু প্রধান পরিবর্তন দেখা গেল জিল্ রোব্লেস্-এর সি.ই. জি.এ. (কন্‌ফেদেরাথিওন্ এস্‌পানোলা দে দেরেচাস্ ও তোনোমাস) এর বেলায়। একক দল হিশেবে এদের আসনসংখ্যাই এবার সবচেয়ে বেশি দাঁড়াল—১১৫। ১৯৩১-এর নির্বাচনে এই দল তখনো তৈরিই হয়নি। বস্তুত প্রথম নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী প্রজাতন্ত্রী সরকারের সংস্কার প্রচেষ্টা প্রতিরোধের জন্য তৈরি হ'লো এই দল। এটা আসলে কোনো রাজনৈতিক দল নয়, একটা মোর্চা। ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারিতে ৪২টি ছোটোবড়ো দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর এক প্রতিনিধি সম্মেলন থেকে এই মোর্চার সৃষ্টি। জিল রোব্লেস্ এই মোর্চার নেতা নির্বাচিত হলেন। প্রজাতন্ত্রী পর্বে এখান থেকে প্রায় প্রত্যক্ষ ফ্যাসিবাদের সূত্রপাত হ'লো স্পেনে। এই মোর্চার ঘোষিত উদ্দেশ্যের অন্যতম ছিল খ্রীষ্টিয় সভ্যতার সংরক্ষণ ও সংবিধান সংশোধন, বিশেষত

ধর্ম, শিক্ষা ও সম্পত্তির প্রসঙ্গে। জিল্ রোব্‌লেস্ খোলাখুলি ঘোষণা করলেন, 'ইউরোপের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, আমার মতে, মার্কসবাদী এবং মার্কসবাদ-বিরোধী গোষ্ঠীই কেবল গ'ড়ে উঠতে পারে। জার্মানিতে তাই ঘটছে এবং স্পেনেও তাই ঘটবে। এই মহান যুদ্ধ আমাদের এ-বছর লড়তেই হবে।' ইউরোপীয় দক্ষিণপন্থার একেবারে মূলধারার সঙ্গে নিজেকে এভাবে মিশিয়ে দিয়ে রোব্‌লেস্ নির্দ্বিধায় মাদ্রিদের এক সভায় ঘোষণা করলেন যে, স্পেনের অসুখ সারাবার জন্য ফ্যাসিবাদী চিকিৎসায় দোষের কিছু নেই। এই দ্বিতীয় নির্বাচনে কমিউনিস্টরা প্রথম কোরতেস্-এ প্রবেশ করল, একটি আসন নিয়ে।

সত্যি কথা বলতে কী ফ্যাসিবাদের আস্বাদ ১৯৩৬-এর ১৮ জুলাই যে প্রথম পাওয়া গেল তা নয়। ঐ সামরিক অভ্যুত্থান স্পেনীয় ফ্যাসিবাদের এক চূড়ান্ত প্রকাশ সন্দেহ নেই। প্রাক্-প্রজাতন্ত্রী আমলে প্রিমোর একনায়কী শাসনকালে একবার এই ফ্যাসিবাদের লক্ষণ ফুটে উঠতে দেখা গিয়েছিল। ১৯৩১-এর পর জিল্ রোব্‌লেসের সেদা ফ্যাসিবাদের লক্ষণগুলোকে নিশ্চয়ই আরো প্রকট করেছিল। বস্তুত দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্বে সমস্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও উদ্যত ফ্যাসিবাদের দাপটে থমথমে হ'য়েছিল। প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র, মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র, শ্রমিক আন্দোলন এ-সবই তখন আক্রমণের লক্ষ্য এবং স্পেনের স্বার্থবিরোধী ব'লে চিহ্নিত। স্পেনের স্বার্থ, লাতিফুন্দিয়া ও খামারমালিকের স্বার্থ, গির্জার স্বার্থ ও সেদার স্বার্থ সব এই পর্বে একাকার। জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে গোষ্ঠী বা দলীয় স্বার্থের এই সমীকরণ ফ্যাসিবাদের এক নির্ভুল কুলক্ষণ। রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিশেবে করপোরেটিভিজম বা সমবায়িতা তখন দক্ষিণের ঘোষিত আদর্শ। এই আদর্শ ফ্যাসিবাদেরই নামান্তর মাত্র। জার্মানি, ইতালি, অস্ট্রিয়া, পোর্তুগাল ইত্যাদি রাষ্ট্রের পথ তখন স্পেনীয় দক্ষিণেরও পথ। এই নিহিত ফ্যাসিবাদ একেবারে প্রকাশ্যে ফুটে বার হ'লো প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় এবং শেষ সাধারণ নির্বাচনের পর। ১৯৩৬-এর ১৬ ফেব্রুয়ারির ঐ নির্বাচনে বামপন্থী মোর্চা ফ্রেন্তে পোপুলার মোট ৪৭১টি আসনের (২টি আসনের নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল) মধ্যে ২৭৮টি আসন পায়। দক্ষিণপন্থীদের আসনসংখ্যা এবার দাঁড়াল ১৩৭। মধ্যপন্থীদের আসনসংখ্যা এবার ভীষণ ক'মে গেল—মাত্র ৫৬। লড়াইটা এবার ছিল সত্যি-সত্যি বাম-দক্ষিণে লড়াই। মার্কস-বাদ ও বামপন্থা বনাম মার্কসবাদ-বিরোধিতা ও দক্ষিণপন্থা সেদার এই স্লোগান এক অর্থে সত্য প্রমাণিত হ'লো এ-বারের নির্বাচনী ফলাফলে। রাজনৈতিক পরিভাষায় যাকে পোলারাইজেশন বলে খানিকটা তাই দেখা গেল। কট্টর দক্ষিণপন্থা থেকে

স'রে গেল সাধারণ মানুষ। মাঝখানের দু-বছরে যা ঘটেছিল এটা কি সাধারণ মানুষের দিক থেকে তার প্রতিবাদের এক ধরনের প্রতিরোধচেষ্টা? ঐ দু-বছর সময়, যাকে বলা হয় বিয়েনো নেগ্রো, অর্থাৎ কালা দু-বছর, তার মধ্যে প্রথম বামপন্থী সরকারের সংস্কার প্রচেষ্টার যেটুকু করা সম্ভব হয়েছিল তার প্রায় সবটাই বাতিল করা হ'লো। প্রথম প্রজাতন্ত্রী ক্যাবিনেটের সমাজতান্ত্রিক মন্ত্রী লারগো কাবালেরোর সমস্ত শ্রমআইন বর্জিত হ'লো। বড়ো খামারের মালিকেরা তাদের জোত জমি সব ফিরে পেলেন। সরকার থেকে এ-সব জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। কৃষি সংস্কারের ফলে লাভবান সমস্ত দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের আবার জমি থেকে উৎখাত করা হ'লো। আর ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে যে দু-এক পা এগোনো গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী মানুয়েল আথানার নেতৃত্বে তার সবকিছু স্থগিত রইল আপাতত। সমাজ ও অর্থনীতির এই বাস্তব পরিস্থিতিতে নির্বাচনী প্রচার পর্বে সেদা-মোর্চার চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের আর কোনো সন্দেহ রইল না।

১৬ ফেব্রুয়ারির ফ্রেন্তে পোপুলারের নির্বাচনী জয়ের জন্য দক্ষিণপন্থা কতোটা প্রস্তুত ছিল বলা শক্ত। তবে নির্বাচনের পর তাদের প্রস্তুতি দ্রুত এলিয়ে গেল। সামরিক পন্থা যে তাদের কাছে অস্পৃশ্য নয় এ-ধারণা তো আগেই পাওয়া গিয়েছিল। এখন সেই পন্থা তাদের দিক থেকে অনিবার্য হ'য়ে উঠল। হিটলার-মুসোলিনি এখন আর শুধু সুদূর আদর্শ নয়, সরাসরি সুহৃদ। ফ্রাঙ্কোর প্রার্থনার উত্তরে সমরসাহায্য পাঠাতে এঁরা কোনো কার্পণ্য করেননি। তবে সেটাই তো প্রত্যাশিত। স্পেনের ঘোলা জলে এঁদের অনেক রকম মাছ ধরবার ফন্দিই ছিল। তাতেও ততো অবাক হই না আমরা। ইঙ্গ-ফরাশী গণতন্ত্র ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে সরাসরি অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন মনে করলেন না। এটাই অনেককে হয়তো অবাক করে। তবে তাতেও কি সত্যিই অবাক হবার কিছু আছে? অন্তত এখানেও আমাদের জন্য শিক্ষণীয় কিছু থাকে।

সবশেষে, স্পেনের গৃহযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে, স্মরণ করতেই হবে সেই আন্তর্জাতিক বাহিনীর কথা। সব ত্রুটিবিচ্যুতি দুর্বলতাব্যর্থতা সত্ত্বেও উনিশশো ছিয়াশির পৃথিবীর জন্য তাঁদের কথা মনে রাখতে হবে; যে-আদর্শে প্রাণিত হ'য়ে তাঁরা ঐ দায় মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, সেই আদর্শের কথা, সেই দায়ের কথা আজ আমাদের জন্য আরো-জরুরি। এক-এক সময়ে মনে হয় আজকের পৃথিবী বোধহয় আরো ছোটো হ'য়ে গেল একালের সব যোগাযোগ বিস্ফোরণ সত্ত্বেও। তবু মনে রাখা ভালো তিরিশের দশকের সেই আন্তর্জাতিক বাঁশের কেল্লার কথা।

গ্রন্থটীকা :

পাদটীকায় কণ্টকিত করতে চাইনি ব'লে আমার তথ্যের সূত্রগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করিনি। তথ্যসংগ্রহের জন্য যে-সব বই থেকে সাহায্য নিয়েছি এখানে এক-সঙ্গে তাদের উল্লেখ করছি। এইসব বইয়ের লেখক-সম্পাদকদের কাছে আমি ঋণী। যুক্তিবিন্যাসের ত্রুটিবিচ্যুতির দায়িত্ব অবশ্যই আমার।

১ দোলোরেস ইবারুরি—'দে শ্যাল্ নট্ পাস্'
[ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৬৬]

২ হিউ টমাস—'দ্য স্প্যানিশ সিভিল ওঅর'

৩ এডুয়ার্দ দ্য ব্লায়ে—'ফ্রাঙ্কো : অ্যাণ্ড দ্য পলিটিক্স অভ স্পেন'

৪ নোম্ চম্স্কি—'অ্যামেরিকান পাওয়ার অ্যাণ্ড দ্য নিউ ম্যাণ্ডারিন্স্'

৫ 'ইণ্টাওন্যাশনাল সলিডারিটি উইদ্ দ্য স্প্যানিশ রিপাব্লিক'—আন্তর্জাতিক সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত :

৬ পল প্রেস্টন—'দ্য কামিং অব দ্য স্পানিশ সিভিল ওঅর'

৭ পল প্রেস্টন (সম্পাদিত :)—'রেভোলিউশন্ অ্যাণ্ড ওঅর ইন্ স্পেন'

৮ রেজি দেব্রে—'কন্ভারসেশন্স্ উইদ্ আইয়েন্দে : সোশ্যালিজম্ ইন চিলি'

৯ পাওলো স্প্রিয়ানো—'আন্তোনিও গ্রামশ্চি অ্যাণ্ড দ্য পার্টি'

অশোক মিত্র

বিবেকবোধের পীড়নে দীর্ণ হ'তে চাই না আমরা

তেমন-কিছু আলোড়ন-শোরগোল নেই, স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় থেকে পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত, কিন্তু তেমন-কোনো উদ্‌যাপন নেই। হয়তো, যেহেতু এই যুদ্ধে গণতান্ত্রিক মানুষকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল, বেদনায় জড়িত এই যুদ্ধের স্মৃতিতে, ফ্যাসিবাদকে স্পেনের মাটি থেকে মুছে ফেলতে ব্যর্থ হয়েছিল সেই দেশের জনসাধারণ তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্মৃতি খুঁড়ে নতুন ক'রে সেই ব্যর্থতাবোধকে অনুভব করতে রাজি নন অনেকেই। সম্ভবত তাই, পঞ্চাশ বছর অতিক্রমের এই বছর, তাঁরা নীরবতাকে বেছে নিয়েছেন।

কিন্তু এ তো ইতিহাসের প্রতি একচোখোমি। ইতিহাসের প্রবাহ কখনোই একমুখী নয়, ইতিহাসের গতিবেগেও নিরন্তর কোনো অবৈকল্য নেই। মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস কোনো মুহূর্তে সাফল্যে দীপ্ত, অন্য-কোনো মুহূর্তে পরাজয়ে মলিন। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতার অন্যতর ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। যদি, প্রতিটি যুদ্ধেই গণতান্ত্রিক মানুষের আন্দোলন বিজয়ী হ'তো, তাহ'লে পৃথিবীর চেহারা পুরোপুরি পালটে যেতো। কিন্তু পৃথিবীতে হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, শোষণলিপ্সা, পরস্বাপহরণের জন্য এর-ওর-তার আকুলি-বিকুলি ; কিছু-কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বৈরাচারী প্রবণতার বাইরে আসতে পারেন না, তাঁরা সাধারণ মানুষকে তুচ্ছাতি-তুচ্ছ বিবেচনা করেন, তাঁরা ধ'রে নেন বসুন্ধরায় একমাত্র তাঁদের অধিকার, সাধারণ মানুষ যুগের পর যুগ ধ'রে শোষিত হবে, কিন্তু প্রতিবাদ করবার কোনো অধিকার থাকবে না তাদের ; উপর থেকে যে-মত বা আদর্শ চাপিয়ে দেওয়া হবে, দেশের গরিব-নিম্নবিত্তদের নীরবে নতমস্তকে মেনে নিতে হবে তা, অন্যথা গর্দান যাবে। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে, তিরিশের দশকে, ফ্যাসিবাদ তার সামগ্রিক হিংস্রতা নিয়ে এই মানবদর্শন গোটা পৃথিবীর উপর চাপাবার লক্ষ্য নিয়ে সমস্ত আঁটঘাট নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর্থিক সংকটে জরাজীর্ণ, কারখানায়-খামারে-সদাগরি দপ্তরে ছাঁটাই, লক্ষ-লক্ষ মানুষ প্রতি দেশে কর্মহীন, দেশে-দেশে সরকার হতভম্ব। বুভুক্ষু মানুষের সংগ্রাম হয়তো বিপ্লবের

দিকে মোড় নেবে, দেশে-দেশে সরকারের এ-ধরনের আতঙ্ক ভয়। ইউরোপে অনেক দেশেই পুঁজিপতিদের প্রত্যক্ষ উৎসাহেই তাই ফ্যাসিবাহিনী গ'ড়ে তোলা হয়, বিপ্লব তথা সমাজতান্ত্রিক অভ্যুদয়কে রুখবে এইসব ফ্যাসিবাহিনী, পুঁজি-পতিদের এবংবিধ আশা। সুতরাং ফ্যাসিবাদী বর্বরতা সারা ইউরোপ জুড়ে যখন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো, যে-ফ্যাসিবাদের মধ্যমণি জর্মানিতে হিটলার ও তার কীচক সম্প্রদায়, ইহুদিদের পুড়িয়ে মারার পরম মহোৎসব, অনেক ধনতান্ত্রিক দেশের নেতারা তখন চোখ বুঁজে কোকিলের দিকে কান পেতেছিলেন, কিংবা আরো একটু এগিয়ে গিয়ে হিটলার-মুসোলিনি ভজনায় নিজেদের দক্ষ থেকে দক্ষতর করছিলেন। হিটলার ও নাৎসিদের সেবায় আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান তা নিয়ে যেন প্রায় প্রচণ্ড কাড়াকাড়ি।

একমাত্র ব্যতিক্রম, সেই সময়ে, স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকার। শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষের প্রতীতির উপর নির্ভরশীল এই সরকার ফ্যাসিবাদের কাছে মাথা নোয়াতে সম্মত হলেন না কিছুতেই, সামরিক বাহিনীর একটি বড়ো অংশ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ফ্যাসি নেতা ফ্রাঙ্কোর বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিল, গণতান্ত্রিক সরকার প্রত্যয়ে দৃঢ় কিন্তু সামর্থ্যে দুর্বল। ফ্রাঙ্কোর সশস্ত্র অভিযানে নাৎসি জর্মানি ও ফ্যাসি ইতালির প্রত্যক্ষ সমর্থন, অথচ কোনো তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার স্পেনের নির্বাচিত সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না, তাঁরা নির্বিকার, তাঁদের মানসিকতার নিখুঁত বর্ণনা আমাদের বাংলা প্রবচন : ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। ফ্রাঙ্কোর ফালাঙ্গী বাহিনীর সরঞ্জামের অভাব নেই. জর্মানি-ইতালি থেকে প্রভূত সাহায্য আসছে, অন্যপক্ষে স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকার অসহায়, কপর্দকহীন, নিঃসঙ্গ। একদিকে অন্যায়, জোর ক'রে, স্রেফ গায়ের জোর দেখিয়ে, একটি দেশের মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদের স্বৈরাচারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়কল্প, অন্যদিকে ন্যায়, সমগ্র দেশের লক্ষ-লক্ষ সাধারণ মানুষ তাদের পছন্দের সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করছে, আপনারা লড়াই চালিয়ে যান, আমরা আছি, আমরা লড়বো, আমরা হঠবো না, ফ্যাসিবাদকে আমাদের ঘর বাড়ি মাটি জমি দখল করতে দেবো না, ফ্যাসিবাদ স্পেনে ঠাঁই পাবে না, তাকে আমরা প্রতিহত করবোই।

অদ্ভুত সেই সময়, একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার বর্গী দস্যুদের হামলার বিরুদ্ধে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লড়ছেন সেই দেশের লক্ষ-লক্ষ সাধারণ মানুষ, স্ত্রী-পুরুষ আবালবৃদ্ধবনিতা সেই সরকারের সঙ্গে, তাদের আত্মপ্রত্যয়ে খামতি নেই অথচ তাদের কোনো সম্বল নেই। একটি দেশে গণতন্ত্রকে হত্যা করা

হচ্ছে, কিন্তু সমস্ত ইউরোপ জুড়ে এককুড়ি দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকার, কারো কোনো মাথাব্যথা নেই, একটি সরকারকেও পাওয়া গেল না যে স্পেনের সরকারকে রক্ষা করার আংশিক দায়িত্ব ঘাড় পেতে মেনে নেবে। স্পেনের নির্বাচিত সরকার, স্পেনের মানুষদের পছন্দের সরকার, একা, সংগ্রামেরত, তার পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর মতো অন্য-একজনও নেই।

এই অবস্থায়, স্পেনের সরকারের তথা স্পেনের সংগ্রামরত সাধারণ মানুষের আর্ত আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলেন দেশ-বিদেশ থেকে হাজার-হাজার স্বেচ্ছাসেবক-স্বেচ্ছাসেবিকা। মানুষের ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথম, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রের আদর্শ ভাবনার প্রান্তর পেরিয়ে কর্মক্ষেত্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে দৃষ্টান্তিত হ'তে দেখা গেল। অসুরের বিরুদ্ধে শুভের লড়াই, স্পেনের শ্রমজীবী মানুষদের চিরতরে পর্যুদস্ত করার ষড়যন্ত্র, দেশে-বিদেশে বিবেকবান জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব আলোড়ন, এ-লড়াই শুধু স্পেনের গরিব কর্মজীবী মানুষের বাঁচার লড়াই নয়, এ-লড়াই আমাদেরও বাঁচার লড়াই। স্পেনের সরকার একা, অসহায়, স্পেনের অধিবাসীবৃন্দ একা, অসহায়, তাঁরা ঢালহীন-তলোয়ারহীন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন দস্যুদলের বিরুদ্ধে, মানবসভ্যতা যাতে অটুট থাকে সেই অঙ্গীকারে বদ্ধ হ'য়ে তাঁরা সংগ্রামরত, স্পেনের জনগণ, স্পেনের সরকার আমাদের জন্যও লড়াই করছেন, আমরা যে যেখানে আছি না কেন! স্পেনের যুদ্ধ বর্বরতার বিরুদ্ধে, হিংস্রতার বিরুদ্ধে, বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে, জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে; স্পেনের যুদ্ধ মানবতার সপক্ষে, গণতন্ত্রের সপক্ষে, স্বাধীনতার সপক্ষে। এই যুদ্ধ, সুতরাং, একা স্পেনের নয়, একা স্পেনদেশীয়দের নয়—এই যুদ্ধ আমাদেরও আমাদের সকলের।

দেশে-দেশে সরকার উদাসীন, গণতন্ত্র ধ্বংস হোক ফ্যাসিবাদ বুকে চেপে বসুক তাতে তাঁদের কী। কিন্তু এইসব নপুংসক সরকারদের পরোয়া না-ক'রে কাতারে-কাতারে স্বেচ্ছাসেবক-স্বেচ্ছাসেবিকা এগিয়ে এলেন। এগিয়ে এলেন ছাত্র-শিক্ষক করণিক, এগিয়ে এলেন কৃষক-মজুর-ফেরিওলা, এগিয়ে এলেন শিল্পী-কবি-অভিনেতা, এগিয়ে এলেন ক্রীড়াবিদ-সাংবাদিক-ট্যাক্সিচালক। তাঁরা নিজেদের দেশে স্পেনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করলেন, অস্ত্র সংগ্রহ করলেন, সংগ্রহ করলেন খাদ্য ও অন্যান্য সরঞ্জাম। এবং এ-সবকিছু সরকারি বেড়াজাল এড়িয়ে কী ক'রে স্পেনের মানুষদের কাছে যথাদ্রুত পৌঁছে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণে অহোরাত্র নিজেদের নিয়োজিত রাখলেন। যিনি ছবি আঁকেন, তিনি ছবি এঁকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিংবা দরজায় ঘুরে সেই ছবি বিক্রি ক'রে স্পেনের জন্য টাকার সংস্থান করলেন। যিনি কবি, তিনি কবিতা রচনা ক'রে স্পেনের সংগ্রামের

প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করলেন, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নাট্য-অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে টাকা তুলে সেই টাকায় অস্ত্র কিনলেন, কিংবা গায়ক-গায়িকার দল গান গেয়ে জোগাড় করলেন ওষুধপত্র, অথবা জামাকাপড়, অথবা ট্রাক বা বাস, যা-সবকিছু স্পেনে যুদ্ধের কাজে লাগবে, স্পেন বাঁচলে আমরা বাঁচবো। আমি ইংল্যাণ্ডে কিংবা মার্কিন দেশে, আপাতত বেকার, প্রতিদিন প্রায় অভুক্ত, কিন্তু আপাতত আমার নিজের সমস্যার দিকে তাকানোর দরকার নেই, এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি স্পেনকে বাঁচানো : স্পেন আমাদের আদর্শ, স্পেন আমাদের অঙ্গীকার, আমাদের স্বপ্ন আমাদের স্বপ্ন, আমাদের ভবিষ্যৎ।

এবং যা প্রায় অকল্পনীয় ছিল, হাজার-হাজার মানুষ, নারী-পুরুষ কিশোর-যুবক-যুবতী-মধ্যবয়সী-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। তাঁরা নানা অসুবিধা তুচ্ছ ক'রে সশরীরে স্পেনে উপস্থিত হয়েছিলেন ন্যায়যুদ্ধে প্রত্যক্ষ যোগ দেওয়ার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে। যিনি সারা জীবন ধ'রে শুধু গল্প কি উপন্যাস রচনা করেছেন, তিনি স্পেনে পৌঁছে ট্রাক বা বাস চালাতে শিখেছেন, সৈন্যদের অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের পারাপারে সাহায্য করেছেন, যিনি বন্দুক বা সঙ্গিন চোখে দ্যাখেননি আগে কদাচ, তিনি গোলাগুলি ছুঁড়তে শিখেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে কামান দেখেছেন। কোনো স্বেচ্ছাসেবক বা স্বেচ্ছাসেবিকা রাঁধুনি ব'নে গিয়ে সৈন্যদের জন্য রান্নার ব্যবস্থা করেছেন, অথবা হাসপাতালে গিয়ে মুমূর্ষু ও আহতদের পরিচর্যা করেছেন, কিংবা টেলিফোন বা বেতার -ব্যবস্থার পরিচালনায় অংশগ্রহণ ক'রে যোগাযোগব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছেন। পরাপরজ্ঞানহীন, মান-অভিমান-আত্মস্বার্থ বিসর্জিত এক পরম নিবেদনের অধ্যায় স্পেনের গৃহযুদ্ধে।

এই মানুষগুলি এসেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিনিধি হিশেবে, সব কটি মহাদেশ থেকে অন্তত কয়েক হাজার, নিদেন কয়েক শো। সোভিয়েৎ দেশের মানুষ, হাঙ্গেরি-পোল্যাণ্ড-চেখোস্লোভাকিয়ার মানুষ, সুইডেন-নরওয়ে-হল্যাণ্ড-ডেনমার্কের মানুষ, ফ্রান্স-ইংল্যাণ্ডের মার্কিন রাষ্ট্র-ব্রাজিল-চিলি-আর্জেন্টিনার জাপানের-চীনের-ভারতবর্ষের। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ স্পেনের মাটিতে, যুদ্ধক্ষেত্রে, ফ্যাসিবাদী হানায় মৃত্যুবরণ করেছেন, কেউ চিরদিনের জন্য পঙ্গু হ'য়ে গেছেন, কেউ চোখ হারিয়েছেন, কেউ পা বা হাত। পালাবার পথে ধুলো ওড়ানোর দঙ্গলে তাঁরা গিয়ে জোটেননি। আদর্শের মহামিলনক্ষেত্রে মৃত্যুভয় অবলুপ্ত, বরঞ্চ মৃত্যুতেই যেন গৌরব, চরিতার্থতা। কারণ এই মৃত্যুর হেতু আদর্শবোধ, এই মৃত্যু স্বাধীনতার পতাকা উজ্জ্বল আকাশে আরো অনেক-অনেক উঁচুতে তুলে ধরার জন্য, গণতন্ত্রের শিক্ষা গোটা পৃথিবীকে আরো

উজ্জ্বল দীপ্তিতে বিকিরিত করার জন্য : আমরা আলাদা-আলাদা দেশে জন্মগ্রহণ ক'রে থাকতে পারি—আমাদের গায়ের রঙ, আমাদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান পরস্পর-বিভিন্ন হ'তে পারে—তাহ'লেও আমরা এক, অচ্ছেদ্য, ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ, এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

স্পেনকে বাঁচানো যায়নি, বাঁচানো যায়নি স্পেনের গণতন্ত্রে আত্ম-অর্পিত মানুষদের, নানা দেশ থেকে কাতারে-কাতারে হাজির-হওয়া যুবক-যুবতী মধ্য-বয়সী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কবি শিল্পী অভিনেতা গল্পলেখক ঔপন্যাসিক তাঁদের সম্মিলিত, যৌথ, দুর্দমনীয় প্রতিজ্ঞা এবং সেই প্রতিজ্ঞার সংহত নিয়োগ ঘটিয়েও ব্যর্থমনোরথ হ'তে বাধ্য হয়েছিলেন, স্পেন এবং স্পেনের অধিবাসীদের অন্ধকারের আড়ালে অতঃপর প্রায় চল্লিশ বছর কাটাতে হয়েছে। স্পেনে গৃহযুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বিভীষিকাযুক্ত যে-ঋতুর শুরু, তাঁর অবসান ঘটাবার জন্য আরো অনেক আত্মাহুতির প্রয়োজন ঘটেছে ইউরোপ-এশিয়া-আফ্রিকা জুড়ে, গ্রাম-শহর জ্বলেছে, কোটি-কোটি মানুষের নিধন, অবর্ণনীয় বীভৎসতা, সেই বীভৎসতার পাশাপাশি অযুত বীর্যের কাহিনী, সংকল্পের কাহিনী, সাফল্যের কাহিনী।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ চিরাচরিত বিচারে অসাফল্যের কাহিনী, সাময়িকভাবে হ'লেও সাধারণ মানুষের হেরে-যাওয়ার কাহিনী, সত্যের-ন্যায়ের পরাজয়, অন্যায়ের-অসত্যের-অসুরের বিজয়কুর্তন। কিন্তু ইতিহাস তো একপেশে ব্যাপার নয়, ইতিহাস তো অদূরদর্শিতাও নয়। আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ, যদি তাৎক্ষণিক সফলতা থেকে তা বঞ্চিতও হয়, কাতারে-কাতারে মানুষের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আন্তর্জাতিকতাবোধে উদ্দীপ্ত হ'য়ে জড়ো হওয়া, কোন্ কষ্টিপাথরে যাচাই হবে তার অপরিমেয় মূল্য, কোন্ সময়সীমার তুলাদণ্ডে ?

স্পেনের গৃহযুদ্ধ এখন ইতিহাস, পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত। স্পেনে যে-বীভৎসতা দৃষ্টান্তিত হ'তে দেখা গিয়েছিল, তাঁর হাজার গুণ বীভৎসতা আমরা এখন প্রতিদিন ঘটতে দেখছি দক্ষিণ আফ্রিকায় : কিছু শ্বেতকায়, যারা সারা দেশের জনসংখ্যার মেরে-কেটে মাত্র এক-দশমাংশ, যাদের পূর্বকাহিনী সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকের ইতিকথা, অত্যাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ ; দেশের শতকরা নব্বুই-ভাগ মানুষ, যারা কৃষ্ণকায়, তারা বছরের পর বছর ধ'রে অত্যাচারিত, নিষ্পেষিত। আমরা প্রতিদিন খবরকাগজে সেই অত্যাচারের বিবরণ পড়ি, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, এখানে-ওখানে বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের নিন্দা ক'রে বক্তৃতামালা। কিন্তু আমাদের বিবেকবোধ তার বেশি এগোতে যেন অনিচ্ছুক, আমাদের আদর্শের অনুভূতি যেন ঈষৎ

মুহ্যমান, স্পেনে পঞ্চাশ বছর আগে হাজার-হাজার স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকা বাহিনী অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের সপক্ষে জড়ো হয়েছিল ; এখনও আবার তাদের কেন জড়ো করা যাবে না সেই চিন্তাতেও নিজেদের বিব্রত করতে, মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়, আগ্রহবান নই আমরা। স্পেনের গৃহযুদ্ধের স্মৃতি আমরা কি মুছে ফেলতে চাই, মুছে ফেলতে চাই নিছক এই কারণে যে বর্তমান মুহূর্তে বিবেকবোধের পীড়নে দীর্ণ হ'তে চাই না আমরা ?

যুদ্ধের দামামা



বিনয় ঘোষ

স্পেনের জনসেনা

আজ [১৯৪২] যে-মহাযুদ্ধ মানবসভ্যতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে, তার প্রস্তাবনা প্রথমে শোনা যায় স্পেনে। মাদ্রিদ ও বার্সেলোনায় ফ্যাশিস্ট মহাযুদ্ধের সতর্কঘন্টি বাজে ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে। প্রথম কঠিন পরীক্ষায় কৃতকার্য হ'য়ে ফ্যাশিজম উৎসাহিত হয়। বনেদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির শাসকবর্গের নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে আত্মসমর্পণ, এমনকী সহযোগিতা পর্যন্ত ফ্যাশিস্টদের সাম্রাজ্য-জিগীষায় ইন্ধন সরবরাহ করে। স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে প্রথম প্রমাণিত হয় যে ফ্যাশিবাদের মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ়, সামরিক সহযোগিতার ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং তথাকথিত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি নিষ্ক্রিয় ও ক্লীব। সঙ্গে-সঙ্গে এ-সত্যও প্রতিষ্ঠিত হয় যে সশস্ত্র ও সংঘবদ্ধ ফ্যাশিস্ট সেনাবাহিনীর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হ'লো সশস্ত্র ও স্বাধীন জনসেনাবাহিনী।

১৯৩০ সাল পর্যন্ত স্পেন মধ্যযুগের কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল বলা চলে। একদিকে অত্যাচারী ও বিলাসপঙ্গু ভূস্বামীগোষ্ঠী, দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্র ও কোর্ট, চার্চ ও সৈন্যবিভাগ, প্রত্যেক ছ-জন সৈন্যের একজন ক'রে আর্দালি কর্মচারী (সাব-অলটার্ন), আর একদিকে অসংখ্য নিঃস্ব, দরিদ্র কৃষক এই ছিল স্পেনের সমাজব্যবস্থা। ফরাশি, জার্মান, আমেরিকান ও ব্রিটিশ মালিকদের কয়েকটা কারখানাও ছিল। স্পেনের ইতিহাসের এইটুকুই বৈশিষ্ট্য। স্পেনের জাতীয় শিল্পমালিক ও ধনিকগোষ্ঠীর বৈপ্লবিক দায়িত্ব সাম্রাজ্যবাদের সংকটের যুগে বিশেষ ঐতিহাসিক কারণেই আসে। সেইজন্য ঠিক বিপ্লবী মনোভাব তাঁদের ছিল না, রফা ও আপসই ছিল তাঁদের নীতি। স্পেনের ভূস্বামীগোষ্ঠী ও চার্চ বর্ধিষ্ণু ধনিকগোষ্ঠীর এই সংগ্রামবিমুখতার সুযোগ নিয়েই একরকম ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিল। ১৯৩১ সালে রাজতন্ত্রকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সোশ্যালিস্ট ও বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের নিয়ে যে-গবর্নমেণ্ট গঠিত হয়, এই আপস-মনোবৃত্তির জন্যে সে-গবর্নমেণ্ট বিপ্লব সার্থক করতে পারেনি। ফলে দক্ষিণপন্থীদের গবর্নমেণ্ট হয় ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৪ সালে আস্তুরিয়ান খনির শ্রমিকরা বিদ্রোহ করে। ১৯৩৬ সালে, অবিরাম সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফলে, 'পিপ্‌লস ফ্রণ্ট'-এর সমর্থকরা নির্বাচনে জয়ী হয়। ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম স্পেনের ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণ স্থাবর সামন্ততান্ত্রিক স্পেনীয়

সমাজের বিরুদ্ধে অভিযান করে এবং সফলও হয়। প্রগতিশীল স্পেনের যুবক সম্প্রদায় 'ইয়ং কমিউনিস্ট লিগ'-এর কর্মসূচি গ্রহণ ক'রে 'ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট ইউথ' নামক প্রতিষ্ঠান গঠন করে। দেশের জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয় এবং জমির মালিক হয় কৃষকরা। দেশের কলকারখানা পরিচালনার ভার গ্রহণ করে নূতন গঠিত 'জাতীয় কাউন্সিল', এবং ব্যাঙ্কগুলিকেও এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্পেনের জনসাধারণের এই সম্মিলিত অভিযানে প্রতিক্রিয়া-শীল সামন্তপ্রভু ও ধনিকগোষ্ঠী সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে। প্রতিশোধ নিতে হবে, এই অভিযান বন্ধ করতে হবে। একমাত্র সামরিক বিদ্রোহ ভিন্ন এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনো পথ নেই। ষড়যন্ত্র শুরু হ'লো। এই ষড়যন্ত্রের ভরসা হলেন ফ্রাঙ্কো, কারণ ফ্রাঙ্কো একজন জেনারেল, এবং ভূস্বামী ও ধনিকদের সমর্থন পেলে তিনিই হয়তো সৈন্যদের বিদ্রোহ করতে সক্ষম হবেন। হিটলার ও মুসোলিনি চেয়ে দেখলেন এই ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের সাফল্যের উপর তাঁদের ভবিষ্যতের গুরুতর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করছে। স্পেনীয় অন্তর্বিপ্লবের কষ্টিপাথরে অনেক কিছু যাচাই হ'য়ে যাবে। বোঝা যাবে, উদারনৈতিক অভিজাত গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড শিথিল হয়েছে কিনা, আর নৃশংস সামরিক শক্তির কাছে জনসাধারণের সংহত শক্তি ও দৃঢ়তা কতখানি সত্য। এই হ'লো পটভূমি।

মাদ্রিদ, জুলাই ১৯৩৬। গোপন সামরিক চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বিষে বাতাস দূষিত। মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার পথে-পথে ছোটো-ছোটো জনতা। সাধারণের নির্বাচিত গবর্নমেণ্টকে বাঁচাতেই হবে। চারদিকে শুধু ফ্রাঙ্কোর নাম, যেন অশরীরী একটা ভীতি ধীরে-ধীরে বিকট রূপ নিচ্ছে। ১৭ই জুলাই সংবাদপত্রে মরোক্কোর সৈন্যদের বিদ্রোহের সংবাদ প্রকাশিত হ'লো। জনসাধারণের ধ্বনি হ'লো 'অস্ত্র চাই'। এ-বিদ্রোহ যে কীসের পূর্বাভাস তা বুঝতে দেরি হ'লো না। সকলেই জানে ফ্রাঙ্কোকে অনেক সামরিক কর্মচারী সাহায্য করবে, সৈন্যদেরও না-ক'রে উপায় নেই। ফালাংগে পার্টির অস্ত্রশস্ত্রেরও অভাব হবে না। বাইরে বিদ্রোহীদের বন্ধুও জুটবে অনেক। শুধু গবর্নমেণ্টের সৈন্যবাহিনী এই বিদ্রোহীদের দমন করতে পারবে না। সুতরাং সাধারণের ধ্বনি হ'লো, 'অস্ত্র চাই'। কিন্তু নির্বাচিত প্রগতিশীল গবর্নমেণ্ট তাদের অস্ত্র দিল না—অস্ত্র ছিল না ব'লে, এবং আরো অনেক কারণে। সঙ্গে-সঙ্গে দেশব্যাপী টুকরো অস্ত্রশস্ত্র যা-কিছু আছে সংগ্রহ করা আরম্ভ হ'লো। দোকান থেকে, গৃহ থেকে, জনসাধারণ রাইফেল্, শটগান, তলোয়ার, পুরোনো-পিস্তল, যা পাওয়া যায়, ভিক্ষে ক'রে জোগাড় করল। তারা ফ্রাঙ্কো ও ফ্যাশিজ্‌মকে ধ্বংস করবেই শপথ করেছে। পরদিন সকালে মাদ্রিদের

গবর্নমেণ্ট রেডিওতে বলা হ'লো যে মরোক্কোর সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু এ-বিদ্রোহ পাগলামি। ফল হ'লো না। ক্রমে-ক্রমে চারদিক থেকে অনুরূপ বিদ্রোহের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল—সেভিইয়ে, সারাগোসা, পাম্পালোনা, ভালেনসিয়া, ভালাদোলিদ, বার্গস—সব জায়গা থেকে। সমরসচিব উদ্বিগ্ন হ'য়ে মাদ্রিদ সেনাদলের কম্যাণ্ডারদের ডেকে পাঠালেন। তারা ক্ষীণকণ্ঠে বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্যারাকে ফিরে গেল। সোশ্যালিস্টরা এদিকে দেরি না-ক'রে কাসা দেল পুয়েবলোতে অস্ত্র বিতরণ শুরু ক'রে দিল। মাত্র আট হাজার লোককে সামান্য অস্ত্র-শস্ত্র মাদ্রিদ দিতে পারে, কিন্তু অস্ত্র চায় প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক। পপুলার ফ্রন্টের নেতারা গবর্নমেণ্টের কাছে রাইফেল চাইলেন। কিন্তু মাত্র পঞ্চাশ-ষাট হাজার রাইফেল ছিল, রাইফেলের বোল্টগুলি ছিল মোন্তানা ব্যারাকের বিশ্বস্ত অফিসার-দের কাছে। তাঁরা 'বিশ্বস্ত' ব'লেই সেগুলো দিলেন না। এই না-দেওয়ার অর্থ কী, সকলেই বুঝল, কিন্তু তবু গবর্নমেণ্ট এর কোনো মীমাংসা করলেন না। গবর্নমেণ্ট তখনও হাত গুনছেন, আর বাইরে পথে-পথে জনসাধারণের 'নো পাসারান' ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। পপুলার ফ্রন্টের নেতাদের চাপে গবর্নমেণ্ট পুনর্গঠিত করা হ'লো। গিরাল হলেন কর্তা আর কাস্তেইয়ো হলেন সমরসচিব। কিন্তু তখনও জনসাধারণ রাইফেল পেল না। পথে-পথে জনসেনারা দল বেঁধে ঘুরছে। পুয়ের্তা দেল সোল-এ এক বিরাট জনতা অস্ত্র দাবি ক'রে চীৎকার করছে। গবর্নমেণ্ট সে-দাবি মঞ্জুর করলেন না। সেইদিন সন্ধ্যায় মোন্তানা ব্যারাক থেকে প্রথম কামানের শব্দ শোনা গেল। মাদ্রিদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

জনসাধারণ জানে সৈন্যদের মধ্যে অধিকাংশই ফ্রাঙ্কোবিরোধী কিন্তু অফিসার-দের কবলে প'ড়ে বাধ্য হ'য়ে তাদের বিদ্রোহ করতে হয়েছে। ব্যারাকের সামনে লাউডস্পিকার বসিয়ে সৈন্যদের আহ্বান ক'রে বলা হ'লো আত্মসমর্পণ করতে। কিন্তু রাইফেল ও কামানের শব্দে এর উত্তর এলো। সারা রাত যুদ্ধ হ'লো। পথে-পথে, কাফেতে, ঘরের বারান্দায় শুয়ে মাদ্রিদের অধিবাসীরা রাত কাটাল। সিয়েরা থেকে ফ্রাঙ্কোর সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে মাদ্রিদের দিকে, আর দেরি করা চলে না। যার যা হাতিয়ার ছিল তাই নিয়ে ছুটে গেল মাদ্রিদ রক্ষার জন্যে। জেনারেল মোলার সৈন্যবাহিনীকে তারা পথে বাধা দেবে।

এই জন-সেনাবাহিনীর কোনো ব্যারাক নেই, পোশাক নেই, সরকারি ডিপো নেই অস্ত্রশস্ত্রের। যেখানে-সেখানে তারা ঘুমিয়ে থাকত, রেস্তোরাঁ ও কাফেতে খেতো, দোকানদার ও দেশভক্ত অধিবাসীদের কাছ থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহ করত। এই বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন জন-সেনার দল অগ্রসর হ'লো জেনারেল মোলার

সুসজ্জিত ও সংঘবদ্ধ সেনাবাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্যে। নানা পার্টি থেকে সেনাদল গঠন করা হয়েছে। কারু উদ্দেশ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, কেউ চায় মূরদের কবল থেকে ক্যাথলিক চার্চ রক্ষা করতে, কেউ বিদেশীর শাসন থেকে স্পেন-কে মুক্ত করতে, কেউ-বা নিজের জমির মালিকানাটুকু রক্ষা করতে। কিন্তু এই-সব বিভিন্ন উদ্দেশ্য সংগ্রামের মধ্যে শেষে উৎসতে মিলিত হ'লো। নানা ধ্বনি একটি মহাধ্বনিতে পরিণত হ'লো : 'ফ্যাশিজম ধ্বংস হোক', 'নো পাসারান'।

অ্যানার্কিস্টরা খবরের কাগজে ডাইনামাইট জড়িয়ে নিয়ে পাহাড়ে লুকোলো। তরুণ সোশ্যালিস্টরা গেল আল্‌তো দে লিওনের দিকে। প্রথম অগ্রগামী বাহিনীর নেতা হ'লো বাইশ বছরের একটি তরুণী, অরোরা আর্নাইজ়। সমস্ত পথ তারা ঘিরে ফেলল। শত্রুর পথ বন্ধ। মোলা থামতে বাধ্য হলেন, কয়েক মাস তাঁর অভিযান স্থগিত রইল। পরে হিটলার ও মুসোলিনির অফিসার, ট্যাঙ্ক ও বিমান নিয়ে আবার মাদ্রিদের দিকে তিনি অভিযান করলেন।

এদিকে গবর্নমেণ্টও প্রস্তুত হচ্ছে। অস্ত্রকারখানায় অস্ত্র উৎপন্ন হচ্ছে। সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বাইরে থেকে কিছু-কিছু অস্ত্র ও খাদ্য আমদানির চেষ্টা চলছে। ফ্রাঙ্কোর জন্যে কিন্তু অনবরত সৈন্য, ট্যাঙ্ক, কামান, গোলাগুলি, বিমান আসছে রোম-বার্লিন থেকে। ফ্রাঙ্কোর ভয়ডর নেই। আলতো দে লিওনে জনবাহিনীর নিদারুণ ক্ষতি ও হার হ'লো। তার কারণ শুধু অস্ত্রাভাব নয়, শৃঙ্খলা ও সুনিয়ন্ত্রণের অভাবও। তারপরেই বিচ্ছিন্ন জনসেনার দল ব্যাটালিয়নে গঠিত হ'লো। এত অসুবিধা সত্ত্বেও মোলা তখনও মাদ্রিদের পিছনে সিয়েরাতে আত্মরক্ষার সংগ্রাম করছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কো জেঁকে বসেছেন। ইতালীয় ও জার্মান বোমারু বিমান স্পেনের নগর ধূলিসাৎ করছে। নাগরিকরা অসহায়। মোলার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফ্রাঙ্কোর চারটি সৈন্যবাহিনী স্পেনের চারদিকে যুদ্ধ করছে। এ ছাড়াও ফ্রাঙ্কো গর্ব ক'রে বলতেন যে সর্বত্রই তাঁর 'পঞ্চম বাহিনী' (ফিফ্‌থ কলাম কথাটির ব্যবহার হয় স্পেনের যুদ্ধে) আছে।

ফ্রাঙ্কোর অহংকার মিথ্যে নয়। বোমাবর্ষণ হয়, কিন্তু সাইরেনের শব্দ শোনা যায় না। অতর্কিতে আক্রান্ত হ'য়ে হাজার-হাজার নরনারী শিশু মারা যায়। অফিসাররা ফ্রাঙ্কোর 'পঞ্চম বাহিনী', তাই সাইরেন শব্দ করে না। কিন্তু ফ্রাঙ্কো ও মোলা সিয়েরাতে প্রায় মিলিত হ'তে চলেছেন। গবর্নমেণ্ট পদত্যাগ করল। নূতন গবর্নমেণ্ট গঠিত হ'লো—দুজন সোশ্যালিস্ট, দুজন কমিউনিস্ট, দুজন বামপন্থী রিপাবলিকান, একজন রিপাবলিকান ইউনিয়নিস্ট, একজন বামপন্থী কাতালান ও একজন বাস্ক ন্যাশনালিস্ট নিয়ে। কাবাইয়েরো হলেন প্রধানমন্ত্রী, আলভারেস

দেল ভেও হলেন বৈদেশিক মন্ত্রী। নূতন গবর্নমেণ্ট ঘোষণা করলেন যে তাঁরা রাষ্ট্রসংঘের নীতি সমর্থন করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রমুখ অভিজাত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নিরপেক্ষতার মুখোশ খ'সে পড়ল না। স্পেনের জনসাধারণের আবেদন শূন্যে মিলিয়ে গেল। মাদ্রিদ মুখ ফিরিয়ে হেসে নিজেই প্রস্তুত হ'লো শেষ সংগ্রামের জন্যে। তারা হাতবোমা তৈরি করল, কামান, বন্দুক, গুলি, আরো অনেক অস্ত্র। সিয়েরা থেকে একত্রে মিলিত হ'য়ে ফ্রাঙ্কো ও মোলার সেনাবাহিনী ইতালীয় পদাতিক বাহিনী, জার্মান বোমারুবিমান ও কামান নিয়ে মাদ্রিদের দিকে অগ্রসর হ'লো। পৃথিবীর সচেতন ও সুবুদ্ধিমান মানুষেরা বুঝল, এ-অভিযান আন্তর্জাতিক ফ্যাশিস্ট অভিযানের সূচনা। ব্রিটেন, ইতালি, জার্মান, সোভিয়েৎ ইউনিয়ন—সব দেশ থেকে স্বেচ্ছাসেবক এবং দলে-দলে পলাতক ও বন্দী সোশ্যালিস্ট কমিউনিস্ট, বুদ্ধিজীবী, যুবক ও ছাত্রেরা এলো মাদ্রিদ রক্ষা করতে। এই হ'লো 'ইণ্টারন্যাশন্যাল ব্রিগেড'—ফ্যাশিস্টবিরোধী বিশ্বসংগ্রামের সেনাবাহিনী।

ফ্যাশিস্ট জার্মানি ও ইতালি থেকে দলে-দলে পলাতক বন্দী সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। তারা বুঝেছিল মাদ্রিদের পরাজয়ের অর্থ কী। সেইদিন তারা বুঝেছিল যা বুঝতে শাসকশ্রেণীর ১৯৩৯-৪১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ব্রিটেন থেকে প্রতিভাবান যুবকের দল এলো—উইনট্রিংহ্যাম, র‍্যালফ ফক্স, কর্নফোর্ড, কডওয়েল, আরো অনেকে। ভালেকাস থেকে জার্মানরা এলো, সেনাদলের নাম 'টাইলমান ব্রিগেড' (টাইলমান জার্মান কমিউনিস্ট নেতা)। খাকির পোশাক প'রে তারা গান গাইতে-গাইতে চলেছে। জন সমারফিল্ড 'ভলাণ্টিয়ার ইন স্পেন'-এ লিখেছেন : 'এ-গান তারা বহুদিন গেয়েছে জার্মানির পথে-পথে; নাৎসি বন্দীশিবির ও সেলের মধ্যে এ-গানের প্রতিধ্বনি তাদের কানে পৌঁছেছে। এ-সুর স্বাধীন জার্মানির সুর, তাই তারা এই সুরে গান গেয়ে চলল স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রে। সেনাবাহিনীর সামনে লাল পতাকা। অদ্ভুত দৃশ্য। সবকিছু উত্তেজনা ও প্রেরণার লক্ষণ তাদের মধ্যে ছিল, দেখলে মনে হয় যেন যে-কোনো গবর্নমেণ্ট এদের ঘরবাড়ি ভুলিয়ে সাম্রাজ্য জয়ের জন্যে মরতে রাজি করাতে পারে এখনই। কিন্তু আমরা জানতাম এরা আমাদের যোদ্ধা, স্পেনের জনসাধারণের যোদ্ধা, স্বাধীনতার যোদ্ধা, সাম্রাজ্যের নয়। তারা জানে কী জন্যে তাদের মরতে হবে। আমরা বজ্রমুষ্টির অভিনন্দন জানালাম তাদের, যে-অভিনন্দন ইতিহাসের কোনো সেনাবাহিনী পায়নি।'

মাদ্রিদের যুদ্ধক্ষেত্রে এইভাবে সকলে অগ্রসর হ'লো। একদিকে ফ্রাঙ্কোর ইতালি ও জার্মানি থেকে আমদানি-করা ভারি-ভারি কামান, লরি, গাড়ি, ট্যাঙ্ক,

বিমান ও সেনাবাহিনী, আরেক দিকে মাদ্রিদের জনসেনা এবং মুক্তিকামী আন্তর্জাতিক মানবসেনা। পৃথিবীর বিরুদ্ধে মাদ্রিদ। কারণ পৃথিবীর অস্ত্র ও অর্থ ফ্রাঙ্কো ও ফ্যাশিজমের পক্ষে। মাদ্রিদের শহরতলি 'ইউনিভার্সিটি সিটিতে' ফ্যাশিস্টরা ভীষণভাবে আক্রমণ করল। মাথার উপর, চারদিকে বিকট শব্দ; সংগীত, গোঙানি, হুইস্‌ল—বোমারু আর জঙ্গি বিমান, কামান, বোমা, রাইফেল, শেল-এর অশ্রুতপূর্ব ঐকতান। ক্রন্দনমথিত বাতাস, উত্তপ্ত স্প্লিণ্টারের ঘূর্ণি, খণ্ডিত চূর্ণিত মানুষ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, গাছপালা ডাল চারদিকে। টুকরো-টুকরো নরদেহ বাতাসে উড়ছে। মাটি ফুঁড়ে পুঁজরক্তের মতো গলগল ক'রে গরম কাদার প্রবাহ বেরুচ্ছে। মাদ্রিদের জনসেনারা, আন্তর্জাতিক বাহিনীর যোদ্ধারা, কামান, ভাঙা রাইফেল, মরচে-পড়া তলোয়ার, পিস্তল, হাতবোমা, ডাইনামাইট, লোহার রেলিং, ডাণ্ডা, কোদাল, হাতুড়ি, ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্যাশিস্টদের উপর। 'বিদ্রোহীদের তারা মাদ্রিদে প্রবেশ করতে দেবে না। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যুদ্ধ চলল। সকলে বাইরে প্রচার করল 'মাদ্রিদের পরাজয় হয়েছে'। ফ্যাশিস্টদের আজকাল বন্ধুর অভাব নেই।

কামানের গোলায় ও বোমায় মাদ্রিদের এক-একটা দিক গুঁড়ো হ'য়ে গিয়েছে, আরেকদিক থেকে স্পেনের জনসেনা যুদ্ধ করেছে। প্রত্যেকটি গৃহ হয়েছে এক-একটি দুর্গ। আবর্জনা ও ধ্বংসের স্তূপের মধ্যে, মাটির তলায়, পরিখা কেটে স্পেনের জনগণ যুদ্ধ করেছে। ঘর্ঘরমান ট্যাঙ্ক একটার পর একটা তারা ধ্বংস করেছে বিস্ফোরক ও হাতবোমা ছুঁড়ে। ইস্পাতের গুঁড়োর সঙ্গে তারাও টুকরো-টুকরো হ'য়ে মিলিয়ে গিয়েছে। পেট্রলের বোতল, পিস্তল, কাঁটাতার, ট্র্যামলাইনের টুকরো দিয়ে তারা ফ্যাশিস্টবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করেছে। ফ্যাসিস্টদের তারা ধ্বংস করবে, মাদ্রিদ রক্ষা করবে।

মাদ্রিদ তারা রক্ষা করেছিল। তারা জানত মাদ্রিদ তাদের. তারা স্বাধীন, তাই প্রাণ দিয়ে তারা মাদ্রিদ রক্ষা করেছিল। ফ্যাশিস্টরা স্বাধীন জনসেনাকে পরাজিত করতে পারেনি। ইতিহাস এ-সত্য স্বীকার করবে।

কিন্তু মাদ্রিদ আত্মসমর্পণ করল প্রায় দু-বছর পরে। বেপরোয়া ফ্যাশিজম যখন উন্মত্ত হ'য়ে উঠলো, তখন মাদ্রিদের 'পঞ্চম বাহিনী' ফ্রাঙ্কোর জয়ের পথ সুগম ক'রে দিল। মিয়াজা নিরাশায় অভিভূত হলেন, বেস্তাইয়ো ও কাসাদো আত্মসমর্পণ করলেন। রণক্লান্ত ও রণব্যস্ত জনসাধারণ এই আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাস-ঘাতকতার দমন করার অবকাশ পায়নি। স্পেনের জনসেনা ফিরে গেল। ব'লে গেল, 'আমরা মরিনি, মরবোও না। আবার আমরা ফিরে আসব একদিন।'

সেদিন ফ্রাঙ্কো বলেছেন, লাল ফৌজ যদি বার্লিনের পথে অভিযান করে তাহ'লে তিনি তাদের ধ্বংস করতে লক্ষ-লক্ষ সৈন্য পাঠাবেন। ইণ্টারন্যাশন্যাল ব্রিগেড, টাইলমান ব্রিগেড ও স্পেনের জনসেনা আজও (১৯৪২) মরেনি। তারা ফ্যাশিজমের কাছে পরাজিত হয়নি, গোপনে-গোপনে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। উদ্ধত ফ্যাশিজম আজ সদম্ভে পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে অগ্রসর হ'লেও, স্বাধীন জনসেনারা একদিন ফিরে আসবে, তাদের আক্রমণ পর্যুদস্ত করবে, এ-আতঙ্ক ফ্যাশিজমের আজও আছে।···

১৯৪২

দলোরেস ইবারুরি

অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলি

হিংস্র পশুটার মুখের দুর্গন্ধ মাদ্রিদের বাতাসকে কলুষিত করছে। এগিয়ে আসছে জন্তুটা, আর আজকেই গণপ্রতিরোধকে মরণ-কামড় দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। আজ, ১৯৩৬-এর ৭ই নভেম্বর, ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের জন্মবার্ষিকী। প্রতি-বিদ্রোহীরা ভাবছে যে তারা এমন-এক প্রচণ্ড আঘাত করবে, যে-আঘাতে মাদ্রিদের প্রবেশপথ উন্মুক্ত হ'য়ে যাবে, হাঁটু গেড়ে আত্মসমর্পণ করবে প্রজাতন্ত্রী স্পেন, আর মানুষের চেতনা থেকে সম্পূর্ণ মুছে যাবে এই স্মরণীয় তারিখটি।

প্রচণ্ড লড়াই চলছে। রাজধানী দখল করার জন্য বিদ্রোহীদের প্রথম প্রচেষ্টা গণবাহিনীর হাতে পরাজিত হ'ল। তবুও, বেশ খানিকটা এগিয়ে এল বিদ্রোহীরা। মাদ্রিদ এখন ক্ষতবিক্ষত; অস্ত্রের আঘাতে রক্ত ঝরছে তার সর্বাঙ্গ থেকে। শহরের চারপাশের রাস্তায় দ্রুত পরিখা খনন করা হচ্ছে, ব্যারিকেড গ'ড়ে তোলা হচ্ছে ভাঙা বাড়িঘর ও কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে। শহর থমথম করছে; মাঝে-মাঝে সাইরেনের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শহরের মানুষদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে বিপদ খুবই কাছে।

বিদ্রোহীরা কামান দাগছে সেরো দে লো এঞ্জেলস থেকে, বোমাবর্ষণ করছে তাদের বোমারু বিমান থেকে। ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে মাদ্রিদের বড়ো-বড়ো বাড়িগুলি, বিস্ফোরণে যেন তাদের নাড়িভুঁড়িও বেরিয়ে পড়েছে; শতাব্দীর পুরোনো স্মৃতিস্তম্ভগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে, আগুনে ভস্মীভূত হচ্ছে কত অমূল্য শিল্প-সম্ভার, প্রাণ হারাচ্ছে হাজার নরনারী। বোমায় বিধ্বস্ত হ'ল প্রাদোর জাদুঘরটি। পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল আলবার ডিউকের প্রাসাদ, যার মধ্যে ছিল কত-না মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল আর শিল্পসম্ভার। আশেপাশের সমস্ত বাসিন্দা কামান গর্জনের ফাঁকে-ফাঁকে পেছিয়ে যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে।

পঞ্চম রেজিমেণ্টের [কমিউনিস্ট নেতৃত্বে গঠিত : অনুবাদক] লাউডস্পীকার থেকে অনবরত জনসাধারণকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হচ্ছে—কী তাদের করা উচিত, আর কী না-করা উচিত। তারা হুঁশিয়ার ক'রে দিচ্ছে যে শত্রুর এই নবতম আক্রমণকে রুখতেই হবে। মাদ্রিদ আজ আর গতকালের নিরাপদ, মুক্ত শহর নয়। আজ এটা অবরুদ্ধ দুর্গ। মাদ্রিদের শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের অন্যত্র সরিয়ে

দেওয়া হয়েছে। এখন যে-সব লোক—ছেলে ও মেয়ে—মাদ্রিদে রয়েছে, তারা মাদ্রিদের গৌরবময় ইতিহাসে আর-এক নতুন উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাদের দুর্জয় সংকল্প: তাদের প্রিয় শহরটির প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি ইঞ্চি জমি, তারা রক্তের মূল্যেও রক্ষা করবে।

শত্রুর আক্রমণ এগিয়ে আসছে। জনতাও সজাগ এবং প্রস্তুত। হিশেব করা হচ্ছে, সমস্ত সম্ভাবনার কথা মনে রাখা হচ্ছে। কয়েকটা ঘণ্টা কেটে গেল। উত্তেজনায় স্নায়ুতন্ত্রে অসহনীয় চাপ পড়ছে। মাদ্রিদের জনতা মুঠো শক্ত ক'রে অপেক্ষা করছে, কান খাড়া, চোখে অতন্দ্র প্রহরা—তারা খুঁজছে কোথায় দুশমন, কোন ছিদ্রপথে তারা মাদ্রিদে ঢুকতে পারে, কোথায় ছোবল মারতে পারে তাদের বিষদাঁত!

সাবধান! চারদিকেই আতঙ্ক, বিপদ, চোরাগোপ্তা আক্রমণের সম্ভাবনা! এমন সময় আমরা শুনতে পেলাম একটা ভারি বুটের শব্দ, ক্রমেই বাড়ছে, ক্রমেই কাছে আসছে। এবারে, একেবারে পাশের রাস্তায় অবিশ্রান্ত বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য আমাদের মনে সংশয়, কী করব? ওরা কারা? আজ, ১৯৩৬-এর এই ৭ই নভেম্বর, ওরা কারা চলেছে মাদ্রিদের রাজপথ প্রকম্পিত ক'রে? ওদের মুখ কঠোর, মাথা উঁচু, কাঁধে রাইফেল, তাতে ধারালো বেয়নেট-গুলি রোদে ঝলসাচ্ছে!

জানলার পিছনে গণবাহিনীর যোদ্ধাদের হাত বন্দুকের ট্রিগারে, বোমা তৈরি। উদ্বিগ্ন চোখে ওরা তাকিয়ে রয়েছে এই অভিযাত্রী সেনাদলের দিকে। মেয়েরা হতাশায় ছেলেদের কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বলছে: "ওরা ঢুকে পড়েছে! আমরা কেন অপেক্ষা করছি?"

এমন সময় রাস্তা থেকে, বিদেশী ভাষায়, তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ শোনা গেল—বাতাসে যেন চাবুকের শিষ। তারপরই অজানা একাধিক বিদেশী ভাষায়, অভিযাত্রীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল আমাদের অতি পরিচিত, অতি প্রিয় সেই গানের কলি: "জাগো, জাগো, জাগো সর্বহারা···"। আকাশ-বাতাস ভ'রে গেল গানের সেই বজ্রনিনাদে। মাদ্রিদের জনতার স্নায়ুতে শিহরন খেলে গেল। মেয়েরা আনন্দে কেঁদে ফেলল: "আমরা কি স্বপ্ন দেখছি?" মাদ্রিদের রাজপথ পদভারে কাঁপিয়ে অভিযাত্রীরা তখন 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইছে ফরাসি ও ইতালীয়, জার্মান ও পোলিশ, রুমানীয় ও হাঙ্গেরীয় ভাষায়। এরা ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের দেশে, আমাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে লড়তে, এবং হয়তো মরতে, এসেছে।

মাদ্রিদের জনতা প্রবল উচ্ছ্বাসে রাস্তায় নেমে এসে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। এখন তারা বুঝেছে যে এরা আমাদের বন্ধু। ভালোবাসায়, আবেগে তারা হাসছে, কাঁদছে, জড়িয়ে ধ'রে আদর করছে ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের সহ-যোদ্ধাদের। থমকে দাঁড়িয়েছে অভিযাত্রীরা। মাদ্রিদের প্রতিটি মানুষই চাইছে তার নিজের বাড়িতে, অন্তত একবারের জন্য একজন স্বেচ্ছাসেবককে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যেতে। ভুলে গেছে তারা মুহূর্তের জন্য অবরোধের কথা, বিপদের কথা। হঠাৎ, আনন্দ গান হাসি ছাপিয়ে, শোনা গেল দূরে বিমানের মৃদু গর্জন। সবাই চিৎকার ক'রে উঠল: "বোমারু বিমান! বোমারু বিমান!"

কয়েকটা কালো বিন্দু ক্রমে বড়ো হ'য়ে উঠল। এবার তাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ওরা কাছে আসছে, খুব নিচু দিয়ে উড়ছে। কিন্তু এগুলি তো জার্মান বা ইতালীয় বিমান ব'লে বোধ হচ্ছে না। এ কাদের অজানা বিমান, আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে? কিন্তু তারা তো মেশিনগান চালাচ্ছে না, বা বোমাও ফেলছে না! এরা কারা?

একঝাঁক বিমান মাদ্রিদের আকাশের উপর দিয়ে উড়ে, নিচু হ'য়ে অভিবাদন জানাল জনতাকে। তখন আমরা দেখতে পেলাম তাদের প্রত্যেকের ডানায় আঁকা প্রজাতন্ত্রের পতাকা। পরে স্পেনীয়রা ভালোবেসে এদের নাম দিয়েছিল 'মাছি' আর 'বোঁচা নাক'। কিন্তু সেদিনের সেই মুহূর্তটি বর্ণনার অতীত। আকাশের দিকে তাকিয়ে, বিস্ময়ে ভালোবাসায় উল্লাসে হাজার-হাজার কণ্ঠ থেকে জয়ধ্বনি বেরিয়ে এল—অভিবাদন জানাল আমাদের আকাশে ওড়া প্রথম সোভিয়েত বিমানবহরটিকে। লক্ষ কণ্ঠে শোনা গেল: "এগুলো সোভিয়েত বিমান! এগুলো আমাদের···আমাদের···আমাদের!" এই এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তে বহু দূরের সমাজতন্ত্রী দেশ আমাদের গণফৌজ ও সমস্ত নরনারীর হৃদয়ের এত কাছাকাছি এসে গেল, যে আর কোনওদিনই কোনও সীমান্ত, কোনও সমুদ্র, কোনও পর্বতমালা, কোনও বন্দীশালা বা কোনও সন্ত্রাসই স্পেনের জনগণ ও সোভিয়েতের জনগণের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। আজও না, ভবিষ্যতেও না। চিরকালের মতো অচ্ছেদ্য বন্ধনে তারা আবদ্ধ—সংগ্রামে, বীরত্বে, আত্ম-ত্যাগে।

মাদ্রিদ তার শক্তিকে যেন আবার ফিরে পেয়েছে। সে এখন দুর্জয়। বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিহত হচ্ছে বার-বার, প্রতিহত হবে আরো শতবার।··· মাদ্রিদ রক্ষার সংগ্রামে ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের এক সম্মানিত স্থান রয়েছে। অবরোধের শানিত ছুরিকা যখন প্রায় মাদ্রিদের কণ্ঠনালীতে ঠেকছিল, তখন

আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড। তাদের দেখে মাদ্রিদের জনগণের প্রতিরোধের ক্ষমতা শত গুণ বেড়ে গেল এবং তাদের উভয়ের সম্মিলিত শক্তিতে তারা রুখে দিয়েছিল ফ্যাসিস্টদের জয়যাত্রাকে।

মাদ্রিদ রক্ষার এই সংগ্রামেই জন্মেছিল টেলম্যানের গান। জার্মান সহযোদ্ধারা লড়তে-লড়তে এবং মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই গান গাইতেন। জার্মানির জনগণ আজও সগর্বে এই গান গেয়ে চলেন, অভিবাদন জানান স্পেনের মৃত্যুহীন সংগ্রামকে—

স্পেনের আকাশে তারাগুলি ঝলমল করছে ;
নিচে, অনেক নিচে, পরিখায় ব'সে আমরা—
ভোর হ'য়ে আসছে,
ডাক আসছে যুদ্ধের !
বহুদূরে ফেলে এসেছি আমাদের মাতৃভূমি ;
তবু, এখানেই, প্রতিরোধে আমরা অটল !
তোমাদের, আমাদের সংগ্রামের একই লক্ষ্য—
স্বাধীনতা !

ফ্যাসিস্টদের বিদ্রোহ একটা মহাপ্লাবনের মতো আমাদের দেশকে ধ্বংস করছিল। তার বিরুদ্ধে জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধা অর্জন করছিল। এই সংগ্রামে কেউ নিরপেক্ষ ছিল না। হয় তোমরা আমাদের পক্ষে, নয়তো বিপক্ষে। যুদ্ধ ও শান্তি, ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্র—এদের মধ্যে সংগ্রামে উদাসীন থাকার অর্থই হ'ল আক্রমণকারীকে সাহায্য করা। সারা পৃথিবীর মানুষদের সংগ্রামী মেজাজকে লক্ষ্য ক'রে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সকল ফ্যাসিস্টবিরোধী ও গণতন্ত্রকামীর কাছে ডাক দিল : স্পেনের পাশে দাঁড়াও। তারা ডাক দিল্ : নিজের দেশে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ো এবং স্বাধীনতার সপক্ষে লড়বার জন্য তাদের স্পেনে পাঠাও।

এই আহ্বানে সবার আগে সাড়া দিল ফরাশি, জার্মান, ইতালীয় ও পোলরা। প্রথম আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সেনাপতি হ'য়ে এলেন হাঙ্গেরীর কমিউ-নিস্ট নেতা এমিল ক্লেবার—মাদ্রিদকে রক্ষা করতে। জার্মানি তখন হিংস্র নাৎসি পশুর থাবার নিচে। কিন্তু হিটলার ভাঙতে পারেনি তাদের সবার মনোবল। সেখান থেকে এল বাছাই-করা ফ্যাসিস্টবিরোধীরা ও কমিউনিস্টরা—ফ্রানৎস ডাহ্‌লেম, হানস বেইমলার, হাইনরিখ রাউ, গুস্তাফ ৎসিস্তা, হাইনৎস হফমান, লুই শুস্টার, লুডভিগ রেন।

হিটলারের বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বুলগার জনতার মহান সন্তান ও বিপ্লবী নেতা ডিমিট্রভ। সেই বুলগারিয়া থেকে এল শত-শত শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবী। স্পেনের মাটিতে তারা নিয়ে এল নিজেদের বীরত্ব ও বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা। ইতালি থেকে এলেন ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামে পোড়-খাওয়া সহযোদ্ধারা—লুইজি লঙ্গো, পিয়েত্রো নেম্নি, দ্য ভিত্তোরিও, নিনো নানেত্তি, ভিত্তোরিও ভিদালি, পাকিয়ার্দি, রোসেল্লি প্রভৃতি। সবচেয়ে বেশিসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক এল ফ্রান্স থেকে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দ্যুমঁ, আঁদ্রে মার্তি, ডা: রকে, কর্নেল ফেবিয়েন—এবং আরও অনেকে।

১৯৩৬-এর নভেম্বরে মাদ্রিদের রাজপথে ফরাশি ও জার্মান স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়কত্ব করছিলেন দ্যুমঁ ও হানস কাহ্‌লে—যাঁরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং এখন স্পেনের মাটিতে তাঁরা সহযোদ্ধা—কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়ছেন ফ্যাসিস্ট দুশমনের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সপক্ষে। হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, চেখোস্লোভাকিয়া, ব্রিটেন, ইউগোস্লাভিয়া, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন—মোট ৫৪টি দেশ থেকে হাজার-হাজার সেরা তরুণ তাদের রক্ত ঢেলে দিতে এসেছিলেন স্পেনে। ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের জনসংখ্যা হয়তো খুব বেশি ছিল না, কিন্তু ঐতিহাসিক তার গুরুত্ব। স্পেনের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল তাদের নিজ-নিজ দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামী ঐতিহ্য।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যে-বীরেরা ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের হ'য়ে লড়তে এসে, স্পেনের মাটিতে শহিদত্ব বরণ করেছিলেন, তাঁদের স্মরণ ক'রে ল্যাংস্টন হিউজ লিখেছেন :

একটা সমুদ্র
আর আধখানা মহাদেশ পেরিয়ে
আমি এলাম !
সীমান্ত,
স্বর্গের মতো উঁচু পর্বতমালা
আর রক্তচক্ষু সরকারেরা
আমাকে বলল : না,
তুমি কিছুতেই যেতে পাবে না !
তবু আমি এলাম !
আগামীকালের প্রদীপ্ত সীমানায়

আমি ভর করলাম
আমার সাহস ও বুদ্ধি নিয়ে—
খুব বেশি নয়,
কারণ বয়স আমার নিতান্তই অল্প!
(বলা ভালো আমি তরুণ ছিলাম,
কেননা আমি তো এখন মৃত!)
যা দিতে চেয়েছিলাম
আমার সর্বস্ব—
তা আমি দিয়েছি—
যাতে আর-সবাই বাঁচতে পারে।
আর যখন বুলেটে বিদ্ধ হ'ল আমার হৃদয়,
যখন ঝলক-ঝলক রক্তে
ভ'রে গেল আমার মুখ—
তখন আমি ভাবলাম,
এটা কি রক্ত,
না রক্তাভ বহ্নিশিখা?
না কি আমার মৃত্যু
জন্ম দিচ্ছে নতুন জীবনকে?
সবই এক!
আমাদের স্বপ্ন!
আমার মৃত্যু,
তোমাদের জীবন!
আমাদের রক্ত!
দীপ্ত বহ্নিশিখা!
সবই আজ এক হ'য়ে গেছে।

অনুবাদ : গৌতম চট্টোপাধ্যায়

টেড অ্যালেন / সিডনি গর্ডন

মৃত্যুহীন মাদ্রিদ

৬ই ডিসেম্বর, সময় : সকাল ছটা। ডাক্তার নর্ম্যান বেথুন মাদ্রিদে ফিরলেন, সঙ্গে একটা স্টেশনওয়্যাগন। চিকিৎসার সাজসরঞ্জামে গাড়িটা ভর্তি। সঙ্গে সরেনসেন, তাঁর নতুন রিক্রুট এবং হ্যাজেন সাইস নামে একজন ক্যানাডিয়ান যুবক যে লণ্ডনে গিয়ে বেথুনের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং সেই থেকেই তাঁর মেডিক্যাল ইউনিটে স্বেচ্ছাসেবক হিশেবে কাজ করছে।

এই সময়ে মাদ্রিদে বিরাট উৎসব চলছিল। ফ্রাঙ্কোর বাহিনী দক্ষিণ থেকে যে-প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছিল, তাকে আপাতত ব্যর্থ করা হয়েছে। সুতরাং শহরের জনসাধারণ একটু হাঁফ ছাড়ার সুযোগ পেয়েছে। এক নবীন দৈত্য যেন তার শক্ত আঁট ক'রে রাখা পেশীগুলোকে একটু আলগা ক'রে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে। এক প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে তারা লড়েছে এবং সফল হয়েছে, হোক সে-সফলতা সাময়িক। নিজেদের এই শক্তি সম্বন্ধে তারা নিজেরাই এতদিন সচেতন ছিল না, আজ এই জয় তাদের মধ্যে এনে দিয়েছে সংগ্রামী মানুষের আত্ম-বিশ্বাস। বর্তমান মিলিটারি কমাণ্ডের সঙ্গে সমঝোতায় বসার জন্য আর মিনতি জানাবার প্রয়োজন নেই, মাদ্রিদের জঙ্গি জনতা আত্মরক্ষায় সক্ষম। ফ্রাঙ্কোর অফিসারদের মাদ্রিদের বুকে পা দেওয়ার আগে এখনো অনেক রক্ত ঢালতে হবে।

মাদ্রিদের কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তাঁদের মেডিক্যাল ইউনিট সামরিক ইতিহাসে অভিনবত্বের এক নজির সৃষ্টি করবে। একটি বিশাল প্রাসাদের কতগুলি বিশেষ ঘরে blood transfusion unit তৈরি করা গেল। এগারোটি ঘরবিশিষ্ট এই প্রাসাদে বেথুন কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর দুই সহকারীকে নিয়ে চ'লে এলেন। এটা আগে জার্মান দূতাবাসের লিগ্যাল কাউন্সিলের বাড়ি ছিল। বাড়িটি মাদ্রিদের সবচাইতে অভিজাত অঞ্চল প্রিন্সিপ দ্য ভ্যরগরায় অবস্থিত। একজন অফিসার বেথুনকে জানালেন, "এখানে কেউ বোমা ফেলে আপনাকে বিরক্ত করবে না, ফ্রাঙ্কোর বোমা প্রাসাদের চৌহদ্দি মাড়ায় না…।"

তিনটি ঘরে বেথুন, সরেনসেন এবং সাইস থাকতেন। বাকি আটটি ঘরের কোনোটা রেফ্রিজারেটিঙ রুম, কোনোটা রক্ত সংরক্ষণের হিমঘর, কোনোটা রিসেপশন অফিস—এই রকম বিভিন্ন দপ্তরে বিভক্ত ছিল। বেথুনের সহকারী

নিযুক্ত হলেন আরো দুজন স্প্যানিশ ডাক্তার। এ ছাড়া ছিলেন দুজন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, তিনজন নার্স, একজন রাঁধুনি, একজন কেরানি এবং একজন দারোয়ান।

আস্তে-আস্তে ট্রান্সফিউশনের জন্য আরো প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আসতে থাকলে এই ইউনিটটি ৪০০ মাইলের ফ্রন্ট জুড়ে কাজ করতে লাগল। বেথুন এবং তাঁর দুজন ডাক্তার সহকারীকে ফ্রন্টের তিনটি আলাদা অঞ্চলের ভার দেওয়া হ'ল। সামরিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত এই মেডিক্যাল ইউনিটটির 'কমাণ্ডার' হিশেবে এর সঙ্গে সম্পর্কিত যে-কোনো ঘটনার দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে প'ড়ল বেথুনের ওপর। লিয়াজোঁ বা যোগাযোগ সংক্রান্ত অফিসার নিযুক্ত হলেন সরেনসেন এবং ফ্রন্ট জুড়ে যাতে সুষ্ঠুভাবে ওষুধ এবং ফার্স্ট এইড বক্স বহনকারী যানবাহনগুলি যাতায়াত করতে পারে তা দেখার দায়িত্ব পড়ল সাইসের ওপর।

যে-মুহূর্ত থেকে এঁরা কাজ শুরু করবেন সে-মুহূর্ত থেকে বিশ্রাম ব'লে আর কিছুই তাঁদের থাকবে না। দিন-রাত ধ'রে তাঁদের অবিশ্রান্ত কাজ করতে হবে ফ্রন্টের এখানে-ওখানে, যুদ্ধের খবর পেলেই ছুটতে হবে, জীবনদান করার মহৎ সৌভাগ্যকে অর্জন করতে।

ইতোমধ্যে সবকিছু ঠিক হ'য়ে গেল। ছোটো-ছোটো রেফ্রিজারেটিঙ ইউনিটগুলো বিতরণ ক'রে দেওয়া হ'ল তিনটি অঞ্চলের হাসপাতাল এবং ফিল্ড স্টেশনগুলিতে। এরপর বেথুন দেখা করলেন মেডিক্যাল ইউনিটের সদস্যবৃন্দ এবং এই সংক্রান্ত অফিসারদের সঙ্গে। বললেন, "মহাশয়গণ, আমাদের মহান 'দুধ বিতরণ কেন্দ্রে'র কাজ প্রস্তুত। কিন্তু একটা অত্যন্ত অদরকারি জিনিশ আমাদের নেই, তা হ'ল দুধ···। সেটা যদি না-পাই তাহ'লে বন্ধুগণ বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।" এ-কথা ব'লে এই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ঘুরে তাকালেন অফিসারদের দিকে। চরম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘাড় নাড়লেন স্প্যানিশ ভদ্রলোকটি, "আমরা দেখব যাতে আপনার প্রয়োজনমতো রক্তদাতা আমরা জোগাড় করতে পারি।" "মনে রাখবেন কমরেড, যতদিন এই মেডিক্যাল ইউনিট কাজ করবে, ততদিন রক্তের প্রয়োজন ফুরোবে না। রক্তের স্টক অফুরন্ত না-থাকায় জরুরি অবস্থায় আমরা যেন মানুষকে প'ড়ে-প'ড়ে মরতে না-দেখি। আমাদের দাবি পূরণ করতে গেলে প্রতিদিন আরো-আরো লোককে এগিয়ে আসতে হবে।" স্প্যানিশ ভদ্রলোক মনে হ'ল অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছেন। তিনি বুঝতেই পারছিলেন না এ নিয়ে এত আলোচনার কী আছে। "আপনাদের দাবি আমরা পূরণ করব।" গভীরতর আত্মবিশ্বাস তাঁর কণ্ঠ ফুঁড়ে বেরুল।

তিনদিন ধ'রে মাদ্রিদের বেতার এবং প্রেসের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে আবেদন জানানো হ'ল। ফ্রন্টের মহান যোদ্ধারা ফ্যাসিজমকে রুখবার জন্য রক্ত দিচ্ছেন, তাঁদের সে-রক্ত ফিরিয়ে দিতে হবে! তিনরাত্রির শেষ রাত্রি। কাল সকালে শুরু হবে রক্ত দেওয়া। বেথুন নিঃশব্দে রেডিয়োতে ঘোষণা শুনছিলেন। তারপর আস্তে-আস্তে এগিয়ে গেলেন ল্যাবরেটারির দিকে। রক্ত গ্রহণের যন্ত্র-পাতিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন খালি বিকারগুলোর দিকে।

'আচ্ছা, কাল যদি কেউ না-আসে?'···সবকিছু প্রস্তুত অথচ তবু অনিশ্চয়তা তাঁর মস্তিষ্কের গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে ধাক্কা খেতে লাগল। 'খুব সোজা বড়ো-বড়ো পরিকল্পনা করা, টাকা থাকলে যন্ত্রপাতি কেনাটাও কিছু না। কিন্তু রক্ত? প্যারিস-লণ্ডনের বুকে হাজার ডলারের বিনিময়েও পাওয়া যাবে না একফোঁটা রক্ত। কিন্তুএই মাদ্রিদে? একটাও কি বাড়ি আছে এ-শহরে যেখানে ক্ষুধা নেই? একটাও কি পরিবার আছে যার একজনও এই মূহূর্তে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করছে না ফ্রাঙ্কোর পোষা কুকুরদের বিরুদ্ধে—স্বাধীনতার জন্য, শান্তির জন্য? আর কী আশা করা যায় সেই পুরুষদের কাছ থেকে যারা সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাত্রির কাছে আত্মসমর্পণ না-ক'রে সদাসতর্ক থাকছে আধো-ঘুমের মধ্যে, আর কী পাওয়া যেতে পারে সেই মহিলাদের কাছ থেকে, যারা বীন খেয়ে বেঁচে আছে আর দৃঢ়তাকে সম্বল ক'রে গ'ড়ে তুলছে দুর্গ?'

বেথুন সাইসকে জাগিয়ে তুললেন। "কালকের কথা নিয়েই ভাবছিলাম।" বললেন তিনি: "তোমার কি মনে হয় উপযুক্ত সংখ্যক লোক আমরা পাব?" সাইস জানালেন: "অফিসাররা তো বললেন সেটা কোনো সমস্যাই নয়।" "হ্যাঁ, তবু···", বেথুন পায়চারি করতে লাগলেন। "আচ্ছা, শুভরাত্রি—আজকের রাত্রিতেই আমাদের যা ঘুমোবার ঘুমিয়ে নিতে হবে।"

সকালবেলা। "ডক্টর বেথুন"—ডাক্তার লোপেজের ডাক শুনে বেথুন ঘুরে দাঁড়ালেন। সারা রাত্রি বোধহয় তাঁর ঘুম হয়নি। লোপেজ তাঁকে নিয়ে গেলেন বারান্দার দিকে। হাত তুলে আঙুল দেখালেন রাস্তার দিকে নির্দেশ ক'রে।

দু-হাজারেরও বেশি লোকের এক জনতা ইতোমধ্যেই রাস্তাটার প্রতি ইঞ্চি জমি ভ'রে ফেলেছিল এবং প্রতি মিনিটেই আরো নতুন লোক লাইনে ঢোকার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। তাদের প্রত্যেকের চোখগুলো স্থিরনিবদ্ধ ইনস্টিটিউটের দিকে। মেয়ে-ছেলে, যুবক-বৃদ্ধ, খেতে-পাওয়া না-খেতে-পাওয়া, নাগরিক, সৈন্য, গৃহিণী, গরিব শ্রমিক কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে এই বিশাল জনসমুদ্রে এসে মিলেছে।

অসীম ধৈর্যভরে তারা অপেক্ষা করছে। বেথুন আর দেরি করতে চাইলেন না। ইনস্টিটিউটের দরজা খুলে গেল। সারা সকাল, সারা দুপুর কাজ চলল। একের পর এক লোক আসছে—যাচ্ছে। রক্তে সিফিলিস এবং ম্যালেরিয়ার জীবাণু আছে কিনা তা একের পর এক পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং তারপর রক্ত নেওয়া হচ্ছে। যন্ত্রের মতো পুরো ব্যাপারটা সংঘটিত হচ্ছে। সবই হচ্ছে, কিন্তু ভিড় বাড়ছে বই কমছে না। জনতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই অঞ্চলে শেষে একটা মিলিশিয়া গ্রুপকে পাঠাতে হ'ল, আনতে হ'ল একদল অতিরিক্ত কর্মচারীকে। অবশেষে আর-কোনো বোতল বাকি রইল না। রান্নার জন্য রাখা রেফ্রিজারেটরটাও যখন ভর্তি হ'য়ে গেল তখন কাজ বন্ধ করা ছাড়া আর-কোনো উপায় রইল না। বারান্দা থেকে ডাক্তার লোপেজ্ ঘোষণা করলেন যে পরের দিনের আগে আর রক্ত নেওয়া যাবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা সে-কথা শুনবে কেন? প্রচণ্ড চিৎকারের মধ্যে লোপেজ্ বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, কেন এই সিদ্ধান্ত নিতে হ'ল···কিন্তু কে কার কথা শোনে? বিব্রত লোপেজ্ তাকালেন বেথুনের দিকে। "কী করা যায়? ওদের তো কিছুতেই বোঝানো যাবে না।" বেথুন বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে সেই একগুঁয়ে লোকগুলোকে দেখতে লাগলেন। উৎফুল্ল মুখটা লোপেজের দিকে ফিরিয়ে বেথুন বললেন, "ওরা যদি না-ফেরে তাহ'লে আজ ওদের নাম-ঠিকানা রেজিস্ট্রি করে রাখা যাক, আর ওদের যতজনের সম্ভব রক্ত পরীক্ষা ক'রে রাখা যাক, যাতে কিছুদিন বাদেই প্রয়োজনের সময়ে ওদের কাছ থেকে আমরা আবার উপকার পেতে পারি।" দশদিন বাদে বেথুন স্প্যানিশ এইড কমিটিকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালেন: "ইনস্টিটিউটের মিশন সফল। জনতার কাছ থেকে অপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। সবাইকে অভিনন্দন।"

অনুবাদ: প্রজিত জানা

রাফায়েল আলবের্তি

ফেদেরিকো গার্থিয়া লোরকার জন্যে কয়েকটি কথা

ফেদেরিকো, তোমার মৃত্যুর পর এই প্রথম আমি তোমার বিষয়ে লিখছি। তোমার নিজের গ্রানাদায় তোমার বিরুদ্ধে সেই অপরাধের পর, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, এই আমি প্রথম তোমার কথা লিখছি। যদিও এই সামান্য কয়েক ছত্র তোমার 'জিপসি গাথা'-র (Romancero Gitano) পূর্বকথা হিশেবে লেখা তা কিন্তু স্পেনের মানুষের হৃদয়ের মাধ্যমে, যারা তোমার কবিতা প'ড়ে-প'ড়ে মুখস্থ করবে তাদের মাধ্যমে, তোমার সঙ্গে কথা বলবে। তোমার জন্যে আমি লিখেছি, তোমাকে পাঠানো হয়েছে এই লেখা।

১৯২৪-এর অক্টোবরে মাদ্রিদের ছাত্রভবনের ছোট্ট বাগানটায় তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রথম দিনটা আমার মনে পড়ে। তখন তুমি সদ্য গ্রানাদা থেকে ফুয়েন্তে ভাকুয়েরস থেকে ফিরে এসেছ সঙ্গে নিয়ে তোমার বই-এর প্রথম গাথা—

সবুজ তোমাকে আমি যেভাবে চাই
সবুজ বাতাস। সবুজ ডালপালা…

কবিতাটি তোমার পড়ায় প্রথম সেই শোনা। তোমার সেরা গাথা। বিনা দ্বিধায় বর্তমান স্পেনীয় কাব্যে শ্রেষ্ঠ। তোমার "সবুজ বাতাস" আমাদের সকলকে স্পর্শ করেছিল, আমাদের কানে তার প্রতিধ্বনি থেকে গিয়েছিল। এখনও তেরো বছর পরে আমাদের কবিতার নবীনতম শাখা-প্রশাখায় তার শব্দের ঢেউ।

হুয়ান রামোন হিমেনেথ, যাঁর কাছে তুমি এত শিখেছ, আমরা সকলে শিখেছি, তাঁর Arias Tristes-এ লিরিক গাথার সৃষ্টি করেছিলেন যা ছিল আশ্চর্য, সংগীতময় ও অবিস্মরণীয়। তুমি তোমার 'Romance Sonambulo'-তে নাটকীয় সৃষ্টি করলে যার মধ্যে ছিল লুকোনো শিহরন ও রহস্যময় রক্তধারা। আন্তোনিও মাচাদোর La Tierra da Alvar Gonzalez হ'ল একটি বিবরণধর্মী রোমান্স, কবিতার শরীরে এক ভয়াবহ কাস্তিলীয় কাহিনী। 'Romance Sonambulo' এবং তোমার 'Romancero Gitano'-র ঘটনাগুলোকে আবার বলা যায় না। গল্পবলিয়ের সবরকম প্রচেষ্টা তারা এড়িয়ে যায়। তুমি, হুয়ান রামোন ও মাচাদো-র সঙ্গে, রোমান্সের প্রাচীন স্পেনীয় ধারার ভিত্তির ওপরে আরেকটা শৈলীর সৃষ্টি

করলে যা বিস্ময়কর ও জোরালো, প্রাচীন কাস্তিলীয় ঐতিহ্যের পক্ষে একাধারে যা নির্ভর ও মুকুটের মতো।

তারপর এল যুদ্ধ। আমাদের দেশের জনগণ ও কবিরা গাথা লিখল। যুদ্ধের দশ মাসের মধ্যে প্রায় একহাজার গাথা সংগৃহীত হয়েছে। তুমি এবং প্রধানত তুমিই এর প্রত্যেকটিকে প্রভাবিত করেছ। অন্যান্য কণ্ঠস্বরের তলায় লুকোনো তোমার কণ্ঠ আমাদের সংগ্রামে শামিল। কিন্তু সবচেয়ে জোরে আমাদের কানে ধ্বনিত হয় তোমার রক্ত। তোমার রক্ত তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে, বিশাল হাতের মতো আকাশে উঠে আসে, অভিযোগ ও প্রতিবাদে মুষ্টিবদ্ধ। কেউ এটা বিশ্বাস করতে চায়না। এটা অসম্ভব! কেউ অনুভব করে না যে তুমি ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে আছো। তোমাকে ওরা ভোরবেলা নিয়ে গিয়েছিল। কেউ-কেউ বলে কবরখানায়। অন্যরা বলে একটা রাস্তার ওপর। সত্যি হ'ল···কিন্তু কেউ সেই সত্য যে কী তা বলতে পারে? এমনই ব্যাপারটা।

পেটেণ্ট চামড়ার আত্মা নিয়ে
তারা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে এসেছিল···

কে তোমাকে সাবধান করতে পারত যে তোমার কবিতার সিভিল গার্ডরা তোমার নিজের গ্রানাদার জনবিরল এক শহরতলি এলাকায় কোনোদিন এক ভোরে তোমায় খুন করবে? এ-ভাবেই ঘটনাটা ঘটেছিল। কিন্তু সে-মৃত্যু তোমার ছিল না।

সেই আঠারোই জুলাই আমি ছিলাম ইবিজা দ্বীপে যখন অভ্যুত্থান শুরু হয়। সিভিল গার্ডরা আমারও সন্ধানে এসেছিল। আমি পালিয়েছিলাম। সতেরো দিন আমি পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। রাইনার মারিয়া রিলকে বলেছেন যে কিছু মানুষ অন্যের মৃত্যুবরণ করে, তাদের যা প্রাপ্য মৃত্যু তা তাদের ঘটে না। তোমার মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল আমার। অথচ তোমাকে হত্যা করা হ'ল। আমি পালাতে পেরেছিলাম। কিন্তু তোমার রক্ত এখনও তাজা। অনেকদিন তোমার রক্ত তাজা থাকবে।

তোমার 'Romancero Gitano'-র নতুন-নতুন সংস্করণ বেরুচ্ছে। তোমার নাম ও স্মৃতি স্পেনে, আমাদের দেশের হৃদয়ে শেকড় বিস্তার করছে। কেউ যেন এই শেকড় ওপড়াতে চেষ্টা না-করে। যে-মাটিতে এই শেকড় ছড়িয়েছে সেই মাটি তা বরদাস্ত করবে না। মাটি আগুন হ'য়ে ফেটে পড়বে, কার্তুজ ও গোলার বিস্ফোরণ হ'য়ে উঠবে এবং যারা তোমাকে উপড়ে তুলতে চাইবে তাদের হাত পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। স্পেনের ফালাঞ্জিস্ত, তোমার হত্যাকারীরা শয়তানের

মতো তোমার গৌরব কাজে লাগাতে চেষ্টা করছে যা তাদের নিজেদের বন্দুকের গুলিতেই শতবিদ্ধ। তারা ভণ্ডামি ক'রে তোমাকে রাজকীয় স্পেনের কবি বানাতে চায়—হায় মুসোলিনির রাজকীয় স্পেন! ওরা চেষ্টা চালাক। নির্লজ্জ বেহায়াপনায় মশগুল তোমার খুনেরা ভুলে যায় যে তোমার নাম ও তোমার কবিতা এখনকার মতো চিরদিনই স্পেনের ফ্যাসিবিরোধী শক্তির সংগ্রামী মানুষের ঠোঁটে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। আমাদের মুখে তোমার প্রত্যেকটা কবিতা তোমার হত্যাকারীদের চূড়ান্তভাবে অভিযুক্ত করছে।

আমরা স্মরণ করি। আমরা স্মরণ করব। ভুলে যেতে আমরা পারি না। তাদের মুখ আমরা চিনে রেখেছি যারা এখনও তোমাকে খুঁজছে, তোমাকে পায়ের ওপর হাঁটিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং এই যুদ্ধের সবচেয়ে বুদ্ধিহীন ও কদর্য অপরাধ নিয়ে মারাত্মক ভাঁড়ামি চালিয়ে যেতে সাহায্য করছে। কিন্তু আমরা তা মেনে নেবো না। ওরা ব্যর্থ হবে। আমরা তোমার হাত নিষ্কলুশ রাখব—আমরা যারা ছিলাম তোমার বন্ধু ও কবি—লুইস সেরনুদা, মানুয়েল আলতোলাগুয়ের, এমিলিও প্রাদোস, ভিসেন্তে আলেইহান্দরে. পাবলো নেরুদা, মিগেল এরনানদেথ, আমি। তোমার কবিতার সেই দুঃখী ও অসামান্য মানুষদের সঙ্গে আমরা তোমার স্মৃতিকে প'হারা দেবো, তোমার নিয়ত উপস্থিতি এবং তোমার নামের প্রতি সেই উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সম্মান জানাবো যেমন প্রাচীন কবিরা করতেন তরুণ গার্থিলাসো দে লা ভেগা-কে যিনি শিরস্ত্রাণ ছাড়াই শত্রুর বিরুদ্ধে ঘোড়ায় চ'ড়ে লড়তে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, যিনি তাঁর দুঃসাহস, বীরত্ব ও গানের জন্য একই সঙ্গে শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন, চিরকাল।

অনুবাদ: নবারুণ ভট্টাচার্য

রুপার্ট জন কর্নফোর্ড

ফ্রন্টের চি

মারগট হাইনম্যানকে। ডায়েরিতে লেখা চিঠি।
আরাগঁ, ১৬–৩০ আগস্ট ১৯৩৬।

প্রিয়তমা আমার,

ঠিক এই মুহূর্তে আমি ফ্রন্টে বেকার অবস্থায় সমস্ত দিন কাটাচ্ছি। (কেন, সে কথা একটু পরেই বলবো) আর তাই তোমাকে এই দীর্ঘ পত্র লেখার সুযোগ মিলেছে। যদি এখানে এত গরম না-হ'ত তাহ'লে আমি আমার ভাবনা-চিন্তা আর অনুভূতিগুলোকে বাছাই করার একটা চেষ্টা করতাম। কিন্তু তা পারছি না, তাই যা মনে আসছে ঠিক সেইভাবেই লিখছি···

মারা যাবার একটা আশঙ্কা আছে। পরিসংখ্যানগত ভাবে খুব বেশি নয় কিন্তু তাহ'লেও তা থেকেই যায়। প্রথমত, আমি এখানে রয়েছি কেন? রাজনৈতিক কারণগুলো তো জানোই। তাছাড়া একটা ব্যাক্তিগত কারণও আছে। সতেরো বছর বয়স থেকে আমি একধরনের বন্দী অবস্থায় ছিলাম। আমার সমবয়সীদের আমি ঈর্ষা করতাম তাদের হাঘরের মতো ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা আছে দেখে। এবং কিছুটা এই কারণেই আমি প্রথম নিজেকে স্বনির্ভর ব'লে অনুভব করার পরই এখানে চ'লে এসেছি। কিন্তু আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমাকে আর-কখনো অহেতুক ছেড়ে আসবো না। হ'তে পারে যে পার্টি আমাকে হয়তো পাঠাবে, কিন্তু এবারের পর আমি যখনই সুযোগ পাবো তোমার সঙ্গে থাকবো। আমি আমার সমস্ত শক্তি, সমস্ত মন ও সমস্ত শরীর দিয়ে তোমাকে ভালোবাসি। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা আমার সব অভিজ্ঞতার মধ্যে সবচেয়ে নিখুঁত এবং একদিক দিয়ে আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য।

যাই-হোক, এ-সব কথা এখন থাক। এই মুহূর্তে আমি আরাগঁ-তে আছি, যুদ্ধক্ষেত্রে, একটা পাহাড়ের মাথায়। আমার চারদিকে বৃত্তাকার পাথুরে পাহাড়, সবুজ ঝোপে ঢাকা ও খুবই অনুর্বর। মাঝে-মাঝে দু-একটা মাঠ। দু-কিলোমিটার দূরে শত্রুদের দখলে একটা গ্রাম। পাঁশুটে পাথরের চাঁইয়ের মাথায় একটা বড়ো গীর্জা। শত্রুদের চোখেই দেখা যায় না। মাঝে-মাঝে এক-একটা যা

রাইফেলের শব্দ শুনি। এক দমকা মেশিনগানের গুলি চলে। একটা কি দুটো এরোপ্লেন। মাঝে-মাঝে, বহুদূর থেকে, আমাদের পক্ষের বন্দুকের শব্দ শোনা যায়। থাকার মধ্যে শুধু এক উত্তপ্ত সূর্য। এত গরম যে আমি প্রায় অসুস্থ হ'য়ে পড়েছি। খুবই কম খেতে পারি আর কাজ প্রায় করতেই পারি না। কিছুই করার নেই। আমরা প্রায় সারাদিন শুয়ে-ব'সেই কাটাই। রাত্রে দু-ঘণ্টার প্রহরা—গত রাত্রে কিছু মাইল দূরে সারাগোসার পেছনে আলোর ঝিকিমিকি দেখে খুব ভালো কেটেছে। খোলা জায়গায় পাথরের ওপর একটা কম্বল নিয়ে ঘুমোই—গত রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু কম্বল ভেদ ক'রে গায়ে লাগবার মতো নয়। এখানে আমাদের কতদিন থাকতে হবে জানি না। এবারে ঝামেলার কথাটা বলি। আমি ফ্রণ্টে চ'লে এলাম আর রিচার্ড পিছনে প'ড়ে রইলো। আমার পার্টি কার্ডের জোরে আমি দলভুক্ত হয়েছি। এখানে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি-জানা ইতালির এক ছোট্ট কমরেড ছিলেন। এখন তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে প'ড়ে আছি শুধু আমি আর আমার একমাত্র যোগাযোগ আছে ভাঙা-ভাঙা ফরাশি-জানা এক তরুণ কাতালোনীয় কমরেডের সঙ্গে। আর সেই জন্যেই শুধু নিঃসঙ্গ নয় নিজেকে কিছুটা অপ্রয়োজনীয় ব'লেও মনে হচ্ছে। যাই-হোক এটা আশা করা যায় না যে এখানে আসা পর্যন্ত যে-রকম নিখুঁতভাবে সব ঘটছিল এখনও তাই ঘটবে। কখন বা কীভাবে ফিরে যাবো তা সঠিকভাবে না-জানার ফলেই এই একাকিত্ব, এই স্নায়বিক উদ্বেগ। আর এখনো গোলাগুলির মধ্যে পড়ার অভিজ্ঞতা না-হওয়ায় অবধারিতভাবেই আমি বেশ ভগ্নোদ্যম। এমনকী আমার প্রেস টিকিট ব্যবহার ক'রেও বাড়ি ফিরে যাবার কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু এখানে যুদ্ধ করতে এসে একটু একা লাগার জন্য ফিরে যাওয়া ভীষণভাবেই হাস্যকর হবে। সুতরাং আপাতত সারাগোসার পতন, তা যখনই হোক না কেন, সেই পর্যন্ত এখানে আছি···

···সকালে—সেটা ছিল রবিবার—রোদের তাপ শুরু হবার আগে, শত্রুদের শহর পোর্দিগুয়েরার ঘণ্টাধ্বনি ভীষণ ধীর আর করুণ শোনাচ্ছিল। কেন জানি না এই ঘণ্টাধ্বনি আমাকে এমন অবসন্ন ক'রে দিল, জীবনেও আমার সে-রকম হয়নি। যাই -হোক, এখন আমি মানিয়ে নিয়েছি। গত রাত থেকে আমরা আমাদের আরো আরামের ব্যবস্থা করেছি—ঘুমোবার জন্যে ছোট্ট একটা ট্রেঞ্চ খুঁড়ে তাতে খড় বিছিয়ে দিয়েছি। যতক্ষণ আমি কোনোকিছু করছি, তা যতই উদ্দেশ্যহীন হোক না কেন, আমার বেশ লাগে। কর্মহীন অবস্থাই আমার স্নায়ুগুলোকে কুরে-কুরে খায়। কিন্তু গত রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। ছোটোবেলায় যখন আমি

স্কুলে পড়তাম তখন আমার চেনাশোনার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোক ছিল রাগবি দলের ক্যাপ্টেন—'ডি' নামে একটা হাঁদা। আমি তার সঙ্গে একটা ডর্মিটরিতে শুতাম আর তাকে ভীষণ ভয় পেতাম। তার কথা আমি বহু বছর ভাবিনি। কিন্তু গত রাতে স্বপ্নের মধ্যে একেবারে স্পষ্ট দেখলাম তার সঙ্গে আমি লড়াই করছি এবং পিছু হঠছি না। এটা বোধহয় একটা শুভ ইঙ্গিত। আমি জানি না কতদিন এই পাহাড়ের ওপর থাকবো। তবে ক্রমশ আমি খাপ খাইয়ে নিচ্ছি···

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব বলতে সত্যি-সত্যি কী বোঝায় তা যে কেউ বার্সিলোনায় গেলে বুঝতে পারবে। সব ফ্যাসিবাদী ছাপাখানাগুলোকে দখল করা হয়েছে। মিলিশিয়া কমিটিগুলোর হাতেই আসল শাসনক্ষমতা। ফ্যাসিস্তদের ব্যাপারে সত্যিই একটা ভয় আছে। কিন্তু তা এই মূল সত্যটিকে বদলায় না যে এই জায়গাটা স্বাধীন আর সর্বদাই তার স্বাধীনতার ব্যাপারে সচেতন। রাস্তায় সর্বত্র সশস্ত্র শ্রমিক আর মিলিশিয়ার লোক। অনেকেই এখন যে-সব কাফেতে ব'সে আছে সেগুলো আগে বুর্জোয়াদের দখলে ছিল। চৌরাস্তার দিকে মুখ ক'রে রয়েছে বিরাট হোটেল কোলন, যেটা এখন ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট পার্টি অভ্ কাতালোনিয়ার দখলে। আরো নিচে, ব্যাঙ্ক অভ্ স্পেনের উলটো দিকের বাড়িটায় হচ্ছে অ্যানার্কিস্টদের সদর দফতর। র‍্যাম্বলাতে মারকুইসদের প্রাসাদে কমিউনিস্ট পার্টির সদর দফতর। কিন্তু কেউ কোনো উত্তেজনা অনুভব করছে না। জনগণের অধিকাংশই অ্যানার্কিস্ট সমস্যা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং তারা তাদের স্বাধীনতাকে উপভোগ করছে। রাস্তাগুলোয় সারাদিন লোকে গিজগিজ করে আর রেডিও অফিসগুলোর চারদিকে বিরাট ভিড় থাকে। কিন্তু সেখানেও উত্তেজনা বা হিস্টিরিয়ার মতো কিছুই নেই। মনে হচ্ছে যেন লণ্ডনে সশস্ত্র শ্রমিকরা রাস্তাগুলোকে দখল ক'রে রেখেছে। এটা নিশ্চিত যে তারা রাস্তায় মস্‌লি বা 'অ্যাকশন'-বিক্রেতাদের সহ্য করবে না। তার মানে এই দাঁড়ায় না যে শহরটা সত্যিকারের অর্থে মুক্ত নয়। এটা খাঁটি সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্ব, উপচে-পড়া সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাকে সমর্থন করছে। কমিটিগুলো এখনো সোভিয়েত ধরনের হয়নি। আঞ্চলিক ভিত্তিতে বা একক কারখানা হিশেবে নয়, এগুলো গঠিত হয়েছে সংগঠনগুলির প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে। তার জন্যে এর ভিত্তি কিছুটা সংকীর্ণ, কিন্তু খুব বেশি নয়, কারণ এখানকার একটা বিরাট অংশ সংগঠিত।

যুদ্ধে যাচ্ছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে শেষ করবার মতো কিছু পেলাম। যদি যোদ্ধার মতো নাও পারি কমিউনিস্টের মতো যুদ্ধ করবো। আমার সব ভালোবাসা। স্যালুট! —জন

এ-অবধি চিঠিটার অবস্থা খুব দুঃখজনক। কারণটা এই : আমি বেরিয়ে এসেছিলাম ক-দিন থাকবার বাসনা নিয়ে, কয়েকটা গুলি ছুঁড়বো, তারপর বাড়ি চ'লে যাবো। ব্যাপারটা শুনতে খুব ভালো লাগত কিন্তু বাস্তবে এ-রকম কিছু করা যায় না। গৃহযুদ্ধ নিয়ে খেলা করা যায় না। সাবধানে, যাতে মারা না-পড়তে হয়, এমনভাবে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। এটা উপলব্ধি করতে বেশি সময় লাগেনি যে, হয় এখানে মন-প্রাণ দিয়ে থাকবো অথবা স'রে যাবো। এই সমস্যা এড়াতে আমি চেষ্টা করেছিলাম। তারপর এত একা আর খারাপ লেগেছে যে আমি বার্সিলোনা ফিরে যাবার একটা পাস জোগাড় করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার হ'য়েই সমস্যাটার সমাধান ক'রে ফেলা হয়েছে অন্যভাবে। যাই হোক একবার যখন যোগ দিয়েছি এর মধ্যে থাকতেই হবে, সে আমার ভালো লাগুক আর নাই লাগুক। তাছাড়া সত্যিই তো আমার বেশ ভালো লাগছে। গতকাল আমরা আক্রমণ করতে বেরিয়েছিলাম, আর যুদ্ধের সম্ভাবনাটা ছিল ভীষণ উদ্দীপনাময়। সেইজন্যেই পাতার ওপরে ওই বার্তাটা দেখেছো। কিন্তু শেষে আমরা কিছু না-ক'রেই ফিরে এসেছি। আমি কিন্তু খাপ খাইয়ে নিচ্ছি, কথাবার্তার দু-একটা টুকরো বুঝছি আর সুখী বোধ করতে শুরু করেছি। আমার মনে হয় আমি খুব ভালো যোদ্ধা হবো। এখানে এসেছি ব'লে আমি খুশি বোধ করছি। সম্ভবত দু-মাস থাকতে হবে আর অনেক-অনেককিছু শিখতে পারবো। অক্ষত অবস্থায় ফেরবার সম্ভাবনা শতকরা সত্তর ভাগ আর জীবন্ত ফেরবার সম্ভাবনা শতকরা নব্বুই ভাগ—তার মানে অবস্থাটা মোটের ওপর চলনসই আর যদি তা নাও হ'ত তাহ'লেও আমাকে থাকতে হবে।

সব মিলিয়ে আমি মানসিক দুর্যোগের সবচেয়ে খারাপ দিনগুলোকে কাটিয়ে উঠেছি। অবশ্য শারীরিক কষ্ট স্বীকারের পরীক্ষা হবে আগামী দিনে। কিন্তু আমার মনে হয় আমি সহ্য করতে পারবো। আমার কী-রকম বোধ হচ্ছে, বোঝানো বেশ কঠিন। আমি যেন আমার ব্যক্তিত্ব, স্বয়ং আমাকে আমি যেন ঘোষণা করতে পারছি। জানো, বহুদিন ধ'রে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি ভীত উদ্বিগ্ন হ'য়ে। আর যা আমাকে একজন ব্যক্তি হিশেবে জনস্রোত থেকে আলাদা ক'রে চিহ্নিত করতে পারে, তা যেন মুছে গিয়েছিল। আমি যেন এক এমন নিঃসঙ্গ মানুষ, যে কখনো আতঙ্কিত, কখনো গৃহকাতর, উদ্বিগ্ন, শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, নিদ্রাতুর ও স্বস্তিহীন। আমার সমস্ত ব্যক্তিত্ব, আমার যত শক্তি, আমার বিশ্লেষণী ক্ষমতা, এতদিন সব লুকিয়ে ছিল। এখন সব কিছু পালটে যেতে শুরু করেছে। আমি কিন্তু খাপ খাইয়ে নিচ্ছি। প্রথম যখন

লড়াই শুরু হবে তখন হয়তো আবার আমার পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে যাবে। কিন্তু এখন, আমি, জন কর্নফোর্ড, মাটির তলা থেকে বাইরে বেরুতে শুরু করেছি, নিজেকে চিনছি, ও নিজেকে উপভোগ করছি, এবং এই অনুভব ভালো লাগছে।

সৈন্যদলটা পেশাদার আর অপেশাদার সেনার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। কোনো চিৎকার নেই, অভিনন্দন দেওয়া নেই। যখন কাউকে কিছু করতে বলা হয়, সে সেই কাজটা করে বটে কিন্তু কোনো বাড়তি উৎসাহ দেখায় না। অফিসাররা সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয় আর তাদের মান্যও করা হয়। সৈন্যদলের প্রায় অর্ধেকের ওপর ইউনিফর্ম পরে। নীল আর বাদামি আলখাল্লা আর শার্ট। বাকিদের মোটামুটি কোনো বর্ণনা দেওয়া যায় না। আমি নিজে কালো কর্ডের একটা মোটা ট্রাউজার পরি (বুর্জোয়াদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে)। গায়ে থাকে একটা নীল শার্ট আর আলপাকার সেই কোটটা। পায়ে দড়ির শুকতলাওলা চটি। অসংখ্যবার দোমড়ানো পুরোনো সমব্রেরো, একটা টুপি, একটা কম্বল আর কার্তুজের বাক্স (একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা), যার মধ্যে একটা বাড়তি শার্ট, একটা ছুরি, দাঁতের ব্রাশ, এক টুকরো সাবান আর চিরুনির জায়গা আছে। একটা বড়ো টিনের মগও আছে বেল্টের সঙ্গে বাঁধা।

যেটা নতুন তা হ'ল নিরাপত্তাহীনতার একটা বোধ। আমার কাছে এই বোধ নতুন হ'লেও শ্রমিকরা স্কুল ছাড়ার দিন থেকেই এটা অনুভব করে। এর আগে আমার সব কাজের পটভূমিতে ছিল এক সচ্ছল আর নিরাপদ আশ্রয়, আর ছিল আমার এমন-সব বন্ধুরা প্রয়োজন বোধ করলেই যাদের কাছে গিয়ে হাজির হ'তে পারি। এখানে আর তা হবার নয়। আমাকে সম্পূর্ণ নিজের ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রথম দিকে ব্যাপারটা খুব কঠিন ব'লে মনে হ'ত আমার। কিন্তু এখন বুঝি আমি চালিয়ে নিতে পারবো।

...গতকাল আমি প্রথম গুলিচালনার মুখোমুখি হলাম। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ব্যাপারটা এ-রকম : সন্ধেবেলা আমরা জানতে পারলাম যে আমরা একটা অতর্কিত আক্রমণ করতে যাচ্ছি। সেই সন্ধ্যাতেই প্লেসিনেবা (লেরিডা)-তে একদল ইতালিয়ান এসে পৌঁছেছে। আমরা পিছনের অঙ্গনে একটা আগুন জ্বেলেছিলাম। আমাকে একটা মুরগি ছাড়াতে দেওয়া হয়েছিল। তারপর দলের নেতা, যে এত দিন দিব্যি বাড়িটাকে একটা আঁস্তাকুড় হ'য়ে উঠতে দিয়েছিল সে-ই, হঠাৎ উঠে প'ড়ে লাগল সবকিছু গোছগাছ করবে ব'লে আর অতি অসাধারণ খাবার বানিয়ে ফেলল। এই প্রথম আমরা পরিষ্কার টেবিল-ক্লথ আর পরিষ্কার কাঁটা-চামচ সহযোগে খেলাম। খাওয়া-

দাওয়ার পর একটা সিগারেট শেষ করলাম। যে-কথাবার্তা আমি একবর্ণও বুঝি না সেটাও এখন দিব্যি কান পেতে শুনে যাই।

আমাদের জিনিশপত্র সব একজায়গায় করা হ'ল, তারপর মার্চ ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ঘণ্টা খানেক কি ঘণ্টা দুয়েক আমাদের একটা স্কোয়ারে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আর আমি দু-দুবার ফুটপাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম —কেননা সেদিন সকালেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, বলতে গেলে কিছুই যখন ঘটছে না আর রাতে এত ঘুম হচ্ছে তখন আমি আর কিছুতেই দিনের বেলা ঘুমুবো না। এর কিছুক্ষণ পরেই আমরা যাত্রা করলাম। আবার রাস্তায় থামলাম এবং আবার রাস্তাতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। আমাদের দলের বিশৃঙ্খল অবস্থার কথাটা তখনও আমার মনে হয়েছিল। প্রত্যেকেই ফিশফিশ করছে, একে অন্যকে চুপ করতে বলছে। সব মিলিয়ে তাতেও গণ্ডগোল কিছু কম হচ্ছিল না। অবস্থাটা বেশ ভালো লাগছিল আমার। খুশি হ'য়ে উঠেছিলাম। একটু পরে রাস্তাটা ছেড়ে আমরা পাহাড়ি এলাকায় ঢুকে পড়লাম। মিহি ধুলোয় ভর্তি রাস্তাটা পায়ের তলায় এতক্ষণ নরম ঠেকছিল।

আরাগনের উঁচু আলওলা ছোটো-ছোটো টুকরো-টুকরো খেত পেরিয়ে সারা-রাত ধ'রে আমরা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে হাঁটলাম। প্রথমে বার-বার আমার পা হড়কে যাচ্ছিল আর হোঁচট খাচ্ছিলাম, কিছুক্ষণ বাদে আমিও একরকম তালে তাল মেলাতে শুরু করলাম। তারপর আকাশে ক্রমশ আলো ফুটতে শুরু করল এবং বুঝতে পারলাম এটা কোনোমতেই নৈশ আক্রমণ নয়। এই সময় অনেক নিচে বাঁদিকে সারাগোসার আলোগুলোও দেখতে পেলাম। তারপর আমরা অল্পক্ষণের জন্য থামলাম আর আমাদের এক কমরেড অনেক মাইল নিচে পোর্দিগুয়েরার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ধারণাই করতে পারেনি যে আমরা এত উঁচুতে উঠেছি। এতক্ষণে আমি চালটা বুঝতে পারলাম। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে রাত্তিরবেলায় যাত্রার ফলে আমরা শত্রুদের ঠিক পেছন দিকে এসে পড়েছি—সেবাস্তিয়ান, এক মোটা রুমেনিয়ান, এই পাহাড়ে চড়ার সময় অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। সে এবার 'মাইস্টার সিঙ্গারস্' থেকে একটা গান গাইবার চেষ্টা শুরু করল। কিন্তু সুরটা আমি ধরতে পারলাম না। তারপর আমরা নিচে নেমে গেলাম। আমাদের বাছাই ক'রে কয়েকটা দলে ভাগ করা হ'ল, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে গোলমালের মধ্যে সেই দল আবার ভেঙে দেওয়া হ'ল। পাহাড়ের চুড়ো থেকে—তখন পাঁচটা বা ছটা হবে, পুরোপুরি দিন শুরু হ'য়ে গেছে, আমরা পোর্দিগুয়েরা দেখতে পাচ্ছিলাম। তারপর আমরা আরো নেমে গেলাম। একটা উঁচু মতো ঢিবি

জায়গাটাকে চোখের আড়াল ক'রে রেখেছিল। তারপর আবার এগোনো শুরু হ'ল। আমাদের একটি মাত্র সারি খেতের নীরস জমির উপর পাখার মতো ছড়িয়ে পড়ল, আমরা দ্রুতবেগে হাঁটতে শুরু করলাম। সারা রাত্তির ধ'রে যে-কম্বলটাকে ব'য়ে এনেছি গরমের চোটে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তারপর ঢিপির ওপরে শত্রুদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। সঙ্গে-সঙ্গেই গ্রামের অন্য প্রান্ত থেকে আক্রমণ শুরু হবার শব্দ কানে এল। আমরা সামনের দিকে এগোতে লাগলাম, দেখতে-না-দেখতে গ্রামের থেকে কয়েক শো গজ দূরে একটা আঙুরখেতের মধ্যে গিয়ে হাজির। গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছি। জীবনে এই প্রথম মাথার ওপর দিয়ে গুলি চ'লে যাবার শব্দ শুনলাম। এই সময়ই আমাদের ভেতরকার সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাহীনতা ধরা পড়ছিল। বাঁদিক থেকে গ্রামের বাড়িগুলো ক্রমশ এগিয়ে আসছিল, কিন্তু ডানদিকেরগুলো একটা ঢিবির আড়ালে ঢাকা ছিল, শুধু গীর্জার মিনারটাই দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু আমার এটা পরিষ্কার মনে হ'ল যে আমাদের ডানদিকেই আক্রমণ করা উচিত। কেননা, সেই দিকেই শত্রু পক্ষের মেশিনগানটা রয়েছে, যেটা আমাদের পাল্টা আক্রমণ রুখছে। কিন্তু সে-রকম কিছু হ'ল না। আঙুরখেতের সামনে দিয়ে আমাদের একটা দল হেঁটে গেল, নিজেদের বেশ ভালো ক'রেই গোপন ক'রে অলিভখেতের নিচে গিয়ে ঘাপটি মেরে রইল। অলিভখেতটা পেরুলেই গ্রাম। আরেকটা দল চলে গেল বাঁদিকের বাড়িগুলোকে আক্রমণ করার জন্যে, বাড়িগুলো অবধি পৌঁছেও গেল তারা। তখনো কে হারছে সে-সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। তারপর আমাদের আক্রমণের অপরিকল্পিত প্রকৃতিটা আমি বুঝতে পারলাম। আমি যে-দলের সঙ্গে ছিলাম, তাদের আঙুরখেতে ডেকে পাঠান হ'ল। আঙুরখেতে ব'সে আমি কাঁচা আঙুর চুষে-চুষে খেতে শুরু করলাম। তেষ্টা যে তাতে মিটল তা নয়, কিন্তু একটা টক স্বাদ মুখে র'য়ে গেল। তখন আমি দেখলাম যারা বাঁদিকের বাড়িগুলো দখল করেছিল, তারা দলে-দলে বেরিয়ে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। তখনো পর্যন্ত আমার এতটুকু দুর্ভাবনা হয়নি। হয়তো তখনো পর্যন্ত কেউ আহত হয়নি তাই। মাউসার বন্দুকের পিছু-ধাক্কা এত অল্প দেখে আমার অবাক লাগছিল। এটা এর আগে ব্যবহার করার সুযোগ হয়নি—কিন্তু তা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছিলাম না। তখনো পর্যন্ত কোনো শত্রুকে দেখতে না-পাওয়ায় আমি শুধু দরজা আর জানলাগুলোর ওপরই গুলি চালাচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ আমাদের কানে এল শত্রু-বিমানের গর্জন। আমরা আঙুরখেতের মধ্যে স্তব্ধ হ'য়ে ঘাপটি মেরে রইলাম। মিলানো নামে এক লম্বা ইতালিয়ানের সঙ্গে ছিলাম আমি। আমারই দলের লোক। সে যা করছিল

আমিও তাই করছিলাম। মনে হ'ল প্লেনগুলো আমাদের লক্ষ করেনি। তারা পোর্দিগুয়েরার অপর দিকে, অর্থাৎ যেদিক থেকে আমরা আক্রমণ চালাচ্ছিলাম সেই দিকেই, কেবল বোমা ফেলছিল। বোমা পড়ার পর আমাদের দিকের যোদ্ধারা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল। অবশ্যই ভীরুতার জন্য নয়, কেউই সামান্যতম ভীত ছিল না, এই বিশৃঙ্খলা শুধুমাত্র নেতৃত্বের অভাবের জন্য। কোথায় যেতে হবে এ-ব্যাপারে কোনো নির্দেশ না-থাকায় যে যেদিকে পারল লুকিয়ে পড়ল। সেই জন্যে মিলানো ঠিক করল পিছু হঠবে। আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। খুঁজে পেতে মোটামুটি চোদ্দজনকে পাওয়া গেল। এরপর আমরা সবাই ফিরতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা একটা কুয়োর কাছে এসে হাজির। বেশ বড়োশড়ো মুখ-খোলা ছ-গজ জোড়া পাথুরে কুয়ো। জলের ওপর একটা মরা ইঁদুর ভাসছে। আমরা জলপানের জন্য দাঁড়ালাম। মিলানো অবশ্য বলেছিল, এ-অবস্থায় আমরা ধরাও প'ড়ে যেতে পারি। আমরা যখন ফিরে যাচ্ছি, আঙুর-খেতে কয়েকজনকে দেখতে পেয়ে তাদের দিকে গেলাম। সংখ্যায় তারা বেশি ছিল না। কয়েক মিনিট ঘুমিয়ে নেবার জন্যে আমরা আঙুরখেতে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে পড়তে হ'ল। বলা হ'ল এখনই আমাদের পশ্চাদপসরণ করা উচিত। আমরা কুয়ো পেছনে ফেলে খাড়াই বেয়ে ওপরে উঠে পাথরের একটা গোলা ঘরের মধ্যে চ'লে এলাম। সেখানে বিশ্রাম নিতে-নিতে আলোচনা হ'ল। শেষে একজন কমরেড, বলিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, ওভারঅল পরা একজন শ্রমিক, তিনি উদ্যোগ নিলেন এবং কিছু নিয়মকানুন চালু করলেন। আলোচনাটা ঠিক আমি বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছিলাম যে কী করা হবে এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে তিনজনের একটি কমিটি নির্বাচিত করা হবে। শেষে ঠিক হ'ল পশ্চাদপসরণ করাই বাঞ্ছনীয়। ফেরবার পথে আমি এক-জন কমরেডের মগ ধার নিয়ে কুয়োতে জল খাবার জন্যে গেলাম। আরো কয়েকজন আমাকে অনুসরণ করল। সেই গুদাম ঘরে সব মিলিয়ে পঁচিশ জন ছিল। তারপর অকস্মাৎ, একেবারে কানের কাছে বুলেটের শব্দ—জিপ্-জিপ্-জিপ্। আমরা কুয়োর পাথরের কানাচের আড়ালে ব'সে পড়লাম। তারপর ছোটো-ছোটো দলে ভাগ হ'য়ে ধীরে-ধীরে মাথা নিচু ক'রে খেতগুলো পেরুতে লাগলাম। আমাদের চারদিক দিয়েই বুলেটের ঝড় বইছিল। আরো দ্বিগুণ ঝুঁকে চললাম। মাঠ পেরিয়ে ফিরে এলাম পাহাড়ে। আমার গলা তখন একেবারে শুকিয়ে কাঠ। এত তৃষ্ণার্ত যে ঢোঁক গিলতেও কষ্ট হচ্ছে। তার ওপর প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত আর ক্লান্ত। অসম্ভব মনের জোর ছিল তাই শরীরটাকে টেনে নিয়ে একটার পর একটা পা

ফেলে এগোতে পারছিলাম। সূর্যের অবিশ্বাস্য উত্তাপের জন্য পাহাড়ে চড়াটা ভীষণ কষ্টকর ব্যাপার হ'ল। আমি নিজে মিলানোর পেছনের দিকে রইলাম। মিলানো পর্বতারোহী, কাজেই আমি যথাসম্ভব তার পরিমিত পদক্ষেপকে অনুসরণ করারই চেষ্টা করছিলাম। অবশেষে আমরা চুড়োয় পৌঁছলাম। এত কষ্ট সত্ত্বেও আমার বেশ ভালো লাগতে শুরু করল। এতক্ষণ নিজেকে এক অক্ষম সৈন্যের মতো মনে হচ্ছিল। এবার অন্যদের মতোই মনে হ'তে লাগল। আমার দেহের পক্ষে এই ধরনের শারীরিক সহনশীলতার বেশি আর-কিছু দেখানো সম্ভব ছিল না—আমি নিশ্চয়ই অন্যদের থেকে বেশি ক্লান্ত হ'য়ে পড়িনি আর জলের জন্য অনেক কম চ্যাঁচামেচি করেছি। আমাদের দলটা দুটো ভাগে ভাগ হ'য়ে গেল, একদল জলের জন্য গেল। অপর দল মিলানোর সঙ্গে আরো উঁচুতে উঠতে শুরু করল। আমরা জলের খোঁজে নিচে নেমে গেলাম। সেখানে একটা কুয়োর পাশে এক বৃদ্ধ বসে-ছিলেন। আমরা একটা ফুটো গামলায় ক'রে জল তুললাম। আমি কতটা তৃষ্ণার্ত ছিলাম এর থেকেই বোঝা যাবে যে, ফুটো গামলাটা দিয়ে হুড়-হুড় ক'রে জল বেরুতে থাকলেও গামলাটা শেষ হবার আগেই পাঁচবার কাপ (২।৩ পাঁইট) ভ'রে জল খেয়েছিলাম। আমি লক্ষ করছিলাম যে বেশি অভিজ্ঞরা অল্প পান করল। তারপর আমরা গোলাঘরে গিয়ে ঘণ্টা তিনেক ঘুমোলাম। সেই বুড়ো লোকটি আমাদের রাস্তায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। আমরা ধীরে-ধীরে তার পঙ্গু গতির সঙ্গে সমতা রেখে সাইপ্রেস বনের মধ্য দিয়ে উঁচু ক'রে পাড় দেওয়া নিষ্ফলা খেতের টুকরোগুলো পেরিয়ে পাহাড়ের গা থেকে প্রক্ষিপ্ত বড়ো-বড়ো মার্বেলের যত খণ্ড পেরিয়ে, প্রত্যেক কুয়োয় একবার ক'রে জল খাবার জন্য থেমে-থেমে নামতে লাগলাম। সবচেয়ে বিপদের সময়টা পেরিয়ে গেছে। বাকিরা এখন পাহাড়ের নিচে। আমরা যখন প্রথম শিবিরে পৌঁছলাম, শুনলাম মুখোমুখি আক্রমণে পাঁচজন মারা গেছেন। তারপর আস্তানা। সেই সবুজ শ্যাওলা ঢাকা গ্রামের বদ্ধ জলাটার চারপাশ ঘিরে যে-অ্যাম্ফিথিয়েটারটা রয়েছে সেটাকে পেরিয়ে, ফুটবল মাঠের ফাঁকা জমিটা পার হ'য়ে প্লেসিনোয় ফেরা।

অনুবাদ : শাশ্বতী ঘোষ

হানস্ আইসলার

স্পেনে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের জন্য একটি কনসার্ট

মাদ্রিদে তাঁর আস্তানায় লুডভিগ রেন-এর সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন, 'খুব ভালো হয়েছে আপনি এসেছেন। কালকে আমাদের জন্য একটি কনসার্টের ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে। কয়েকদিন আগে আপনার নামে একটি সমন পাঠিয়েছিলাম। আপনি পাননি?' কাগজপত্র ঘেঁটে একটি কাগজ তিনি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন যাতে লেখা ছিল—

হানস্ আইসলারের জন্য সমন।
কমরেড আইসলার, আপনি এখন কোথায়?
মেরু অঞ্চলে, নিউ ইয়র্কে না মস্কোয়?
দোহাই আপনাকে, আমাদের জন্য রচনা করুন সংগীত
আমাদের পক্ষে কাজটি বেজায় কঠিন
আপনার পক্ষে নিছকই মজা।
এবং তার স্বরলিপি পাঠান আমাদের
মাদ্রিদে ও বার্সেলোনায়।

স্বভাবতই আমি একটা কনসার্টের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ ছিল না। আন্তর্জাতিক ব্রিগেড সদ্য ফ্রন্ট লাইন থেকে ফিরেছে এবং সেই রাতেই তারা মাদ্রিদ থেকে কয়েক ঘণ্টার পথে—শহরে চ'লে যাবে। পেশাদার শিল্পীদের বাছাই করার না-ছিল সময়, না-ছিল সুযোগ এবং একটা অনুষ্ঠান দাঁড় করানো মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু রেন এর থেকে অনেক বড়ো-বড়ো বাধা-বিপত্তির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি আমাকে ঠাণ্ডা বরলেন। রেন বললেন, 'আমরা কয়েকটা নতুন কবিতা লিখে ফেলছি এবং আপনি তাতে সরাসরি সুর লাগাতে শুরু ক'রে দিন। কাল আপনি আমাদের কাছে—শহরে—চ'লে আসুন, সেখানে একটা হল আমরা তৈরি রাখবো। সকালে আপনি স্বেচ্ছাসেবীদের গানগুলো তালিম দেবেন আর বিকেলে, পাঁচটার সময়, আমাদের কনসার্ট হবে।' রেন তাঁর লেখার কাগজপত্র থেকে কবিতার জন্য কিছু টুকরো মালমশলা থেকে কবিতা লিখতে শুরু ক'রে দিলেন। প্রথমটা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি আমাকে

এগিয়ে দিলেন এবং আমিও সুর লাগানো শুরু করলাম। প্রায়ই বার্তাবাহকেরা এসে বাধা দিচ্ছিল আর তখন একটা ব্যাটেলিয়নও রওনা দিচ্ছিল। রেন-কে আমি খুবই তারিফ করছিলাম কারণ সামরিক কাজকর্মের ফাঁকেই তিনি কবিতা লিখছিলেন, দু-একটা শব্দ নিয়ে আমার সঙ্গে কথাও বলছিলেন। দু-ঘণ্টা কাজ করার পর চারটে নতুন গান নিয়ে আমি আমার কোয়ার্টারে ফিরে গেলাম এবং নতুন ক'রে সেগুলো আবার লিখলাম।

পরের দিন—শহরে আমার সঙ্গে ব্যাটেলিয়নের দেখা হ'ল এবং শুরু হ'ল এক স্মরণীয় সকাল। ব্যাটেলিয়নের সেক্রেটারি এক মহিলা। তিনি অনুষ্ঠানের কর্মসূচি স্টেনসিলে টাইপ করছিলেন। তৎক্ষণাৎ সেটা কয়েকশো ছেপে ফেলা হ'ল যাতে কনসার্টে উপস্থিত প্রত্যেকে একটি ছাপা কর্মসূচি পায়। নতুন গানগুলো তাতে ছাপা ছিল যাতে তারা গানে গলা মেলাতে পারে। গান গাইতে পারেন এমন কমরেডরা বিভিন্ন বাহিনী থেকে এসে রিপোর্ট করতে লাগলেন। কনসার্ট শুরু হওয়া অবধি আমরা আমাদের মহলা চালিয়েছিলাম। মাদ্রিদে স্পেনীয় ভাষায় আমি নতুন **Marsch des fünften Regiments**-এ সুর দিয়েছিলাম, স্পেনের কমরেডদের সঙ্গে তার মহলা হ'ল। ফরাশি ব্যাটেলিয়নের প্রধান দুমঁ আমাকে একটি ফরাশি ভাষ্য পাঠিয়েছিলেন। ফরাশি কমরেডদের সঙ্গে তার মহলা হ'ল। অস্ট্রিয়ার কমরেডরা এমনকী একটা আকর্ডিয়নও জোগাড় করেছিলেন। জার্মান কমরেডদের সঙ্গে আমরা **7. Januar** গানের মহলা দিলাম। ইহুদি স্বেচ্ছাসেবীরা তাঁদের কয়েকটি অসামান্য লোকগীতি গাইবার জন্য আমার সাহায্য চাইলেন।

বিকেল পাঁচটায় আমার দেখা সেই অন্যতম অনন্য কনসার্ট ঠিক সময়ে শুরু হ'ল।

মঞ্চের ওপরে স্বেচ্ছাসেবীরা ছিলেন যাঁরা গান গেয়েছিলেন। আহত কয়েকজন তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। স্বেচ্ছাসেবী ও স্পেনীয়রা বসেছিলেন প্রেক্ষাগৃহে। হোক সহজ ও সরল কিন্তু কোনোরকমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য তৃষ্ণা কী তীব্রতার সঙ্গেই না প্রকাশিত হয়েছিল! এটা সম্যকভাবে বোঝার দরকার। স্বেচ্ছাসেবীরা প্রচণ্ড কষ্টদুঃখ স'য়ে এসেছেন, আরো কঠিন বাধা রয়েছে সামনে। ফ্রণ্ট থেকে এসে তাঁরা তাঁদের কঠোর ও অসামান্য অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে চাইছিলেন। অন্যান্য জাতির স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে তাঁরা মিলতে চাইছিলেন।

অসাধারণ হয়েছিল সেই অনুষ্ঠান। গান খুব সুন্দর হয়নি কারণ ট্রেঞ্চের হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডায় অনেকের গলা ব'সে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁদের গান গাওয়া

হয়েছিল প্রাণবন্ত এবং তাঁরা উৎসাহভরে গেয়েছিলেন। কৃষক যুদ্ধে নিশ্চয়ই কৃষকরা তাদের বিদ্রোহের গান এমন ক'রেই গেয়েছিল, এমন ক'রেই গেয়েছিল 'ট্যাবরাইটরা',* প্রথমবার 'লা মার্সাঈ' নিশ্চয়ই এমনই শুনিয়েছিল। স্বরস্রষ্টা হিশেবে আমার কাছে সেই সন্ধ্যা ছিল অতীব শিক্ষামূলক। আরো-একবার প্রমাণিত হ'ল যে সংগীত কী প্রয়োজনীয় এবং নতুন দুনিয়ার জন্য মহান সংগ্রামে সংগীত কতটা গুরুত্বপূর্ণ হ'তে পারে।

অনুবাদ : নবারুণ ভট্টাচার্য

* ট্যাবরাইটরা ছিলেন হুসাইটদের (১৫শতাব্দী) র‍্যাডিকাল দলের সদস্য।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

স্পেনে নিহত আমেরিকানদের প্রসঙ্গে

স্পেনে আজ রাতে নিহতরা ঠাণ্ডার মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে। তুষারঝড় চলেছে জলপাই বাগিচার ভেতর দিয়ে, চলেছে গাছের শেকড়-মাটি দু-ভাগ ক'রে। কবরের ঢিবির ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে তুষার যেখানে ছোটো-ছোটো কাঠের ফলক লাগানো (ফলক লাগাবার সময় যখন ছিল)। ঠাণ্ডা বাতাসে জলপাই গাছগুলো রোগা কারণ তাদের নিচু ডালগুলোকে একসময় কেটে ট্যাঙ্কের ওপরে ঢাকা দেওয়া হয়েছিল এবং জারামা নদীর ওপরে ছোটো পাহাড়ে নিহতরা ঘুমিয়ে রয়েছে। যখন তারা সেখানে মারা গিয়েছিল সেই ফেব্রুয়ারিতে শীত ছিল এবং তারপর থেকে নিহতরা ঋতুবদলের ব্যাপারটা লক্ষ করেনি।

দু-বছর হ'য়ে গেল লিনকন ব্যাটালিয়ন সাড়ে-চার মাস ধ'রে জারামার উঁচু জায়গায় দখল রেখে লড়াই করেছিল এবং প্রথম যে-আমেরিকান নিহত হয়েছিল সে সেই থেকে অনেকদিন ধ'রে স্পেনের মাটির অংশ হ'য়ে গেছে।

স্পেনে আজ রাতে নিহতরা ঠাণ্ডার মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে এবং সারা শীত তারা ঠাণ্ডার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকবে যেমন মাটিও ঘুমোবে তাদের সঙ্গে, কিন্তু বসন্তে বৃষ্টি আসবে মাটিকে সদয় ক'রে তোলবার জন্য। দক্ষিণের পাহাড়ের ওপর বাতাস আলতো ব'য়ে যাবে। কালো গাছগুলো ছোটো-ছোটো সবুজ পাতায় বেঁচে উঠবে এবং জারামা নদী বরাবর আপেল গাছগুলোতে ফুল ধরবে। এই বসন্তে নিহতরা আবার অনুভব করবে যে মাটি আবার বেঁচে উঠতে শুরু করেছে।

আমাদের নিহতরা এখন স্পেনের মাটির অংশ এবং স্পেনের মাটি কখনও ম'রে যেতে পারে না। প্রত্যেক শীতে মনে হবে স্পেন ম'রে যাচ্ছে কিন্তু প্রত্যেক বসন্তে তার মাটি আবার বেঁচে উঠবে। আমাদের নিহতরাও স্পেনের সঙ্গে চিরদিন বেঁচে থাকবে।

পৃথিবী যেমন কখনো মরতে পারে না তেমন যারা স্বাধীন কখনো তারা আর ক্রীতদাসত্বে ফিরে যাবে না। যেখানে আমাদের নিহতরা শুয়ে আছে সেখানে যে-কৃষকেরা মাটি চষে তারা জানে যে নিহতরা কেন মরেছিল। যুদ্ধের সময় এগুলো শেখার সময় তাদের হয়েছিল এবং মনে করবার জন্য তাদের সামনে চিরকাল প'ড়ে আছে।

আমাদের নিহতেরা স্পেনীয় কৃষক, স্পেনীয় শ্রমিক, সমস্ত ভালো, সরল ও সৎ মানুষের হৃদয় ও মনে বেঁচে আছে যারা স্পেনের প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাস করেছিল, তার জন্য লড়াই করেছিল। এবং যতদিন আমাদের নিহতরা স্পেনের মাটিতে বেঁচে থাকবে, যতদিন পৃথিবী বেঁচে থাকবে, ততদিন স্পেনে কোনো সন্ত্রাসের ব্যবস্থা কায়েম হ'তে পারবে না।

অন্য দেশ থেকে আনা ধাতব অস্ত্রের ভার খাটিয়ে, বিস্ফোরণে রাস্তা বানিয়ে ফাসিস্তরা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশ্বাসঘাতক ও কাপুরুষরা তাদের এগিয়ে চলায় মদত দিতে পারে। তারা শহর ও গ্রাম ধ্বংস করতে পারে এবং জনগণকে দাসত্বের জোয়ালে বাঁধতে চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু জনগণকে দাসত্বে আবদ্ধ করা তাদের অসাধ্য।

অতীতে যেমন তারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তেমনই উঠে দাঁড়াবে স্পেনের মানুষ। মৃতদের উঠে দাঁড়াবার দরকার নেই। তারা এখন মাটি-পৃথিবীর অংশ এবং তাকে কেউ হারাতে পারে না। কারণ পৃথিবী চিরদিন আছে ও থাকবে। সন্ত্রাসের সমস্ত ব্যবস্থা ছাপিয়ে পৃথিবী বেঁচে থাকবে।

যারা এই পৃথিবীতে সম্মানের সঙ্গে প্রবেশ করেছে এবং স্পেনে যারা নিহত হয়েছে তাদের মতো সম্মানের সঙ্গে কেউই পৃথিবীতে আশ্রয় নেয়নি : তারা এর মধ্যেই অর্জন করেছে অমরত্ব।

অনুবাদ : নবারুণ ভট্টাচার্য

কৃষ্ণ ধর

স্পেনের অগ্নিক্ষরা দিনগুলি

স্পেনের ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের স্মৃতি আমার কাছে এক দুর্লভ সম্পদ। সে-স্মৃতি নিজের অভিজ্ঞতার নয়, তবু তা একান্তভাবেই অভিজ্ঞতার অংশ, উজ্জ্বল চেতনায় সংযুক্ত। কলকাতায় থেকে মাদ্রিদের স্বপ্ন দেখেছি। স্পেনের শহরে, অরণ্যে. জলপাইপাতার অন্তরালে সেই দৃঢ়চেতা মানুষগুলোর সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন অনুভব করেছি। ফাসিস্ত ডিক্টেটর ফ্রাঙ্কো স্পেনের গণতন্ত্রকে হত্যা ক'রে জয়ী হ'ল। স্পেনের মানুষের সেই পরাজয়ে বিষণ্ণ হয়েছি। কিন্তু সেই অপরিসীম বীর্যের কথা ভুলিনি। স্পেন আমাদের ভবিষ্যতের জন্য যুদ্ধ করেছিল, শুধু স্পেনের জন্য নয়। স্পেনের মানুষের কী দোষ ছিল? তাঁরা চেয়েছিলেন শান্তি ও গণতন্ত্র, নিজেদের জন্য মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ জীবন, আগামীকালের জন্যও। সেই অপরাধে রক্তের স্রোতে, চোখের জলে স্নাত হয়েছে মাদ্রিদ, ভেসেছে বার্সেলোনা, কিন্তু তাঁরা পারেননি। ডিক্টেটর ফ্রাঙ্কো দুর্মদ শক্তি নিয়ে মুসোলিনির ইতালি, আর হিটলারের জার্মানির সহযোগিতায় হত্যা করল স্পেনের গণতন্ত্র। স্পেনের রিপাব্লিকের পতন ও ফাসিস্ত ফ্রাঙ্কো-বাহিনীর ক্ষমতা দখলে ইউরোপের ইতিহাসে ফ্যাসিবাদের যুদ্ধাভিযানকে উৎসাসিত করল।

দুই দশকেরও বেশি. স্পেনের দরজা গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে বন্ধ। সেখানে নতুন পৃথিবীর কোনো কথা গিয়ে আর পৌঁছোয় না। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য, ফাসিস্ত ফ্রাঙ্কো এখনও (১৯৭০) দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বর, স্পেনের গণতন্ত্রের জল্লাদ। এই গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য পৃথিবীর সকল দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের কটি বছর, গণতন্ত্রের শ্মশানবন্ধুদের উন্মত্ত নৃত্য, স্পেনের মাটিতে রক্তের দাগের অশ্রুমাখা ইতিহাস এখনও মুছে যায়নি।

আলভা বেসি, ব্রুকলিনের মার্কিন নাগরিক, আব্রাহাম লিঙ্কন ব্রিগেডের স্বেচ্ছাসেনা, সুদূর আমেরিকা থেকে আদর্শের তাগিদে ছুটে গিয়েছিলেন স্পেনের রক্তাক্ত প্রান্তরে, মূরদের দেশে, ফ্যাসিজমের হাত থেকে গণতন্ত্রকে মুক্ত করবার অফুরন্ত বাসনায়, ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের হ'য়ে যুদ্ধ করবাব জন্য। আজকের রুদ্ধকণ্ঠ স্পেন কারাগারের অন্তরালে, ফ্রাঙ্কোর বেয়নেটের ধারালো ডগার ঝলকানির আসরে সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলিকে স্মরণ করে। নন-ইণ্টারভেনশনের ছদ্মবেশের

আড়ালে ফ্রাঙ্কোর দস্যুদলকে পরোক্ষ সহায়তা করেছিল ইউরো-মার্কিন শক্তির দল। সেই নিদারুণ সংকটের দিনে যৌবনের পতাকা উড়িয়ে, মুক্ত মানুষের জয়গানে স্পেনের আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে উপস্থিত হয়েছিল ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড। নাৎসি শক্তিতে বলীয়ান ফ্রাঙ্কোর ফাসিস্ত বাহিনীর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল ব্রিটিশ, মার্কিন, ফরাশি, চীনা, জার্মান ও পোল তরুণের দল। এদের কেউ সাহিত্যিক, কেউ-বা সত্য কলেজে-পড়া আদর্শবাদী যুবক। সকলেই কাঁধে নিল বন্দুক। গণতন্ত্রের জন্য মহা আহবে প্রাণ দিতে। যুদ্ধের শিক্ষাও নেই সকলের; সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, রসদের জোগান দেবার মতো ক্ষমতাও তখন ছিল না রিপাব্লিকান সরকারের। তবু প্রাণের অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে, শান্তি ও গণতন্ত্রের পবিত্র সংগ্রামে, স্পেনের মুক্তিকামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল :

Hold, Madrid, for we are coming,
I. B. men be strong......
Side-by-side, we'll battle on-ward,
victory will come !

সেই অবিনশ্বর সংগীতের ডায়েরি আলভা বেসি-র 'মেন ইন ব্যাটল্'। এই ডায়েরির পাতায়-পাতায় এক দুঃস্বপ্নের ইতিকথা মর্মরিত। এর অন্তরালে লুকিয়ে আছে অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা, যা সেদিন পূর্ণ হয়নি। তবু একদিন তারা কথা বলবে : এই মৌন আকাঙ্ক্ষাগুলো মুখর হ'য়ে উঠবে যেদিন মুসোলিনি ও হিটলারের মতো মুছে যাবে ফ্রাঙ্কো, মাদ্রিদে আবার মুক্ত মানুষের জয়গান হবে উচ্চারিত।

আলভা বেসি-র বর্ণনায় একটি আদর্শবাদী সৈনিকের স্মৃতিচিত্রণের অন্তরঙ্গরূপ বিশ্বাসে ও প্রেরণায় উজ্জ্বলতর হ'য়ে ফুটে উঠেছে। এক গভীর সংকটে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড স্পেনের মানুষকে সাহস দিয়েছিল, হেসে, গান গেয়ে, প্রাণের অফুরন্ত যৌবন-প্রেরণার সুগভীর বিশ্বাসে। সে-কষ্টের তুলনা নেই। ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড স্পেনের মানুষের কাছে তখন একটি প্রতীক, পৃথিবীর গণতান্ত্রিক মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংকল্পের একটি সিম্বল। পুরোনো ভাঙাচোরা ট্রেনে, দশজনের জায়গায় কুড়িজন এক-একটি কামরায় গাদাগাদি ক'রে ব'সে, চাঁদের আলোতে গান গেয়ে, জলপাইয়ের অরণ্যের ভিতর দিয়ে তারা এগিয়ে গেল ফ্রণ্টের দিকে। মাদ্রিদ আর কতদূর! গীর্জায়-গীর্জায় স্পেনের

মানুষ প্রার্থনা করত, প্রতি স্টেশনে এসে জানাত বন্ধুত্বের সম্ভাষণ : দরিদ্র, ক্ষুধার্ত গ্রাম্য শিশুরা এসে ভিক্ষা চাইত একটুকরো রুটি, একটুকরো সিগারেট :

Un poco de pan, Camarada ? Tienes pan ? Tienes tabaco por mi, padre ?

এর পরিবর্তে তারা দিত কমলালেবু, বড়ো টশটশে পাকা কমলালেবু। সৈনিকরা তাদের ওপর রুটি আর সিগারেট বৃষ্টি করত। সেই বিষণ্ন, ক্ষুধার্ত শিশু আর নারীদের দেখে সৈনিকরা উচ্চকণ্ঠে গেয়ে উঠত :

Arise, ye prisoners of starvation !

স্টেশনে সমবেত জনতা মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচু ক'রে স্বরে স্বর মেলাত, 'জাগো অনশন-বন্দী যত, জগতের নিপীড়িত ভাগ্যহত'। ট্রেন ছাড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যায়, আন্তর্জাতিক সর্বহারাদের সেই গান, ফাসিস্ত ফ্রাঙ্কোর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি ক'রে মুখর ক'রে রাখত প্রতিটি স্টেশন। আলভা বেসি সেই মেঘে-ঢাকা আকাশের দিনগুলোর কথা লিখেছেন, যখন উজ্জ্বল সূর্যকরের জন্যে মানুষের প্রার্থনার অন্ত ছিল না। তিনি নিজের প্রেরণার সততায় সেই বিগতদিনের অনুভূতি উত্তরকালে আমাদের জন্য গচ্ছিত রেখেছিলেন। হতাশায় কোনোদিন তাঁরা হতোদ্যম হননি, গভীর দুঃখে হননি বিচলিত। মৃত্যুঞ্জয়ী এই মানুষগুলির ইতিহাস প'ড়ে কতবার চকিত হয়েছি, কত বিনিদ্র রাত্রিতে ভেবেছি, কলকাতা থেকে মাদ্রিদের দূরত্ব কী দুরতিক্রম্য! আলভা বেসির এই উত্তপ্ত হৃদয়ের বর্ণনা আমার সেই প্রশ্নের উত্তর এনে দিয়েছে। কী ক'রে ভুলি স্পেনের নির্মম তুষার-বিছনো প্রান্তরে সেদিন ঘুম পাড়িয়ে এসেছি কডওয়েলকে, র‍্যালফ ফক্সকে, জন কর্নফোর্ডকে। ফাসিস্ত ফ্রাঙ্কোর ঘাতক হরণ ক'রে নিয়েছে ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকার অমূল্য জীবন। সেই জ্বালা, আমার কাছে, আত্মীয়বিয়োগের জ্বালার থেকেও অধিক। আমার চেতনায় হয়তো আজীবন তার উত্তপ্ত উপস্থিতি চিরস্থায়ী আসন নিল। প্রাণচঞ্চল যৌবনের উত্তাপে, আদর্শের উজ্জ্বল প্রেরণায় লিঙ্কন ব্রিগেডের প্রতিটি স্বেচ্ছাসৈনিক সেদিন স্পেনের অপরিচিত প্রান্তরে স্পেনের মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, রক্ত দিয়ে রুখে ছিল ফ্যাসিজমের বিরাট দানবকে। কারণ তারা জানত ফ্যাসিজম থেকে পশ্চাৎ-অপসরণ অসম্ভব। আরভিং বলেছিলেন : **Comrades, don't you realise that it's impossible to retreat from Fascism ?**

অনেকেই প্রাণ দিলেন, কিন্তু পশ্চাৎ-অপসরণ করেননি কেউ। ছাউনিতে ব'সে এঁরাই গীটার বাজিয়ে কখনও গেয়েছেন :

Give me a home, where the buffalo roam,
Where the deer and the antelope play,
Where seldom is heard, a discouraging word,
And the skies are not cloudy all day.

এই স্বস্তি, শান্তি ও সুখ, এঁদের একার কামনা নয়, পৃথিবীর অগণিত মানুষের। আলভা বেসি তাই বলেছেন :

During that struggle we partisans of the Republic said that if Spain was lost there would be a second world war. Since World War II ended we have been saying that if Spain remains fascist, the danger of a third is always imminent.

আজ আবার আমরা এই নির্মম সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। 'মেন ইন ব্যাটল' সেই সত্যের মুখাবরণ উন্মোচিত করেছে। এই গ্রন্থ ইতিহাস থেকে ভবিষ্যতের দিকে জ্বলন্ত অঙ্গুলিনির্দেশ।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্রাঙ্কোর বলি : মিগেল এর্‌নান্‌দেথ্‌

১ যে-কবিতায় পর্দা উঠলো গৃহযুদ্ধের

আঁৎকে গুটিয়েছে মাঠ
যখন দেখেছে সে চোখে
তুমুল ছুটে আসে লোক,
পেশীরা আঁটো, উদ্যত।

সে-কোন্‌ খাদ দেখা দেয়
মানুষ-জলপাইবনে !

যে-প্রাণী গান করে সুরে :
যে-প্রাণী চিরকাল পারে
কাঁদতে আর মূল তার
বসাতে মাটি-পৃথিবীতে,
তারও তো মনে আছে নখ।

নখ সে সাজিয়েছে ফুলে,
রেশমি ফিনফিনে সাজে,
তবুও বের হ'য়ে আসে
নগ্ন নির্দয় নখ।

আমারই নখগুলো আজ
আমারই হাত আঁচড়ায়।
স'রে যা, বাছা, তুই দূরে।

না-হ'লে বসাবো যে নখ,
না-হ'লে ছিঁড়ে দেবো নখে
তোর ও-ভঙ্গুর দেহ।

ফের তো হ'য়ে গেছি বাঘ,
দুরে যা, না-হ'লে যে তোর
কিছুতে নিস্তার নেই।

আজকে ভালোবাসা হ'লো
অন্য নাম মৃত্যুরই—
মানুষই মারে মানুষকে।

২ মিগেল এর্‌নান্‌দেথ্‌

মিগেল এর্‌নান্‌দেথ্‌ জন্মেছিলেন ১৯১০-এ; তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো ১৯৪২-এর বসন্তে, যক্ষ্মায়, ফ্রাঙ্কোর জেলখানায় একটানা তিন বৎসর কাটানোর পর। তাঁর বয়েস তখন বত্রিশও হয়নি।

৩ জনতার থেকে হাওয়া

জনতার থেকে হাওয়া এসে আজ আমাকে লালন করে
হৃদয়ে ছড়িয়ে গিয়ে।
জনতার থেকে হাওয়া এসে জোর আমাকে সামনে ঠ্যালে,
গরগর করে আমারই গলায় রোষে।
শাস্তি পাবার আগে টের পেলে বন্ধ্যা নিরীহ ষাঁড়
নীরবে নোয়ায় মাথা,
সিংহ কিন্তু তার মাথা তোলে উলটে শাস্তি দিতে
রূঢ় কর্কশ থাবার রুক্ষ স্বরে।
আমি তো আসিনি ষাঁড়ের মতন কোনো জনগণ থেকে,
আমার জনতা সোৎসাহে দেয় সিংহের লাফ যেন
কিংবা দীপ্ত ছোঁ-মারা ঈগল বুঝি,
শিঙে যার আছে অটুট অহংকার
আমার জনতা তেমন মোষের দুর্দম তাড়া যেন।

এস্পানিয়ার শূন্য ঊষর পর্বতভূমিতলে
ষাঁড় বা বলদ জন্মেনি কোনোদিনও।
কারা বলে তারা জোয়াল পরাবে এমন জাতির কাঁধে?

কে কবে জোয়াল পরিয়েছে বলো তুমুল ঘূর্ণিহাওয়ায়,
কিংবা খাঁচায় বন্দী করেছে অগ্নিগর্ভ বাজ ?
এই যারা আছো বাস্কে, যেন-বা পাথরবর্ম পরা,
এই যারা আছো সাহসী আস্তুরীয়,
দুরন্ত সব ভালেন্‌সিয়ানো চাষী,
—মাটি, তবু কোনো ডানার মতন তোমরা হাওয়ায় ভাসো—
এই যারা আছো চাষ-করা কোনো মাটির মতনই রোদেবৃষ্টিতে গড়া
কাস্তিইয়ের মানুষ,
আন্দালুসীয় বিদ্যুৎছিলা যারা,
গিটারের সুরে জন্ম যাদের, মূর্তি যাদের গড়া
অশ্রুর কোনো প্লাবিত কামারশালে,
রাইশস্যের খেতের মধ্যে এস্ত্রেমাদুরাবাসী,
শান্ত বাদল ঝরেছে যেখানে সেই গালিসিয়াবাসী,
কাতালোনিয়ার নাছোড় আস্থাবাদী,
আরাগন থেকে শুদ্ধ জাতক তোমরা এসেছো যারা,
বিস্ফোরকের মতন সুফলা মুরসীয় যারা আছো,
ক্ষুধা ঘাম আর দৃপ্ত কুঠার শাসন করেছো যারা,
জয় ক'রে গেছো ধাতুর রাজ্য, কৃষিকর্মের প্রভু,
নাভারের আর লেওনের সেই প্রতিভূ মানুষজন,
শেকড়ের মাঝে শেকড় গরিমাময়,
জীবন থেকে যে মৃত্যুতে যায়, শূন্যতা থেকে অন্য-শূন্যে কোনো,
যারা আজ আসে স্বল্প শ্যামল তৃণদলভূমি থেকে,
তোমাদের ওরা জোয়ালে বাঁধতে পারবে না কোনোকালে,
বরং ওদের নিজেদেরই পিঠে যে-জোয়াল আছে আজ
তাকে তোমাদেরই টুকরো করতে হবে
ষাঁড়-বলদের সন্ধ্যা সূচনা করে
ঝলমলে ঊষা, দৃপ্ত, প্রতিভাময় !
খামারের যত দীন গন্ধের পোশাক জড়ায়ে পিঠে
ষাঁড় ও বলদ ম'রে যায়, আসে ঈগল ও সিংহেরা—
তাদের পিছনে অবারিত হাওয়া, নির্বাধ নীলাকাশ—
আর উদ্ধত জেদি মোষ আছে যত

শান্ত ও স্থির—তারা কেউ মরবে না।
জোয়ালে বাঁধা যে-ষাঁড় ও বলদ তার মৃত্যুর কোনো
বিশেষ মূল্য নেই।
অথচ সবীজ বীরদের যত মৃত্যুযন্ত্রণা যে
ছড়ায় বিশ্বজুড়ে।
আমাকে যদি-বা মরতেই হয়, মাথা তুলে যেন মরি।
যদি ম'রে যাই, কুড়িগুণ মৃত, কর্কশঘাসে তখন ঝলসে উঠবে আমার মুখ—
দাঁতে দাঁত চাপা, গালে খরখরে দাড়ি।
গান গেয়ে আমি আহ্বান করি নির্ভয়ে মৃত্যুর,
কেননা সকল যুদ্ধের মাঝখানে
বন্দুক আর রাইফেলগুলো যত-খুশি গর্জাক,
গান ক'রে ওঠে সমস্ত শোর ছাপিয়ে প্রবল স্বরে
সে যে কত-শত দুর্জয় বুলবুল।

• কবি ও রাখাল

মিগেল এর্নানদেথ্‌ ছিলেন রাখাল, পূর্ব স্পেনের ওরিউয়েলা গ্রামে ছাগল চরাতেন। তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন নিজের চেষ্টায়, প্রায় একা-একাই। গাঁয়ের চার্চের গ্রন্থাগার তাঁকে সন্ধান দিয়েছিলো স্পেনের সাহিত্যের স্বর্ণযুগের: গোঙ্গোরা, কেভেদো, লোপে দে ভেগা, কালদেরোন এবং আরো-অনেক স্মরণীয় কবি-নাট্যকারকে এই চার্চের ধূলিধূসর লাইব্রেরিতেই আবিষ্কার করেছিলেন এর্নানদেথ্‌। একদিক থেকে সেটা তাঁর পক্ষে ভালোই হয়েছিলো। কেননা স্বর্ণযুগের পর স্পেনের সাহিত্যে সে-একটা বিষম বন্ধ্যা ও ঊষর যুগ গেছে। কবিতা আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে বিংশ শতাব্দীতে—ফেদেরিকো গার্থিয়া লোরকা, রাফায়েল আলবের্তি, আন্তোনিয়ো মাচাদো, ভিসেন্তে আলেইহান্দ্রে, হোর্হে গিয়্যেন পর-পর আবার অনেকগুলো নাম জ্বলজ্বল করতে থাকে। যেন কেউ দীর্ঘদিন পর অসাড় কোনো ঘুম থেকে জেগে উঠেছে, সোৎসাহ, শক্তিময়, স্বাস্থ্যবান। কিন্তু সেই জাগরণ যে স্পেনের রাজনৈতিক নবজাগরণের সমসময়েই ঘটেছিলো, এটা কোনো কাকতাল নয়। এই কবিদের সকলেই যে ফ্রাঙ্কো-বিরোধী ছিলেন, সকলেরই যে বিশ্বাস ছিলো সাম্যবাদে—এটাই বুঝিয়ে দেয় যে দেশের রাজনৈতিক জাগরণের সঙ্গেই জড়ানো ছিলো সাহিত্যেরও নবজাগরণ। এঁদেরই মধ্যে একজন কবি এর্নানদেথ্‌। কিন্তু ফ্রাঙ্কো যাদের হত্যা করেছিলো কিংবা

দেশ থেকে পাঠিয়েছিলো নির্বাসনে, গার্থিয়া লোরকা বা আন্তোনিয়ো মাচাদো যেমন, তাঁদের মতো এর্নানদেথ্‌কেও ফ্রাঙ্কোর বলি হ'তে হ'ল, যখন তাঁকে গ্রেফতার ক'রে বিনাবিচারে আটকে রাখা হ'লো ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে; অন্ধকার জেলকুঠুরিতে, যেখানে তাঁর ফুশফুশ ঝাঁঝরা ক'রে দিলো ক্ষয়রোগ।

৫ ফ্রন্টের হাসপাতালের দেয়ালের জন্যে : 'প্রথম মানুষ'

যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে প'ড়ে থাকে কত ক্ষত-বিক্ষত।
যুযুধান যত শরীর ছড়ানো এ-বিশাল প্রান্তরে
ফোয়ারায় ছোটে উষ্ণ রক্ত, যেন-বা গমের খেত,
ছোটো সব ধারা, ঘন স্বরে কথা বলে।

সকল সময় রক্ত ঝরেছে আকাশ লক্ষ্য ক'রে।
সমুদ্র-শাঁখ যেন রব তোলে, আহতরা শুয়ে থাকে,
যদি থাকে কোনো ক্ষিপ্র উড়াল ক্ষত-অভ্যন্তরে,
ঢেউ যদি ডাকে সারাৎসারেই তার।

সিন্ধুর ঘ্রাণ রক্তে যেন-বা. সিন্ধুর স্বাদ, সুরার লহর যত।
সিন্ধুরই সুরা, রূঢ় সে মদিরা, ছিটকে ভেঙেছে—যেথা
আহত মানুষ ডুবে যায়, তার অবিরাম শিহরন,
আর সে যেন-বা ফুল, ফুটে ওঠে, কোথা আছে সেটা জানে।

আহত আমিই : তাকাও এদিকে : আরো প্রাণ চাই, আরো।
ক্ষত থেকে এই রক্তের যত সমর্পণকে ছড়াবো ভাবছি আমি
এই এক প্রাণ তার পক্ষে যে কত ছোটো সেটা জানি।
কখনও আহত হয়নি, এমন কেউ কি কোথাও আছে?

সুখী শৈশব নিয়েই আমার জীবন একটি ক্ষত।
কখনও যে-জন জখম হয়নি ; যে বোঝেনি কোনোদিনও
জীবনই যে তাকে আহত করেছে, সানন্দে বিক্ষত
ঘুমোয়নি যে, তাকে করুণাই কোরো, দয়ার পাত্র সে যে।

সানন্দে কেউ কখনো যদি-বা গিয়েছে হাসপাতালে
যেন আধোখোলা ক্ষতের বিতান, এমনি সে হ'য়ে ওঠে,
কুসুমিত এক রক্তকরবী ব্যবচ্ছেদের ঘরে,
আর রাঙা দরোজায়।

২

আমার রক্ত ঝ'রে-ঝ'রে পড়ে যেই ভাবি স্বাধীনতা,
সে-ই তো আমার সংগ্রাম, বাঁচি তার জন্যেই শুধু।
'স্বাধীনতা'-ভেবে আমি যেন কোনো বন্দী রক্ততরু,
সদয়, সাদরে শল্যবিদকে দিয়ে দিই চোখ, হাত।

মুক্তির কথা ভাবতেই বুকে বালির চেয়েও বেশি
কত-যে হৃদয় দপদপ করে; ধমনী ছড়ায় ফেনা,
আমি ঢুকে পড়ি হাসপাতালের তুলোয় বা ব্যাণ্ডেজে,
যেন তারা সব ফুটেছে পদ্মফুল।

যারা মুক্তির মূর্তি ধুলোয় লুটিয়েছে এইখানে,
লড়বো তাদেরই বিরুদ্ধে আমি, এই ভেবে ছুটে যাই।
আমার হাত-পা বাড়ি-ঘর, সব—যা-কিছু—সকল থেকে
ছিটকে বেরোই যুদ্ধে কেবল মুক্তির কথা ভেবে।

কেননা যখন শূন্য চক্ষুকোটর সকাল হবে
মুক্তি বসাবে দুটি মণি যারা ভবিষ্যৎকে ছাখে,
মুক্তিই দেবে নতুন হাত-পা ছিন্নভিন্ন দেহে,
আবার তা যাতে অম্লান জন্মায়।

সকল ক্ষতের মধ্যে হারাই দেহের টুকরো যত,
অঙ্কুর মেলে তারাই আবার প্রাণরসায়িত, হেমন্তহীন ডানায়-
কেননা আমি যে ছেঁটে-ফেলা গাছ, তবু জন্মাই ফের :
যেহেতু এখনও আমার মধ্যে দপদপ করে প্রাণ।

৬ কবি ও রাখাল (পূর্বানুবৃত্তি)

মিগেল এর্নানদেথের প্রথম কবিতার বই 'অনেক চাঁদে দক্ষ' বেরোয় ১৯৩৩ সালে। এর কবিতাগুলো প্রথমে বেরিয়েছিলো স্থানীয় কাগজেই, আর যখন তাঁর বয়েস বাইশ, প্রধানত রামোন সিহে-র চেষ্টায় ও উৎসাহে কবিতাগুলো এক জায়গায় জড়ো ক'রে বই বার করা হ'লো : 'পেরিতো এন লুনাস'। তিনশো বছর আগেকার স্পেনে স্বর্ণযুগের সাহিত্যেরই অনুসরণে আঁটসাঁট স্তবকে গড়া এই কবিতায় এর্নানদেথ্ সতেজ উৎসাহে ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁরই নিজের বিংশ শতাব্দীর শৈশব, আর রচনা করেছিলেন এমন-একটি বই যার শিষ্ট শক্তি মুগ্ধ করেছিলো ফেদেরিকো গার্থিয়া লোরকাকে, যার রচনানৈপুণ্য ও নির্মাণকৌশল প্রশংসা পেয়েছিলো হুয়ান রামোন হিমেনেথের।

তিন বৎসর পরে, মিগেল এর্নানদেথ্ ততদিনে মাদ্রিদে, কবি মানুয়েল আল্তোলাগিররের প্রকাশভবন থেকে বেরিয়েছিলো এর্নানদেথের দ্বিতীয় কবিতার বই : 'এল রাইয়ো কে নো থেসা' ('যে-বজ্র কখনও থামে না')। তিন-চারটি বড়ো কবিতা ছাড়া এই বইতে ছিলো আঁটো ধ্রুপদী গড়নের সনেটগুচ্ছ : আঁটো ও ধ্রুপদী গড়ন, তবে তাতে অবিশ্রাম কালো ডানা আছড়াচ্ছে প্রেম, যেখানে ঝড় উঠেছে কামারশালার হাতুড়ি আর নেহাইয়ে, আর বুক ঠুকরে ফেঁড়ে যাচ্ছে বাজপাখির তীক্ষ্ণ চঞ্চু। তাছাড়া আছে একটি দীর্ঘ কবিতা, তাঁর বন্ধু রামোন সিহে-র মৃত্যুতে বিলাপ, গার্থিয়া লোরকার বুলফাইটার বন্ধুর মৃত্যুতে বিলাপের সঙ্গে তার তুলনা চলে। এর্নানদেথ কখনও কোনো বিবর্ণ ও পাণ্ডুর আবেগ নিয়ে কাজ করতেন না : তাঁর সনেটগুচ্ছ যেন মোড়কে-বাঁধা বিস্ফোরক, যার মধ্যে বারুদের মতো দপদপ করছে তাঁর প্রচণ্ড হৃৎপিণ্ড।

৭ সৈন্য ও তুষার

ঠাণ্ডায় জমিয়ে দেয় ডিসেম্বর দু-ধার নিশ্বাসে,
হিম সে আকাশ থেকে ফুঁ দিয়ে পাঠায় তাকে নিচে,
শুকনো-কোনো আগুনের সুতো যেন খুলে-খুলে আসে ;
সৈন্যদের গায়ে এসে আছড়ায় যেন কোন্ প্রচণ্ড বর্ষণ।
যেখানে অশ্বের দল রেখে গেছে ক্ষুরচিহ্নগুলি
তুষার সেখানে যেন বেদনারই নিঃসঙ্গতা কদম-কদম গেছে দূরে,
ফেটে-যাওয়া নখ যেন এমন তুষার, কিংবা যেন জীর্ণ থাবা কারু,
যেন কোনো স্বর্গের পিশুন, যেন কোনো চরম বিদ্বেষ।

ভেতরে বিশাল-ভারি রংচটা মর্মর কুঠারে
যে যেন কামড়ায়, ছাঁটে, কাটে, ফাঁড়ে, আঁচড়ায় কেবল।
পাখা ও নয়ানজুলি, নিঃসঙ্গতা আর তুষারের ধ'সে-যাওয়া যত আলিঙ্গন
নেমে আসে অবিরাম, ঝ'রে পড়ে সবখানে—এমন তুষার।
শীতের গভীর মূল থেকে ছিটকে আসে এইসব হিংসা ও হিংস্রতা।
ক্ষুধিত ও হিম থেকে সারাক্ষণ ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে কাঁচা ক্ষুধা,
ঝুলে থাকে নগ্ন-সব দেহের ওপর, চিরন্তন যে-বিদ্বেষ তার
সে যেন ধবল, মৌন, অন্ধকার, উপবাসী, আরো-মারাত্মক।
নেহাই, বিদ্বেষ, সব শিখাগুলি—সে চায় নরম ক'রে দেবে,
সে চায় থামাতে সিন্ধু, গোর দিতে সব ভালোবাসা।
সে যায় বিশাল স্বচ্ছ রেশমি হাওয়ার ঝাপটা ছুঁড়ে,
ছুঁড়ে মারে কাচের বিরূপ টুকরো, সেইসব মূর্তি—যারা বলে না কিছুই।
আমি চাই সমস্ত দোকান আর কাপড়ের কারখানা আজ
পশমে বানিয়ে দিক প্রকাণ্ড হৃৎপিণ্ড যেটা উপচে প'ড়ে ঢেকে দেয় সব ;
সকাল জ্বালিয়ে দেয় যারা, যেন ঢেকে দেয় সেইসব দেহ,
তাদের চেহারা, হাঁক, চীৎকার, বুটজুতো আর রাইফেল।
নগ্ন যারা হয়তো বেরুবে, যারা হয়তো বেরুবে শুধুই
বরফে-তুষারে সেজে ; বারে-বারে নির্মম চঞ্চুকে
যুঝে যে হঠাতে চায় ক্ষওয়া সেই বিশীর্ণ পাথর,
চঞ্চুর বিবর্ণ খাত, আর যত পাণ্ডুর রেহাই—
এমন পাথরে সেজে যারা সবে বার হবে আজ
সেই মৃতদের জন্যে চাই আজ বসন, বসন !
সবচেয়ে লাল সব হাড় দিয়ে চুপচাপ যারা ফিরিয়েছে
বরফের প্রচণ্ড হামলাকে, সেইসব মৃতদের জন্যে চাই বসন, বসন !
কেননা এ-যোদ্ধাদের যত অস্থি, সব সূর্যজ্বলা,
কেননা আগুনই তারা, যার আছে পদচিহ্ন, চোখ, হাত এমন আগুন।

কুঁজো হ'য়ে গুঁড়ি মেরে ঠাণ্ডা সে এগোয়, মৃত্যু সে হারায় সব পাতা।
আমি তো শুনতে পাই ঝ'রে পড়ছে অবিরাম শব্দহীন আওয়াজ কেবল।
শাদা তুষারের বুকে লাল ছোপ, জীবন বদ্‌লে গেছে আজ পুরোপুরি
বাষ্পময় হিম লালে, জীবন তুষারে বোনে কেবল আগুন।

এমনই স্ফটিকস্বচ্ছ পাথরের মতো যত যোদ্ধারা এখানে,
আগুন বা শিখা ছাড়া কিছুই পারে না দিতে তাদের চেহারা।
হিমে আড়-ধরা যত চিবুকের হাড়, মুখগুলো হা-করা, জমাট ;
তাদেরই আক্রমণে-যা-কিছু আক্রান্ত, সব বদ্‌লে যায় ভস্মের স্মৃতিতে।

৮ পাবলো নেরুদার ওপেনহাউস

'যে-বজ্র কখনও থামে না' বেরিয়েছিলো ১৯৩৬-এর গোড়ায়। তার দু-বছর আগে, চিলের পাবলো নেরুদা মাদ্রিদে এসেছিলেন চিলের দূতাবাসে কাজ নিয়ে। ততদিনে স্পেনের সব কবিরা নেরুদাকে জানেন। মাদ্রিদে যে-বাড়িতে নেরুদা তাঁর স্ত্রী দেলিয়ার সঙ্গে থাকতেন, সেটা অল্পদিনেই কবিদের ওপেন হাউস হ'য়ে উঠলো : কবিরা আসতেন সদলবলে, উদ্দাম আড্ডা হ'তো, তর্কবিতর্ক, সবচেয়ে বেশি যেতেন গার্থিয়া লোরকা ও মিগেল এর্নানদেথ্। নেরুদার কবিতার কাগজ 'কবিতার সবুজ অশ্বে' গার্থিয়া লোরকা ও এর্নানদেথের কবিতা প্রকাশিত হ'তে লাগলো, কিন্তু দু-বৎসরের মধ্যেই কবিতার এই উন্মাদক ও জাগর দিন-গুলোয় ছেদ হানলো গৃহযুদ্ধ। ১৯৩৬-এর ১৮ জুলাই ফ্রাঙ্কো উত্তর আফ্রিকা থেকে হামলা চালালো। নেরুদা, কন্সাল হিশেবে তাঁর যে-ক্ষমতা, তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে ঘোষণা করলেন, চিলে স্পেনীয় রিপাবলিকের পক্ষে। তাঁকে মাদ্রিদ থেকে সরিয়ে দেয়া হ'লো। পারীতে এসে আন্দ্রে ব্রেতঁ, পল এলুয়ার, লুই আরাগঁ,—এই সব কবিদের সহায়তায় নেরুদা স্পেনের উদ্বাস্তুদের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে শুরু করলেন। দক্ষিণপন্থীদের বর্বরতা তাঁকে এতটাই নাড়া দিয়েছিলো যে তিনি এবার প্রকাশ্যে বামপন্থীদের সঙ্গে মিলে কাজ করতে শুরু করলেন। ততদিনে ফ্রাঙ্কোর মস্তানরা, গুয়ার্দিয়া সিভিল, খুন করেছে গার্থিয়া লোরকাকে।

'সরকারিভাবে' গৃহযুদ্ধ শুরু হবামাত্র এর্নানদেথ্ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলেন, রিপাবলিকপন্থী সৈন্যদের পঞ্চম রেজিমেন্টের সঙ্গে সরাসরি ফ্রন্টে চ'লে গিয়েছিলেন। পরে তাঁকে ফ্রন্ট থেকে বদলি ক'রে দেয়া হ'লো মাদ্রিদে, রাজধানীর প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলবার জন্যে।

যুদ্ধের সূচনাতেই, মিগেলের বাগ্‌দত্তা হোসোফিনা মানরেসার বাবা ফ্রাঙ্কো-পন্থীদের হ'য়ে লড়াই ক'রে ফ্রন্টে নিহত হয়েছিলেন। এর্নানদেথ্ স্বেচ্ছায় পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন—হোসেফিনার মা, তিনটি তরুণী মেয়ে এবং একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের কিশোরের। মনে রাখতে হবে দুটি তথ্য : মিগেল ও হোসেফিনা তখনও বিয়ে করেননি এবং হোসেফিনার

বাবা ছিলেন গুয়ার্দিয়া সিভিলের সদস্য, যে-ঘোড়সোয়ার বাহিনীর লোক (এখন হ'লে তারা মোটর সাইকেলে চ'ড়ে আসতো, মাথায় ক্র্যাশ্‌ হেলমেট, চোখে কালো চশমা) গার্থিয়া লোরকাকে গুলি ক'রে মেরেছিলো আর এর্‌নান্‌দেথ্‌কে গ্রেফতার ক'রে হাজতে পুরেছিলো। আর, দুই, মিগেল তখন নিজে প্রায় আশারহিতভাবে কপর্দকবিহীন। কিন্তু এর্‌নান্‌দেথ্‌ ঘ্যানঘ্যান করতেন না, হোসেফিনার পরিবারের মানুষদের জন্যে তাঁর এক অপরিসীম মমতার বোধ ছিলো। মিগেল আর হোসেফিনা বিয়ে করেছিলেন গৃহযুদ্ধের মধ্যেই—মার্চ ১৯৩৭-এ।

আর, সারাক্ষণ, এরই মধ্যে, এর্‌নান্‌দেথ্‌ কবিতা লিখে যাচ্ছিলেন যেন কোন্‌ ঝড়ের তাড়ায়। কোনো-কোনো কবিতা পোস্টকার্ডে ছাপা হ'য়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে হাতে-হাতে ঘুরতো। 'ভিয়েন্তে দেল পুয়েব্‌লো' ('জনতার থেকে হাওয়া') গৃহযুদ্ধের প্রথম কবিতার বই, বেরিয়েছিলো ১৯৩৭-এ। সবল, স্বাস্থ্যবান, আবেগ-দীপ্ত, পৌরুষমণ্ডিত—এই কবিতাগুলোর ভেতর ধ্বনিত হয়েছিলো প্রখর মানবিকতার বোধ আর সংগ্রামের অঙ্গীকার, রিপাবলিকপন্থীদের সকলশ্রেণীর মানুষকে তা এক বিপুল ঐক্যের সূত্রে বেঁধে দিতে চেয়েছিলো।

১৯৩৭-৩৯-এর মধ্যে এর্‌নান্‌দেথ্‌ রচনা করেছিলেন 'এল ওম্‌ব্রে আথেচা' ('মানুষ তাড়া করে')। এই বইয়ের প্রতিটি কবিতার মধ্যে মর্মন্তুদভাবে মানুষকে আহত ক'রে যায় যুদ্ধ। এর্‌নান্‌দেথ্‌ কবিতা লেখেন গন্তব্যবিহীন প্রেমপত্র বিষয়ে, বগিভর্তি জখমদের নিয়ে ধেয়ে-চলা ট্রেন নিয়ে। তিনি লেখেন 'মুক্তির কথা ভেবে'। গভীর, তন্ময়, বেদনাতুর এই বই স্পেনের শোক আর ট্রাজেডির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়। গোইয়ার দুশো বৎসর পর আবার যেন এই বইতে যুদ্ধ ফুটে উঠলো তার সমস্ত সর্বনাশ নিয়ে, জমাটবাঁধা রক্তের কালো রেখায় উদ্বেল হ'য়ে উঠলো স্তব্ধীভূত কামনাবাসনা।

মার্চ ১৯৩৯-এর শেষে ফ্রাঙ্কোপন্থীরা মাদ্রিদ দখল ক'রে নিলে। তখন দোন হুয়ানের দেশ সেভিইয়েতে রিপাবলিকপন্থীরা চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে। এর্‌নান্‌দেথ্‌ একবার চেষ্টা করেছিলেন সীমান্ত পেরিয়ে পোর্তুগাল চ'লে যাবার, কিন্তু কাগজপত্র ঠিক ছিলো না ব'লে তাঁকে সীমান্ত থেকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হ'লো। ১১ মে তাঁকে গ্রেফতার করলো গুয়ার্দিয়া সিভিল। জীবনের বাকি দিনগুলো—তিন বৎসর—তাঁকে কাটাতে হ'লো হাজতে। কয়েক মাসের মধ্যেই ঠাণ্ডায়, অনাহারে অস্বাস্থ্যকর স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে তাঁর যক্ষ্মা হ'লো। এক বন্ধু বাইরে থেকে একজন ডাক্তার এনেছিলেন, জেলখানাতেই অপারেশন হ'লো, মিগেলকে চিঠি লিখতে হ'লো হোসেফিনাকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার তুলো আর গ্যজ-এর জন্যে। আর

সেই সময় তিনি জেনেছিলেন, হোসেফিনা ও তাঁদের শিশুপুত্রের পেঁয়াজ ছাড়া আর-কিছু খাবার ছিলো না—যে-খবর পেয়ে তিনি লিখেছিলেন তাঁর সেই মর্মভেদী কবিতা, 'পেঁয়াজের ঘুমপাড়ানিয়া'।

সবসত্ত্বেও, কবিতা ঝড়ের বেগে আসছিলো—জেলখানাতেও। এই ঝড়ের বেগ আগের চাইতে কিঞ্চিৎ প্রশমিত, তেমন বাঁধন-ছেঁড়া নয়, বরং ধীর হাওয়া যেন, কিন্তু থমথমে; একেকটা রক্তের ফোঁটার মতো কবিতাগুলো চুঁইয়ে পড়ছিলো। অথচ, তবু, তাঁর তখনকার কবিতাতেও হতাশা নয়, এক ব্যাকুল মমতার বোধই প্রকাশিত হয়েছিলো। যেন পাইনের ডগার মতো কবিতা—সংহত, রজনে ভরা, সুগন্ধি, যে-সব কবিতা একবার পড়লে পাঠককে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন ক'রে রাখে।

যে-দশ বৎসর কবিতা লিখেছেন এর্নানদেথ, তারই মধ্যে তাঁর কবিতার বিশাল বিস্তার ঘটেছিলো। তাঁর শেষ কবিতাগুলো, মরণোত্তর প্রকাশিত, যেন ভ'রে আছে আশ্চর্য শুদ্ধ কোনো বিভায়, যেন কোনো আলোছড়ানো অন্ধকারের টুকরো। এর্নানদেথ একেবারে ভেতর থেকে কবিতা লেখেন: প্রেমের কবিতা লেখেন হৃৎপিণ্ডের দপদপ দিয়ে, যুদ্ধের কবিতা লেখেন ট্রেঞ্চ থেকে, হাজতবাসের কবিতা লেখেন স্মৃতিজীবিকার বলির সর্বাঙ্গ দিয়ে। 'উলতিমাস পোয়েমাস' আরো হেলান দেয় অন্ধকারের গায়ে, মৃত্যুর মধ্য থেকে, কবরের ভেতর থেকে, যেন জীবনের বাণী ব'য়ে নিয়ে আসে তাঁর কবিতা। ফুশফুশের অপারেশন, অথচ ওষুধ নেই, তুলো নেই, ব্যাণ্ডেজের গ্যাজ নেই: ঘা শুকোয় না, বুকে বসানো নলের মুখ বন্ধ হ'য়ে যায়, কাশির দমকে বুকের ঘা থেকে রক্ত আর পুঁজ পড়ে বিছানায়, খবর আসে তাঁর স্ত্রী আর শিশুপুত্র (তার বয়েস তখন মাত্রই আট মাস) শুধু পেঁয়াজ খেয়ে বেঁচে আছেন। কিন্তু এই অবস্থা থেকেও বেরিয়ে আসে কবিতা—মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে বলে।

• বন্দীশালা / ২

নিষ্ঠুর কোনো ষাঁড়ের জন্যে এখানে যোঝে না কেউ,
সেই অশ্বেরই জন্যে যুদ্ধ বালামচি যার পচে,
বুঝেছে যে তার সকল কদম রুষ্ট পচনশীল
ক্ষুরের দাপের নিচে।

কষ বেয়ে তার যে-ফেনা গড়ায় মুছে ফ্যালো এইবার,
শেকল হঠাও বিশ্বের বুক থেকে:

যাকে দেখে এই সূর্য পেছোয় ভয়ে
ছিপি এঁটে রাখো কণ্ঠনালী ও পাকস্থলিতে সে-সব বন্দীশালার।

মুক্তির যারা ক্রীতদাস, যারা আদৌ মানুষ নয়,
ফাঙ্গাস জমা তাদের জিভে যে স্বাধীনতা প'চে যায়!
ভাঙো এ-শেকল, ভাঙো বেড়ি সব পায়ে
ঝন যারা বাজে বন্দীর পিছে-পিছে।

যারা শুধু চায় নিছকই নিজের বন্দীশালা বা কালো কোণগুলো থেকে
পা-র বেড়ি ভেঙে বেরিয়ে পড়তে, ভুলে যেতে বাকি সব—
তাহ'লেই তারা পালকে-পালকে ধ'সে পড়ে চারধারে,
শ্যাওলা গজায়, গজায়, বুকে দেয় হামাগুড়ি,

তারা চিরকাল চিরদিন রবে শেকলবন্দী, জেনো।
মানুষই কেবল নিশ্চিত জানে কাকে বলে স্বাধীনতা :
আমি দেখি শুধু মানুষই রয়েছে পাতালে কুলুপ আঁটা.
আমিও সঙ্গে যেন।

প্রহরী, কপাট লাগাও, কঠিন কঠোর আগল আঁটো।
সজোরে গা চেপে তাকে যত বাঁধো, আত্মাকে তুমি বেঁধে দেবে—নেই
এমন শক্তি কোনো,
কত চাবি আছে, কত ক্রূর তালা, কত-শত অন্যায়—
পারবে না তবু আত্মাকে বেঁধে দিতে।

শেকল, হ্যাঁ, তা-ই : সে যা চায় তা যে রক্তশেকল শুধু,
ধমনীজটিল লোহার টুকরো, তপ্ত শিরার সুতো,
রক্তে শেলাই, যা পরে কখনও মানুষেরই হাতে গড়া
অন্য সুতো বা শেলাই দেবে না বাদ।

সে-এক মানুষ গর্তে প'ড়ে যে, সাহায্যহীন, একা ;
তীব্র আততি, অপেক্ষা করে ত্যক্ত চকিত, দেয়ালের গায়ে কান—
কেননা যখন একবার লোকে যেই বলে 'স্বাধীনতা!'
আকাশ ওড়ে যে, বন্দীশালাও ওড়ে!

১০ বাস্তবকে দখল ক'রে নেয়া : গাব্রিয়েল থেলাইয়ার বক্তব্য

আমরা সবাই জানি কবিরা যখন, প্রতিকূল পরিস্থিতি ও বিপাকের মধ্যে প'ড়ে, মিথ্যে ও চটচটে সব কবিতা লেখেন, সেগুলো কিন্তু তাঁদের যথার্থ গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির বাইরেই থেকে যায়। মিগেল এর্নান্দেথ্ অথচ তার ঠিক উলটো : তাঁর চারপাশে যে-সব ঘটনা ঘটছে তার মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ মগ্ন, আর তাঁর সেরা কবিতাগুলোও তখনই রচিত হচ্ছে। মিগেল এর্নান্দেথের সময়োপযোগিতা আজ শুধু তাঁর কবিতার নান্দনিক বৈশিষ্ট্য থেকেই আসে না—মিগেল যখন প্রথম লিখতে শুরু করেন, তখনই সে-বৈশিষ্ট্যগুলো হুয়ান রামোন হিমেনেথ-এর নজরে পড়েছিলো এবং তাকে তিনি অভিনন্দিত করেছিলেন ; কিন্তু এর্নান্দেথের কবিতার সময়োপযোগিতা আসে তাঁর এই ভঙ্গিটায় যেভাবে তিনি বাস্তবকে কবিতায় মিশিয়ে দেন, এমনকী তাঁর সমসময়েই যা কবিতার সংজ্ঞার্থে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলো।

মিগেল এর্নান্দেথ্ যে আমাদের কবিতা এমন আদ্যোপান্ত বদ্‌লে দিতে পেরেছিলেন, তা শুধু এইজন্যেই যে তিনি এমন-এক কবি যিনি সবসময়েই কথা বলেছেন, সু-সমাচার যাকে বলে, 'খাঁটি ও সত্য'। নতুন এস্পানিওল কবিদের ওপর তাঁর কবিতা যদি এখনও প্রধান প্রভাব হ'য়ে থাকে তবে সেটা এইজন্যেই যে তিনি জানতেন কেমন ক'রে বাস্তবকে দখল করে নিতে-হয়। তিনি জানতেন কেমন ক'রে কবিতায় নিয়ে আসতে হয় মুহূর্তের বাস্তব, যেটা, আশ্চর্য, অনেক বেশি টেকসই হ'য়ে ওঠে তথাকথিত 'অসাময়িক' কবিতার চাইতে—নিজেরা যে-জগতে আছেন, তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে যে-অযোগ্যেরা ও অপোগণ্ডেরা 'শুদ্ধ' ও 'অসাময়িক' কবিতা লিখে চলেছেন, তাদের ভঙ্গুরতার পাশে মিগেলের স্থায়িত্ব বিস্ময়কর। আর যদি মিগেলের কবিতার স্থায়িত্ব নির্ভর ক'রে থাকে নিছক তাঁর রচনার নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের ওপর, শুদ্ধতা ও সূক্ষ্মরুচির ধ্বজাধারীরা যেমন ভজান, তবে এটাও সত্য যে এই নান্দনিকতা কোনো ফল নয়, বরং কবিতাটিরই অঙ্গাঙ্গী অংশ, যা বাস্তব তারই গভীরে প্রোথিত।

১১ জুলাই ১৮, ১৯৩৬—জুলাই ১৮, ১৯৩৮

আমার কপালে হাতুড়ি হানছে ঝড় নয়, এ তো রক্ত।
এ-রক্ত—সে তো দু-দুটি বছর : প্রকাণ্ড দুই ধারা।
রৌদ্রের মতো কাজ করো তুমি, রক্ত, সকল খেয়ে
ছুটে চ'লে আসো যতক্ষণ-না ডুবে যায় সব শূন্য বারান্দায়।

রক্তই সেরা সম্পদ সব ঐশ্বর্যের চেয়ে।
যে-রক্ত রাখে জমিয়ে সকল প্রণয়ের উপহার।
ছাখো সে কেমন সিন্ধু নাড়ায়, ট্রেন দেয় চমকিয়ে,
ষাঁড়ের সকল উৎসাহ ছিঁড়ে ওশকায় সিংহকে।

সময়ই রক্ত। আমার শিরায় সময়ই তো বহমান।
প্রহর-উষার উপস্থিতিতে আমি আহতেরও বেশি,
সমস্ত রূপ সব আকারের রক্তে ধাক্কা লাগে।

এমন রক্ত যেখানে মরণ কদাচিৎ করে স্নান :
যে-রক্ত আজও মলিন হয়নি তার তোলপাড় আভা,
যেহেতু আমার চক্ষু, হাজার বছর বয়সী, দিয়েছে যে আশ্রয়।

১২ প্রথম কবিতার বই প'ড়ে এর্‌নান্‌দেথ্‌কে লোরকার চিঠি

কবি :

আমি আপনাকেই মোটেই ভুলিনি। তবে বাঁচা নিয়ে আজকাল বড্ড ব্যস্ত আর আর আমার হাত থেকে কলম খ'সে-খ'সে প'ড়ে যায়।

আপনার কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে, বিশেষ যখন ভাবি আপনি রয়েছেন কতগুলো হাঁদা শুওরের সাহিত্যিক গণ্ডির মধ্যে, আর আপনার সব উৎসাহ-উদ্দীপনা, যা এত রৌদ্রময়, তা এভাবে বন্দী দেখে, তারা দেয়ালে এভাবে ঘা খাচ্ছে দেখে, আমার ভারি কষ্ট হয়।

তবে জানি এভাবেই আপনি সব শিখে নেবেন। যে-ভয়ংকর শিক্ষা দিচ্ছে জীবন, তার মধ্যে কী ক'রে নিজের ওপর রাশ টেনে রাখতে হয়, সেটা আপনি এভাবেই শিখতে পারবেন। আপনার বই দাঁড়িয়ে থাকে গভীর স্তব্ধতায়, সকল প্রথম বই যেমন থাকে, আমার প্রথম বই যেমন ছিলো, যার মধ্যে ছিলো কত যে আনন্দ আর কত উদ্দীপনা। লিখুন, বই পড়ুন, শিখুন, আর লড়াই করুন! নিজের রচনা সম্বন্ধে মিথ্যে দম্ভ যেন না-হয়। আপনার বই প্রচণ্ড, তার অনেক মনমাতানো দিক আছে, আছে সেই চোখের দৃষ্টি যার কাছে প্রাঞ্জল হ'য়ে আসে মানুষের মর্মযন্ত্রণা, যদিও, আপনি যেমন বলেছেন, এর মধ্যে তার চাইতে বেশি-কিছু 'কোহোনেস' [অণ্ডকোষ, অন্ত্র, তলপেট] যা কোনো প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। সবকিছুই সহজ ভাবে নিন। ইওরোপের সবচেয়ে সুন্দর

কবিতা আজকে এস্পানিয়াতেই লেখা হচ্ছে। তবে, সেইসঙ্গে, এখনকার লোক আবার তেমন ভালো নয়। 'পেরিতো এন লুনাস' ('অনেক চাঁদে দক্ষ') মোটেই এই গবেট স্তব্ধতায় আক্রান্ত হবার যোগ্য নয়। না, বরং এই বই ভালো লোকদের মনোযোগ, উৎসাহ ও ভালোবাসা পাবার যোগ্য। আপনার মধ্যে আছে কবির রক্ত, আর তাই এই কবিতার মধ্যে যা আছে, যে-অঙ্গীকার আছে, তা থেকেই যাবে। এমনকী যখন আপনি আপনার চিঠিতে আপত্তি করেন চারপাশের নীরবতা বিষয়ে, তখনও এই বন্য হিংস্র পরিবেশের মাঝখানে, যেটা আমি পছন্দ সবচেয়ে করি, আপনার হৃদয়ের স্নেহ ও কোমলতাই, ব্যথা আর আলোয় যা এত ভরপুর।

আমার ইচ্ছে আপনার আবেশ কাটিয়ে উঠুন আপনি—কেউ বুঝলো না, এমন কবির হতাশা কাটিয়ে উঠুন ; আরো সদয়, মানুষের জন্যে আরো গভীর, আবেশ আসুক বরং। আমাকে লিখবেন। আমি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা ব'লে দেখি, 'পেরিতো এন লুনাস' প'ড়ে তাঁরা কতটা উৎসাহ নেন, দেখা যাক।

কবিতার বই, মিগেল, মনে রাখবেন, খুব ধীরে-সুস্থে লোকের কাছে গিয়ে পৌঁছোয়।

আমি খুব ভালো ক'রেই জানি আপনি কী ভাবছেন, আর সেইজন্যেই ভাইয়ের মতো আমার আলিঙ্গন দিচ্ছি আপনাকে—স্নেহ ও বন্ধুতার আলিঙ্গন।

(আমাকে লিখবেন কিন্তু) —ফেদেরিকো

১৩ গত দুই মাসে…

গত দুই মাসে স্তব্ধ পড়েছে যারা
সেইসব মৃতদেহের ওপর ব'সে
আমি চুমু খাই ফাঁকা জুতোগুলো সব,
এবং খ্যাপার মতো
চেপে ধরি এই হৃদয়ের হাত, আর
তাকে যে চালায় সেই খর আত্মাকে।

আমি চাই যেন আমার গলার স্বর
পাহাড় চড়তে পারে,
পরে যেন নামে মাটি পৃথিবীতে, হেনে দিতে পারে বাজ ;
আমার গলা তো এ-ই শুধু চায় আজ,
সকল সময় এটাই চেয়েছে শুধু।

আমার প্রবল কণ্ঠস্বরের ঘনিষ্ঠ কাছে এসো,
একই মায়ের দেশ,
গাছের শেকড় আমায় বন্দী করে
যেন-বা জেলখানায়,
তোমাকেই ভালোবাসবো ব'লেই আমার এখানে আসা,
আমার রক্ত মুখ দিয়ে আমি তোমারই জন্যে যুদ্ধ করতে চাই,
রক্ত ও মুখ—ওরাই আমার বিশ্বাসী রাইফেল।
যদি এসে থাকি ধূলিকণা থেকে আমি,
জন্ম যদি-বা নিয়ে থাকি কোনো গর্তে,
ভাগ্যবিহীন, কোনো টাকাকড়ি ছাড়া,
সে তো এজন্যে একদিন আমি হবো
বিষণ্ণতারই কোনো-এক বুলবুল,
সর্বনাশেরই প্রতিধ্বনির ঘর,
যাদের তা শোনা উচিত কেবল সেই মানুষেরই জন্যে
যাতে আমি গান গেয়ে যাই, গাই
দুঃখ ও তাপ দারিদ্র্য আর মাটি-পৃথিবীরই গান।

কাল লোকে জেগেছিলো,
নগ্ন, কিছুই গায়ে জড়াবার নেই,
ক্ষুধার্ত, তার খাদ্য কিছুই নেই,
কিন্তু আজকে এসেছে সে-এক দিন
বিপজ্জনক, যেমন প্রত্যাশিত,
রক্তসিক্ত, যেমন প্রত্যাশিত।
লোকের হাতের রাইফেলগুলো আজ
সিংহ হবার কামনায় উত্তাল,
সে-জন্তুদের শেষ ক'রে দেবে ব'লে
যারা এতবার জানোয়ারই হয়েছিলো।

অযুত লক্ষ শক্তির দেশ, তোমার
অস্ত্রশস্ত্র যদিও স্বল্প হাতে,
দিয়ো না ধ্বসতে তোমার অস্থিগুলো :
যতদিন আছে বদ্ধ মুষ্টি, স্পর্ধা ও দাঁত-নখ,

যতদিন আছে অভ্যন্তর, অন্ত্র, অণ্ডকোষ,
এমনকী শুধু থুতু আছে যতদিন,
যারা আমাদের জখম করেছে, ছেড়ো না তাদের, হানো।
এমন প্রবল যেন সে জোরালো হাওয়া,
এমন কোমল যেন সে স্নিগ্ধ হাওয়া,
হানো, যারা হানে তোমাকে সকল সময়।
ঘৃণা করো, যারা ঘৃণা করে আজও তোমার ভেতরে শান্তি
ঘৃণা করো, যারা তোমার নারীর গর্ভকে ঘৃণা করে।
সতর্ক থেকো, পিঠে না-বসায় ছুরি,
মুখোমুখি বাঁচো, মরো
দেয়ালের মতো চওড়া ও খোলা বুক টান ক'রে রেখে।
দেশের মানুষ, তোমার সকল বীরের জন্যে আজ
রুদালির সুরে ক্রন্দন গাই আমি,
আমারই মতোই তোমারও যে উদ্বেগ,
তুমি ব্যথা পেলে যে-অশ্রু ঝরে, জেনো
তোমার আমার একই ধাতু নিংড়োনো,
একই সে ধাতুতে গড়া
তোমার মগজ, আমার চিন্তা, দুয়েরই দুঃখ-শোক,
আমার রক্ত, তোমার দুঃসাহস,
তোমার যাতনা, আমার সকল গর্ব—
সবই তৈরি যে একই দানা দিয়ে, একই জেনো এই দারু।
আমার কাছে এ-জীবন যেন-বা দুর্গপ্রাকার কোনো
শূন্যের মুখোমুখি।

আত্মা সজাগ থাকে যতদিন, ততদিন যেন বাঁচি,
যখন লগ্ন ঘনাবে তখন নির্ভয়ে যেন মরি,
এইজন্যেই আমি আছি এইখানে,
দেশের গভীরে শেকড়ের ঠিক মাঝে,
যেমন ছিলাম সর্বদা আমি, যেমনটি থেকে যাবো।
জীবন—সে যেন কঠিন-কঠোর রাশি-রাশি ঢোঁক গেলা,
কিন্তু মৃত্যু—সে তো এক ঢোঁক শুধু।

১৪ এর্নান্দেথ্‌কে প্রথম দেখে : রাফায়েল আলবের্তি

পাবলো নেরুদাই তাকে সব চেয়ে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট দেখেছিলেন। নেরুদা বলতেন : 'মিগেল…ও-রকম একটা আলুর মতো মুখ…ঠিক যেন মাটি খুঁড়ে তুলে-আনা।'

মাটি খুঁড়ে…মাটি থেকে…যদি আমি কোনো কিশোরকে দেখে থাকি, যার শেকড় দেখা যাচ্ছে, ভোরবেলায় যাকে মাটি থেকে ওপড়ানো হয়েছিলো অথচ শেকড়শুদ্ধ উপড়েতোলার ব্যথা এখনও যার সর্বাঙ্গে, তবে এ শুধু সে-ই, মিগেল। শেকড়, কত শেকড়, গভীর থেকে উদ্‌গত অঙ্কুর, তার শরীরের ভিজে মাটিতে এখনও যার মাটিকাঠামো লেপটে আছে, হাড়গোড়ের এই খোলশ, শেকড় বেরিয়ে আসে মিগেলের মুখের চ্যাপটা আলু থেকে, আর তার গোটা শরীরটাকেই শেকড়ের একটা জট পাকিয়ে দেয়। ওদিকে, অন্যদিকে, যখন সে ঝুঁকে পড়তো সামনে, কোনো আভিজাত্য ছাড়াই, কোনো বিষণ্ণ জন্তুর জবুথবু মন্থর মাথা নামানোর মতো, তোমার হাতের সঙ্গে তার হাত জুড়ে দেবার জন্যে, তার মাথা যেন সবসময়েই এমন আওয়াজ ছুঁড়ে দিতো, যা থেকে, মনে হ'তো, মর্মরিত হ'য়ে উঠেছে সবুজ পাতা, আলোর ঝলক ছাওয়া।

হ্যাঁ, মিগেল এসেছিলো মাটি থেকে, সরাসরি, স্বাভাবিক, যেন কোনো বিশাল বীজ যাকে মাটি থেকে তুলে এনে চষা মাটিতে রাখা হয়েছে। আর তার কবিতা ককখনো এই অনুভূতি হারায়নি, হারায়নি এই বোধ যে মাটি থেকেই এসেছে তার আত্মা ও শরীর।

'আমার নাম তো কাদামাটির দলা,
যদিও লোকে ডাকে আমায় মিগেল।'

তার ওপর কাজ ক'রে যাচ্ছে যে-শাবল আর বেলচা তার শব্দ, তার হাড়ের কর্কশ পাথরের ওপর ঘা পড়বার শব্দ, অথচ একই সঙ্গে, তার মধ্যে বোনা রয়েছে মাঠে-ঘাটে চাষীরা যে-গান করে বীজ বোনার সময়, সেই গান।

আজকের দিনের কত-কত এস্পানির মতোই, মিগেলের ছিলো ক্যাথলিক ভাবনার প্রবণতা। আর তাই, তার অসময়ে-সমাপ্ত রচনায়, আবিষ্কার করা যায় মৃত্যু নিয়ে ডানাঝটপট অভিনিবেশ, যেখানে যে-কোনো মুহূর্তে ধ্বংসে যেতে পারে বলেই স্মরণ করা হয়েছে বস্তুকে। যখন তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় মাদ্রিদে, হোসে বের্গামিনের ছোট্ট কাগজ 'ক্রুথ ই রাইয়া' [ক্রুশ ও ডোরা] সদ্য প্রকাশ করেছে, কালদেরোনের ধরনে লেখা, মিগেলের ধার্মিকতার নাটক, যার মধ্যে ছিল তুমুল শোষণক্ষমতা আর মৌলিক শক্তি। কিছুদিন পরেই ১৯৩৬-এ মানুয়েল আলতোলাগিররের প্রকাশ ভবন থেকে বেরুলো তার 'প্রথম' বই, 'এল

রাইয়ো কে লো থেসা'। সত্যিকার এক বজ্রপাতের মতো, যার বিদ্যুৎঝিলিকের মধ্যে আছে স্বাভাবিক ও প্রজ্ঞাবান কোনো কবির আলোর উন্মোচন। অলৌকিক এক বজ্রবিদ্যুৎ, কেননা মনে হয় যেন প্রকৃতিকে উলটে দেয়া হয়েছে এখানে, এই বাজবিদ্যুৎই ছিটকে বেরিয়েছে কোনো মাটি-পাথর থেকে আকাশ লক্ষ্য ক'রে, সেই পার্থিব অস্তিত্ব থেকে আলোর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে অসহায় আর অন্ধকার।

আর জুলাই ১৮, ১৯৩৬-ও ছিলো বজ্রপাতের মতো—সে উপড়ে দিয়েছে, টালমাটাল দুলেছে, আর তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে, যতক্ষণ-না সে খুলেও দিয়েছে চোখ। দিনটা ছিলো সংগ্রামের প্রতিরোধের সমুচিত জবাবের, একদিকে এস্পানিয়ার সবচেয়ে নোংরা সবচেয়ে নিচু দিক—অন্যদিকে সবচেয়ে মহান ও প্রতিশ্রুতিময় উত্তরণ। মিগেল সেই মুহূর্তে নিজের শেকড়কে সবচেয়ে স্পষ্ট ক'রে চিনতে পেরেছিলো, সে যে মাটি-পৃথিবীরই টুকরো—এত ভালো ক'রে আগে সে কখনো তা বোঝেনি।

আর সে তার চাষীর দৈনন্দিন কর্ডুরয়ের ট্রাউসারের বদলে সৈন্যবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকের দুঃসাহসী নীল ওভারঅল প'রে নিলে। আর তাই, তখন, চলো যুদ্ধে, চলো জীবনে, লোকের সঙ্গে মিলতে—'ট্রেঞ্চে আর হাসপাতালে রক্ত ঝরাতে-ঝরাতে'—সেই বীরদেরই সঙ্গে, যারা গমের মতোই সরল ও সজীব—আর তাদেরই কাছে মিগেল এর্নান্দেথের সব ঋণ—সে যে নিজেকে আবিষ্কার করতে পেরেছে, তারা অন্তর্গত সত্যিকার প্রকৃত সত্তা যে পুরোপুরি দীপিত হ'য়ে উঠেছে—সেইজন্যে তার সব ঋণ এই সাধারণ মানুষদেরই কাছে। নিজের কাছ থেকে সে নিজেকে ছিঁড়ে বেরুলো 'ভিয়েন্তো দেল পুয়েবলো' (জনতার থেকে হাওয়া) বইতে, এপিক আর লিরিকের সে-এক সর্বনেশে ধ্বস, মুখোমুখি লড়াই আর তার জের, দাঁতে-দাঁত চাপার শব্দ আর সানুনয় আর্তনাদ, রোষ, ক্রন্দন, মমতা,—যত্ন সবকিছু। তার মধ্যে যা-কিছু থর-থর ক'রে কাঁপছিলো এখন তা ওতপ্রোত বোনা হ'য়ে গেলো তার গভীর শেকড়ের সঙ্গে।

কিন্তু এখন, তার গলা সবাইকে শুনিয়ে, হাওয়ার মধ্যে সুখী শিমখেতের মতো, হাজতে বন্দী হবার পর, এখন, বিধ্বস্ত, কঠোর শাস্তি-পাওয়া তার বুক যতক্ষণ-না তা থেকে ফিনকি দিয়ে বেরুলো রক্ত নির্যাতনশিবিরে হাজতের চোরকুঠুরিতে, আরো-একবার মিগেল, এক নিরুৎসাহ মিগেল, ফিরে এলো মাটিতে, সেই শেষ, চরম গর্তের মধ্যে। এই গর্ত খোঁড়েনি কোনো পরিশ্রমী চাষী হাত, সুখী খামার-বাড়ির হাত, এই গর্ত মোটেই রাতের শিশিরে আর শান্তিতে সজীব নয়। মন্থর

কতগুলো হিম হাত খুঁড়েছিলো এই গর্ত, আর তাকে ঠেশে দিয়েছিলো তাতে ; মৎসর, হিংস্র, ভীষণ কতগুলো হাত, যারা ধ'রে নিয়েছিলো যে সে কোনো মন্দ, মরা বীজ, শুকনো অঙ্কুর যেন, ফিরে জন্মাবার কোনো প্রাণরস যেন নেই তাতে। কিন্তু ঐ ঘৃণ্য লোকগুলো জানেনি যে সব-ঝাঁটানো ঝোড়ো হাওয়াও আছে, আছে বন্ধুর মতো সহায়ক বৃষ্টি-বাদল, আছে সেই মাটি যারা আপাতশুষ্ক শেকড়কেও ফিরে বাঁচিয়ে দেয়, জাগিয়ে দেয় ; ওরা জানেনি যে আছে এমন মাটি, মনে হয় উষর, অপচিত, সবহারানো, অথচ তার জন্যেও আছে পুষ্টি, সার, উর্বরকর খাদ্য।

এরই মধ্যে, মিগেলের নিজের পাহাড়তলির কিছু-কিছু গভীর ছেলেকে তার জন্যে বিলাপ করবার জন্যে তুলে দিতে হবে নলখাগড়ার বাঁশি, যা গান ক'রে উঠবে এমন প্রচণ্ড শক্তিশালী শোকে-বেদনায় যে সব ছত্রভঙ্গ পাল ফিরে আসবে সেই আশার দিনের শ্যামল ভূমিতে, যে-আশার দিন, এটা সুনিশ্চিত, অত্যাসন্ন।

১৫ আহত ট্রেন

স্তব্ধতা যা নৌকাডুবি ঘটায় সকল রাতে
কুলুপ-আঁটা মুখের স্তব্ধতাতে।
মাঝখানে সে ফাঁড়েও যদি, স্তব্ধ-থাকা থামায় না সে আর—
মৃতদেহের জলে-ডোবা ভাষায় কথা বলে।

স্তব্ধতা।

গভীর তুলোর পথগুলো সব খোলো,
শব্দ ঢাকো চাকার, যত ঘড়ির,
লাগাম টানো সিন্ধুস্বরের, হাত চাপো সব পারাবতের মুখে,
উথলে তোলো স্বপ্নগহন রাত।

স্তব্ধতা।

পলায়মান রক্তেভেজা ট্রেন,
রক্ত ঝ'রে মরছে যারা ভঙ্গুর সেই মানুষজনের গাড়ি,
বাক্যহারা যন্ত্রণার এ-গাড়ি,
স্তব্ধ, কাতর, ফ্যাকাশে, ছটফটে।

স্তব্ধতা।

উঠছে যে-ট্রেন পাহাড় বেয়ে মৃত্যুমলিন পাণ্ডুরতার গাড়ি,

পাণ্ডুরতা সাজায় মাথাগুলো,
সাজায় 'উঃ'-কে, হৃদয়, ধুলোবালি,
বিষম যারা জখম তাদের বুক।

স্তব্ধতা।

ওরা চলে, হাত-পা ও চোখ এদিক-সেদিক ছড়ায়,
ওরা চলে, টুকরো ছড়ায় ট্রেনে।
উধাও ওরা, তিক্ত যত চিহ্ন পিছে রেখে,
নতুন কোনো ছায়াপথে, নিজেই ওরা দীপ্ত তারা তারই।

স্তব্ধতা।

গলাভাঙা, কর্কশ ট্রেন, নিরুৎসাহ, রক্ত যেমন লাল :
শেষ কষ্টের মধ্যখানে কয়লা শুয়ে, ঘন শ্বাসায় ধোঁয়া,
আর, যেন ঠিক মাতৃপ্রতিম, এনজিন এক লম্বা নিশাস ছাড়ে,
ট্রেন ছুটে যায় দীর্ঘ কোনো নিরুদ্যমের মতো।

স্তব্ধতা।

গভীর কোনো সুড়ঙ্গ পেলে থামতো বুঝি বিশাল এ-জননী,
পারতো তবে আকুল কাঁদতে শুয়ে।
আমরা জানি পথে যে আর বিরতি বা স্টেশনও নেই
যদি-না-হয় হাসপাতাল বা কারু বুকের মাঝে।

বাঁচার জন্যে বেশ যথেষ্ট একটু-কিছু সামান্য যা জোটে :
শরীরের এক ছোট্ট কোণায় রাখতে পারো গোটা মানুষ তুমি।
মাত্র একটি আঙুল কিংবা ডানার একটা টুকরো একাই প্নারে
আলতো তুলতে আস্ত শরীর পরম-কোনো ওড়ায়।

স্তব্ধতা।

মুমূর্ষু এই ট্রেনকে থামাও, বাঁধো,
ককৃখনো যে ফুরোয় না তার রাত চিরে এই অবিশ্রান্ত যাওয়া।
অথচ এক মরতে-বসা ঘোড়া, সেও তো একটা সময় পড়ে
নাল না-পরা, ক্ষুর হারানো, লুপ্ত নিশাস, বালির মধ্যে গোরে।

১৬. পেঁয়াজের ঘুমপাড়ানিয়া

পেঁয়াজ—সে যেন জমাট তুষার
রুদ্ধ, বেচারি মতো।
তোর সকালের জমাট তুষার,
আমার রাত্রিবেলার।
ক্ষুধা ও পেঁয়াজ, তারা যেন কালো
বরফ, জমাট-বাঁধা,
বিশাল ও গোলগাল।

ক্ষুধার দোলনা দোল দিয়ে যায়
ছোট্ট বেচারি বাছাকে।
শুধু পেঁয়াজের রক্ত যে তার
বাঁচবার সম্বল।
এ-রক্ত তবু তোরই কেবল,
ওপরে ঝালর চিনি,
ঠিক যেন এক তুষার প্রলেপ,
পেঁয়াজ এবং ক্ষুধা।

জ্যোৎস্না হয়েছে কালো এক মেয়ে
স্থৎলির থেকে ঝরে
তোরই দোলনার ওপরে, বাছারে,
হেসে ওঠ একবার,
কেননা যদি-বা চাঁদও খেতে চাস
তাও খেতে পাবি আজ।

আমার বাড়ির ছোট্ট দোয়েল
হেসে ওঠ খিলখিল।
তোর দু-চোখের হাসি ঝিলিমিলি
জগতেরই আলো যেন।
এমন হাসিস যা শুনে আমার
বন্দী আত্মা যেন
ছোট্ট জমিতে দুরন্ত আছড়ায়।

তোর হাসি এসে আমার এ-কাঁধে
ডানা দেয়, খোলে দোর।

অভাব আমার নিঃসঙ্গতা,
গারদ সরায় দূরে।
যে-মুখ আকাশে দিয়েছে উড়াল
তোরই ও-ওষ্ঠাধরে
ছোট্ট বিজুলি যে-হৃদয় হ'য়ে ওঠে।

তোর হাসি যেন দীপ্ত কৃপাণ
জিতেছে যুদ্ধ সব,
পরাস্ত ক'রে ফুল ও দোয়েল
রৌদ্রকে রণে ডাকে।
এ-হাসি আমারই অস্থি-প্রেমের
মধুর ভবিষ্যৎ।

শরীর কেবল আছড়ায় ডানা
ক্ষিপ্র চোখের পাতা।
জীবন কত-যে রঙে-রঙে ভরা,
এমন ছিলো না আগে।
তোর ঐ ছোটো দেহটুকু থেকে
ডানা আছড়ায় ওড়ে
সে যে কত শ্যামাপাখি।

জেগেই দেখেছি আমি পরিণত
প্রাপ্তবয়েস লোক—
দোহাই, জাগিসনে রে।
শোকে জর্জর আমার এ-মুখ :
তুই শুধু হেসে ওঠ।
তোর দোলনায়, পালকে-পালকে,
চিরকাল, বাঁচা হাসি—
প্রতিরোধে-গড়া দুর্জয় হাসি—
সে কাকে কীসের ভয়!

আট মাস তোর হাসির বয়েস,
লেবুর পাঁচ মুকুল !
তোর আছে খুদে, এইটুকু, পাঁচ
দীপ্ত বন্যতা যে।
তোর আছে পাঁচ ছোটো-ছোটো দাঁত
যেন সবে ফুটে-ওঠা
সতেজ পাঁচটি জুঁই ফুল, কত
সৌরভে ভরপুর।
চুমু দিয়ে কাল গড়া হ'য়ে যাবে
সীমান্তরেখা এক,
যখন বুঝবি তোর ঐ দাঁত
সেও এক হাতিয়ার।
জেনে যাবি তোর দাঁতের তলায়
ছুটেছে কেন্দ্র খুঁজে
জলন্ত কোনো ছটফটে শিখা
উড়ে যা রে, বাছা, নির্ভয়ে দুই
স্তনের চাঁদের মাঝে :
পেঁয়াজকরুণ স্তন দুটি, তুই
তবু সন্তোষে ভরা।
দু-পায়ে সটান দাঁড়া, বাছা, তুই
খেয়ালই করিসনে রে
কী ঘ'টে চলছে তোর চারপাশে,
কী ঘ'টে চলেছে দেশে !

১৭ পাবলো নেরুদার সঙ্গে রবার্ট ব্লাইয়ের কথাবার্তা : নিউইয়র্ক জুন ১২ / ১৯৬৬

ব্লাই : আমার ধারণা আপনিই প্রথম সম্পাদকদের একজন যিনি এর্নানদেথ্‌কে প্রকাশ করেছিলেন, আপনার সেই 'কাবাইয়ো ভের্দে পোর লা পোয়েসিয়া' (কবিতার সবুজ ঘোড়া) পত্রিকায়।

নেরুদা : হ্যাঁ।

ব্লাই : আপনার মনে আছে এর্নাদ্‌দেথ্‌ কখন মাদ্রিদ এসেছিলেন ?

নেরুদা : মিগেল এর্নানদেথ ছিলো রাখাল ছেলে, ছাগল চরাতো। শিক্ষা

বলতে যা বোঝায়, তা সে পেয়েছিলো শুধু গাঁয়ের যাজকের কাছে। একদিক থেকে সেটা চমৎকার ছিলো, কারণ চার্চের গ্রন্থাগারে ছিলো সব ধ্রুপদী সাহিত্য—কয়েকশো বছর সে-সব বই কেউ প'ড়েও ছাখেনি! মিগেল তাদের আবিষ্কার করেছিলো, আর এস্পানিওল স্বর্ণযুগের কবিতা থেকে সে নিজের জন্যে নিজেই তৈরি ক'রে নিয়েছিলো আশ্চর্য এক ভাষা, অত্যন্ত জোরালো, পুরোপুরি ধ্রুপদী। সে ছিলো ভাষার প্রভু যেন—দুর্দান্ত ক্ষমতা ছিলো শব্দচয়নের। এর্নানদেথ্ ১৯৩৪-এ তার গাঁ ওরিউয়েলা থেকে মাদ্রিদে এসেই সরাসরি আমার সঙ্গে দেখা করেছিলো। আর দারুণ হাসিখুশি ছিলো। একবার যখন মিগেল আমার সঙ্গে হাঁটছে, আমি বললুম, আমি কোনোদিন কোনো বুলবুল শুনিনি, কারণ আমার দেশে কোনো বুলবুল নেই। আমার দেশে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তো—তা-ই বুলবুল নেই। শুনে সে বললে: 'ও, আপনি কোনোদিন শোনেননি ··' ব'লেই সে একটা গাছে উঠে পড়লো, মগডালে ব'সে বুলবুলের মতো শিস দিতে শুরু করলো। তারপর তরতর ক'রে গাছ বেয়ে নেমেই দৌড়ে গিয়ে আরেকটা গাছে উঠে পড়লো, আবারও শিস দিলে সে—এবার অন্য-এক বুলবুল, আগেকার বুলবুলের গানে সাড়া দিচ্ছে।···

আমি মিগেলের কবিতা ছাপিয়েছিলুম—তবে একেবারে গোড়ায় দিকের কবিতা নয় অবিশ্যি—কিন্তু সেইসব কবিতা যা তার নিজের মধ্যেই বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলো। এখানে বলা উচিত, মিগেল খুব মন দিয়ে আবার 'রেসিদেনসিয়া এন লা তিয়েররা' (মাটি-পৃথিবীর আশ্রয়) পড়ছিলো—সে-বই তখন সদ্য বেরিয়েছে। আর সেই বই পড়ার ফলে বদলে গেলো তার রচনার আড়ষ্টতা, তার ধ্রুপদী রচনারীতি, আর তাকে তা অনেক বেশি স্বাধীনতা এনে দিলো। যে-ভয় তার ছিলো—বরফ গ'লে গেলো, আর সে ক্রমেই স্বাধীন আর উন্মুক্ত হ'য়ে উঠলো, আশ্চর্য এক কবি। এটা কখনও ভুলবেন না যে সে যখন মারা গিয়েছিলো তখনও খুবই তরুণ ছিলো।

ব্লাই: কিছু লোক ফ্রাঙ্কো শাসনের হ'য়ে ওকালুতি করে যে ফ্রাঙ্কো সত্যি-সত্যি এর্নানদেথ্‌কে খুন করেনি, এর্নানদেথ্ মারা গিয়েছিলেন হাজতে, যক্ষ্মায়। ফ্রাঙ্কো শাসন তাঁকে যদি বাঁচাতে চাইতো, তবে তাঁকে কি বাঁচাতে পারতো না? এ-বিষয়ে আপনার মধ্যে কোনো খটকা আছে?

নেরুদা: এ-সব ওকালুতি কৈফিয়ৎ সব ডাহা ভণ্ডামি। সকলেই জানে যে ফ্রাঙ্কোর মাস্তানরা ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকাকে গুলি ক'রে মেরেছিলো। আর ফ্রাঙ্কো একবার বিবৃতি দিয়ে বলেছিলো যে ফেদেরিকো গুলি খেয়ে

মরেছিলো একেবারে গোড়ার দিকে, যখন সব বিশৃঙ্খল, তুলকালাম ওলোট-পালোট অবস্থা—এই খুন নিছকই একটি দুর্ঘটনা।

কিন্তু এই কৈফিয়ৎ নিছকই ধাপ্পা আর মিথ্যে ছাড়া আর-কিছুই না। কারণ গারথিয়া লোরকা যদি সত্যি দুর্ঘটনাতেই ম'রে থাকেন, ফ্রাঙ্কোর হাতে অজস্র সময় ছিলো এর্‌নান্‌দেথ্‌কে জেল থেকে ছেড়ে দেবার। সে ছিলো রাখাল, খোলা হাওয়ায় খোলা মাঠে থাকতে যে অভ্যস্ত—সে কেমন ক'রে 'সাত' বছর একটা হাজতে কাটাবে? জেলখানায় তার যে যক্ষ্মা হয়েছিলো, তার কারণ সে জেলখানায় আটক ছিলো—জল্লাদের কাজ করেছে যক্ষ্মা, তবে হুকুমটা ফ্রাঙ্কোর।

ব্লাই: সে-সময় ওখানে দামাসো আলোন্‌সো ছিলেন না? তিনি এ-বিষয়ে কিছু করতে পারতেন না?

নেরুদা: ঠিক জানি না, তবে আমার ধারণা সাহিত্যিকরা সে-সময় দারুণ ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, তাঁরা খুব-একটা বেশি-কিছু করেননি। তাঁরা হয়তো মিগেলকে সাহায্য করেছেন, এক-আধবার টুকিটাকি জিনিশপত্র পাঠিয়েছেন হাজতে, তবে আসল ব্যাপারে কোনো সাহায্যই করেননি।

ব্লাই: কেমন ছিলেন মিগেল এর্‌নান্‌দেথ্‌, যখন তিনি কথা বলতেন আপনাদের সঙ্গে? তিনি কি তাঁর কবিতার মতো ছবি সাজিয়ে কথা বলতেন, না কি সব সময় ব্যবহারিক জগতের প্রসঙ্গই টেনে আনতেন?

নেরুদা: মিগেল ছিলো গভীর ধাতের ছেলে, খুব চিন্তা করতো, আর সে সবসময় ভাবছিলো—আমি সবসময় খুব কৌতূহল বোধ করতুম ছাগলদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী ছিলো। তারপর একদিন তাকে আমি জিগেশ করি, সে তখন এমন অনেক কথা বলে, যা আমি কক্‌খনো ভাবিওনি—তার দেখার চোখ ছিলো খুব তীক্ষ্ণ আর সজাগ। আমায় একবার সে এক 'কাবরা', এক ছাগীর কথা বলে—ছাগীটি ছিলো পোয়াতি, সে তার পেটে কান রাখতো, শুনতে পেতো কেমন ক'রে আস্তে-আস্তে বাঁটে দুধ আসছে—সে একটা শব্দ ক'রে সেই রহস্যময় আওয়াজটা বর্ণনাও করেছিলো আমার কাছে। এইসব ছোটোখাটো কথা বলতো সে, তার নিজের জগতের কথা। চমৎকার ছেলে ছিলো সে।

ব্লাই: আমি জানি যে এস্পানিয়ার তরুণ কবিরা এর্‌নান্‌দেথের দারুণ প্রশংসা করেন। সাম্প্রতিক এস্পানি কবিতা সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী?

নেরুদা: এখন এস্পানিয়ার কবিতার এক নবজাগরণ হয়েছে। কবিতা ছিলো বন্দী, কিন্তু এখন এক নতুন প্রজন্মের কবিরা এসেছেন, ব্লাস দে ওতেরো এবং

আরো অনেকে, আর এটার তাৎপর্য অনেক এবং গভীর। কবিতার এখন একটা রুদ্ধশ্বাস ও মহান সময় এসেছে—ঠিক যেমন রাফায়েল আলবের্তি বা ভিসেন্তে আলেইহান্দ্রেদের আমলে এসেছিল। নতুন জীবনরস এনে দিয়েছেন এঁরা কবিতায়, আর একটা ভূমিকাও বেছে নিয়েছেন, নাগরিক ভূমিকা, সর্বসাধারণের পক্ষে এক ভূমিকা,—আর আমার মনে হয় সেজন্যে আমাদের তাঁদের অভিনন্দন জানানো উচিত।

১৮ চিঠি

কম্পিত টেবিলগুলি থেকে
চিঠিদের পায়রার খোপ
মেলে দেয় দুরন্ত উড়াল,
স্মৃতিরা হেলান দেয় যাতে,
যাতে ভার গরহাজিরার,
যাতে আছে স্তব্ধতা, হৃদয়।

চিঠির ডানার শব্দ শুনি,
উড়ে যায় নিজেরই কেন্দ্রে সে।
যেখানেই যায় দেখা হয়
নারী ও পুরুষ কত-শত
বিচ্ছেদের রক্তাপ্লুত বলি,
সময়ের করুণ শিকার।

চিঠি, বিবরণ, আরো চিঠি,
পোস্টকার্ড, কত স্বপ্নলিপি,
স্নেহমমতার টুকরো যত
আকাশেই কল্পিত রচিত,
এ ওকে পাঠায় বাসনাকে,
রক্ত থেকে রক্তের উদ্দেশে।

যদিও আমার জীবন্ত-দেহ
এখানে কবরচাপা

লিখো তবু তুমি মাটিতে এখানে
পারি যাতে ফিরে লিখতে।

পুরোনো চিঠি ও খামগুলো
কোণে-কোণে মৌন প'ড়ে থাকে,
লেখার ওপরে ছাপ দেয়
সময়ের অনিবার্য রং।
খুদে-খুদে শিহরনে ভরা
ধীরে-ধীরে মরে সব চিঠি।
মৃত্যুর যাতনা বোঝে কালি,
খোলা পাতা মানে পরাভব,
কাগজে গজায় কত ফুটো
একরত্তি কবরের মতো
আবেগ যা থেকে হারিয়েছে,
ভালোবাসা যারা অনাগত।

যদিও আমার জীবন্ত দেহ
এখানে কবরচাপা
লিখো তবু তুমি মাটিতে এখানে
পারি যাতে ফিরে লিখতে।

যখনই তোমাকে লিখতে যাই
এমনকী দোয়াতেও জাগে
উত্তেজনারই খুদে ঢেউ,
কালো ও হিমার্ত দোয়াতেরা
লজ্জায় বেপথু, শুধু কাঁপে,
আঁধার গভীর থেকে ওঠে
মানবিক কী স্বচ্ছ উষ্ণতা।
যখনই তোমাকে লিখতে যাই
হাড়েরাও লিখতে চায় যেন,
আমার প্রেমের চিরস্থায়ী
কালিতে তোমাকে চিঠি লিখি।

চলেছে আমার উষ্ণ লিপি,
আগুনে রচিত পারাবত,
দুই ডানা ভাঁজ ক'রে রাখা,
মাঝখানে তোমারই ঠিকানা।
যে-পাখি কেবল চায় ছুঁতে
তোমার শরীর, হাতগুলো,
তোমার অস্থির দুই চোখ,
নিশ্বাসের মধ্যবর্তী জমি,
সেই তার নীড় ও আকাশ,
সেই তার আকাশের হাওয়া।
সেখানে তোমার আবেগের
মাঝখানে নগ্ন তুমি, একা,
বসনবিহীন, যাতে পারো
ছুঁতে তাকে বুকের ওপর।

যদিও আমার জীবন্ত দেহ
এখানে কবরচাপা
লিখো তবু তুমি মাটিতে এখানে
পারি যাতে ফিরে লিখতে।

কাল প'ড়ে ছিলো কার চিঠি,
নেয়নি কেউ, মালিকবিহীন :
হয়তো উড়েছে তারই খোঁজে
শরীর যে হারিয়ে বসেছে
সেই কারু চোখের সমুখে।

যে-সব চিঠিরা বেঁচে থাকে,
কথা বলে মৃতের তরফে :
মানবিক, একান্ত কাগজ,—
অথচ এমন চোখ নেই
তার দিকে তাকায় একবার।

চোখ, দাঁত বাড়ে যতক্ষণ
আমার কেমন মনে হয়
প্রচণ্ড চীৎকারের মতো
তোমার চিঠিরা কাছে আসে।
নাও যদি থাকি আমি জেগে,
ঘুমের মধ্যেই অবশেষে
পৌঁছে যাবে তোমার চিঠিরা।
আমার ক্ষতরা, আমি জানি,
হ'য়ে উঠবে ছলকানো দোয়াত,
তোমার চুম্বন মনে ক'রে
কেঁপে উঠবে যেন এই মুখ,
বারে-বারে আবারও আওড়াবে
কেউ যা শোনেনি, সেই স্বরে :
আমি তোমাকেই ভালোবাসি।

:৯ মৃত্যুর আগে শেষ চিঠি

হোসেফিনা, রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে। তবে ডাক্তার বারবেরোকে জানাতে হবে যে উনি যে-নল বসিয়েছিলেন তা থেকে পুঁজ ঝ'রে পড়ছে না ; তার বদলে মুখটা আরো বড়ো হ'য়ে গেছে, হা করা, পুঁজ জ'মে থাকছে, ঘা থেকে ঝ'রে পড়ছে বিছানায়—বিশেষ মাঝে-মাঝে যখন কাশির দমক আসে। এ এক বিশ্রী দশা, আমার সেরে-যাওয়াটাকে বড্ড বিলম্বিত ক'রে দিচ্ছে। এখান থেকে যত শিগ্‌গির পারি আমি চ'লে যেতে চাই। মাঝে-মাঝে চমকপ্রদ সব ঝকমকে ভাবনা দিয়ে ওরা আমাকে সারাবার চেষ্টা করে, আর সবকিছু কেমন গা-ছাড়া, হাঁদা—কিছুতেই-কিছু-এসে-যায়-না এমন ভাব। তবে, সোনা আমার, একটু ভালো বোধ করছি আগের চাইতে। এখান থেকে একবার বেরিয়ে যেতে পারলেই বিদ্যুৎঝলকের মতো ক্ষিপ্র হ'য়ে উঠবে আরোগ্য। আমাদের ছেলেকে আমার হ'য়ে হামি দিয়ো। আমি তোমাকেই ভালোবাসি, হোসেফিনা।

আন্দ্রে মালরো

স্পেনের ফ্রন্টে

আজ এপিফ্যানির দিন, 'তিন রাজা'র ভোজ, স্পেনের শিশুদের মহোৎসব। সকালে যুদ্ধমন্ত্রকের দপ্তরে যখন এসেছি রাস্তায় ছেয়ে ছিল সাঁজোয়া গাড়ি। সারাদিন ধ'রে চলেছে গাড়িগুলো, আর একশো কিলোমিটার দূরে তখন ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড আর সৈনিকরা তেরুয়েলের কবরখানাকে দখল করেছে, হারিয়েছে, আবার দখল করেছে। নতুন স্পেন ভূমিষ্ঠ হবার পর এই প্রথম শিশুদের ভোজ, ট্রেড ইউনিয়নরা চেয়েছিল এমন একটা উৎসব বাচ্চাদের জন্যে লাগিয়ে দিতে যা আগে কখনও তারা দেখেনি। এক সপ্তাহ ধরে শ্রমিকরা সারারাত জেগে কার্টুন সিনেমার চরিত্রদের কার্ডবোর্ডের মূর্তি বানিয়েছে, বাচ্চারা তুমুল বায়না ধ'রেছিল, এবং পুরনো নিয়মমত কেকের দুর্গ, বুড়ো ষাঁড়, রাজা আর তাদের চরিত্রদের পাশাপাশি এবার ভালেন্সিয়া ছেয়ে গেছে মিকি মাউস আর ফেলিক্স দা ক্যাট-এর বারো ফুট মূর্তিতে।

আমার গাড়ি আমায় যুদ্ধমন্ত্রক থেকে ফ্রন্টে ফেরৎ নিয়ে যাচ্ছে। ভোর তিনটে। মেঘের আড়াল ভেঙে যে তারার আলো আসছে তাতে চকের চার-পাশে উঁচু বাড়িগুলোর আভাস পাওয়া যায়, রাতের মাটিতে পুরনো স্প্যানিশ যুদ্ধপোতের (মুখের) মতো দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধকালীন নীল আলোগুলো গভীর সমুদ্রের মাছের নীল রশ্মির মতো চৌমাথায় আবছা আভা ফেলেছে, অল্প বৃষ্টিতে ভেজা অ্যাসফল্ট গিলে নিচ্ছে মিকি মাউস মূর্তির ছায়া। ভালেন্সিয়া ঘিরে চওড়া কয়েকটা বুলভার, সেখানে পৌঁছতেই আমরা প্রচুর যানবাহনে আটকে গেলাম। আমরা একবার হেডলাইটগুলো জ্বালালাম—শিশুদের স্বপ্নের যত মানুষ, খ্রিষ্টযুগের গোড়া থেকে আমেরিকার বাচ্চাদের স্বপ্ন পর্যন্ত, মেজাই থেকে মিকি মাউস পর্যন্ত সবাই ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে এখানে; কয়েক হাজার বাচ্চা, যারা এপিফ্যানির ফিস্টি খেতে এসেছিল, বৃষ্টির ভয়ে ঐ মূর্তিগুলোর পায়ের ফাঁকে আশ্রয় নিয়েছে, এবং কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

এদিক-ওদিক কয়েক মাইল জুড়ে রাত্রির বুকে প'ড়ে আছে শিশুস্বপ্নের এই অশরীরীরা, যেন যত দেশের সব আত্মারা এখানে আসবে তাদের নিয়ে যেতে, যেসব ছোটোরা ঘুমোয় তাদের জন্যে। প্রত্যেকটা চাতালে গাড়ির আবছা ঘুমন্ত

আলোয় তাদের পায়ের তলায় দেখা যাচ্ছে দল বেঁধে বাচ্চারা ঘুমিয়ে আছে, শান্তভাবে—একটু দূরে তেরুয়েলের আহতদের মতো একই মাটিতে শুয়ে।

তেরুয়েলের কামান থেকে গোলার মরা আওয়াজ মাটিকে মৃদু কাঁপিয়ে দিচ্ছে, নাড়া খাচ্ছে পলকা অশরীরীরা যাদের নিচে নিথর শিশুদের শান্ত ঘুম, মরা মানুষের মতো ছড়ানো হাত।

সৈনিকদের একটা ব্যাটালিয়ন ফ্রণ্টে চলেছে। ওরা প্রাদোর দিকে যাচ্ছে, 'ইণ্টারন্যাশনাল'-এর জোরালো কলি এগিয়ে আসছিল। ওরা যখন আমার জানলার ঠিক নিচটাতে, যখন গানটা সবচেয়ে জোরে হবার কথা তখন হঠাৎ পড়ে গেল স্বর, একটু দূরে গিয়ে ফের শুরু হ'ল, নিচু পর্দায়, চাপা গলায়। জানলার ধারে গেলাম, এক অন্ধ রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছে সাদা একটা লাঠি সামনে বাগিয়ে। যুদ্ধে যাচ্ছিল যে কিশোররা তারা তাকে পাশে সরিয়ে দিতে সাহস করেনি, লোকটি হেঁটে চলেছে কুচকাওয়াজী সৈনিকদের স্রোতের বিপরীতে, ওরা ওকে দুপাশ দিয়ে ঘিরে যাবার সময় গান থামিয়ে দিয়েছিল। লোকটাকে ছাড়িয়ে ওরা কিছুটা দূর গিয়ে আবার গান ধরেছে, একটু নরম গলায়। অন্ধ এগিয়ে চলেছে, কাঁধটা একটু পেছনে ঠেলে—প্রায় সব অন্ধরাই যেটা ক'রে থাকে ; সে একটু বিড়ম্বিত এত লোকের মধ্যে পড়ে, যারা তার জন্যে চুপ করে গেল, যাদের সে দেখতে পাচ্ছে না—গোল করে ঘিরে তাকে এক সশ্রদ্ধ ভীতি, আদিযুগের অন্ধদের মতো, সে বুঝতে পারে না, সে পালাতে চায়, হেঁটে চলে আরো জোরে ; সৈনিকরা বাঁক নেয় অন্ধ ওদের ছোঁয়ার আগেই, যেন নিয়তিকে রাস্তা ছেড়ে দিতে।

আবার দেখেছিলাম তাকে। মাদ্রিদের দ্বারপথ—কারাবানচেলে ছিল মুর সৈনিকরা। আমরা যারা পদাতিক বাহিনীতে আগে লড়েছি এবং রাতে মুরদের টমটম শুনেছি বহুবার তারা জানলা খুলে রেখেছিলাম শোনার জন্যে ; কিন্তু হাওয়া আসছিল মাদ্রিদের দিক থেকে, বৃষ্টির রাতে কিছু শুনতে পেলাম না, মেশিনগানের মর্মরও নয়। রাত নটার পর রাস্তায় পাহারা ছিল সাংঘাতিক কড়া, প্রায় শূন্য হয়ে যেত রাস্তাঘাট।

একটা বড়ো হোটেলের মাথা থেকে নিঃসন্দেহে পুলিশেরই সুবিধার্থে একটা সার্চলাইট মাঝে-মাঝে রাস্তা ধুয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ আমার সামনে, আলোর বন্যায় দুটো হাত দেখা গেল, বিশাল দুটো পঞ্চাশ ফুট লম্বা হাত—আবার মিলিয়ে গেল রাতের বুকে। পুলিশ আর সৈনিকরা নিশ্চয়ই অন্ধ ভিখিরিটিকে চিনত, তারা তাকে পথ ছেড়ে দিয়েছে। ওর হাতে লাঠি ছিল না, নিজেকে বাঁচাচ্ছিল

হাতড়ানো হাত দিয়ে, সার্চলাইটের আলোর রেখায় প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না ওকে, কিন্তু ওর ছড়ানো হাত, মনে হ'ল যেন জীবিত ও মৃতদের খুঁজে বেড়াচ্ছে এক ভয়াবহ মাতৃসুলভ ভঙ্গিমায়।

মাদ্রিদ আর তালাভেরার মাঝখানে এক গ্রামের প্রান্তে ডায়নামাইটাররা বসেছিল শত্রু-ট্যাঙ্কের অপেক্ষায়।

বার্তাবহরা এসে তাদের সংকেত দেবে। এখনকার মতো কিছু করণীয় নেই। একটা ফাঁকা শুঁড়িখানায় বসে ওরা গল্প বলছে একে অন্যকে :

"আমি গোর্দে আর সাবরানেকের সঙ্গে পিছু হঠার দলে ছিলাম। ওরা ছিল ওদের গ্রামের খনি-শ্রমিক ; আমাদের গাঁয়ের পিছন দিককার বাহিনীতে ওদের চাকরি দেওয়া হয়েছিল, সেসময় কোনো ডায়নামাইটার থাকত না। ওরা আগে আর্মিতে মেশিনগান চালাত, ওদের মেশিনগান চালাতে দেওয়া হ'ল। আক্রমণের প্রথম দিন ওদের কোম্পানিকে বলা হ'ল একটা ছোটো জঙ্গলকে ধ'রে রাখতে। ডাইনে বাঁয়ে তখন গুলি চলছে, জাহান্নমের আগুন, হঠাৎ ওরা খেয়াল করল ওদের দুপাশের দুই কোম্পানি পিছু হটে গেছে আর ঘিরে ফেলেছে মূররা, চম্পট দেওয়া ছাড়া কিচ্ছু করার নেই, রাস্তা করতে হবে, তিনশো গজ এগোও ধ'া করে, থামো, গুলি চালাও, গড়ান দাও, আবার তিনশো গজ ছোট। তো ছুটতে লাগল ওরা, খরগোশের মতো লাফ দিয়ে দিয়ে, হচকিস গুলো সঙ্গে। প্রথম তিন শো গজ গিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে গুলি চালাতে শুরু করল। গোর্দের কাছে বন্দুকটা ছিল, সে এক রোল চালিয়ে দিল। মূরগুলো ট্র্যাকের মধ্যে ঠিক বাইস্কোপের মতো উল্টে পড়ছিল, কিন্তু ওরা ধ'রে ফেলবেই শেষটায়।

" 'পালা' ব'লে চেঁচাল সাবরানেক। কিন্তু আরেকজন ব'সে তখন রোল মেরামত করতে লেগেছে।

" 'পালা, তোর ভগবানের দোহাই!' সে সেই রোল ঠিকঠাক ক'রে গেল স্যাডেলে বসে, তারপর চালাল গুলি। আবার মূরগুলো পড়তে লাগল। সাবরানেক খচেমচে বুটশুদ্ধু পায়ে গোর্দের পাৎলুনে বেশ কিছু লাথি মেরে গেল। গোর্দে উঠে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করছিল, আবার সাবরানেকের লাথি পড়ল পেছনে। তখন সে দুহাতে মেশিনগানটা জাপটে ধ'রে সোজা শত্রুদের ভেতরে প্রচণ্ড বেগে ছুটে ঢুকে গেল, পেছনে সাবরানেক, চেঁচাচ্ছে কলজে ফাটিয়ে। মূররা যে আলটা ধ'রে রেখেছিল তার ওপারে দুজনে অদৃশ্য হ'ল। এখানে ওদের দেখে আমি এখনও ধাক্কা সামলাতে পারিনি, আমি ভেবেছিলাম দুজনেই ম'রে গেছে।"

বাইরে, অন্তরা বসে, শুয়ে আছে জোড়াকম্বল মুড়ি দিয়ে, দেখলে মনে হবে

মেক্সিকান কোনো সৈন্যবাহিনী—সমবেরোগুলো নেই খালি। কিছুক্ষণ পরপর আগুনের আলোয় মুখগুলো জ্বলে উঠছে, নেপোলিয়নের যুদ্ধের খোদাই ছবিতে যেমন থাকে।

"'৩৪ সালে পেদ্রো আসতুরিয়াসে ছিল গনজালেস পেনিয়ার সাথে। আমরা পাঁচজন-পিছু একটা বুলেটে লড়ছিলাম। কার্তুজ খালি হয়ে গেলে মেয়েরা সেগুলো কুড়িয়ে আনত, স্যালাডের বাক্সে পুরত, তারপর বাক্সগুলো ট্রাকে করে পাঠান হ'ত ফের গুলি ভরার জন্যে। শত্রুপক্ষের প্লেন তাড়া করত সাঁজোয়া ট্রেনগুলোকে, সেগুলো পড়িমরি করে টানেলে ঢুকে পড়ত, অপেক্ষা করত কতক্ষণে প্লেন জ্বালানি আনতে ফেরৎ যায়, তখন আবার বেরিয়ে পাঁইপাঁই ছুটত আরেক টানেলের দিকে। এই চলত। চাষীরা মিয়েহেসের চারদিকে লড়ছিল। সেটা শেষ দিন। আর কিচ্ছু করার নেই। কিন্তু মূরবাহিনীর বাইরের ডানাগুলো ঢেউয়ের মতো মিয়েহেসের দিকে আসছিল। সাঁড়াশি থেকে বাঁচতে ওদের আরো তিন ঘণ্টা সময় দরকার ছিল।

"তখনও খনি থেকে আনা কিছু ডায়নামাইট পড়েছিল কিন্তু বোমা বানাবার মতো কিছু ছিল না। না তামা, না ইস্পাত। এদিকে মূররা আসছে। একটা ছোটো কুঁড়েঘরে কমিটির লোকেরা ব'সে ভাবছিল কী করা। মূররা এগিয়ে আসছে। একটা অদ্ভুত গুড়গুড় শব্দ দেয়ালগুলোকে কাঁপাতে শুরু করল। ভূমিকম্প নয়, শুধু দেয়াল কাঁপছে, মাটি নয়। এবং কামানও নয় : একটা কিরকম মৃদু কিন্তু অনেক কিছুর শব্দ, হাজারটা ঢাকের চাপা আওয়াজের মতো। পেদ্রো বাইরে বেরিয়ে এল, যেই সে দরজা খুলেছে, ক্রমশ বেড়ে ওঠা রহস্যময় সেই গুড়-গুড় শব্দের নিচে শোনা গেল স্পষ্ট মেশিনগানের আওয়াজ, কাপড় ছেঁড়ার মতো। হঠাৎ একটা গোরুকে দেখা গেল বড়ো রাস্তায়, গোরুটা একটু থমকে দাঁড়াল, তারপর কেন্দ্রীয় কমিটির আস্তানার সামনে দিয়ে রাস্তার অন্য ধার দিয়ে দৌড়ে পালাল। পেছন পেছন একটা ষাঁড় ছুটে পালাল, 'করিদা'র স্বভাবসিদ্ধ ঝাঁকালো, ভ্যাবাচ্যাকা চলনে। এবং অতঃপর পেদ্রো যখন দেখল একটা খরগোশ হন্তদন্ত হয়ে ওর দিকে ছুটে আসছে সে বুঝে গেল ব্যাপারটা।

"শহরটা ঘেরাও করতে, মূররা রাউণ্ড আপের কায়দায় এগোচ্ছিল। পশু, গোরু মোষ সব মিয়েহেসের ওপর মেশিনগানের গুলিতে তাড়া খেয়ে এসে হুড়মুড়িয়ে পড়ছে, গাঁয়ের সীমানার চাষীদের বসতির মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রের দিকে ওরা যাচ্ছে, আর ওই হাজার খুরের দাপটে মাটি কাঁপতে লেগেছে। বিরাট পশুযূথ মাঠ থেকে ফেরার সময় যেরকম গুড়গুড় শব্দ হয় সেইরকম ক'রে পাহাড় থেকে নামছিল জন্তু-

গুলো। এখন মনে হচ্ছে ওরা উঠে আসছে মাটি থেকে। ঘণ্টার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

"পাহাড়ের গোরু-ভেড়াদের গলায় বাঁধার জন্য যে-সব ভারি, গম্‌গমে ব্রন্‌জের ঘণ্টা থাকে সেইরকম ঘণ্টা বাঁধা প্রত্যেকটা জন্তুর গলায়, মুসলিমদের যূথের মতো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে টেবিল, চেয়ার, বোর্ড, যত রাজ্যের জিনিশপত্র সব কুঁড়েঘরের জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হ'ল, আশেপাশের বাড়ি থেকেও আনা হ'ল কিছু। গুড়গুড়, ধুপধাপ বেড়ে চলেছে: গোরু-মোষের বাহিনী এগিয়ে আসছে। ব্যারিকেডের মালপত্র হুড়মুড় ক'রে ডাঁই করা হ'ল। চারদিক থেকে চাষীরা এসে জড়ো হচ্ছিল ওই নতুন ব্যারিকেড গড়বার জন্যে—গবাদিবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যারিকেড।

"গবাদিগণকে আটকানো হ'ল। একটা-একটা ক'রে ভারি ঘণ্টাগুলোকে চাষীরা খুলে বা ছিঁড়ে নিল ওদের গলা থেকে, ষাটজন ডায়নামাইটার সেই দিয়ে বোমা তৈরি ক'রে ফেলল। তারপর ওরা জায়গা নিয়ে নিল মূরদের আসার রাস্তায় পাথরে-পাথরে যত গর্ত আছে তার ভেতর।

"তিন ঘণ্টারও বেশি ওরা মূরদের ঠেকিয়ে রেখেছিল গর্তের ভেতর থেকে গোরুর ঘণ্টা ছুঁড়ে। যুযুধান জনতা ছিট্‌কে ছড়িয়ে পড়েছিল স্পেনের ভেতরের দিকটায়, কেউ-কেউ চলে গেছিল সীমানা পেরিয়ে ফ্রান্সে। আটান্নজন ডায়নামাইটার মারা গেছিল।"

"আমি ছিলাম তালাভেরায়," আরেকজন বলে। "ওদের প্লেন এমন বোমা মারছিল, আগে কখনও দেখিনি। সারাগোসার চারধারে চাঁদের উপত্যকার মতো ছ্যাঁদা হ'য়ে গেছে; সমস্ত জায়গা জুড়ে পঁচিশ পাউণ্ডের সব না-ফাটা বোমা। বোমাবাজির সময় দশটায় একটা ক'রে বোমা ফেটেছে। অসাধারণ দৃশ্য। ফাশিস্তরা প্রায় আগাগোড়া হালকা বোমা মেরে যাচ্ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল আর ওদের হাতে ভারি বোমা নেই। গর্ত থেকে বোমাগুলো বেরিয়ে আসছিল মুঠো-মুঠো শস্যের মতো, আমাদের ওপর সোজা এসে পড়তো। মাঝে-মাঝে একটা হয়তো ফাটলো, যেন দুর্ঘটনাবশত। মনে হচ্ছিল ফাশিস্তরা আমাদের বিশাল-বিশাল তীর ছুঁড়ে মারছে। রাস্তার ধারে যেখান দিয়ে আমাদের ট্রাকগুলো যাচ্ছিল ওরা অন্তত পনেরোবার বোমাবাজি করেছে, পাঁচ থেকে নয় প্লেনের ছোটো স্কোয়াড্রন, রাস্তার দু-পাশে বোমা জমা হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন ঠেলাগাড়ি ক'রে নিয়ে যাওয়া হবে। একটার ওপর আরেকটা বোমা পড়েছে এবং ফাটেনি।"

"একটু অদ্ভুত ব্যাপারটা। কয়েকটা না-ফাটলে ঠিক আছে; কিন্তু অতগুলো

না-ফাটলে কেমন যেন বিদঘুটে লাগে। আমাদের মধ্যে কয়েকজন বিমানের কারিগর ছিল ; বেশ কয়েকবার ওরা প্লেনে বোমা লোড করেছে। ওরা পারকাশন ফিউজ খুলে বোমাগুলোকে পরীক্ষা করতে লাগল। একজন হঠাৎ উত্তেজনায় হাতে একটা ছোট্ট টাইপ-করা কাগজের চিরকুট নিয়ে দ্বিতীয় জনকে দেখাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো। দ্বিতীয় জনের হাতেও খুলে-মেলা একটা চিরকুট, সে-ও সাংঘাতিক উত্তেজিত। ওই চিরকুটে পর্তুগীজ শ্রমিকরা সরাসরি লিখে দিয়েছে : 'এই বোমা ফাটবে না'।"

বার্তাবাহকরা সবে এসেছে। অ্যাকশনের সংকেত। ডায়নামাইটাররা বোমা নিয়ে ছুটে গেল। মনে পড়ল একজন অ্যানামাইটের কথা যাকে আমি চিনতাম বহুদিন আগে, তার প্রথম হাতি শিকারেই সে মারা পড়েছিল : হাতিটা তাড়া করছিল, আমার বন্ধুর মনে হয়েছিল এইরকম একটা বস্তুর কাছে মানুষ এত তুচ্ছ …লোকগুলো সব ফায়ারিং লাইনের দিকে এগিয়ে গেল, একজনের পেছনে আরেকজন, পিঠে বোমা, বগলের নিচে বোমা। সামনের পাহাড়ের ভাঙা চূড়োর দিকে আটকে আছে আমাদের চোখ, উৎকণ্ঠিত হ'য়ে অপেক্ষা করছিলাম প্রথম সাঁজোয়া গাড়িটার জন্যে।

"একজন চাষী আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। লোকটা ফাশিস্ত এলাকা থেকে বেরিয়ে চ'লে এসেছে।"

তার সঙ্গে গেলাম যেখানে কৃষকটি দাঁড়িয়েছিল, বৈমানিকরা তাকে ঘিরে ধ'রে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। সে উত্তর দিচ্ছে অনিচ্ছার সঙ্গে। কাছে যেতে তার মুখের আদলটা পুরো দেখতে পেলাম, স্প্যানিশ চাষীর লম্বাটে, গাঢ় রঙের মুখ : সেইসব মানুষের মুখ যারা নেপোলিয়নের সঙ্গে লড়াই করেছে একদিন, পুরোপুরি সেই-রকম কল্পনা করতে হ'লে শুধু লোকটার মুখঢাকা টুপিটা সরিয়ে একটা গিঁটবাঁধা কাপড় পরিয়ে দিতে হয়।

"তুমি বলছিলে তুমি কথা বলতে চাও আমার সঙ্গে ?"

"না। আমি বিমানবাহিনীর কম্যাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।"

"উনিই," বৈমানিকরা তাকে বলল।

কৃষকটি সন্দিগ্ধ। আধঘণ্টার মধ্যেই প্লেনগুলো উড়বে—আমার পোশাকে কোনো পদের ইনসিগনিয়া নেই।

"তুমি প্লেন ছাড়ার নির্দেশ দিতে পারো ?"

বৈমানিকরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, কয়েকজন বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ, কয়েক-জন আবার একটু সন্দিগ্ধ ; লোকটা শত্রু-এলাকা থেকে এসেছে। আমি তাকে

একধারে টেনে নিলাম। ওকে লেওনের পিপলস্ ফ্রন্ট আমার কাছে পাঠিয়েছে। ওর গ্রামের কাছাকাছি ফাশিস্ত প্লেনগুলো রয়েছে। ও শত্রুসারির মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে লেওনে আমাদের লোকদের জানাতে—তারা ওকে তৎক্ষণাৎ আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আমি একজনকে লেওনের পিপলস্ ফ্রন্ট হেডকোয়ার্টারে ফোন ক'রে জেনে নিতে বললাম গল্পটা সত্যি কিনা, তারপর ফিরে এলাম কৃষকটির কাছে।

"কোথায় প্লেনগুলো ?"

"জঙ্গলের মধ্যে। ফাশিস্তরা গাছের নিচে জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে জায়গা করেছে, যেখানে আড়াল রাখা যাবে ওগুলো।"

"মাঠটা কেমন দেখতে ?"

"যেখান থেকে ওড়ে ?"

"হ্যাঁ।"

সে একটা ছবি আঁকল। লম্বা সরু একটা ছবি।

"সৈন্যরা কাল থেকে কাজ করছে মাঠটা চওড়া করবার জন্যে।"

"কীভাবে প্লেনগুলো ছোটে ?"

সে একটু ভাবে।

"পুবে-পশ্চিমে।"

"আর জঙ্গলটা ?"

"পুবদিকে।"

অর্থাৎ শত্রুপ্লেনগুলো পুব থেকে পশ্চিম দিকে গিয়ে উড়বে। হাওয়া, বেশ জোরে পুবদিক থেকে বইছে, এবং কোনো সন্দেহ নেই যে ওলমেদোতেও তাই হবে। চাষীটি যে-মাঠের কথা বলছে সেখানে টেক্-অফ্ করতে শত্রুপ্লেনগুলো যথেষ্ট নাজেহাল হবে।

"ক-টা প্লেন আছে ?"

"কাল রাতে ছিলো বারোটা বড়ো প্লেন আর ছখানা ছোটো। আমরা বাচ্চা ছেলেদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি।"

আমাদের কাছে ছিল চারটে মাত্র প্লেন। লোকটা যদি সত্যি কথা ব'লে থাকে তো শত্রুশিবিরে হানা দিয়ে চমকে দেওয়ার চেষ্টা করা যেতেই পারে। ও যদি মিথ্যে ব'লে থাকে তো আমরা খুঁজে বার করার আগেই শত্রুদের প্লেন উড়ে যাবে এবং আমরা ফিরব না। একজন টেলিফোনচালক এলো লেওনের উত্তর নিয়ে। লোকটি সত্যি ওলমেদো থেকেই আসছে কিন্তু লেওনের লোকেরা ওল-

মেদোর লোকেদের চেনে না। এখন আমাদের ওপরেই নির্ভর করছে কী করব।

আমি ওকে একটা মানচিত্র দেখালাম; যা ভেবেছিলাম, সে প'ড়ে উঠতে পারল না।

"আমাকে নিয়ে চলো ওলমেদোতে," সে বলল, "আমি দেখিয়ে দেবো। আমি তোমাদের সোজা সেই জায়গাটায় নিয়ে যেতে পারব।"

"তোমার পরিবারের কেউ ফাশিস্তদের হাতে মারা পড়েছে?"

"না। আমাকে তোমাদের প্লেনে নিয়ে চলো।"

এইরকম অবস্থায় গুপ্তচররা ধরা প'ড়ে যায়—আকাশযুদ্ধে শত্রুরা কাকে আক্রমণ করবে বাছতে পারে না। ওলমেদো দেড় ঘণ্টার পথ। আমাদের প্লেনে পাঁচ ঘণ্টা টিঁকে থাকার মতো জ্বালানি আছে।

"তুমি কখনো প্লেনে চড়েছ?"

"না।"

"ঘাবড়ে যাচ্ছ না?"

সে বিশেষ বুঝল না কথাটা।

"ভয় করছে না তোমার?"

"না।"

"তুমি মনে করো যে রাস্তাটা তুমি চিনতে পারবে?"

"ওলমেদো থেকে পারব। ও-দেশকে আমি একটা বুনো কুকুরের চেয়েও ভালো চিনি।"

আমাদের কাছে খেদানেপ্লেন ছিল না, কিন্তু আকাশ মেঘলা হ'য়ে আছে, আমরা মেঘের আড়াল পেতে পারি।

অন্য যে-তিনটে প্লেন আমাদের অনুসরণ করছিল ত্রিভুজ তৈরি ক'রে, তারা মাঝে-মাঝে ক্রমশ ঘন হ'য়ে-আসা মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে, সিয়েরার দিকে যত এগোচ্ছি। স্তূপ-করা তুষারের বিরাট প্রান্তর থেকে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ো জেগে আছে উল্টোনো লাঙলের ফলার মতো। ওদের ওপরে শত্রুদের স্কাউটরা অপেক্ষা করছে রকেট নিয়ে, ওদের খেদানেপ্লেনকে সংকেত দেবার জন্যে। কিন্তু অন্যদিকে মেঘের সমুদ্র অনেক গাঢ়, যারা সংকেত পাবে তাদের কাছ থেকে ওদের আলাদা ক'রে দিচ্ছে। আমরা মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ছি, মাঝে-মাঝে বেরিয়ে আসছি যাতে পাহাড়ে ধাক্কা না-খাই—তিমির ছানারা যেমন নিশ্বাস নেবার জন্যে জলের ওপরে উঠে আসে। আমাদের আর স্কাউটদের ওপরে, তলাকার যুদ্ধের উন্মাদনার অনেক-অনেক ওপরে, হেমন্তের সকালের অপূর্ব পরিষ্কার আকাশ। প্রান্ত

দাঁত-বসানো একটা ঠাণ্ডা প্লেনে ঢুকে আসছে ; এইসব যুদ্ধ, যা মাত্র কয়েক সপ্তাহ টে঺কার কথা, তারা অদৃশ্য পৃথিবীর বুকে আশ্রয় নিচ্ছে, আহতরা যেমন ক'রে শয্যা নেয়। আমাদের মুখে ঝাপটা মারছে যে-হাওয়া তার মধ্যে শীত যুদ্ধের প্রাচীন মুখে আরেকবার হাত বুলিয়ে নিল। মেঘ আরো কাছে এল। কিষান আমার দিকে তাকায়। আমি জানি ও ভাবছে: "কী ক'রে তোমাদের পথ দেখাব যদি কিছু দেখতেই না-পাই ?" কিন্তু কিছু বলে না ও। আমি ওর কানে চেঁচিয়ে বলি:

"আমরা ওলমেদোর ওপর দিয়ে ঢুকব।"

সে সিয়েরার দিকে তাকায়, নিচে তাকায় এবং অপেক্ষা করে। প্রত্যেকটা প্লেনে কম্যাণ্ডাররা নিচে-জেগে-ওঠা চুড়োর দিকে দৃষ্টি রেখেছে, লক্ষ করছে রকেট ওড়ে কিনা।

আমরা এখন সিয়েরার ওপরে। সমুদ্রের অন্য পারে মেঘেরা জটলা করেছে।

আমরা কম্পাস দেখে উড়ছি, কিন্তু তির্যক হাওয়াতে যে-স্থানান্তরটুকু হয় কম্পাসে তা ধরা পড়ে না। আমরা যদি আমাদের পথের কুড়ি-তিরিশ কিলোমিটার বাইরে চ'লে যাই শত্রুপ্লেনগুলো ওড়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। আমি অঞ্চলটা পরিক্রমণ করতে চাই সম্পূর্ণ মেঘের আড়াল থেকে না-বেরিয়ে, তারপর আবার উঠে-আসা, রাস্তা শুধরে নেওয়া, এবং ওলমেদোর দিকে এগিয়ে যাওয়া। অতঃপর কিষান দেখাবে পথ।

সিয়েরা পেরিয়ে এসেছি, আমরা শত্রু-এলাকার ওপরে। এখন মোটরে কোনো দুর্ঘটনা মারাত্মক। আহত বৈমানিকদের প্রতি মূরদের একটা বিশেষ পক্ষপাত আছে। উজ্জ্বল এই আকাশের নিচে, মেঘের আড়ালে প'ড়ে আছে নির্যাতন, মৃত্যু। আমাদের পেছনে অন্য প্লেনগুলো এখন ত্রিভুজ ক'রে অনুসরণ করছে একই শরীরের দুই হাতের মতো দৃঢ়তায়।

আমরা ওলমেদো ছুঁতে চলেছি। মেঘ, আকাশ, এখনও সেই একটা গম্ভীরতা··· আমরা মেঘের ভেতর ঢুকলাম। যেই কুয়াশা আমাদের ঘিরে ফেলছে, মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধ শুরু হ'ল। প্লেনটা নেমে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে যথাসম্ভব গা ঢেকে ; যুদ্ধের ছাউনিগুলোতে এখন মেশিনগানার আর বমাররা সতর্ক নজর রাখছে। আমি আর পাইলট—কম্পাস আর অল্টিমিটারটা তীব্রভাবে দেখে যাচ্ছি, মানুষের মুখও কখনও দেখিনি এমনভাবে।

অল্টিমিটারের কাঁটা নামছে: ৮০০—৭০০—৫০০—৪০০—৩৭৫—৩৫০। আমরা এখনও কুয়াশার চাদর ছিঁড়ে বেরোইনি। যদি আরো নামতে থাকি

এবং যদি আমরা ঠিক ওলমেদোর ওপরে না-থাকি (যা হওয়া সম্ভব) আমরা পাহাড়ে ধাক্কা খাবো—এ-অঞ্চলে চারদিকেই পাহাড়।

আবার উপরে উঠতে লাগলাম। নামার আগে দেখেছিলাম মেঘের সমুদ্র কয়েক জায়গায় ফেঁসে গেছে। আমরা অপেক্ষা করব, যেখানে আছি সেখানে চক্কর দেবো, যতক্ষণ-না আমাদের নিচে একটা ফাটল দেখা দেয়।

আমাদের প্লেন মাটির সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে। এতক্ষণ আমরা এগিয়েছি, আমাদের চোখ আর মন ছিল সামনে যা প'ড়ে আছে তার দিকে, যার দিকে এগোচ্ছি মন আচ্ছন্ন ক'রে ছিল সেটা, এই প্রথম আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে। প্লেনগুলো এখন গোল হ'য়ে ঘুরছে মেঘের ওপরে, দুরের পাহাড় অবধি সেই মেঘ ছড়িয়ে আছে; কিন্তু মেঘগুলো এমন একটা গতিতে এগিয়ে চলেছে দেখলে ভুল হয় যেন মাটিরই চলন, এবং মনে হচ্ছে যেন মানুষ, পৃথিবী, নিয়তি ভেসে যাচ্ছে এই বিশালতার সঙ্গে, আমাদের নিচ দিয়েই যে গড়িয়ে চলেছে, এদিকে, ওপরে তখন বিশ্বের বাইরে প্লেনগুলো ঘুরে চলেছে নক্ষত্রের অবশ্যম্ভাবিতায়।

কিন্তু সেই সঙ্গে শিকারী পাখির মতো আদিম, জান্তব এক প্রবৃত্তি আমাদের পেয়ে বসেছে। বাজপাখিদের শত-শত বছরের পুরোনো চক্রাবর্তনের মতো আমরা ঘুরে চলেছি আর অপেক্ষা করছি মেঘে কখন ভাঙন ধরে। সমস্ত অভিযাত্রীদের চোখ নিচের দিকে, যেন আমরা গোটা পৃথিবীটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি এবং আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ কোনো ফাটল দিয়ে তার আবির্ভাব ঘটবে। আর মনে হচ্ছে মেঘ আর পাহাড়ের এই গোটা নিসর্গ যেন ঘুরছে ধীর গ্রহের মতো আমাদের স্থির যন্ত্রের চারধারে।

একটা মেঘ, অন্যদের থেকে গাঢ়, সব্‌জে রঙের, এগিয়ে আসছে। এটাই ভাঙন। পুরনো, ধুসর মানচিত্রের মতো পৃথিবী দেখা যাচ্ছে ।

ওলমেদো ঠিক নিচে নয়, কয়েক কিলোমিটার ডাইনে, পিঙ্গল দেখাচ্ছে টালি-গুলোর জন্যে, যেন ছেঁড়া মেঘের গায়ে পুরোনো রক্তের দাগ। আমার প্লেন ডানায় ঝাপট দিল—লড়াই-এর সংকেত—আমরা গোঁত্তা মেরে নামতে লাগলাম নিচের দিকে।

সব-কটা মাথা সামনে ঝুঁকে আছে, সমান্তরাল, পুরনো বাস-রিলিফের মতো। আমরা গির্জার ওপরে; নিচু দিয়ে বাড়িগুলো ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, পলায়মান জন্তুযূথের মতো।

কৃষকটি দেখছে, সারা শরীর ওর টানটান, মুখ অর্ধেকটা খোলা, গাল বেয়ে এঁকেবেঁকে পড়ছে অশ্রু, কোঁটায়-কোঁটায়; সে কিছু চিনতে পারছে না।

একটু দূরে গোলার ধোঁয়ার বিরাট কুণ্ডলি দেখা গেল, যে-মেঘের টুকরোগুলো থেকে বেরিয়ে এলাম তার মতো। শত্রুদের অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্ট বন্দুকগুলি চালাতে শুরু করেছে; গোলন্দাজরা নিশ্চয়ই শত্রুশিবিরের কাছাকাছি রয়েছে, কিন্তু মাটিতে ধোঁয়ার চিহ্নও নেই। আমাদের হাতে বড়ো জোর দু-মিনিট সময়। কৃষকটি বলেছিল মাঠটা ওলমেদোর উত্তরে। আমি কম্যাণ্ড ডায়ালে সোজা উত্তর দিকে সংকেত রাখলাম, অন্য তিনটি প্লেনে কেউ জানে না যে আমরা কোথায় যাচ্ছি, খবরই রাখে না।

অল্প কিছুক্ষণের জন্যে আমি প্লেনটাকে ৯০° ঘুরিয়ে রাখলাম। আমাদের রাস্তা এখন ওলমেদোর প্রথম সড়কের সমান্তরাল। আমি কৃষককে বললাম:

"ওই ছাখো গির্জা। রাস্তা। আভিলার রাস্তা।"

সবকিছুই সে কিছু-কিছু চিনতে পারছে, কিন্তু দিকনির্দেশ করার মতো দিশা পাচ্ছে না। যখন বাড়িগুলো অবধি থাকবে না, কাকে চিনবে সে? মুখের ওপরের দিকটা স্থাণু, অনড়, চোখ থেকে জল প'ড়ে যাচ্ছে, নিচে থুৎনিটা কাঁপছে আক্ষেপে, কষ্টে।

ফাশিস্ত খেদানেপ্লেন মোটর চালিয়ে দিয়েছে নির্ঘাৎ। যেটা প্রথম উড়বে সেটাই আমাদের মাঠটা দেখিয়ে দেবে; কিন্তু তার আক্রমণে যদি অন্যগুলো ওড়ার সময় পায়, আমাদের একজনও ফিরতে পারবো না। এ এখন মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মামলা।

একটাই উপায় আছে: কৃষকটিকে এমন-একটা দৃষ্টিকোণ দেওয়া যাতে সে অভ্যস্ত। লম্বালম্বিভাবে সে জায়গাটাকে দেখে অভ্যস্ত নয়। মাটিতে—অনুভূমিকভাবে দেখলেই—সে সব চিনতে পারবে। আমাদের মাটি থেকে যেমন দেখা যায় যতটা সম্ভব সেইরকম একটা দৃষ্টিকোণ পাওয়া দরকার। আমি উত্তর থেকে কয়েক পয়েণ্ট বাইরে বেরিয়ে তিরিশ মিটারে নামিয়ে আনলাম প্লেনগুলো।

মেশিনগান গর্জাচ্ছে, কিন্তু তাতে এসে-যায় না কিছু। অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্ট বন্দুক থেমে গেছে—আমরা বেশি নিচে, ওদের রেঞ্জের নিচে। সৈনিকেরা, খামারের পশুরা আমাদের তলা দিয়ে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে, স্নোপ্লাও থেকে যেমন ক'রে বরফ ছিটকে বেরোয়। যদি শুধু দেখতে-দেখতে আর খুঁজতে-খুঁজতে লোকে ম'রে যেতে পারত তাহলে কৃষকটি ম'রে যেত। ও আমার হাত খামচে ধরল, শক্ত, বাঁকা একটা আঙুল কিছুতেই সোজা করতে পারছে না, সেটা তুলে দেখাল নিচু আকাশের তলায় কালো আর ময়লা হলুদ রঙের একটা বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড। সে আমায় ডানদিকে টানতে লাগল সমস্ত শক্তি দিয়ে,

যেন আমিই প্লেন। আমি কম্যাণ্ড সংকেত পুবদিকে ক'রে দিলাম। কৃষকটি চিৎকার ক'রে উঠল। একটি লোকও ঘাড় ঘোরায়নি। কৃষকটি চ্যাচায়, কিন্তু কথা বলে না, আর সেই আঙুল যা এখনও বেঁকে আছে তাই দিয়ে একটা জঙ্গল দেখিয়ে দেয়।

"এটাই সেই?"

সে গোটা ঘাড়, মাথা ঝাঁকিয়ে বলে হ্যাঁ, তখনও তার দুই হাত ছড়ানো। আর ওইখানে জঙ্গলের পাশেই সেই লম্বাটে মাঠ, ওড়ার আগে আমাদের সে যেটা এঁকে দেখিয়েছিল। একটা তাড়া-করার প্লেন আর একটা বোমারু প্লেন খোলা মাঠে রয়েছে, খেদানেপ্লেনের প্রপেলার ঘুরতে শুরু করেছে।

প্লেনটা যেদিকে উড়বে ঠিক সেইদিকে আমরা এগোচ্ছি। আমরা ওপরে উঠে এলাম, যাতে আমাদের বোমাই আমাদের পেড়ে না-ফ্যালে, কয়েক সেকেণ্ডেই আমরা আবার অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌ গোলার নিশানায় এসে যাবো। মাঠের উপর দিয়ে যেতে-যেতে কয়েকটা হালকা বোমা ছেড়ে গেলাম—খেদানেপ্লেনটার রাস্তায় বাগড়া দেবার পক্ষে যথেষ্ট, যাতে ও গতি নিতে না-পারে। পাক খেয়ে ফিরে এলাম একঝাঁক হালকা বোমা ফেলতে-ফেলতে। নিশানা করা অসম্ভব, কিন্তু আমাদের এলোপাথাড়ি বোমার আক্রমণ ফাশিস্ত প্লেনটার রাস্তা রুখে দিয়েছে। জঙ্গলের ওপর দিয়ে বোমা ফেলে চ'লে গেলাম, ওখানে একদল লোক বোমারু প্লেনটাকে ঠেলার চেষ্টা করছে। আমরা আবার আগের মতো মেঘের ওপরে থেকে ফিরে এলাম। মাঠটা নজরে এল যখন, খেদানে প্লেনটা দেখি কাৎ হ'য়ে প'ড়ে আছে: আমাদের কারুর একটা ভারি বোমা কাছেই এসে মেরেছে নিশ্চয়ই।

পুরো গতিতে চারটে চাকাওলা প্লেন তির্যক ব্যূহ ক'রে জঙ্গলের ওপর দিয়ে উড়ে গোলাগুলোর দিকে এগিয়ে গেল, গোলাগুলো একটা বাঁধ তৈরি ক'রে ফেলছে—আমরা যেন ইচ্ছে ক'রেই ওদের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে যাচ্ছি। জঙ্গলের ওপর আমাদের বোমা পড়ছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না ওখানে। কোনো সন্দেহ নেই সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর থেকে টেলিফোনে খবর পেয়ে খেদানে-প্লেন আকাশে উড়ে গেছে। আমাদের মেশিনগানাররা আকাশে নজর রাখছে, পাইলট আর বমাররা মাটির ওপর চোখ রেখেছে; চক্কর দিয়ে যাচ্ছি।

হঠাৎ এয়ারপকেটের মতো একটা ধাক্কা খেলাম। কাছাকাছি কোনো গোলা ফেটেছে? ধারে-কাছে তো ধোঁয়ার কুণ্ডলি নেই। কিন্তু দূরে নিচে জঙ্গল থেকে ঘন কালো ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ করেছে, দেখেই আমি চিনতে পেরেছি:

গ্যাসোলিন। সরাসরি বা অপ্রত্যক্ষভাবে আমরা শত্রুদের ডিপোতে মেরে দিয়েছি। এখন কোথায় বোমা চালাচ্ছি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বিরাটাকার ধোঁয়া উঠে আসছে, যেন এই শান্ত বনের মাটির নিচে স্তরে-স্তরে আগুন লেগে গেছে। দেখতে জঙ্গলটাকে শেষ সকালের অন্য যে-কোনো জঙ্গলের মতোই। কয়েকজন দৌড়ে বেরিয়ে এল—কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকশো-জন, কিছুক্ষণ আগে-দেখা সেই পশুযূথের মতোই, নাক-বরাবর ছুটছে সবাই। আর ছড়িয়ে-পড়া ধোঁয়াকে বাতাস মেরে নামিয়ে দিচ্ছে, যেন যুদ্ধের সমস্ত চিহ্ন আকাশ হতভাগা মানুষের পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে ফেরৎ দেবে। আমার পাশে চাষীটি আনন্দে, শীতে, কাঁপতে-কাঁপতে প্লেনের গায়ে পা ঠুকছে।

...

মাদ্রিদের ওপর বোমা পড়ছে। আমি একটা লোকের পিছু নিয়েছি, সে নিজের সমান মাপের একটা পাণ্ডুলিপি হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। লোকে ওই আকারের কাগজে সচরাচর লেখে না, এবং অত বড়ো পাণ্ডুলিপি দেখে একজন লেখকের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক:

"আপনার ওই পাণ্ডুলিপিটি কীসের?"

এরোপ্লেনের বোমার আওয়াজ কানে আসে।

"এটা পাণ্ডুলিপি নয়, মশাই," সে বিনয়ের সঙ্গে বলে "আমার ঘরের দেয়ালের কাগজটা পালটাবো ভাবছি।"

অনুবাদ : মৈনাক বিশ্বাস

জেম্‌স্‌ লার্ডনার-এর জীবন ও মৃত্যু : কাউকে তো কিছু করতে হবে

সাংবাদিক হিশেবে জিম যে খুব উঁচুদরের ছিল তা নয়। বলা যায়, যদি বলতেই হয়—আমার মনে হয় এটা খুব নাটকীয় শোনায় যে, এক চৌকশ সাংবাদিক হঠাৎ বুঝে ফেললেন চোখের দেখাই তো সব নয়। জিমের ব্যাপারটা কিন্তু ও-রকম না। আসলে, জিম খানিকটা এটা-ওটা করতে-করতে খবর-কাগজের জগতে এসে ভিড়ে গিয়েছিল, এই পর্যন্ত। আর ও-কাজ যে তার খুব জমাটি মনে হ'তো তাও নয়। ও হার্ভার্ড ছেড়েছিল, কেননা সেখানে ওর খুব-কিছু হচ্ছে ব'লে মনে হয়নি। আর তাহ'লে তো চাকরি-বাকরির একটা-কিছু করতেই হয়। খুব স্বাভাবিকভাবে এসে গেল 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড-ট্রিবিউন্‌'-এ, ওর বড়ো ভাই জন সেখানে কাজ করত, নামটামও হয়েছিল আর ওখানে লার্ডনার পরিবারের নামের একটা কদরও আছে। কিন্তু মূলত ওর দিক থেকে ব্যাপারটা ছিল আধখেঁচড়া গোছের, দু-চারটে পয়সা-কড়িও হচ্ছে আর ইতোমধ্যে নিজের মাপটা বুঝে নেবার অবকাশ মিলছে। ঐ একঘেয়ে কাজে ওর একদম মন বসত না। সেই ভোজন-সভা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, টুকটাক দু-একটা আত্মহত্যা, টাকার কুমির দু-চারটে গবেটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ইত্যাদি এ-সব একেবারে পোষাচ্ছিল না। অথচ বড়ো শহরের দৈনিকের তরুণ শহুরে সংবাদদাতার ভাগ্যে তো এ আছেই, আর তাছাড়া ও ছিল খুব লাজুক ধরনের, একটু চাপা প্রকৃতির, তাতে ক'রে এ-ধরনের কাজে পেরে ওঠা যায় না।

ও সময় কাটাত নানা ধরনের এলোমেলো পড়াশোনা ক'রে—প্রুস্ত, নীট্‌শে উচ্চকোটির গণিত, ক্রিপ্টোগ্রাফি আর কনট্র্যাক্ট ব্রিজ এইসব নিয়ে; তাছাড়া ছিল জুয়ো, মদ্যপান, সারারাত ধ'রে তুমুল তর্ক, বাজি ধ'রে লড়াই আর বেসবল। রাজনীতিও ছিল এক খেলা; ১৯৩৬-এর নির্বাচনে রুজভেল্ট-এর ভোটের সংখ্যা ঠিক-ঠিক মতো আগেভাগে বলতে পারার জন্য ও খুব গর্ববোধ করত।

এইভাবে তিন বছরেই ঢের হয়েছিল। তারপর একটা সুযোগ এল 'হেরাল্ড-ট্রিবিউন'-এর এক ধ্যাড়ধেড়ে পারী শাখাতে কাজ করবার; অন্তত একটু মুখ

বদলানোর সুযোগ আর একটু প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র যাতে জীবনে নতুন ক'রে আবার কিছু শুরু করা যায়। এখানেও সেই এক ধরাবাঁধা গৎ—তর্জমা, পুনর্লেখন, দক্ষিণ ফ্রান্সের শাত্যোর বাইরে হা-পিত্যেশ ক'রে থাকা, ওয়ালিস সিমসন কোনো-এক বুধবারে নাকি শুক্রবারে বিবাহিত হবেন তা শোনবার অপেক্ষায়।

কিন্তু বিশ্বসংগ্রামের আঁচটা ওখানে আরো প্রত্যক্ষ। ফরাশি রাজনীতি গায়ে না-মেখে পারীতে কাজ করা যায় না আর ফরাশি রাজনীতির দিকে তাকাতে গেলে যারা ফ্রান্সের কথা না-ভেবে নিজেদের ব্যাবসাপাতির কথা প্রথম ভাবে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও বিকিয়ে-দেওয়া কাহিনীর দিকে তো চোখ বুজে-থাকা চলে না। ১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে ও আমাকে একটা লম্বা চিঠি লিখেছিল, ওখানকার সরকারের পতনের বিষয়ে জানিয়ে, তাতে এই তত্ত্বটাও দাঁড় করানো হয়েছিল যে, নিজের আখের গোছাবার লোভে ব্যনে এই সংকটটা বানিয়ে তুলেছিলেন। ইউনাইটেড প্রেস থেকে ওর এক বন্ধুকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সে-কথাও উল্লেখ করেছিল। তার অপরাধ ছিল সে মার্চের আন্‌স্‌শ্লুস্‌-এর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, যার পরে নাৎসিদের কলকাঠি নাড়ানোয় চেখোশ্লোভাকিয়াতে দেখা দিয়েছিল সেই উত্থান। বার্লিনে ইউনাইটেড প্রেসের যে দু-জন মাত্র খদ্দের ছিল এই প্রতিবেদনের ফলে তাদেরকেও বোধহয় হারাতে হয়েছিল। এ-ধরনের ব্যাপার-স্যাপার দেখলে ভাবতে হয়—ভাববার যদি আর-কিছু অবশিষ্ট থাকে।

জিমের মতো সাফ মাথা আমি খুব বেশি দেখিনি। ঠিক যেন একটা যান্ত্রিক কল, ওর আবেগের যে নিজস্ব ধরন ছিল তার থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। কিছু লোক ছিল যারা ওর কূটতর্কের নিস্পৃহ যুক্তিজালে রীতিমতো ভয় পেত আর সঙ্গে ছিল যে-কোনোরকমের যুক্তিহীনতার প্রতি ওর চরম ঘৃণা। এ-রকম লোক অবশ্য খুব বেশি ছিল না, কারণ ও তো নিজেকে খুব একটা খুলে ধরতো না, যাদেরকে খানিকটা সমধর্মী বলা যায় তাদের কাছে ছাড়া। বাইরের দিক থেকে ওর হৃদয়াবেগের লেশমাত্র টের পাওয়া যেতো না। সে-এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমি ওর থেকে বয়েসে মাত্র পনেরো মাসের ছোটো, খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। তবে আমি ওকে কোনোদিনই মেজাজ খারাপ করতে দেখিনি, উদ্দীপনায় ডগমগ করতেও দেখিনি বা আত্মহারা হ'তেও না।

স্পেনই ছিল ওর জীবনের শুরু ও শেষ। ওর ফ্যাসিবিরোধিতা এসেছিল যুক্তিতর্কের ধারা বেয়ে; বাকি ছিল শুধু সংঘর্ষের মধ্যে গিয়ে পড়া, সক্রিয় ভূমিকা নেবার প্রয়োজনীয়তা যাতে উপলব্ধি করা যায়: এই ওর জীবনে প্রথম এমন-কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া যার কোনো উদ্দেশ্য আছে, স্পষ্ট দিকচিহ্ন এবং নির্দিষ্ট

একটা লক্ষ্য রয়েছে। এর আগের পর্যায়ে এক মানসিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এসে সে পৌঁছেছিল শান্তিকর্মে, আজ তা বর্জিত, কারণ সেই যৌক্তিকতা আজ অবান্তর।

জিম বার্সেলোনায় গিয়েছিল ছুটি কাটাতে, ঠিক সাংবাদিক হিশেবে নয়। নিজের সংবাদপত্রের একটা অনুমতি ও কোনোমতে জোগাড় করেছিল যাতে ওখান থেকে দু-একটা ফিচার পাঠাতে পারে আর কোপেনহাগেন পলিটিকেন-এর থেকে কাগজপত্রও জোগাড় করেছিল যাতে যুদ্ধসীমান্তে যাবার সুবিধা হয়। তবে অর্থ ও সময়ের দিক থেকে সে নিজের মতোই গিয়েছিল। আশু যাত্রার সম্বন্ধে সে আমাকে আগেই লিখেছিল, ওর আসল ইচ্ছে ছিল লিঙ্কন-ওয়াশিংটন ব্যাটালিয়ন সম্বন্ধে একটা ছোটো বইয়ের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা।

১৯৩৮-এর ১ এপ্রিল ও পারী ছাড়ে, একই গাড়িতে সহযাত্রী ছিলেন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ও ভিন্‌সেন্ট শীঅ্যান্। বার দুয়েক গিয়েছিল ও যুদ্ধসীমান্তে, সেখান থেকে একটা লম্বা রিপোর্টও পাঠিয়েছিল, যথারীতি কাটাছাঁটা হ'য়ে তা ছাপাও হয়েছিল 'হেরাল্ড ট্রিবিউন'-এ। তারপর বার্সেলোনার বন্ধুদের কাছে সে ঘোষণা করেছিল যে, স্বেচ্ছাসেবক হবার সিদ্ধান্তটা সে পাকাপাকিভাবে নিয়ে ফেলেছে। শুনেছি সেই বন্ধুরা সবাই ওকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিল, তবে নিশ্চয়ই পারবে ব'লে ভাবেনি কেউ। জিমকে যারা জানত তারাই বুঝবে যে ওর সঙ্গে তর্কে জেতার আশা কেউ করে না।

বন্ধুদের প্রভাব এবং দেশের চাপে একটা ফল হয়েছিল, জিমের ওপর নয়, সেনাবাহিনীর কর্তাদের ওপর; তাঁরা ওকে শিক্ষানবিশীর জন্য এক গোলন্দাজ ইউনিটে আপাতত রাখলেন। সেখানে বন্দুকের অভাবে ওকে বেশ কয়েক মাস চুপচাপ থাকতেই হবে। জিম আপত্তি জানিয়েছিল, কর্তারা তখন ওকে কাতালোনিয়ার ট্রেনিং ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলেন, সেখানেও তো কয়েক মাস না-হোক অন্তত কয়েক সপ্তাহ ফ্রন্ট থেকে দূরে থাকতে হবে। সেখানে ও আরেকটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল: সে "ছেড়ে-ছুঁড়ে" এল—যুদ্ধের খিড়কি থেকে একেবারে সামনে।

মে মাসের গোড়ার দিকে, চব্বিশ বছরের জন্মদিনের ঠিক আগে, ও সোজা পায়ে হেঁটে চ'লে এল ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তরে. এব্রো নদীর পুবদিকে দারমোস্ গ্রামের কাছে। ওখানকার এক সাংবাদিক ওর সম্বন্ধে বর্ণনায় লিখেছিলেন: "পরিষ্কার, ছিমছাম, খাকি পোশাক একেবারে ঝকঝক করছে, আনকোরা এক ক্যানভাসের ঝোলা পিঠে ফেলা, তার মধ্যে অন্যান্য টুকিটাকির সঙ্গে ফরাশি ব্যাকরণ, স্প্যানিশ ব্যাকরণ আর একখণ্ড 'চীনের ওপর লাল তারা'।"

১৩ জুলাই তারিখে সে আমাকে লিখেছিল : "এখানকার জীবন আশ্চর্যরকম শান্ত। প্রায় দু-মাস হ'লো আমি যখন থেকে পঞ্চদশ ব্রিগেড, লিঙ্কন-ওয়াশিংটন ব্যাটালিয়নে যোগ দিয়েছি, তারপর থেকে আমরা একদিনও ট্রেঞ্চের ধারে যাইনি বা একদিনের জন্যও কোনো যুদ্ধ করিনি। মনে রাখতে হবে যে, আমরা হচ্ছি এক জোরালো আক্রমণ-বাহিনী, সে-রকমই হবার কথা। অনেক বিমান আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেছে, কিন্তু কেউই আমাদের উপস্থিতিটুকু পর্যন্ত লক্ষ করবার গরজ দেখায়নি।

"অবশ্য আমি খুবই ব্যস্ত আছি, পদাতিক বাহিনীর কায়দাকানুন রপ্ত করা ও অভ্যেস করার কাজে। তুমি যা ভাবছ ঠিক তা নয়, কাজকর্ম আছে বেশ, তবে এত বেশি নয় যে আমার একটুও একঘেয়ে লাগছে না বা দু-চারটে লড়াইয়ের জন্য আমি হাঁপিয়ে উঠছি না। বার দু-তিন আমরা সব সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে রওনাও দিয়েছি, যুদ্ধক্ষেত্রের দিকেই হবে, তবে প্রত্যেকবারই যে-কোনো কারণেই হোক দেখা গেছে ব্যাপারটা ভুয়ো সংকেত।

"মনে হয় আমার কাছ থেকে যুদ্ধের ভেতরকার সুলুকসন্ধান তুমি কিছু আশা করছ, তবে সত্যি কথা বলতে কী ক্যালিফোর্নিয়ার চেয়ে এখানে ব'সে সেটা টের পাওয়া আরো শক্ত। দেখে-শুনে মনে হয় ব্যাপারটা এ-রকম গড়াতেই থাকবে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কোনো বড়োরকমের পরিবর্তনের ফলে যতদিন-না এসপার-ওসপার কিছু-একটা হয়। সুখের কথা যে, যে-কোনো পরিবর্তনই আমাদের পক্ষে যাবে।"

ঐ চিঠি পাবার আগেই আমি খবর পেয়েছিলাম যে, জিম এব্রোর লড়াইয়ে আহত হয়েছিল। ওর চিঠিতে এ-কথাটা ও লেখেনি যে, কম্যাণ্ডার মিলটন ওল্ফ্ বে-শনদী অফিসারদের স্বল্পমেয়াদী শিক্ষাক্রমের স্কুলে, যে-সব সৈন্যদের পাঠিয়েছিলেন সে তার মধ্যে নির্বাচিত হয়েছিল আর সেখান থেকে সে বেরিয়ে এসেছিল করপোরাল স্তরের প্রশিক্ষণ পেয়ে।

তার প্রথম লড়াইয়ের কাহিনী সে মায়ের কাছে লেখা এক চিঠিতে জানিয়েছিল : "জানি না তুমি এই খারাপ খবরটা পেয়েছ কিনা যে, আমি ছ-দিন আগে আহত হয়েছিলাম, এখন ভূমধ্যসাগরীয় এক হাসপাতালে বেশ আছি। টেলিগ্রাম করবার পয়সাও ছিল না, সুযোগও ছিল না। ভাবনার কিছু নেই, এমন-কিছু না, সপ্তাহ দুয়েকের মতো হয়তো আর লড়াইয়ে যাওয়া যাবে না এই পর্যন্ত।

"এব্রো নদীর ওপারে বাধ্য হ'য়ে দিন দুয়েক কুচকাওয়াজ আর পাহারাদারি করতে-করতে আমরা একদিন শত্রুদলের দেখা পেলাম আর চটপট ২০০ জনকে

বন্দী ক'রে ফেলা হ'লো। ওদের ধ'রে নিয়ে ফিরে আসবার পথে যারা পাহারার দায়িত্বে ছিল আমি তাদের একজন। ২৭ তারিখ বিকেল নাগাদ আমরা নদীর ধারে পৌঁছলাম, খুব ক্লান্ত ক্ষুধার্ত, ফেরি পার হ'য়ে এপারে এলাম।

"একটা গুজব শোনা গেল যে, ২০০ গজ মতো দূরে নাকি এক বাগিচা রয়েছে, সারাদিন খাওয়াদাওয়া হয়নি তো, একফাঁকে স'রে প'ড়ে ঐদিকে এগিয়ে গেলাম। কাঁচা-কাঁচা কিছু পেয়ারা, আপেল ও পিচ ছিল, তবে নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। কিন্তু একটু পরেই টের পাওয়া গেল বোমারু বিমান ও বিমান-ধ্বংসী বন্দুকের ফটাফট লড়াইয়ের। গোলা ফাটছে আর চারদিকে ছোটো-ছোটো শাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠছে যতক্ষণ-না কোনো বোমারু নেমে পড়ে, বা যেটা বরঞ্চ বেশি হয়, বিমানগুলো তাদের ভেতরকার বোঝা খালাশ ক'রে দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

"এইবারে বোমারুগুলো আসছিল একেবারে সোজা মাথার ওপর। আমি ভাবতে আরম্ভ করেছি ঐ বিমান-ধ্বংসী গোলার টুকরোতে আঘাত পাবার সম্ভাবনা কতটা। এ-কথাটা মনেই হয়নি যে, সরাসরি বোমার মধ্যে প'ড়ে যাবার বিপদ আছে কোনো, খেয়াল হ'লো যখন যুদ্ধের সরঞ্জামের একটা লরি ৩০০ গজ দূরে বোমার ঘায়ে লকলকে শিখায় জ্ব'লে উঠল।

"বিমানটা যখন চ'লে গেল আমি তখন উপুড় হ'য়ে শুয়ে ছিলাম, কিন্তু বোমাটা বড্ড কাছাকাছি পড়েছিল। বোমা ফাটা আর তার কাঁপুনি দুই-ই ছিল খুব নিদারুণ, তবে সরাসরি যে লেগেছে সেটা তখন বুঝতে পারিনি। বস্তুত, আমি হেঁটেই গেলাম যেখানে আমার রাইফেল, গুলির বেল্‌ট্‌, জলের বোতল ইত্যাদি সব ছিল, জিনিশপত্র তুলে আবার পেছন দিকে ফিরলাম। তখন খেয়াল হ'লো যে, বাঁ-পায়ের ডিমে আর পেছনেও বাঁ-দিকটায় ব্যথা করছে। হাত দিয়ে বুঝলাম ট্রাউজার রক্তে ভিজে গেছে। অল্প-একটু দূরে দেখতে পেলাম বেশ-কিছু সৈন্য বিমানগুলো চ'লে যাবার জন্য ট্রেঞ্চের মধ্যে অপেক্ষা করছে। আমি ওদের কাছে গেলাম, আমার এক নিগ্রো বন্ধু ছিল, সে একটা স্ট্রেচার আনতে গেল। স্ট্রেচার-বাহক আমার ক্ষতস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে অ্যামবুলেন্সে নিয়ে গেল আমাকে। ট্রেঞ্চে আসার পর থেকে বাঁ-পায়ের ডিমে কোনো মাংস লাগাতে পারিনি। মনে হয় উড়ন্ত বোমার টুকরো মাংস ও পেশীর মধ্যে একেবারে সরাসরি এসে ঘা দিয়েছে, নরম কোনো জায়গায় একদম বিঁধে গেছে। আরো দিন দশেক লাগবে আমার পুরোপুরি সেরে উঠতে। আবার ফ্রন্টে যাবার আগে কয়েকটা দিন বোধহয় বার্সেলোনায় থাকতে পারবো মনে হয়।

"এই হাসপাতালটায় আলো-হাওয়া বেশ আছে। পরিষ্কারও, তবে পড়বার কিছু নেই।"

এর কয়েকদিন পরে সে আমাকে একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিল, হাসপাতালের হাইড্রোথেরাপি বিভাগের ছবি এঁকে। আমার পুত্রের জন্মের খবর দিয়ে ওকে টেলিগ্রাম করেছিলাম, তাতে ও লিখেছিল : "তুমি অবশ্য লার্ডনারদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে যাচ্ছো, তবে এখানে সকলে মিলে তোমার চেষ্টা ভেস্তে দেবার জন্যে এক প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। এবার অবশ্য আমাকে ওরা ঠিকমতো তাক করতে পারেনি, ফসকে গেছে, গণবাহিনীর পক্ষে ভাগ্যের কথা, যদিও বোমা নিয়ে পাইলটকে ফিরে ছুঁড়ে মারার তাড়ায় আমি উড়ন্ত এক লোহার টুকরো ধরেছিলাম...সপ্তাহ খানেকের মধ্যে এ-সব ঝক্কিঝামেলা কাটিয়ে বেরোতে পারবো মনে হচ্ছে। উলটো পিঠে দেখতে পাবে আমাকে সারিয়ে তুলবার জন্য অনেক যে-সব প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হচ্ছে না তার মধ্যে একটা।"

ও হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল, ঘা-টা তখনো কাঁচা রয়েছে, পুরো শুকোয়নি। আবার ব্যাটালিয়নে ফিরে আসবার জন্য ওকে দু-সপ্তাহ ধ'রে এক নাগাড়ে লড়তে হয়েছে। সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখে ওকে আবার ফ্রন্টে পাঠানো হ'লো, এবারে নিজের বাহিনীর দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে।

২১ সেপ্টেম্বর, প্রধানমন্ত্রী হুয়ান নেগ্রিন জেনিভাতে স্পেনের সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন : সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের লড়াই থেকে এখুনি প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হচ্ছে। ২২ তারিখে আমেরিকানরা জানত যে তাদের সাহায্যের জন্য স্পেনীয় বাহিনী আসছে, আর তাই তারা ফ্যাসিস্টদের মারাত্মক গোলাগুলির মধ্যেও এগিয়ে গিয়েছিল পড়ো-পড়ো সৈন্যসামন্তদের ঠেকা দিতে। লড়াইয়েও ওটাই তাদের শেষ রাত।

তিন পাহারাদারের এক গোষ্ঠীর দায়িত্ব দিয়ে জিমকে পাঠানো হয়েছিল 'নিরপেক্ষ' অঞ্চলে এক হারিয়ে-যাওয়া পল্টনের খোঁজে। ওরা লোকজনের সাড়া পেয়েছিল : মাটি খুঁড়ছে। জিম থেমে ওদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল ; বুঝতে পারেনি যাদের খুঁড়ছে তারাই না কি শত্রুপক্ষের সামনের সারির সৈন্যসামন্ত। ও একলা এগিয়ে গিয়েছিল ; রাইফেল এবং মেশিনগান গ'র্জে উঠেছিল, হাতবোমা ফাটছিল চারদিকে। ওর একজন সঙ্গী, স্প্যানিয়ার্ড, নিহত হয়েছিল। অন্য জন, অ্যান্টনি নোওয়াকোভস্কি, আমেরিকান, সে একলা ফিরে এসেছিল।

বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে জিমের মৃত্যু বিষয়ে নিশ্চিত খবর পাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ফ্যাসি পক্ষের এক সাংবাদিকের মারফৎ জেনেছিলেন

যে, ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে, যার সঙ্গে ছিল সাংবাদিকের পরিচয়-পত্র। ওর চেয়ে বেশি নিশ্চিত খবর আর-কিছু পাওয়া যায়নি। স্পেনে মার্কিন বাহিনীর সর্বনেশে ক্ষয়ক্ষতির তালিকায় এটাই ছিল অন্যতম শেষ নাম, হয়তো-বা সর্বশেষ নাম।

ঐ সর্বনাশা যুদ্ধে তার যোগ দেবার কারণ হিশেবে একটাই মাত্র বক্তব্য নথিভুক্ত আছে। সে একবার অন্য সাংবাদিকদের কাছে বলেছিল যে, স্পেনের জনগণকে সে দেখেছে, তাদের নিজেদের দেশের যতটুকু অবশিষ্ট আছে তার মধ্যেই সে তাদের দেখেছে; যুদ্ধক্ষেত্রে গেছে, সেখানকার অবস্থাও স্বচক্ষে দেখেছে; আর এ-সবের পরে তার সিদ্ধান্ত : "কাউকে তো কিছু করতে হবে।"

অনুবাদ : সৌরীন ভট্টাচার্য

লিলিয়ান হেলম্যান

একদিন স্পেনে ১৯৩৭

ভালেনসিয়ায় অক্টোবর মাসে বেলা বারোটাতেও দিন বেশ উষ্ণ আর রৌদ্রোজ্জ্বল থাকে। আমি ফুলবাজার থেকে একগুচ্ছ ফুল আর কিছু সবুজ পাতা কিনেছিলাম। এ-রকম পাতা আমি এর আগে কখনও দেখিনি। মোড় ঘুরে রাস্তা ধ'রে এগুলাম—রোদের তাতে হাঁটতে বেশ লাগছিলো। সামনে দেখি একটা বেড়াল; মনে হয় না বেড়ালটাকে হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে ব'সে পড়তে দেখার আগে কী ঘটছে সেদিকে আমার কোনো খেয়াল ছিলো। বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতেই আমি প্রথম সাইরেন শুনতে পেলাম। এক মহিলা যাচ্ছিলেন একটা পেরামবুলেটার ঠেলে, হঠাৎ সাইরেন শুনে একটি বাচ্চা মেয়েকে তুলে নিয়ে, গাড়িটায় বসিয়ে দ্রুত সেটাকে ঠেলে নিয়ে চ'লে গেলেন। সম্ভবত কেউ-কেউ ছুটতেও শুরু করেছিলো, কিন্তু বেশির ভাগই হঠাৎ থমকে থেমে গিয়েই তারপর আগের চেয়েও তাড়াতাড়ি হনহন ক'রে চলতে শুরু করেছিলো। চোয়ালটা হঠাৎ কেমন ক'রে-ওঠায় পরে বুঝতে পেরেছিলাম আমি একটু বেশি জোরে দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছিলাম। অন্যদের মতো আমিও ততক্ষণে হাঁটতে শুরু ক'রে দিয়েছি, বারে-বারে নিজেকে বলছি যতক্ষণ সাইরেনগুলো বাজছে ততক্ষণ অন্তত বোমারু বিমানগুলো এসে পৌঁছুবে না। কথাটা অবশ্য আমি সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করিনি, তবে খোলা স্কোয়ারটায় অনেক লোক ওপরের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো। আমি চট ক'রে স্কোয়ারটা পেরিয়ে আমার হোটেলের দিকে এগুলাম। মোটরের আওয়াজ যখন কানে এলো, আমি কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখিনি মোটরগুলো কোথায়। শুধু ভাবছিলাম হোটেলের ঘরটাতে শুধু একটা দাঁত মাজার বুরুশ, একটা পরিষ্কার রাতজামা, একটুকরো সাবান, একটা পুরোনো জ্যাকেট আর এক বাক্স অখাদ্য মিষ্টি রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি সেইদিকেই হনহন ক'রে হেঁটে যাচ্ছি, ঐ ঘরটাতেই আমি ফিরে যেতে চাচ্ছি, আমার নিজের বলতে যা-কিছু আছে, সব ঐ ঘরটাতেই আছে। আর আচমকা আমি বুঝতে পেরে গেলাম কেন মাদ্রিদের সবচেয়ে গরিব মেয়েরাও তাঁদের যা-কিছু সম্বল সেটুকুও আঁকড়ে ধ'রে আগলে থাকতে চান।

ঠিক যখন এসে হোটেলের কোণটায় পৌঁছেছি, বিমানের আওয়াজ তখন

খুব কাছে। আমি কোণটায় থেমে গিয়ে দেয়ালের গায়ে ঠেশ দিয়ে দাঁড়ালাম। বিমানগুলো পুবদিকে খুব উঁচু দিয়ে দ্রুত উড়ে যাচ্ছে। আমার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়েছিলো দুটি সৈনিক, তাদের একজনের হাতে একথোকা আঙুর। মিনিট খানেকের মধ্যেই সে তার বন্ধুকে কিছু-একটা ব'লে অন্য-একদিকে আঙুল তুলে দেখালো। দক্ষিণ দিক থেকে চারটে বিমান আমাদের দিকে উড়ে আসছে। কাছাকাছি এসে সেগুলো ঘুরে গেলো। হঠাৎ সৈনিকটি আমার বাহু ছুঁয়ে চেঁচিয়ে উঠলো : 'এগুলো আমাদের।' 'ঐ আমাদেরগুলো যাচ্ছে!' তারপর সে কয়েকটা আঙুর ছিঁড়ে নিজের কোটে মুছে পরিষ্কার ক'রে আমার হাতে দিলো। বললো : 'আমাদের বিমানগুলো আকাশে উঠে গিয়েছে। এখন সব ঠিক হ'য়ে গেছে।' কিন্তু সবকিছু ঠিক ছিলো না। বন্দরের চারপাশে মিনিট তিনেকের মধ্যেই ইতালীয় বোমারু বিমানগুলো তেষট্টি জনকে মেরে ফেলেছিলো। কিন্তু আঙুর খেতে-খেতে আমরা তখন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসছিলাম; তখন আমরা তো জানতাম না।

গুস্তাফ রেগলারের সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে আমি বেনিকাসিমের সদর হাসপাতালে পৌঁছেছি তখন। রেগলার, ক্যাথলিক, জেস্যুয়িটপন্থী, হিটলার ক্ষমতায় আসার আগে বেশ সুপরিচিত ঔপন্যাসিক ছিলেন। মহাযুদ্ধের সময় গুস্তাফ ছিলেন ক্যাপ্টেন; এবার, এই 'ছোট্ট যুদ্ধে' ফ্রন্টে যাবার পথে তাঁর গাড়িটায় বোমা প'ড়ে টুকরো-টুকরো হ'য়ে যায়, গুস্তাফ বেশ গুরুতরভাবেই জখম হন। বেনি-কাসিমের পথে যেতে-যেতে আমরা বিভিন্ন লেখক ও তাঁদের নিয়ে আলোচনা করতে-করতে বেশ উত্তেজিতই হ'য়ে পড়েছিলাম, তবে তর্ক ক'রে বেশ মজাও লাগছিলো। আমরা বেনিকাসিমে পৌঁছেছিলাম রাতের খাবার সময়। জর্মান আর মার্কিনরা বড়োশড়ো একটা টেবিলে ব'সে খাচ্ছিলো। তাদের কারু-কারু সঙ্গে ছিলো তাদের স্ত্রী, আর আমি ভাবছিলাম এদের সবাইকে দেখতে কী সুন্দর আর খাবার বা সিগারেটের ব্যাপারে এরা কত উদার! (বেশি-কিছু খাবার অবশ্য ছিলো না, আর যাও বা ছিলো তাও খুব বাজে।)

পরের দিন সকালে এক মার্কিন, ড. বুশ, রেগলার, রাজনৈতিক প্রতিনিধিটি এবং আমি হাসপাতালটা ঘুরে দেখবার জন্য বেরুলাম। তৃতীয় যে-ঘরটিতে আমরা ঢুকলাম, সেখানে দুটি লোক। একজন ক্যানাডীয়। অন্যজন নিউ-ইয়র্কবাসী এক ছোকরা, যার ছোট্ট, শুকনো, ফ্যাকাশে মুখ হামেশাই নিউ-

ইয়র্কের গরিবদের মধ্যে চোখে পড়ে। ক্যানাডীয়টি তার একটি পায়ের পাতা হারিয়েছিলো, কিন্তু তখনও সে তা জানতো না। মার্কিন ছেলেটি বাঁ-পাশ ফিরে শুয়েছিলো, মুখের পেশীগুলো যন্ত্রণায় শিউরে-শিউরে উঠছিলো। তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে আমি তার দিকে তাকাতেও পারছিলাম না। বুশ যখন তাকে পরীক্ষা করবার জন্যে খাটের কাছে গেলো, আমি সেখান থেকে স'রে এলাম। রাজনৈতিক প্রতিনিধিটি মোটাশোটা, ছোটোখাটো মানুষ; কিছুদিন আগেই তিনি মেরুদণ্ডের একটা গুরুতর আঘাত থেকে সেরে উঠেছেন। নিউ-ইয়র্কের ছেলেটিকে ব্যথায় কেঁদে উঠতে শুনে আমি তাঁকে বললাম: 'ওর কী হয়েছে?' তিনি বললেন: 'ওর বৃক্ক আর উরুতে গুলি লেগেছিলো। উরুর আঘাতটা এখনও খোলা ক্ষত।' আমি বললাম: 'ওকে আপনারা ঘুমের ওষুধ দিতে পারেন না? শুনছেন ওর চীৎকার?' প্রতিনিধি মাথা নাড়লেন: 'নিশ্চয়ই। বুশ ওকে কিছু-একটা দেবে। কিন্তু ছেলেটার কথা বেশি ভাববেন না—ওর একটু অসুখ-অসুখ বাতিক আছে।'

মাদ্রিদের তথ্যদপ্তরের সামনের চৌহদ্দিতে কে যেন অনেকগুলো বড়ো-বড়ো মূর্তি বসিয়েছে। কেউ ঠিক পরিষ্কার ক'রে জানে না ওগুলো ওখানে কী ক'রে এলো, অথবা ওগুলো কী, কেনই-বা ওখানে রয়েছে, কিন্তু এ-বিষয়ে সবাই একমত যে ওগুলো সত্যি খুব বিশ্রী। বুধবার রাতে, সাতটা নাগাদ, একজন খবরকাগজের ভদ্রলোক আমায় বললেন, 'এগুলো বেশ বীভৎসই। ওদের যদি গোলাগুলিই ছুঁড়তে হয়, তবে কখনও কেন এগুলোতে মারে না?' আমরা রাস্তায় বেরুবার দরজাটার কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম। 'অন্ধকারে পথ চিনে যেতে পারবেন তো?' শুনে হেসে বললাম, 'নিশ্চয়ই, অন্ধকারে ভয় না-পাবার মতো বয়েস আমার হয়েছে।' কিন্তু দরজা খুলে ফুটপাতে নেমেই বুঝতে পারলাম কথাটা খুব বোকার মতো বলেছি।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ভয়ের একটা অস্ফুট আওয়াজ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। কোনো শহরকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে দেখার অভিজ্ঞতাটা ভয়ংকর। কোনো আধুনিক শহরই রাত্রে আলোহীন হ'য়ে থাকবার জন্য তৈরি হয় না। বাড়িগুলো ওপরের দিকে কতগুলো তেড়াবেঁকা বিকৃত ত্রিভুজে গিয়ে মেলে আর আকাশটাকে পৃথিবীর বড়ো-বেশি কাছে ব'লে মনে হয়। হোঁচট না-খেয়ে, ফুটপাতের কানাগুলো খুঁজতে-খুঁজতে, আর খানাখন্দে পা না-দেবার চেষ্টা করতে-করতে

আমি রাস্তাটা ধ'রে এগুতে লাগলাম। দু-বার আমি পথ হারিয়েছিলাম আর একবার গোড়ালি মুচড়ে প'ড়ে আছাড়ও খেয়েছিলাম, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখি আমি কাঁদছি। গোড়ায় ভেবেছিলাম বুঝি গোড়ালির ব্যথায় কাঁদছি। কিন্তু শেষটায় হোটেলে পৌঁছে যখন আবার বেশ নিরাপদ লাগছে, হোটেলের মধ্যেই আমি দৌড় লাগালাম। এটা সাতটার সময়। সোয়া-আটটা নাগাদ হঠাৎ একটা শিস দেবার মতো আওয়াজ, আর তারপরেই দূরে বিস্ফোরণের শব্দ! কয়েক মিনিট পরেই, রক্তদান শিবিরে যে-ইংরেজ মেয়েটি কাজ করতো, সে আমার দরজা খুলে ঘরে ঢুকে জিগেশ করতে লাগলো, আমি সারাদিন কী-কী করেছি, মাদ্রিদ আমার ভালো লাগছে কিনা, সে কি—কী যেন শোনবার জন্যে সে থেমে গেলো, তারপরেই আবার খুব তাড়াতাড়ি হড়বড় ক'রে কথা বলতে লাগলো।

ওরা তখন মাদ্রিদে মিনিটে চল্লিশটা ক'রে গোলা বর্ষণ করছিলো আর ঐ শিসের শব্দটা ক্রমেই খুব কাছে এগিয়ে আসছিলো। মেয়েটি আমার দিকে ফিরলো, 'জানো, ওগুলো কী?' 'হ্যাঁ,' আমি বললাম, 'বোমা পড়ছে!' 'ঠিক আছে,' মেয়েটি বললো, 'আমি এসেছিলাম এই ভেবে যে এ তো তোমার প্রথম বার। বাথরুমে এসো, তাহ'লেই বুঝতে পারবে কত কাছে বোমা পড়ছে।' আমরা বাথরুমে ঢুকলাম; মেয়েটি স্নানের টবের ওপর ব'সে আমাকে লক্ষ করতে লাগলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শিসের আওয়াজটা সোজা কোণের জানলাটার পাশ দিয়ে চ'লে গেলো আর বিস্ফোরণের শব্দটা কেমন ভারি শোনালো, তেমন তীক্ষ্ণ নয়, কিন্তু খুব কাছে। মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো: 'গিয়ে দেখি আমি কিছু করতে পারি কিনা। তুমি বরং নিচে খাবার ঘরে যাও। ও-ঘরটা একেবারে বাড়ির মাঝখানে।' আমি বললাম: 'তাতে কী লাভ?' মেয়েটি হাসলো। 'খুব বেশি-কিছু না'—ব'লে বেরিয়ে গেলো। আমি বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। শিসের আওয়াজ, গোলা উড়ে-যাবার শব্দ আর তারপর বিস্ফোরণের একটা তীক্ষ্ণ অথবা ভোঁতা আওয়াজ ছাড়া আর-কোনো শব্দ নেই। হঠাৎ একটা একটানা ভারি আওয়াজ অন্ধকারে—আমার মনে হ'লো শব্দটা বোধহয় কোনো মানুষ করছে। আর তার ভেতর থেকে উঠে এলো আরো-একটা শব্দ। লোকটার আওয়াজ থেমে গেলে দ্বিতীয় শব্দটা স্পষ্ট শোনা গেলো: একটি বাচ্চার তীক্ষ্ণ চেরা চীৎকার। সেই রাতে দেড় ঘণ্টা ধ'রে মাদ্রিদে যখন বোমা পড়ছিলো তখন আরো নানারকম শব্দ হয়েছিলো। তাদের অনেকগুলোরই ইংরেজিতে কোনো নাম নেই।

সে-রাতের ক্ষতির হিশেবটা এ-রকম : আশিজন মারা গেছে, দুটো হোটেলে গোলা লেগেছে, একটা মুদির দোকান আর শহরের সবচেয়ে গরিব পাড়ার কিছু বাড়ি মুছে গিয়েছে, তথ্যদপ্তরের বাড়িটায় তিনটে গোলা লেগেছিলো, আর মূর্তি-গুলো যাঁর বিষম অপছন্দ—তিনি সেদিন সেখানে ছিলেন দুটো মূর্তিকে বোমার ঘায়ে উড়ে যেতে দেখবার জন্য। আমার হোটেলের পেছনে একটা রান্নাঘরে, একটি অন্ধ মেয়ে রোজ রাতে স্যুপ নিতে আসতো। সে তার স্যুপের বাটিটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো—স্যুপের বাটিতে চুমুক দিতে-দিতে সে মারা যায়। পরে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক আমায় বলেছিলেন, 'এমনতর হত্যার কোনো মানে হয় না। সামরিক কোনো লক্ষ্যের দিকে ওরা তাগই করে না—কিংবা কোনো মানুষের দিকেও না। আমি যখন ফ্রাঙ্কোর পক্ষে ছিলাম, কয়েকমাস আগে, আমি জর্মান যন্ত্রবিদ্‌দের এটাকে "ছোট্ট যুদ্ধ" ব'লে বর্ণনা করতে শুনেছি। আসলে ওরা অভ্যেস করছে। পরীক্ষা করছে—কামানগুলোর পাল্লা পরীক্ষা করছে। কামান-গুলোর অব্যর্থতা আর পাল্লা মাপাই ওদের উদ্দেশ্য।' একবাটি স্যুপ খেতে-থাকা একটা অন্ধ মেয়ের উপর কামানের পাল্লা মাপা কোনো মানুষের পক্ষে চমৎকার কাজই বটে!

অনুবাদ : অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

ইলিয়া এরেনবুর্গ

'আমি সর্পের দ্বারা চুম্বিত হয়েছি'

আমরা অনেক কিছুই দেখেছি, তা সত্ত্বেও 'স্পেন' শব্দটি শোনামাত্র এখনও শরীরের সব রক্ত মুখে এসে জমা হয়। স্পেনই হ'লো প্রথম যে দু-দুটো ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যের আঘাত ঘাড়ে নিয়েছে। একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন সেদিন সমর্থন জানিয়েছিল স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রকে।

প্রায় তিন বছর ধ'রে স্পেন প্রতিরোধ করেছিল, কিন্তু এই অসম সংগ্রামে সে শেষ পর্যন্ত হার মানলো। মাদ্রিদে এবং বার্সেলোনাতে বোমা বর্ষণ ক'রে জার্মানরা মনোযোগ দিলো প্যারিস এবং লণ্ডনের দিকে।

যুদ্ধের বছরগুলিতে ইংরেজ, মার্কিন এবং ফরাশিরা শপথ নিয়েছিল যে তারা দুনিয়া থেকে ফ্যাসিবাদ ধ্বংস করবে: যুদ্ধ শেষ হয়েছে। হিটলার আর নেই। মুসোলিনি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। তা সত্ত্বেও ফ্রাঙ্কো এখনও মাদ্রিদে ব'সে এবং গেস্টাপো-ধরনের মানুষেরা স্পেনীয় দেশপ্রেমীদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি এম. ব্লুম-এর সংবাদপত্র 'পপুলেয়র'-এ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের নির্যাতন প্রকোষ্ঠগুলি বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে আমরা জানতে পারি যে বন্দীদের মুখে এবং কুঁচকির মধ্যে ব্যাটন ঢুকিয়ে মার দেওয়া হ'তো, পা উলটোদিকে ঝুলিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হ'তো এবং 'পপুলেয়র'-এর ভাষায়, 'জেরা করবার ভার ছিলো জার্মানদের ওপর, যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ তাদের তরজমা ক'রে দেওয়া হ'তো এবং জার্মানরাই ঠিক ক'রে দিতো পরীক্ষার ধারা কী রকম হবে।'

সুতরাং হিটলারের জার্মানির পতনের প্রায় তিন বছর পরেও হিটলারীয়রা স্পেনের শহরগুলিতে সাধারণ লোকেদের নির্যাতন ক'রে চলেছে। আর ফরাশি সোশালিস্টরা যাঁদের এইসব ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হবার কথা, তাঁরা উলটে স্পেনের রুদ্ধ সীমানা খুলে দিয়ে ফ্রাঙ্কোর সাহায্যার্থে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছেন।

এটা কি প্রহসন না? আমি একজনও মাননীয় বাক্যবাগীশকে মুখ খুলতে দেবো না, যদি-না তিনি গোড়াতেই চেঁচিয়ে বলেন, 'মশাই, স্পেনের ব্যাপারটা কী হ'লো?'

তারা বলে স্পেনে যা ঘটেছিল তা হচ্ছে গৃহযুদ্ধ। কিন্তু লাভাল-এর বিরুদ্ধে ফরাশি পার্টিজানদের[১] সংগ্রামকে কেউ কি 'শুধু গৃহযুদ্ধ' বলবে? কুইসলিঙ-এর

বিরুদ্ধে নরওয়েজীয় পার্টিজানদের সংগ্রামকে কেউ কি 'শুধু গৃহযুদ্ধ' বলবে? স্পেনে ছিলো একদিকে দেশপ্রেমী, অন্যদিকে বিশ্বাসঘাতক, একদিকে রাষ্ট্র, অন্যদিকে পঞ্চম বাহিনী, একদিকে প্রজাতন্ত্র, অন্যদিকে ভাড়াটে সৈন্যরা।

স্পেন আক্রান্ত হয়েছিল ইতালি এবং জার্মানির দ্বারা। নতুন ইতালির সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জার্মানির সঙ্গে শান্তিচুক্তির কথাবার্তা চলছে। কিন্তু স্পেনে অ্যাঙলো-স্যাক্সন শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীরা ইবেরীয় লাভাল-কুইসলিঙ ফ্রাঙ্কোকে বাদ দিয়ে রেখেছে। ন্যায়বাদী অথবা শান্তিকামী এ-রকম ভান ক'রে লাভ নেই। এদের দরুন স্পেনে রক্ত ঝরছে।

আমি মাদ্রিদে, বার্সেলোনা এবং ভালেনসিয়ার এমন-সব ছোটো-ছোটো গলিতে জার্মান বোমা ফাটতে দেখেছি, যে-সব সরু রাস্তা বাচ্চা ছেলেমেয়েতে ভর্তি। স্পেনের শিশুদের রক্ত হিটলারের ক্ষমতা প্রয়োগের প্রথম নিদর্শন। ইংল্যাণ্ড কি ভুলে গেছে কীভাবে ইয়ুঙ্কার, হাইনকেল এবং মেসেরশ্‌মিটগুলো লণ্ডনে বোমা ফেলবার আগে স্পেনের বিভিন্ন শহর ধ্বংস করেছিল? কভেন্‌ট্রির কথা আমাদের মনে আছে। কিন্তু কভেন্‌ট্রির আগে গের্নিকা।

আমি জনৈক ফ্যাসিস্ট বিমানবাহিনীর কর্মচারীর সঙ্গে প্রথম আলাপের কথা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। তারা তাকে ডাকতো ওবেরলিউটেনাণ্ট কাউফ্‌-মান ব'লে। পুয়ের্তো ইয়ানো-তে যেখানে কোনো সৈন্য নেই, কারখানা নেই, গুদোম নেই, সেখানে কেন বোমা ফেলা হ'লো, এই প্রশ্নের জবাবে সে উত্তর দিলো, 'আমরা বিভিন্ন ভূপৃষ্ঠ থেকে বোমা ফেলার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছি।' পাঁচ বছর বাদে আমি কাউফমানকে বিয়েলোরুশিয়াতে দেখতে পেয়ে মোটেও আশ্চর্য হইনি। তার ব্যবহারে সংগতি আছে।

কিন্তু সেইসব লোকদের বিষয়ে কী বলা যায় যারা কাউফমান-এর কানে-কানে বলে, 'দয়া ক'রে বোমা ফেলে যাও—আমরা বাধা দেবো না,' তারপর প্যারিস এবং লণ্ডনের বিমান আক্রমণ প্রতিরক্ষার আশ্রয় থেকে তাকেই শাপশাপাণ্ড করে? আর এখন যখন হাজার-হাজার ওবেরলিউটেনাণ্টরা স্পেনের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে, তখন আবার হস্তক্ষেপ না-করার সুবিধা বিষয়ে বাক্‌তাল্লা দেওয়া? এর নাম ছ্যাবলামো? না, সবটাই ঠাণ্ডা মাথায় হিশেব করা। তারা কাউফমানকে ভয় পায় না, তারা এখন ভয় পায় স্পেনের মানুষকে।

যুদ্ধের সময়ে ফ্রাঙ্কো তার মনিবদের আন্তরিকভাবেই সেবা করেছিল। সরকারিভাবে স্পেন জার্মানি-ইতালির জাঁতাতের বাইরে ছিলো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জার্মানির কুৎসিত উপগ্রহে পরিণত হয়। কাঁসুড়ে আর মাস্তানদের নিয়ে

ফ্রাঙ্কো তৈরি করে 'নীল ডিভিশন' এবং সেটাকে পাঠানো হয় পূর্ব সীমান্তে। আমরা জানি ফালাঙ্কিস্তদের[২] জন্য ইস্পাহানিরা দায়ী নন, দায়ী লণ্ডন এবং ওয়াশিংটন। এরাই সেইসব পাষণ্ডদের রক্ষা করেছে, যারা রুশ মেয়েদের ফাঁসি দিয়েছে, নোভোগোরোদ-এর যৌথ খামারিদের খুন করেছে, লেনিনগ্রাদ অবরোধে অংশ নিয়েছে, পুশকিনোর রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করেছে।

ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোকে যে ফ্যাসিস্ট হিটলার সমর্থন করবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু এটা অবাক হবার মতো যে তথাকথিত 'ডেমোক্র্যাট'রা এবং 'সোশালিস্ট'রা তাকে (ফ্রাঙ্কোকে) সমর্থন করছেন। সত্যি, এটা বিস্ময়করের চেয়ে কিছু বেশি। এটা বিরক্তিকর।

স্পেনীয় জনসাধারণের ব্যবহার এ থেকে একেবারে আলাদা। ভণ্ড বন্ধুদের দ্বারা পরিত্যক্ত, বিদেশী এবং দেশী গেস্টাপোদের দ্বারা নীরক্ত, তারা এই কয় বছর ধ'রে অবিরত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে।

রিপাবলিকানরা যখন পশ্চাদপসরণ করছিল, তখন আমি স্পেন-ফ্রান্স সীমান্তে ছিলাম। ভয়ংকর ছিলো সেই দেশত্যাগের হিড়িক। দালাদিয়ের সরকার সীমান্তে রেখেছিল সেনেগলীয়দের এবং তারা জানতো না কী ধরনের মানুষের সঙ্গে তারা লড়াই করছে। বিজিত কিন্তু অকুতোভয় যোদ্ধাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হ'তো কয়েদিদের মতো—তাদের রাখা হ'তো নির্যাতন শিবিরে, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, যেগুলির সঙ্গে জার্মানির অনুরূপ সংগঠনের সঙ্গে তফাৎ অল্পই। কিন্তু ইস্পাহানিরা জানতো যে ফরাশি জনসাধারণ এর জন্য দায়ী নয় এবং দু-বছর পরে এমন একটিও মাকির[৩] বাহিনী ছিলো না যেখানে স্পেনীয়রা ফরাশিদের পাশাপাশি একসঙ্গে লড়াই করেনি।

বহু ইস্পাহানি, বিশেষত তরুণ এবং শিশুরা, আমাদের দেশে আশ্রয় পেয়েছিল। জার্মানরা যখন আমাদের আক্রমণ করে, তখন এই অল্পবয়েসিদের কেউ-কেউ সাবালক হ'য়ে উঠেছে। প্রতিরোধবাহিনীর সম্মানিতদের তালিকায় রুশ নামের ফাঁকে-ফাঁকে হোসে, হুয়ান, রদরিগো, ফেরনান্দো, পাবলো প্রভৃতি নামও পাচ্ছি। তারা শুধু সামরিক সাহায্যই দেয়নি। এত বড়ো বিরাট যুদ্ধে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভূমিকা কতটুকুই বা গুরুত্বপূর্ণ? কিন্তু অঙ্কের হিশেবের বাইরেও অন্য স্বীকৃতি আছে। সেই স্বীকৃতি হ'লো মানবিক হৃদয়ের।

স্পেন, যাকে ধরা হয় পশ্চাদপদ ব'লে, সে কিন্তু ইতিহাসের মালগাড়ির

সহযাত্রী হবে না। স্পেনীয়রা তাদের নির্লিপ্ততা, সাহস এবং মানবিক মর্যাদা-বোধের জন্য প্রসিদ্ধ। কাস্তিইয়ে অথবা আরাগনের দরিদ্রতম নিরক্ষর চাষীও আমেরিকার কৃষকদের চেয়ে রাজনৈতিকভাবে সচেতন। মারশালের ধর্মকথা দিয়ে বারসেলোনা অথবা সেভিইয়ে-এর মজুরদের বোকা বানানো যাবে না। পিরেনিজ পেরোলে দেখা যাবে আরেকটা জগৎ। এখানে এসে স্পেনের ঐতিহাসিক বিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হয়—সামন্তবাদের অবশেষ, রক্ষণশীল গির্জার বোঝা, শাসক শ্রেণী এবং বিদেশী পুঁজির সম্পর্ক। সাধারণ মানুষের গণতন্ত্রে গভীর আস্থা, সামাজিক মুক্তির সঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতার সমন্বয়।

ইংরেজ সাংবাদিকেরা মাদ্রিদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন. ইউরোপের আর কোথাও এত দামি মোটরগাড়ি এবং জঘন্য দারিদ্র্যের সমাবেশ দেখা যায় না। তিন বছরের যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ, নতুন-নতুন জেলখানা আর প্রতি কাবাইয়েরোর পিছনে দশজন ক'রে গোলাম আর প্রতি গোলামের পিছনে হাজার জন বিদ্রোহী —এই হ'লো আমাদের যুদ্ধের স্পেন। ইস্পাহানি জনসাধারণের এই ন্যায়-সংগত ক্রোধের কথা জেনেও অ্যাঙলো-স্যাক্সনরা কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে বুরবঁর সিংহাসনের দাবিদারদের সঙ্গে, জিল রোবল-এর সঙ্গে, সেনানায়ক এবং বিশপদের সঙ্গে, ধূর্ত প্রিয়েতোর সঙ্গে। তারা ব্যাকুলভাবে চাইছে বেআব্রু ফ্রাঙ্কোর চেয়ে র'য়ে-স'য়ে কাজ চালাবার মতো একজন কয়েদখানার অধিকর্তা। কিন্তু আগুন উশকে দিতে তারা ভয় পায়।

কোনো মন্ত্রীপরিষদের সমন্বয়ে গ'ড়ে-ওঠা দেশ স্পেন নয়। আগে এটা ছিলো সামরিক হুনতা এবং সর্বশক্তিমান যাজকদের দেশ—চক্রান্ত আর নীরব দুঃখ, দীর্ঘ পথ, দীর্ঘ গান এবং দীর্ঘ গন্তব্যের দেশ। কিন্তু সেই স্পেন আর নেই। রাজার সঙ্গে-সঙ্গে তা উধাও হ'য়ে গেছে—তা উধাও হ'য়ে গেছে প্রগলভ ব্যবহারজীবী এবং সেনানায়কদের স্বল্পস্থায়ী কর্মজীবনের অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে, যারা ঘণ্টাখানেক তাড়াহুড়ো করলো রিপাবলিকানদের দলে যাবার জন্য।

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে, তখনও পর্যন্ত সম্ভব ছিলো স্পেনীয়দের 'সব শ্রেণীর' শ্রমজীবীদের প্রজাতন্ত্রের ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো। এই সহজ বিশ্বাসের জন্য ইস্পাহানি জনসাধারণকে বড়ো বেশি দাম দিতে হয়েছে, যেমন আস্তুরিয়ান খনিমজুরের রক্ত আর বছর-বছর ধ'রে তার নিরানন্দ প্রতিক্রিয়া, ফ্রাঙ্কো এবং বিদেশী ফ্যাসিস্টদের মধ্যে চুক্তি, ভয়ংকর যুদ্ধ এবং ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস। এখন আস্তুরিয়াস, কাতালোনিয়া এবং কাস্তিইয়ে-এর পাহাড়ে গেরিলা বাহিনী যুদ্ধ করছে ফ্রাঙ্কো আর তার ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠীর সঙ্গে।

'ফ্রাঙ্কোকে কারা সমর্থন করছে? ডলার, ইংরেজ কূটনীতি, ভ্যাটিক্যানের অভিশপ্তরা আর জার্মানি থেকে পালিয়ে আসা হিমলার-এর পোষ্যপুত্ররা। কিন্তু পার্টিজানদের সমর্থন করে ইস্পাহানি জনসাধারণ। শত্রুপক্ষের ক্ষমতা কমিয়ে দেখার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই—সারা দুনিয়া জুড়ে শত-শত শয়তান রয়েছে। কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে জনসাধারণ শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেই এবং এই জয়ের উদ্দেশ্য ফ্রাঙ্কোর বদলে আরেকজন রাজা অথবা জিল রোবল কিংবা প্রিয়েতোকে বসানো নয়।

আমি যে-বার প্রথম স্পেন দেখি (সেটা বছর ষোলো আগে), আমি লিখেছিলাম, 'স্পেন কারমেন নয়, ষাঁড়ের পিঠে চেপে লড়াই নয়, রাজা আলফোনসো নয়, লেরু-র কূটনীতি নয়। ব্লাস্কো ইবানিয়েথ-এর উপন্যাসও নয়। যা-কিছু খাঁটি স্পেনীয় ব'লে বিদেশে রপ্তানি করা হয় যাদের মধ্যে আছে আর্জেনটিনার নর্তকী এবং নকল মালাগা (মদ্য), তার কিছুই নয়। না। স্পেন হচ্ছে দু-কোটি জীর্ণ মলিন দোন কিহোতে, সে হচ্ছে বন্ধ্যা পাহাড়, নিদারুণ অবিচারের বোঝা, শুকনো অলিভ পাতার মর্মরের মতো বিষণ্ণ তার গান, সে হচ্ছে ধর্মঘটীদের আওয়াজের মতো যাদের মধ্যে কোনো পঞ্চম বাহিনী নেই; সে হচ্ছে মূর্তিময়ী ভালোত্ব, মমতা এবং করুণা। এ এক মহান দেশ—পরের গলগ্রহ, ইনকুইজিটর বুরবঁদের শত বাধাসত্ত্বেও যে তার তারুণ্যের আগুন নিভতে দেয়নি।

পরে আমি ইস্পাহানিদের দেখেছি তাদের ভয়ংকর সংকটের দিনে। আমি দেখেছি দয়ালু বৃদ্ধ চাষীদের খেলার বন্দুক হাতে ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এগিয়ে যেতে। মাদ্রিদ যারা রক্ষা করেছিল, সেইসব তরুণ-তরুণীর সাহস আমি দেখেছি। আমি সেইসব লোকেদের 'নো পাসারান' ব'লে ম'রে যেতে এবং যারা কখনো পিছু হঠেনি।

স্পেনীয় সংসদের গত অধিবেশনে আমি ছিলাম। অধিবেশন চলছিল ফিগুদয়েরাস নামে ছোট্ট সীমান্ত শহরের মধ্যে একটি পুরোনো প্রাসাদের প্রকোষ্ঠে। ওখানে ফ্যাসিস্টরা দিনরাতই বোমা ফেলছে। একটি ছোটোখাটো বৃদ্ধ মানুষ সেই অন্ধকার ঘুপচি ঘরে এক টুকরো কার্পেট নিয়ে এলেন। তিনি স্বাধীনতার যন্ত্রণাকে অলংকৃত করতে চেয়েছিলেন। বোমার আঘাতে তিনি মারা যান।

স্পেনে যতদিন ছিলাম, একবারের জন্যও আমাকে কোনো চাষী ফলমূল, চীজ-পনির অথবা মদের দাম দিতে দেয়নি। একজন বলেছিল, 'পেসেতার

(পয়সার) চেয়ে হাসির দাম অনেক বেশি।' এটা আশা করা যায় না যে ওয়াল স্ট্রিটের লোকেরা এর মর্ম বুঝবে অথবা এটা মেনে নেবে যে মুক্তিপ্রাপ্ত এমন সাধারণ লোকও আছে, যারা মানুষকে শ্রদ্ধা করে অথচ আন্তরিকভাবেই টাকা-পয়সাকে ঘৃণা করে।

স্পেন মানবসভ্যতাকে অনেক দিয়েছে। তার শিল্পসাহিত্য অমর। থেরভান্তেস এবং লোপে দে ভেগা, কেভেদো এবং কালদেরোন, ভেলাসকেথ, থুরবারান এল গ্রেকো, গোইয়া—এই কয়টি নাম করলেই তার অবদানের ব্যাপ্তি আন্দাজ করা যাবে। করদোবা, তোলেদো, সেগোভিয়া, সালামান্কা, গ্রানাদা, সেভিইয়ে-এর স্থাপত্য সব দেশের লোকদের আনন্দ দিয়েছে। এবং ভবিষ্যতে দেবেও। এমন শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করেছে যে-দেশের মানুষ, তারা কী ক'রে ফ্রাঙ্কো এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ প্রুশিয়ান ঠগ এবং মার্কিন ব্যাঙ্কারদের সমর্থন জানাবে ?

দোন কিহোতে-র ওপর দারুণ একটি গ্রন্থপ্রণেতা মিগুয়েল দে উনামুনো দীর্ঘকাল রাজনীতির ব্যাপারে কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এ-ব্যাপারে তাঁর সারল্য প্রায় অন্ধতার সামিল ছিলো। তা সত্ত্বেও মৃত্যুর আগে তিনি এই অসাধারণ উক্তিটি ফ্যাসিস্টদের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, 'তোমরা জয় করতে পারো, কিন্তু আস্থা অর্জন করতে পারবে না।'

ফালাঙ্গিস্তরা তরুণ প্রতিভাবান কবি গারথিয়া লোরকাকে গুলি করেছে। প্রজাতন্ত্রের সমর্থকদের কষ্টসাধ্য পথ পরিক্রমণ করতে গিয়ে ফরাশি সীমানা পেরোবার সময়ে মারা যান প্রবীন মহান কবি আন্তোনিও মাচাদো। নির্বাসনে আছেন কবি রাফায়েল আলবের্তি লেখক হোসে, বেরগামিন এবং আরো অনেকে। স্পেনের যুদ্ধের সময় পিকাসো সৃষ্টি করেন, 'গোর্নিকার ধ্বংসাবশেষ' এবং 'ফ্রাঙ্কোর অলীক স্বপ্ন এবং মিথ্যাচার'।

ফ্রাঙ্কোর কোনো কবি বা চিত্রশিল্পী নেই। তার প্রশস্তি গায় 'দ্য ডেইলি মেল'-এর লেখকেরা আর তার চোখ জ্বলজ্বল ক'রে ওঠে ওয়াশিংটনের সবুজ ব্যাঙ্কনোটের তাড়া দেখে।

যুদ্ধের আগেও আমি দেখেছি স্পেনের সরল মানুষদের দেশের ঐতিহ্যের প্রতি কী-রকম ভালোবাসা। এস্কালোনার স্থানীয় গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভাপতি একজন কমিউনিস্ট শ্রমিক। তিনি আমাকে দ্বাদশ শতকের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি দেখান। তাঁর পূর্বসূরি জনৈক ফ্যাসিস্ট এবং তথাকথিত 'ঐতিহ্যের ধারক' আলমারি থেকে ঐগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু কমিউনিস্টটি বললেন, আমরা এগুলি কোনো মিউজিয়মে পাঠিয়ে দেবো।

...

অধ্যাপক মানুয়েল মার্কেস নামে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক মাদ্রিদে থাকতেন। যুদ্ধ শুরু হ'লে মাদ্রিদে ফ্যাসিস্টরা যখন হানা দিতে আরম্ভ করে, তখন তিনি ঘর ছেড়ে চ'লে যান। যাবার আগে তিনি দরজায় এই চিরকুট লটকে দেন, অধ্যাপক মানুয়েল মার্কেস-এর ফাইলগুলি তাঁর তিরিশ বছরের পরিশ্রমের ফল।

কয়েক মাস বাদে তিনি একটি চিঠি পান, 'মাননীয় অধ্যাপক, আপনার বাড়ি যেটি সত্যিই বিজ্ঞানের পীঠস্থান ছিলো, সেটি ফ্যাসিস্টরা ধ্বংস ক'রে ফেলেছে। কিন্তু "লাল মূর্খরা" আপনার তিরিশ বছরের কাজকে রক্ষা করতে পেরেছে। আপনি নিশ্চিত থাকুন আমরা আবার আপনার বাড়ি তৈরি ক'রে দেবো— আপনার যন্ত্রপাতি এবং পঁচাশিটা ফাইল ভর্তি কাগজের তাড়া সযত্নে রক্ষিত আছে। লাল সৈনিক গাব্রিয়েল এর্নানদেথ্ রিনসোন।

এর চেয়ে বেশি আর কী যোগ করা যায়? এটা ঠিকই লাল সৈন্যরা এখনও পর্যন্ত অধ্যাপকের বাড়িটি তৈরি ক'রে দিতে পারেনি। ফ্রাঙ্কো তো কম জেলখানা তৈরি করেনি আর এই জেলখানায় ব'সে আছে অধ্যাপক এবং সৈনিক রিনসোন-এর বন্ধুরা। কিন্তু জেলখানা বেশিদিন টেকে না, অন্যদিকে সাধারণ মানুষেরা অমর।

আজ [১৯৪৮] স্পেন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। দূর থেকে অস্পষ্টভাবে শুনতে পাই জল্লাদদের ক্ষিপ্র আক্রমণে পার্টিজানদের গুলি ক'রে মেরে ফেলার শব্দ। কিন্তু এই মানুষদের আমি চিনি। আমরা জানি সৃষ্টির এই আগুন কখনো নিববে না। স্পেন তো আমাদের কাছে শুধু একটা জাদুঘর নয়, অথবা এমন-একটা দেশ যেখানে আমাদের বহু প্রিয়জনের সমাধি আছে। এটা বহু শিশুরও দেশ— তারাই বড়ো হ'য়ে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো ভয় পেয়েছে। সে জানে তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। একদিন সবকিছুর জন্যই তাকে জবাবদিহি করতে হবে, মাদ্রিদের ধ্বংসাবশেষের জন্য, শিশুদের রক্তের জন্য, 'নীল বাহিনী'র জন্য। অ্যাংলো-স্যাক্সনরা তাকে 'পাপমুক্ত' ঘোষণা করতে পারে, কিন্তু স্পেনের জনসাধারণ তার পাপাচরণ ক্ষমা করবে না।

প্রাচীন ইস্পাহানি মহাকাব্যে একটি চমকপ্রদ গল্প আছে—রাজা রদরিগো বিষয়ে। স্পেন হারিয়ে তিনি দেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। পরে জনৈক তপস্বীর নির্দেশে তিনি গোরস্থানে জ্যান্ত শুয়ে রইলেন— বুকে একটি সাপ জড়িয়ে। তিনদিন তিনরাত রাজা মৃত্যুর অপেক্ষায় রইলেন, শেষকালে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি সর্পটির দ্বারা চুম্বিত হয়েছি।'

জেনারেল ফ্রাঙ্কো কিছুই বলে না, কিন্তু সে-ও চুম্বিত হয়েছে। তবে সাধারণ বিষধর সাপের দ্বারা নয়, সোনালি মার্কিনী কালনাগিনীর দ্বারা। ফ্রাঙ্কোর কাছে স্পেনের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি একটি অ্যাঙলো-স্যাক্সন উপনিবেশ। বলা যেতে পারে পুরো স্পেনটাই একটি জিব্রালটারে পরিণত—যার বহিরঙ্গটা অ্যাঙলো-স্যাক্সনীয়, আর জার্মান ফ্যাসিস্ট দলের ভাড়াটে সৈন্যরা স্কটিশ টুইডের স্যুট প'রে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

তবে ইস্পাহানিরা এই অভিভাবকত্ব মেনে নেয়নি। তাই সংগ্রাম চলছে। পুরনো স্পেনীয় কিংবদন্তি অনুসারে স্বর্গে তিনরকম ভাষা প্রচলিত। মধুর ইতালীর ভাষায় সর্প ঈভকে প্রলুব্ধ করে। ইস্পাহনি ভাষায় ঈশ্বর মানুষকে ইডেন থেকে নির্বাসিত করেন। আর শালীন ফরাশি ভাষায় আদম ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

এখন ইস্পাহানিরা সাপের কথা আর শুনবে না, ইংরেজিতে বললেও না। ফরাশি ভাষারও কোনো প্রয়োজন তাদের নেই, যে-ভাষাতে ব্লুম সমাজবাদীরা ফ্রাঙ্কোকে সনর্থনের জন্য নানা ছলছুতো বের করছে। ইস্পাহানিরা স্পেনীয় ভাষাতেই ফ্রাঙ্কোকে দূর ক'রে দেবে। আর ইস্পাহানিরা জানে একদল মানুষ আছে যারা তাদের প্রতি আস্থা রাখে, যারা কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেনি এবং করবেও না—তারা হ'লো সোভিয়েতের মানুষ।

আস্তুরিয়ার পর্বতে গেরিলাবাহিনীরা এগিয়ে চলেছে, মুখে তাদের পুরোনো গান: 'আমার অলংকার হ'লো আমার অস্ত্র, আমার বিশ্রাম হ'লো আমার সংগ্রাম, আমার শয্যা হ'লো কঠিন প্রস্তর আর আমার স্বপ্ন নিদ্রাকে নির্বাসিত করা।'

আমরা সাড়া দিয়ে বলি: 'সালুদ ই ভিক্তোরিয়া, অভিনন্দন ও জয়।'

অনুবাদ: সুবীর রায়চৌধুরী

উল্লেখ-উৎস:

১ পার্টিজান: অন্যায়ভাবে দেশ জবরদখলকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে গ'ড়ে-তোলা গোপন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যকে বলে পার্টিজান।

২ ফালাঙ্গিস্ত (Falangist). স্পেনের ফ্যাসিস্ট পার্টির নাম ফালাঙ্গো। তার সদস্যকে বলে ফালাঙ্গিস্ত।

৩ মাকি (Maquis): দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান অধিকার কালে সংগঠিত ফরাশি গেরিলা বাহিনী।

৪ পেসেতা: ইস্পাহানি মুদ্রা।

হাওয়ার্ড ফাস্ট

প্রস্থান

কেমন যেন বুড়ো হ'য়ে গেছি রাতারাতি, আর ঘুমও ভাঙলো ভার-ভার; ভাঙলো এক হঠাৎ পরিবারগ্রস্ত ব্যক্তির মতো, দুই বাচ্চা বৌ, বকেয়া বাড়িভাড়া, অথচ এ-সব কিছুই আমার নেই, কেবল এক বোধ যে এবার অনেক কিছুই ফুরোলো, উন্মত্ত মাইফেল ও মেয়েবাজি এবং নানারকম নির্বোধ পাগলামি, সেইসব যাতে সকলে আমার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে হাসতো আর যা-ই ঘটুক না কেন, মেনেও নিতো যেমন কোনো ভাঁড়কে নেওয়া যায় মেনে। 'ভাঁড়ামি করছে,' ওরা বলতো, 'শালা সারাক্ষণ ভাঁড়ামি করে।' কিন্তু কিছু মনে করতো না।

অনেকক্ষণ ধ'রে ক'ষে দাড়ি কামালাম; আর লরেঁস যার কিনা এক চার বছরের মেয়ে আছে দেশে, সে ঠাট্টা ক'রে বসলো যে তার সেই মেয়েও নাকি অমন দাড়ি কামাতে পারে, এবং ব্লেড ছাড়াই. নেহাৎই এক জরাজীর্ণ বদখত ঠাট্টা কিন্তু স্পষ্ট ইঙ্গিত যে কেউই ফুর্তিতে নেই, কারোরই সুখের দিন নয় এটা। 'জাহান্নামে যাও,' আমি বললাম।

'খারাপ কিছু বলিনি, বাপ।'

'জাহান্নামে যাও, বাপজান। আমায় তুমি খেপাতে পারবে না। মন আমার কাছে এক সাম্রাজ্য। বয়স কোনো বাহাদুরি নয়, কেবল কালক্ষেপ।'

ট্রাকগুলো দাঁড়িয়ে আছে, তবু ধীরে-সুস্থে, ভেবে-চিন্তে পোশাক পরলাম। ঠিক কী কারণে জানি না, জামাকাপড়ের সঙ্গে আমার একটা আত্মীয়তা ছিলো—ব্যাগেজ লটারিতে পাওয়া বুট, ভারি ব্রাউন প্যাণ্ট, নীল স্কি-জ্যাকেট, কালো বেরে। আমার জামাকাপড় আগে আমার কখনো ভালো লাগেনি, কিন্তু এখন লাগছিলো; মনে হচ্ছিলো বেশ অনাটপৌরে, এবং বোকা-বোকা হ'লেও এক গ্যাদগ্যাদে ভাবাবেগ জন্মেছিলো জামাকাপড়ের প্রতি। এমনকি কোহেনের কাছ থেকে একটা বুরুশ চেয়ে নিয়ে ঝেড়েও নিলাম পোশাকটা। যারা দেখছিলো তাদের পক্ষে ব্যাপারটা হাসির, কিন্তু হাসাবার জন্যে তা আমি করিনি।

পুরো সাঁজোয়া দলটাই অমনি। এমনিতে দেখলে কারোরই তা মনে হবে না, কিন্তু আমার যেমন জামাকাপড় তেমনি প্রত্যেকেরই একটা না একটা কিছু আছে; এবং ভোরবেলার গাঢ় তরলতায় তারা হাঁটছিলো মেপে-মেপে, স্বেচ্ছাক্রিয়,

যেন কোনো পূর্বনির্ধারিত নাচের পদক্ষেপ ফেলছিলো গুনে-গুনে। কী কথাবার্তা হচ্ছিলো তার খানিকটা মনে করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু অনেকদিনের ঘটনা আর ছিলামও নেহাৎ ছোটো। কথা তেমন টিকে থাকে না যেমন থাকে সোঁদা মাটির গন্ধ, অপেক্ষমাণ ট্রাক এঞ্জিনের আওয়াজ, অন্ধকার উত্তীর্ণ হ'য়েও জ্বলতে থাকা স্পটলাইটের ফিকে আভা। এরাই স্মৃতির বুনুনি করে; হয়তো-বা লসোভস্কি আমাদের তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে বলছিলো, কিন্তু নিশ্চিতভাবে মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে যে ট্রাকে আমরা উঠেছিলাম তা আগেই আধবোঝাই হ'য়েছিলো ক্রোয়াটদের দ্বারা, মস্ত, ঘুম-ঘুম চোখ, পিঙ্গলকেশ সব যুবক যারা আমাদের দেখে হাসলো এবং নিজেরা গাদাগাদি ক'রে অনেকখানি জায়গা ক'রে দিলো আমাদের।

গর্জন ক'রে উঠলো আমাদের ট্রাক আর আমরা হাসপাতাল চৌহদ্দি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

'বিদায়, ডেনিয়া,' বললো ম্যাক গোল্ডষ্টাইন গম্ভীর ও সশ্রদ্ধভাবে। তার-পরই ঝাড়লো একখানা আমার পশ্চাদ্দেশে, ঝেড়ে বললো, 'দেশে যেতে খুব ভালো লাগছে, তাই না, খোকাবাবু?'

'দেশ সেখানেই যেখানে তুমি দেশ বানিয়ে তোলো।' পার্কার নামের এক ইংরেজ এ-কথা বলতো, আমি তার কাছ থেকেই তুলে নিই। তখন আমি এন্তার কথা, বাক্যবন্ধ কেবল তুলে নিচ্ছিলাম; হয়তো এভাবেই ভাষার বাড় হয় বাচ্চা বয়সে। কখনো-কখনো আমি এ-সব ঠিকই প্রয়োগ করতাম, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই সম্ভবত ভুল, এবং হয়তো সেই কারণেই তারা সময়সেতু জুড়ে দৃশ্যমান হ'য়ে আছে। কোনো শব্দ, বাক্যবন্ধ বা বাক্য নিক্ষিপ্ত হ'লো, কী ক'রে তা মনে রাখবে তুমি, যদি শপথ নিয়েও থাকো এবং কাঠগড়ায়ও দাঁড়াতে হয়। যদি আমি শপথ নিয়ে থাকতাম এবং জবাবদিহি করতে হ'তো আমাকে, তাহ'লে হয়তো জানি না, কথার খেলাপই ক'রে ফেলতাম।

বয়স কত ছিলো?

ঠিক বলতে পারবো না—কুড়ি বা একুশ।

পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। নিশ্চয়ই তুমি পিছিয়ে ভাবতে পারো, পারো হিশেব করতে। তুমি তো একজন বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল মানুষ।

আমি?

তারিখ কত ছিলো?

চোদ্দো বা পনেরো বা ষোলো জানুয়ারি। জানোই তো, ঠিক তারিখ দিয়ে তারিখ নিরূপণ হয় না—নিরূপণ বলতে যা বোঝায় আর কী—আমার প্রথম

সন্তানের যখন জন্ম হ'লো বা আমার মায়ের কবরে যখন আমি একমুঠো মাটি ছুঁড়ে দিই, অথবা যখন গোরুটি বিয়োলো, খাশি গোরু আর তখন ছিলো না, কিংবা যখন গির্জের ছায়া সোজা না-হ'য়ে খোঁচা-খোঁচা এবং চার রঙের তাপের তড়িৎ ঝলসে উঠছে পুবদিকে ; কিন্তু কিছুই নয় ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী। তাই মনে আছে যে ভালেন্সিয়ার সেই ব্যারাক, যেখানে ছিলো সকলে, সব দেশের মানুষ, ফরাশি ও স্লাভ ও ক্রোয়াট ও সার্ব ও জর্মান এবং হলদে চুলের উত্তরদেশী এবং কালো চুলের দক্ষিণদেশী, ইতালীয়রা আর গ্রীকরা আর ক্রীটের মানুষ—সেই বিশাল ব্যারাকে ঢোকার মুখে, একটি হিস্পানি মেয়েকে আমি দেখেছিলাম যে আর-সকল জীবন্ত মেয়ের চাইতে সুন্দর, ছিপছিপে, ললিতচরণ, সে পাশ দিয়ে হেঁটে চ'লে গেলো, কিন্তু আমার তাকে মনে আছে আর সে-ই ছিলো সেদিন, আর সেই থেকেই আমি তার প্রেমে প'ড়ে আছি যদিও আর-কখনো তাকে দেখিনি।

ভূমধ্যসাগরীয় আকাশের রঙও আমার মনে আছে যখন সেই সন্ধেয় আমরা জাহাজে উঠেছিলাম।

সেই একই দিন ?

হ্যাঁ, আমি তো তাই মনে করি। আমার তো মনে হয় সেই একই দিন। ভেবে দ্যাখো, সেই মেয়েটির আমি প্রেমে পড়েছি আর ভাবছি তারই কথা, এবং মনে হচ্ছে ব্যারাকে ছিলাম একটুক্ষণই, কেননা তাতে কয়েক হাজার মানুষ থাকা ছাড়া খালি মনে পড়ছে যে গ্রীকরা গান গাইছিলো। মনে পড়ছে কারণ আমি বরাবরই ভেবে এসেছি গ্রীকরা কেমন অদ্ভুত লোক, আমাদের মতো নয় কিংবা ইংরেজদের মতো বা জর্মানদের মতোও নয়, অনেক বেশি হিস্পানিদের মতো, হয়তো, আর তারা যেন কখনো ক্লান্ত হ'তো না ; যেন সারাক্ষণই তাদের সূচনা ; যেখানেই থাকুক না কেন তারা, তাদের সেটা সূচনা, খুব আশাবাদী মানুষ তারা। গানটা আমার মনে আছে, কারণ গানটা ছিলো প্রেমের, আর আমি তো বলতে গেলে প্রেমে প'ড়ে আছি, আর বন্দরের ওপরকার আকাশ ছিলো তেমনি, গোলাপি রঙ হ'য়ে উঠছিলো বেগনি আর আমার ইচ্ছে করছিলো কাঁদতে। এবং ব্যাটাছেলেরা কেমন হয় তা তো জানোই, আমি আর ভাঁড়ামি করছিলাম না ব'লে আমাকে কেবলই খোঁচাচ্ছিলো ; আর যখন আমরা দল বেঁধে হেঁটে জাহাজে উঠছিলাম তখন আমি কাঁদতে লাগলাম, কিন্তু প্রায় অন্ধকার হ'য়ে এসেছে তখন, কেউ খেয়াল করেনি।

অতি উত্তম এক কর্মকাণ্ড, মসৃণ ও নিষ্কণ্টক ঠিক যেমন লীগ অব নেশনস্ ও যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং রাইখষ্টাগ তা হ'তে চাইবে তাই, খালি জাহাজগুলো

ছিলো পুরোনো এবং নোংরা ও জং-ধরা আর কেউ খুব নিশ্চিত ছিলো না কিসের জোরে সেগুলো ভাসছে। আমাদের জাহাজে আমরা উঠে পড়লাম দল বেঁধে এবং সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম একেবারে খোলে। কিন্তু খোলে নামবার আগে আমি একবার ফিরে তাকালাম সুন্দর শহরটির দিকে, ভালেন্সিয়া, রম্র, এক পুরাকালীন শহর। কী ক'রে স্মরণ করবো তখন কী ভেবেছিলাম? ছোকরা ছিলাম তখন, ছ্'দে, শক্তপোক্ত, বিক্ষুব্ধতাপ্রবণ এক ছোকরা যার জিজীবিষা অফুরান, কিন্তু যে প্রেমনত্র আর মুখমণ্ডল অশ্রুসিক্ত, নিশ্চয়ই গাঢ় ও গভীর কিছু ভেবেছিলাম। কিংবা হয়তো বিদায় ছাড়া আর-কিছুই ভাবিনি।

যদি বিদায়ের কথা ভেবে থাকি, তাহ'লে তা অতি অল্পবয়সে যেমন লোকে ভাবে তেমনি, সব ক-টা জায়গাতেই তুমি আবার ফিরে আসবে, অতএব বেদনার অশ্রু মোছো। ফরাশিদের একটা কথা আছে এ নিয়ে, কিন্তু ইংরেজিতে কোনো যথার্থ কথা নেই। এক ওয়েলসীয় খনক ছিলো আমাদের সঙ্গে, পিট্সবার্গবাসী, ১২৯ নম্বর ব্রিগেডের এক ক্যাপ্টেন—ব্রিগেডটা য়ুগোস্লাভদের—হাত-গ্রেনেডের ঘায়ে যার কোমর, অণ্ডকোষ, পেট ও পা ছিঁড়ে গিয়েছিলো, তবুও যে হাঁটতে পারতো; সে পাটাতনের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দেখছিলো শহর অন্ধকার হ'য়ে আসছে, রত্নগরী, শোকার্ত, কিন্তু কিছু বলেনি। জানি না কী বিদায় সে জানাচ্ছিলো। পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ জন ছিলাম আমরা মার্কিনি, নেমে গিয়েছিলাম একেবারে নিচে মালপত্রের পাটাতনে আর আমাদের চারপাশ জুড়ে ছিলো নানান দেশের লোকের দেহের উত্তাপ ও গন্ধ, রুগীদের, আহতদের, স্ট্রেচার-বাহিতদেরও, এবং সবাই ভিড় করেছিলো ঘুলঘুলিতে, ফলে একফোঁটাও আলো ঢুকছিলো না ভেতরে, আর এবারে জাহাজ বেরিয়ে পড়লো মাঝসমুদ্রে।

স্বপ্নের মতো ক'রে বলতে পারি এই ঘটনা, কিন্তু স্মৃতি হিশেবে নয়। যখন শুয়ে থাকি রাত্তিরে আর ভয় করে মরতে, যেমন সকল লোকের করে, কেবল হঠাৎ-হঠাৎ সেইসব ক্ষেত্র ছাড়া যেখানে খবরটা গৌরবের, তখন এই ঘটনার কথা ভাবি আর আর্ত হৃদয়ের পক্ষে তা হ'য়ে ওঠে এক মলম। কিন্তু তথ্যের পাশাপাশি কী মূল্য স্মৃতির? আর, বিশ্বাস করো চাই না-করো, ভয়ের স্মৃতি কিছুই নেই, কারণ ঐ খোলের মধ্যে লোকে নিশ্বাস নিতে পারুক, না-পারুক ঘুমোতে বা নড়াচড়া করতে, কিন্তু কেউ ভয় পেয়েছিলো ব'লে মনে পড়ছে না। তবে হয়তো আমার স্মৃতি দুর্বল এবং আমি যেহেতু বাচ্চা ছিলাম সকলেই আমাকে মায়া করেছে, জিজ্ঞেস করেছে:

'কেমন লাগছে, সোনা?'

'বেশ ভালো।'

'হ্যাঁ, গা এলিয়ে দাও। এলিয়ে দিলেই দেখবে সব ঠিক।'

'শোনো, আমাকে ছাড়ান দাও। আমি দিব্যি আছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি দিব্যি আছো, সোনা, তুমি দিব্যি আছো।'

কিন্তু কোথায় তুলে রাখবে তোমার ভাবনা যখন ভাবনা তোমায় বলছে যে ফাশিস্টরা নির্ঘাৎ জানতে পারবে, এবং চ'লে আসবে এক পেট-মোটা জর্মান রণতরীতে ক'রে আর ঐ পুরোনো খোলগুলোকে লুফে নেবে যেমন শিকারীরা লুফে নেয় হাঁসেদের! স্লাভরা গান ক'রে উঠলো; তারা জগতের নিঃসঙ্গতম মানুষ, অথচ আমরা যে-অর্থে একা সে-অর্থে তারা একা নয় কখনোই, এবং যখন তারা গান গায় তখন স্মৃতি জেগে ওঠে তাদের সব ক্ষতের, তাদের ও তাদের পিতৃপিতামহের। আমাদের নিজেদের গান আমার বেশি পছন্দ। আমরা গাইলাম 'চীন ইস্তক পথ খুঁড়তে-খুঁড়তে'। তারপর 'ঘুরে-ঘুরে চ'লে গেছে দীর্ঘ এক পায়ে-হাঁটা পথ', জগতের মধুরতম গান, করুণতমও বলবো আমি, তার পক্ষে যে প্রেমে প'ড়ে আছে ও প্রেমিকাকে হারিয়েছে। বিশেষ জরুরি আর তেমন-কিছু মনে পড়ছে না, সম্ভবত আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঝকঝকে সকাল সাতটায় আমরা বার্সেলোনা পৌঁছলাম, এবং কোনো আশ্চর্য কারণে সেই আগমন আমার মনে আমার আগে ও পরে দেখা সব জাহাজ বোঝাই সৈন্যদের বাড়িফেরা ও বাড়িছাড়ার সংবাদচিত্রের সঙ্গে গুলিয়ে আছে; কিন্তু সত্যিই তা সে-রকম কিছু ছিলো ব'লে মনে হয় না। তবে জাহাজঘাটায় অনেক লোক ছিলো, এবং পরে শুনেছিলাম নের্গ্রিন সেখানে ছিলেন। তাঁকে আমার মনে পড়ছে না, আঁদ্রে মার্তিকে মনে পড়ছে; সেই প্রথম তাঁকে দেখি, দলের ছেলেরা তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলো।

সূর্যোদয়ের সময় আমাদের ডেকে উঠিয়ে নেওয়া হ'লো। একটা ডুবোজাহাজ আসছিলো আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে এবং তা দেখার পর অনেকটা আরাম লাগলো। মনে পড়ে ডুবোজাহাজটি ছাড়া আর-কোনো বিষয়ে তখন আমরা কথা বলছিলাম না, এমনকি যখন আমরা বোমাবিধ্বস্ত বন্দরে ঢুকলাম এবং ডুবিয়ে দেওয়া জাহাজগুলি দেখলাম, তখনও না। বার্সেলোনার বিশালতা আর ভালেন্সিয়ার রমণীয়তা এক নয়। বার্সেলোনা আমাদের দখলে, তাই আমি তা জানিয়ে দিলাম সেই অনাম্নী মেয়েটিকে যে অমন ললিতচরণে আমার পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলো। বার্সেলোনা আমাদের দখলে, এবং ঈশ্বর সাক্ষী, আমরা ফাশিস্টদের পার্বত্য পর্তুগালে হঠিয়ে দেবোই, এবং মাদ্রিদে বিজয়মিছিল বেরোবে, এবং আমি যখন

এভিনিউ দিয়ে মার্চ করতে-করতে যাবো, তখন তাকে দেখতে পাবো আর সে আমাকে চিনতে পারবে।

বেশ তো মনে আছে তোমার, অথচ তোমার নাকি মনে থাকে না?

মাপ চাইছি, ব্যাপারটা অমনিই, কোনো-কোনো ছোটো-ছোটো জিনিশ মনে থাকে আর কোনো-কোনো বড়ো-বড়ো জিনিশ ভুলে যাওয়া যায়। মনে আছে একটা লেবুর খোশা জলে ভাসছিলো।

আটটার ভেতর আমরা সকলে জাহাজ থেকে নেমে পড়েছিলাম। আমাদের নিতে-আসা ট্রাকগুলো একেবারে জাহাজঘাটায় এনে লাগানো হয়েছিলো, এবং আমরা তাতে উঠে পড়লাম। ট্রাকগুলো আমাদের নিয়ে এলো ব্যারাকে, বার্সে-লোনার বাইরে এক টিলার উপর। জানি না সেই টিলার নাম কী ছিলো, অথবা ব্যারাকগুলোর কী নাম ছিলো, কিন্তু ব্যারাকগুলো ছিলো পুরোনো হিস্পানি ধাঁচের, চারটে-চারটে ক'রে, মাঝখানে উঠোন, এবং চারদিকে চার-পাঁচ তলা অলিন্দ—বিশাল জায়গা, আমাদের সকলকে ধরাবার পক্ষে যথেষ্ট, আর আমরা ছিলাম হাজার-হাজার। আন্তর্জাতিকেরা সবাই যারা অবশিষ্ট; বিভিন্ন জাতির লোকও। কেউ-একজন—কিন্তু মনে পড়ছে না কে—কিন্তু কেউ আমাকে বললো:

'সবটা স্মৃতিতে পুরে নাও, খোকা, হৃদয়ে পুরো নাও।'

'হৃদয় আমার ভর্তি,' আমি বললাম হিস্পানি ভাষায়। 'আমার হৃদয় ভর্তি, উপচে পড়ছে। আমি দেশে যেতে চাই না। আমার কোনো দেশ নেই, আমি অনিকেত।' বিদেশী ভাষায় অনেক কিছু ব'লে ফেলা যায়, যা বোকা-বোকা শোনায় না যেমন ইংরেজিতে শোনায়। যে-ই হোক-না কেন সে, খুব নরম ক'রে উত্তর দিলো, 'ভামোস হুন্‌তোস, ভামোস হুন্‌তোস—আমরা একজোট, আমরা একজোট—।' আর আমার মনে প'ড়ে গেলো যে আমি হাজারো-একবার দেশে যেতে চেয়েছি, দেশে যাবো ব'লে গুমরেছি, দেশে যাবার জন্যে দরখাস্ত করেছি, দেশে যাবো ব'লে কেঁদেছি, এক ভীতিগ্রস্ত বালক, সৈন্য নয়, কিন্তু এখন আমি সৈন্য যদিও যুদ্ধ করবার কোনো দেশ নেই, কোনো জাতি নেই অস্ত্র দেবার এবং বলবার: দাঁড়াও, এই অব্দি, আর নয়।

আমাদের ডাক এলো ও আমরা অলিন্দে ভিড় ক'রে দাঁড়ালাম এবং বক্তৃতা শুনলাম মার্তির। পরে বললেন নেগ্রিন। তারপর পুরো জায়গাটা ভেঙে পড়লো 'আন্তর্জাতিক' সংগীতে, পনেরোটা ভাষায়, আর এটা কিন্তু স্মৃতিই, কারণ আগে কখন এমন ঘটেছে আর আবার কখন এমন ঘটবে? আমরা চ'লে যাচ্ছি, আমরা

বিদায় নিচ্ছি স্পেন থেকে, যে-স্পেন এক সুন্দরী প্রেমাস্পদা নারীর মতো, আমরা চ'লে যাচ্ছি।

মাত্র এক কি দু-দিন পরেই ঘটনাটা ঘটলো। বুঝতেই পারছো, ফাশিস্টরা বার্সেলোনা পৌঁছে গিয়েছিলো, আর আমরা কাসা দে লা সেলভা নামে অন্য-এক জায়গায় চ'লে এসেছিলাম। পশ্চাদপসরণ শুরু হ'য়ে গেছে; শেষ দশা উপস্থিত, আর আমাদের সঙ্গে ছিলো খালি কুবা ও মেক্সিকোর কিছু লোক, আমরা অত্যধিক দীর্ঘদিন থেকে গেছি; প্রস্থানঘোষিত কিন্তু ঝুলে-থাকা অতিথি, এবং আমাদের বন্দুক, বেল্ট, বুট ও আর যা-কিছু মূল্যবান সবই আমরা অবশিষ্ট হিস্পানিদের দিয়ে দিয়েছি। আমরা খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি ও অপেক্ষা করছি, এবং হাওয়া বোঝাই হ'য়ে আছে গুজবে; কিন্তু সবচেয়ে জোরালো গুজব এই যে বার্সেলোনা সমর্পণ করা হচ্ছে শত্রুকে, সেই সভায শূকরকে, সেই কুকুরকে যার এমনকি কুকুরের আত্মাও নেই, সেই ফাশিস্টকে; রণহীন পরিত্যক্ত, রণহীন সমর্পিত; শয়তানকে প্রদত্ত এক দান। আমি রোদ্দুরে শুয়ে থাকি আর আমার প্রেমিকা শুয়ে থাকে আমার পাশে। কাকে যেন বলেছিলাম আমি প্রেমে প'ড়ে আছি। কার সঙ্গে? একটি হিস্পানি মেয়ের সঙ্গে যার চোখ কালো অলিভের মতো আর যার ঠোঁট পপিফুলের। কেবল বোকাদের পক্ষেই বিশ্বাসযোগ্য আমার কথা, কিন্তু তখন আমরা যে-কোনো কথাই বিশ্বাস করি। সেই আমার প্রথম প্রেম, আমার শেষ প্রেম।

তা-ই তোমার মনে থাকে যা তুমি মনে রাখতে চাও; একের অতীত সকলের অতীতের অংশ, আর সর্বত্র সব ছোটো-ছোটো সদর সযত্নে বন্ধ হ'য়ে আছে। শুধু যখন সব শেষ হবে, এবং আমাদের সপক্ষে, তখন সকল সদর আমরা খুলে দেবো। এখানে আসবার দুই কি তিন কি চারদিন পরেই সেই বড়ো সভাটা আহূত হ'লো, শহরটির গর্ব যে একমাত্র থিয়েটার তাতে। আমরা সাত-আটশো লোক সেখানে গাদাগাদি ক'রে ঢুকলাম, ভিড়ে বোঝাই, উপচে পড়ছে আর আমাদের বাদামি কাগজে পাকানো সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন।

খোকন, এ-ই সেই, সবজান্তা কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো ভেতর থেকে।

বক্তা হিস্পানিতে বললেন, 'তোমরা আন্তর্জাতিকেরা, আমিগোস দে কোরাসোন, আমার আত্মার সুহৃদ, তোমরা আন্তর্জাতিকেরা যারা আমার কমরেড, আমার সহযোদ্ধা, তোমরা আমার কথা শোনো। আমরা ম'রে গিয়েও বার্সেলোনা রক্ষা করবো। চলো ফিরে যাই।'

এটাও কিন্তু স্মৃতি। আমি আবার কাঁদলাম; দু-হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে

উঠলাম কিন্তু তারপর আর কাঁদিনি। পরের প্রত্যেকটা ব্যাপারেই আমার চোখ ছিলো শুকনো। না, ভাঁড়ামি আর করছি না, খোকাবাবু আর খোকা নেই। ব'সে-ব'সে, একের পর এক বক্তার কথা শুনতে-শুনতে, যাঁরা বলছিলেন কীভাবে বার্সেলোনা ধ'রে রাখা যায় আর ক'রে তোলা যায় সব স্বাধীন মানুষের এক মুক্তি-সেতু, আমি নিজের এক ব্যবস্থা ভেবে ফেললাম। তারপর আমরা স্পেনের খটখটে রোদ্দুরে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

যারা আমাদের দেশ, মধুর আমেরিকা যার নাম, পাহাড় ও সমুদ্র পেরিয়ে যে-মুক্ত দেশের অবস্থান, সেই দেশ থেকে যারা এসেছে তারা সবাই মিলে এক ছুতোরের দোকানে গেলাম, এবং কেউ-কেউ বললো তারা সেখানে কাজ করবে, কেউ-কেউ বললো দেশে ফিরে যাবে। স্বেচ্ছার্থীরা আর দেশে ফিরবে না। একত্র হ'লো তারা, কথা বলতে-বলতে ও দলের ব্যবস্থা করতে-করতে; আমার কিছু বলবার ছিলো না, তবু কে যেন আমায় জিজ্ঞেস করলো:

'কী হয়েছে, খোকা, ভাবছো?'

'ভেবো না, বাপু। কেউই দুঃসাহসী নয়।'

'আমি নই,' আমি বললাম। আমার বাল্য অতিক্রান্ত, অতিক্রান্ত বয়ঃসন্ধি ও কৈশোর এবং আগাছার উদ্গম যখন তার কাণ্ড দিয়ে রস ব'য়ে যায়, অতিক্রান্ত সেই আশ্চর্য মধুর বিশ্বাস যে তুমি চিরকাল বেঁচে থাকবে যদিও সব মরণশীলদের মৃত্যু হবে, যে মনুষ্যত্ব তেমন অভিশাপ যেমনি আশীর্বাদও বটে, আর আমার অন্তরের শুদ্ধতা ছিলো জীবনেরই এক প্রতিদান। চমৎকার শোধবোধ।

'আমি দুঃসাহসী নই,' বললাম আমি। 'আমি এখানে থাকতে চাই।'

বুঝতেই পারছো, কথাটা হ'লো দরকার হ'লে প্রাণ দিয়েও বার্সেলোনা রক্ষা করা, এবং দরকার খুব সম্ভব হবেই, আর পথ বাছাই তো হ'য়েই আছে। আন্তর্জাতিকদের অধিকাংশই চ'লে গেছে, কিন্তু তুমি থেকে গেছো বিদায়কালে। তোমার সময় পেরিয়েও তুমি থেকে গেছো; তবে নিদ্রা যাও, কাল আবার রুটি ভাগ করা যাবে।

আর কী মনে আছে?

তা, মনে আছে অনেককিছুই, যেমন: বাচ্চারা খেলছে রাস্তায়, তারা উত্তরাধিকারী, আর আমি এখন বড়ো ও তাদের বাচ্চা ব'লে ভাবি। টাটকা সেঁকা রুটি আমাদের সান্ধ্যভোজনে, সম্মানিত অতিথি কিনা। রুটির ভাগ আমরা দিই বাচ্চাদের যারা আমাদের গৃহের আস্বাদ দিয়েছে খানিক যেমন দেওয়া যায় আর-অচেনা-নয় এমন অতিথিকে। করবার জিনিশও ছিলো ঢের, নতুন

যে-সব বন্দুক আসছিলো ফ্রান্স থেকে তাদের বিধি-ব্যবস্থা, অফিসার ও পরিচালন সমিতির ব্যবস্থা, এমনি সূর্যাস্ত অব্দি, মধুর শীতল রাত অব্দি কেবল ব্যবস্থাপনা। আমার শোবার জায়গা হয়েছিলো এক মুচি পরিবারে, আর শোবার আগে আমরা এক গেলাশ মদ্য ও একখণ্ড সসেজ নিয়ে বসতাম।

নাও হে, ভাই বেরাদর, আর বলো দক্ষিণাঞ্চলে কেমন চলছে। দক্ষিণে কি মৃত্যুভয় আছে? কী ঘটতে যাচ্ছে, জয় না পরাজয়? ফাশিস্টদের কি হঠিয়ে দেওয়া যাবে?

'আ স্থ তিয়েম্পো—সময় হ'লেই হবে।'

প্রাচীন সৈনিকের ফিচলেমি। তুমি কি নতুনদের একজন, মেশিনগান চালাও?

সাঁজোয়া বাহিনীর লোক।

মদটা খাও আর সসেজটাও নাও। স্পেনে কবে ভালো লোক জন্মাবে? এক গেলাশ মদে বিছানা নরম হ'য়ে ওঠে।

আর তারপর পড়েছিলাম ঘুমিয়ে যতক্ষণ-না এক হুইসিলের আওয়াজে ঘুম ভাঙলো, এই-ই তাহ'লে, তাই না? আমরা সার বেঁধে দাড়ালাম, তারপর এগিয়ে গিয়ে উঠলাম ট্রেনে, এবং ঠিক গুজব ছাড়া কিছুই কেউ জানে না; কিন্তু খানিক পরে সব বুঝতে পারলাম আমরা। ট্রেন উত্তরে যাচ্ছে, দক্ষিণে নয়। বার্সেলোনা রক্ষা করা যাবে না; শেষ আন্তর্জাতিকেরা চ'লে যাচ্ছে। এ এক সীমান্তমুখী রাতের গাড়ি, সেলাম ও বিদায় কুড়োতে-কুড়োতে যাবে। কোথাও মানুষ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো; কোথাও মানুষ সাহস ও আশা হারিয়ে বসেছিলো, এবং দ্বার খুলে দিয়ে বলেছিলো, এই কন্যাটিকে তুমি নাও, পপির মতো লাল ঠোঁটের ললিত-চরণ এই কন্যা তোমার। যাদের চোখে এখন জল তাদের জন্যে খালি আমার ঘৃণা ও অবজ্ঞা।

'কী হয়েছে, খোকাবাবু?'

'জাহান্নামে গতি হোক তোমার! জাহান্নামে গতি হোক!'

এবং সকালে যখন ট্রেন থামলো, তখন আমরা ফ্রান্সে।

অনুবাদ: অমিয় দেব

গের্নিকা ! গের্নিকা !



পবিত্র সরকার

গের্নিকা ! গের্নিকা !

১ গের্নিকা ! গের্নিকা !

কী এই গের্নিকা ? অনেকেই জানি, এক মহাশিল্পী পাবলো পিকাসোর আঁকা একটি ছবি, বোধহয় এ-শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্কনশিল্প। ছবির মধ্যে যদি যন্ত্রণাবদ্ধ প্রাণশক্তি ভরে দেওয়া যায়, যদি এনে ফেলা যায় জীবন ও মৃত্যুর মর্মান্তিক আর্তি—তা এই ছবিতে পিকাসো যেমন পেরেছেন, আর-কেউ কোথাও তেমন করে পারেননি। এই লেখকের মনে আছে, ১৯৭৫-এ নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টে ছবিটি দেখবার অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার একটি ঘরে ঢুকেই দেয়াল-জোড়া সেই ছবির প্রবল অভিঘাত মানুষকে প্রায় মেঝেতে বসিয়ে দেয়। ছবির সেই ভয়াবহ হিংস্রতা আর ধ্বংসের একেবারে মাঝখানে তা দর্শককে টেনে নেয়। সে-দর্শক হয়তো জানেই না এ কিসের ছবি, এর মধ্যেকার মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর ঘোড়া আর মানুষগুলো কোথাকার, কেন কী উপলক্ষে আঁকলেন পিকাসো এই ছবি, কী এর অর্থ। যারা আর একটু খবর রাখে, তারা বলতে পারে যে ১৯৩০ থেকে ন্যুড নারী চিত্রমালা এঁকে পিকাসো আঁকতে শুরু করেন স্পেনের সেই বিখ্যাত বুল-ফাইটের ছবির সিরিজ। তার মধ্যে ১৯৩৬-এর এই গের্নিকা একটু আকস্মিক, পিকাসোর তুলিতে হঠাৎ এসে তা পরম্পরাভঙ্গ ঘটিয়েছে। এই চলছিল পিকাসোর 'ডাবল-ইমেজ' ছবির পর্যায়, যার চমৎকার দৃষ্টান্ত 'আয়নার সামনে মেয়ে'। সেটিও রয়েছে এই মিউ-জিয়াম অব মডার্ন আর্ট-এ। পিকাসো বলেছেন, এ-ছবিটিতে তিনি মেয়েটির একই সঙ্গে বস্ত্রাচ্ছাদিত, নগ্ন আর এক্স-রে প্রতিকৃতি দেখাতে চেয়েছেন। আসলে হয়তো দেখাতে চেয়েছেন একসঙ্গে মুখের সামনের আর পাশ-থেকে-দেখা ছবি। বাস্তবের বিকৃতি বা 'ডিস্টরসন' এ-সব ছবির মূল প্রকরণ।

তার মধ্যে হঠাৎ এল এই গের্নিকা। এ-ছবি প্রচণ্ড ক্রোধের, দারুণ যন্ত্রণার। ছাব্বিশ ফুট প্রশস্ত এ-ছবিটি সম্পূর্ণ আঁকার আগে পিকাসো দু-ফুট তিন ফুটের অনেকগুলো স্কেচ করেন। মিউজিয়ামের ওই ঘরেই সেগুলো সাজানো রয়েছে অন্যান্য দেয়ালে। শুধু ঘোড়ার মাথাটিরই খান দুই স্কেচ দেখলাম যেন। আস্তে আস্তে টুকরো-টুকরো কল্পনা ছবিতে রূপ পেয়েছে, তারপর সবগুলি মিলিয়ে সেই

বিশাল চিত্রমহাকাব্য তৈরি হয়েছে। যুদ্ধের বর্বরতা, নৃশংসতা আর ধ্বংসকে এমন করে আর-কোনো ছবিতে ধরে রাখা হয়নি।

২ কোন্ যুদ্ধ, কার যুদ্ধ

দুশো-আড়াইশো বছরের শিল্পবিপ্লব সারা ইয়োরোপের চেহারা বদলে দিয়েছিল, কিন্তু স্পেন পড়ে ছিল সেই মধ্যযুগে। আশ্চর্যের কথা এই যে, যে-সাম্রাজ্যবিস্তার ব্রিটেন ফ্রান্স জার্মানি হলাণ্ডের শিল্পবিপ্লবকে সাহায্য করেছে, ত্বরান্বিত করেছে, সেই সাম্রাজ্যবিস্তার, আন্তর্জাতিক হত্যাকাণ্ড আর লুঠতরাজ স্পেনের রোমান ক্যাথলিক গির্জা আর রাজতন্ত্রকে যত পুষ্ট করেছে, সাধারণ মানুষকে ততই বঞ্চনা, শোষণ আর পীড়নের চরম দুর্গতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। ফলে স্পেনের মানুষের ক্ষোভ দীর্ঘদিনের।

আগে এই ক্ষোভ রাজতন্ত্রবিরোধীদের বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষে ফেটে পড়েছে, কিন্তু একসঙ্গে দানা বেঁধে কোনো বড়ো বিস্ফোরণ ঘটায়নি। খানিকটা সেইরকম বিস্ফোরণ ঘটল ১৯৩১-এর এপ্রিলে, যখন রাজতন্ত্র ভেঙে পড়ল, স্পেনে প্রতিষ্ঠিত হল রিপাবলিক বা জনগণতন্ত্র।

জার্মানিতে তখন জাঁকিয়ে বসেছে হিটলার, ইতালিতে মুসোলিনি। ফ্যাসিবাদের গরম নিশ্বাস ভেসে বেড়াচ্ছে ইয়োরোপের বাতাসে। জার্মানির সেই উন্মাদ সারা পৃথিবীকে দখল করে সাম্রাজ্য তৈরির পৈশাচিক স্বপ্ন দেখেছে, সেখানে হঠাৎ ইয়োরোপে একটি দুর্বল রাজ্যে সাধারণ মানুষের হাতে শাসন চলে যাবে, এ কেমন কথা! স্পেনের পাদরিরা আর পরাভূত রাজতন্ত্র তো আড়ালে নিজেদের ক্ষত চাটছিল, তারা সাহায্য চাইল এদের কাছে। দাঁড় করাল ফ্রাঙ্কো নামে এক সুযোগ-সন্ধানী সেনাপতিকে। স্পেনের অধীন আফ্রিকার মরক্কোতে সে বর্বর যুদ্ধে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। সেখানে স্পেন প্রচণ্ডভাবে হেরে যায়, কিন্তু ফ্রাঙ্কোর খ্যাতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। গির্জা আর রাজতন্ত্রের মদত নিয়ে ১৯৩৬-এ সে স্পেনে ঢুকল, শিশু গণতন্ত্রকে শেষ করবার জন্য। সঙ্গে মরক্কোর মুর সৈন্যের বাহিনী। প্রচার করল, খ্রীস্টধর্মের নামে, সম্পত্তির পবিত্র অধিকারের নামে,—আর যা-কিছু প্রতিক্রিয়াশীলদের উস্কে দেয় সে-সমস্ত কিছুর নামে সে লড়াইয়ে নেমেছে, সে স্পেনকে রক্ষা করতে চায়। হিটলার এবং মুসোলিনি প্রকাশ্যেই ফ্রাঙ্কোকে অভ্যর্থনা করল, নবোদগত ফ্যাসিবাদের যোগ্য সদস্য পেয়েছে তারা, পৃথিবীর রোমান ক্যাথলিক রাজধানী ভাটিকান তাকে খ্রীস্টধর্মের পরিত্রাতার গৌরব দিল, কিন্তু ব্রিটেন আর ফ্রান্স—গণতন্ত্রের চিরপরিচিত ধ্বজাধারী

দুই 'মহান' রাষ্ট্র—তারা কী করল ? তারা পার্লামেন্টে মুখে বলল, এ খুব খারাপ, স্পেনে গণতন্ত্র রক্ষা করতে হবে, কিছুতেই ফ্যাসিবাদের প্রশ্রয় নয়। কিন্তু গোপনে স্পেনে গণতন্ত্রীবাহিনী যাতে অস্ত্র না-পায় তার সব চেষ্টাই করে গেল, ফ্রাঙ্কোকে "খ্রীষ্টীয় ভদ্রলোক" বলে সার্টিফিকেট দিল। তারা বলল, এ স্পেনের গৃহযুদ্ধ, নিজস্ব ব্যাপার, আমাদের নীতি হল 'নন্-ইণ্টারভেনশন'—হাত গুটিয়ে থাকা। সারা পৃথিবীর কবি শিল্পী লেখকেরা গণতন্ত্রের পক্ষে এসে লড়াইয়ে যোগ দিল, অন্যদিকে জার্মান আর ইটালিয়ান সৈন্যরা দলে-দলে ফ্রাঙ্কোর পক্ষে এসে লড়াইয়ে নামল। এবং জার্মানির বিমান আক্রমণে ১৯৩৭-এর ২৬ এপ্রিল তারিখে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল স্পেনের বাস্ক সম্প্রদায়ের পবিত্র শহর গের্নিকা।

৩ গের্নিকা কাদের

স্পেনের বাস্ক অঞ্চলের রাজধানী গের্নিকা। শহর এমন-কিছু বড়ো নয়, মূলত কৃষিপ্রধান অঞ্চলের শহর যে-রকম হয়ে থাকে। কিছু লাল টালির শাদা দেয়ালের বাড়ি, একটা বড়ো রাস্তা, মাঝখানে পাহাড়ের উপর গির্জা। চারপাশে পাইনের জঙ্গল আর পাহাড়। বাস্করা ধর্মে রোমান ক্যাথলিক, বিশ্বাসী, আবার সেই সঙ্গে বিদ্রোহের এক প্রবল ঐতিহ্যও ছিল তাদের। স্পেনের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী রাজনীতির তখন বড়ো ভূমি ছিল এই বাস্ক অঞ্চল।

গের্নিকা তাদের পবিত্র শহর। শহরের কেন্দ্রে আছে এক বিশাল 'ওক' গাছ, যার নাম 'গের্নিকা বৃক্ষ'। বাস্কদের প্রাচীন অভিভাবকরা নাকি এই গাছের তলাতেই বাস্কদের চিরাচরিত ন্যায়নীতি আর আত্মশাসনের বিধিবিধান রচনা করেন। আটশো বছর ধরে গের্নিকা সেজন্য বাস্কদের কাছে তীর্থস্থান হিশেবে গণ্য হয়ে এসেছে। গির্জায় মেরীর মূর্তি। ১৯৩৭-এর ২৬ এপ্রিল ছিল হাটবার, শহরের স্কোয়ারে দুর-দুর থেকে চাষীরা এসে তাদের দোকানপাট সাজিয়ে বসেছে। বলদের গাড়িতে, ঘোড়ায় টানা ওয়াগনে এসেছে তারা। সে-সব বলদ বা ঘোড়া আশেপাশে বাঁধা রয়েছে। ঘাস জল খাচ্ছে তারা। এমনই একটি দিনে উড়ে এলো জার্মানির আঠেরোটি প্লেন, ছোট্ট শহরটার উপর বোমা ফেলল কয়েক হাজার—ধ্বংসের বোমা, আগুন-ধরানো বোমা। পালাতে-থাকা মানুষগুলোকে মেশিনগানের গুলিতে শুইয়ে দিল। গের্নিকার শরীর মুছে গেল স্পেন থেকে। সেই দৃশ্য দেখেছিলেন একজন বাস্ক পাদরি, ফাদার এলবার্তো দি ওনাইন্দিয়া।

৪ কাদার এলবার্তো দি ওনাইন্দিয়ার বিবরণ

"আমার মা ও বোনেরা ছিল মারকিনা শহরে। সে-শহর জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সৈন্যদের হাতে পড়তে আর বেশি দেরি নেই, সেটা বুঝতে পেরে আমি একটা গাড়ি নিয়ে তাদের উদ্ধার করে আনতে যাচ্ছিলুম। তারিখটা ২৬ এপ্রিল, বিকেলবেলা। অসামান্য স্বচ্ছ উজ্জ্বল দিন ছিল সেটা। কোমল শান্ত আকাশ। পাঁচটার ঠিক আগে আমরা গের্নিকা শহরের উপান্তে পৌঁছে গেলুম। সেদিনটা হাটবার, কাজেই রাস্তাঘাটে লোকজন গাড়িঘোড়ার ভিড়। হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠে আমাদের গায়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। যে যেদিকে পারছে ছুটছে, জিনিশপত্র যেখানে পারছে ফেলে যাচ্ছে, কেউ ছুটে যাচ্ছে বিমানহানার শেলটারের দিকে, কেউ ছুটছে পাহাড়ের দিকে। দেখতে-দেখতে গের্নিকার আকাশে শত্রুদের বিমান উড়ে আসতে দেখলুম। একটি চাষী পাশ দিয়ে যেতে-যেতে বললে, "ও কিছু নয়, এটা ওই 'শাদা' প্লেন একটা। দু-চারটে বোমা ফেলবে, তারপরেই পালাবে।" বুঝতে পারলুম বাস্করা দু-ইঞ্জিনওলা 'শাদা' প্লেন আর তিন ইঞ্জিনওলা 'কালো' প্লেনের তফাতটা বুঝতে শিখেছে। 'শাদা' প্লেনটা উড়ে এসে শহরটার ওপর নজর বুলিয়ে গেল, আর ঠিক মাঝখানটার মাথায় এসে গুটিতিনেক বোমা ছেড়ে দিল। তার পরের মুহূর্তেই আমরা দেখতে পেলুম সাতটা প্লেনের একটা স্কোয়াড্রন উড়ে আসছে, তার সামান্য পেছনে ছয় প্লেনের আরেকটা স্কোয়াড্রন, তার পেছনে পাঁচ প্লেনের তৃতীয় একটা স্কোয়াড্রন। সবগুলো 'জাংকার' ধরনের প্লেন। সারা গের্নিকায় তখন দারুণ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

রাস্তার ধারে গাড়িটা ফেলে রেখে আমি নেমে পড়লুম, সঙ্গী পাঁচজন মিলিসিয়ানোকে নিয়ে একধারের ঢাকা নর্দমার মধ্যে গিয়ে আড়াল নিলুম। জলে আমাদের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। সেখান থেকে আমাদের দেখা যাচ্ছে না, অথচ আমরা সবই দেখতে পাচ্ছি। প্লেনগুলো বেশ নিচু দিয়ে উড়ে আসছে, মাটি থেকে দুশো মিটারের বেশি হবে না। তাই দেখে আমরা নর্দমা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে দৌড়োলুম, যাতে শত্রুদের নাগালের বাইরে যেতে পারি। কিন্তু প্লেন থেকে ওরা আমাদের দেখে ফেললো আর অনর্গল গুলি চালাতে লাগলো। পাতার আড়ালটুকু বাঁচিয়ে দিল আমাদের। ওরা দেখতে পাচ্ছে না আমরা কোথায় রয়েছি। আমরা একটা পথ ধরে এগোচ্ছি অনুমান করে নিয়েছে ওরা—আর সেইদিকে মেশিনগান তাক করে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। গাছের ডাল ছিঁড়ে-খুঁড়ে ছুটে যাচ্ছে বুলেট, কাঠ ফেটে ছিটকে পড়ার হাড়-কাঁপানো আওয়াজ কানে আসছে। ঐ মিলিসিয়ানোদের সঙ্গে আমি প্লেনগুলোর ওড়বার

ছকটা বুঝে নিলুম, তারপর তাদের নজর আর নিশানা এড়ানোর জন্যে গাছপালার মধ্যে দিয়ে কিম্ভূতভাবে এঁকে-বেঁকে এগোতে লাগলুম। ততক্ষণে স্ত্রীলোক শিশু আর বৃদ্ধেরা মশামাছির মতো মৃতদেহের স্তূপ গড়ে তুলছে, রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে চতুর্দিকে।

চোখের সামনে দেখলুম খেতের মধ্যে একা বৃদ্ধ চাষী দাঁড়িয়ে আছে। মেশিনগানের বুলেট এসে তাকে শেষ করে দিল। এক ঘণ্টা ধরে ওই আঠারোটা প্লেন মাটির কাছাকাছি উড়ে বোমার পর বোমা ফেলল গের্নিকার ওপর। সেই বিস্ফোরণ আর বাড়ি ধসে পড়ার আওয়াজ যে কী ভয়ংকর তা বর্ণনা করি কী করে? আকাশে বারবার একই করুণ ছক ধরে উড়ে আসছে প্লেনগুলো, গের্নিকার সব কটা রাস্তার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। বোমা ফেলছে হাজারে-হাজারে। পরে আমরা বোমার গর্তগুলোও দেখেছি। তার কোনো-কোনোটা ষোলো মিটার প্রশস্ত, আট মিটারের মতো গভীর।

সন্ধে সাতটা নাগাদ প্লেনগুলো ফিরে গেল। তারপরেই উড়ে এল আরেক গুচ্ছ, এবার বিশাল উঁচুতে উড়ছে। এ-শহর ইতিমধ্যেই মৃত, শহিদের মতো, তবু তারই ওপর আগুন-লাগানোর বোমা ফেলতে লাগল তারা। এবারের বোমাবর্ষণ চলল পঁয়ত্রিশ মিনিট ধরে। এ-সময়টুকু সারা শহরটাকে বিরাট এক আগুনের চুল্লিতে পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট। কী অবিশ্বাস্য ঘৃণ্য শয়তানি বুদ্ধি এদের! বোমা ফেলে দাবানল জেলে ওরা জগৎকে বোঝাতে চায় যে, দ্যাখো, বাস্করা নিজেরা ওদের শহর পুড়িয়ে দিচ্ছে কেমন।

প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টা ধরে গের্নিকার এই ধ্বংসতাণ্ডব চললো। বোমাবর্ষণ একসময় থামলো, লোকেরা শেলটার ছেড়ে বেরিয়ে এলো। কারো চোখে জল দেখলুম না আমি। সকলের কেমন একটা হতবুদ্ধি অবিশ্বাস। গের্নিকার দিকে তাকিয়ে আছি আমরা, যা চোখে পড়ছে তা বিশ্বাস করতে পারছি না।

সন্ধে নেমে এলো, আধ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি দূরে আর দৃষ্টি চলে না। যেদিকে তাকাই, আগুনের শিখা লকলক করছে, ঘন কালো ধোঁয়া উঠছে আকাশে। আমার চারপাশে মানুষ হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে। কেউ-কেউ হাত দুটিকে ক্রসের ভঙ্গিতে আকাশে তুলছে, স্বর্গের করুণা ভিক্ষা করছে।

বিলবাও থেকে কিছু দমকলের লোক এসে পৌঁছেছে ততক্ষণে। যে-বাড়ি-গুলো বোমায় অক্ষত ছিল তারা আগুনের হাত থেকে সেইগুলোকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলো। আমরা শুনলুম, বাইশ কিলোমিটার দূরের লেকেইসিয়ো থেকে আগুনের শিখা দেখা গেছে। শহরের মধ্যে প্রায় কেউই বাঁচেনি, যারা শেলটার

নিয়েছিল তাদের কেউ না ; হাসপাতালের অসুস্থ আহতদেরও কেউ না। সব শেষ।

গের্নিকায় না-ছিল বিমান-ধ্বংসী কামান, না-ছিল গোলাবারুদ ; মেশিনগান তো ছিলই না।

মধ্যরাত্রের আগে পর্যন্ত যে-দৃশ্য চললো তা করুণ ও ভয়ংকর। বনের মধ্যে শিশু পুরুষ মহিলারা তাদের প্রিয়জনদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা যা পাচ্ছে তা হয়তো বুলেটে ঝাঁঝরা হওয়া মৃতদেহ।

ছোট্ট একটা পাহাড়ের ওপর ছিল 'গের্নিকা-বৃক্ষ'। তার আশেপাশের বাড়িগুলোর কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু মূল্যবান নথিপত্র রেকর্ড নিয়ে সিটি হলটা পুরো ধ্বংসস্তূপের চেহারা নিয়েছে।

রাত্রি যত গভীর হতে থাকলো, গের্নিকাকে গ্রাস করে লেলিহান আগুনের শিখা আরো দীর্ঘ হয়ে আকাশ ছুঁতে লাগল। মেঘের গায়ে রক্তের ছোপ লাগল যেন। আমাদের মুখেও রক্তের রং মাখিয়ে আগুন জ্বলতে লাগলো।"

ফাদার দি ওনাইন্দিয়া মারকিনাতে পৌঁছে মা আর বোনেদের উদ্ধার করে ফিরে যাচ্ছিলেন ওই একই পথে। কয়েক ঘণ্টা পরে আবার গের্নিকাতে এসে পৌঁছোলেন তিনি। তখন মধ্যরাত্রি, শহরের বুক চিরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। তখন দেখলেন ঝোড়ো বাতাসে আগুন আরো জ্যান্ত হয়ে উঠেছে যেন, ধোঁয়ার এক বিশাল মেঘ শহরের মাথার ওপরে থমকে আছে। গের্নিকার মানুষ সারা শহর জুড়ে মৃতদের কবর দেবার আয়োজন করছে। গের্নিকার আগুন নিবলো না। সেই রাত্রি জুড়ে, পরের দিন এবং তারপরেও দুটো পুরো দিন ধরে গের্নিকা পুড়তেই থাকলো।

সেভিল থেকে মদ্যপ জেনারেল কেইপো দি লানো রেডিয়োতে চাউর করে দিলে যে, বাস্কের কমিউনিস্টরা জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে অপদস্থ করবার জন্য তাদের শহর পুড়িয়ে দিয়েছে। কে বিশ্বাস করবে তার কথা ? তাহলে এও বিশ্বাস করতে হয় যে, বোমাবর্ষণের ধোঁকা তৈরি করবার জন্য ওই বাস্করা বিশাল-বিশাল বোমার গর্তও খুঁড়েছে কষ্ট করে, দেয়ালে প্রচুর পেট্রোল ঢেলেছে। ও-কথা যে মিথ্যা, তার প্রমাণ হিশেবে চারদিকে যে-অজস্র বোমার টুকরো ছড়িয়ে ছিলো, তা কার নজর এড়াবে ? সে-টুকরোগুলোয় জার্মান ভাষার ছাপই বা লুকোনো যাবে কেমন করে ? পরে ধরা পড়লো এক জার্মান বিমানসৈনিক। তার কাছে পাওয়া ডায়েরির ২৬ এপ্রিলের পাতায় দেখা গেলো স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'গার্নিকা'।

বোঝা গেল, জার্মান কন্‌ডর লিজিয়ন-এর প্রকাণ্ড নির্মম ধ্বংসোন্মাদনার লক্ষ্য হয়েছে গের্নিকা।

রাত দুটো নাগাদ, তখন সেটা ২৭ এপ্রিল, গের্নিকার কাছের পাহাড়ে বিলবাও থেকে বাস্ক সৈন্যদের একটি দল আসছিল, অন্য-একটা দলকে বিশ্রাম দেবার জন্য। তার তরুণ সার্জেন্ট আরিস্তারকো ইয়োল্‌দি ফাদার দি ওনাইন্দিয়ার সামান্য পরেই পৌঁছেছিল গের্নিকায়। সে কী দেখেছিল এই শহরের?

৫ সার্জেন্ট আরিস্তারকো ইয়োল্‌দির বিবরণ

"লরিতে করে আসছিলুম আমরা। কিন্তু গের্নিকার মুখে এসে বুঝলুম লরিগুলোকে ফেলে যেতে হবে। ওই দাউ-দাউ আগুনের দেয়াল ভেদ করে লরি নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। লাফিয়ে নেমে যে-যেভাবে পারলুম, আগুনের শিখা এড়িয়ে শহর পার হতে লাগলুম।

আগুন! আগুন! চতুর্দিকে অগ্নিশিখা, সমস্ত শহরটা যেন এক বিশাল জ্বালামুখী। বিলবাও থেকে আর্মির অ্যামবুলেন্স এসেছে কয়েকটা। তখনও শহরের মেয়েপুরুষ অঙ্গারের স্তূপ খুঁড়ে মৃতদেহ বার করে আনছে। শহরের মূল স্কোয়ারের চারদিকে প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ি ভেঙে পড়েছে। গির্জাতেও লেগেছে বোমা, কেবল তার সামনের মুখের দিকটা খাড়া আছে। সন্ন্যাসিনীদের কন্‌ভেণ্ট মাটিতে মিশিয়ে গেছে। তবে তারা দেখলুম সব জায়গায় রয়েছে, আহতদের শুশ্রূষায় ব্যস্ত। আশ্চর্যের ব্যাপার, গের্নিকার সেই বিখ্যাত গাছটি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। গির্জার কিছু পেছনে, পাথর-বাঁধানো একটি আঙিনায়, চারপাশে সাজানো পাথরের বেঞ্চির ঠিক কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে সেই গাছ। পুরো আঙিনাটাই বেঁচে গেছে।

শুধু আগুনের ভয়াল গর্জন, তার বাইরে অন্য-কোনো শব্দ নেই। কেউ কথা বলছে না। চাষীদের কয়েকটা দিশেহারা বলদ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারাও চুপচাপ। সকলে যেন বোবা হয়ে গেছে।

গের্নিকা শহরটা আমার আগাপাস্তলা চেনা, কিন্তু আজকের গের্নিকাকে চেনা যায় না। ছোট্ট ছিমছাম শহর গের্নিকা, বাড়িগুলোতে লাল টালির ছাদ, দেয়ালে ঝকঝকে চুনকাম করা। হাটবারের দিন দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসে ভিড় করতো, গোরু গাধা আর দুধ মাখন পনির বেচাকেনা হ'ত। হাটবারে মানুষের মুখে হাসি ফুটে উঠতো। লোকেরা জটলা করতো, দরদাম করতো, মদ খেয়ে তেষ্টা মিটিয়ে গান ধরতো। সেদিন আর গান শোনা যায়নি। রাস্তার ওপরে মৃত পশুদের দেহ

পুড়ছে। ধ্বংস আর অঙ্গারের স্তূপ সরিয়ে বলদের গাড়িতে সে-সব মৃত পশু আর মানুষের শব তুলছে লোকে—কবর দিতে নিয়ে চলেছে। মেঘ মাথার ওপরে এসে থমকে আছে। মনে হল আকাশেও দাউদাউ করে আগুন ধরে গেছে। আসলে জ্বলতে-থাকা গের্নিকার প্রতিচ্ছায়া ভাসছে মেঘের ওপর।

দ্রুত গের্নিকা পেরিয়ে গেলুম আমরা, যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছোলুম এসে। মাইল-খানেক মার্চ করে গিয়ে পেছন ফিরে তাকালুম। তখনও দেখতে পাচ্ছি গের্নিকা জ্বলছে, অগ্নিশিখার গর্জন শুনতে পাচ্ছি তখনও। কিন্তু কোথাও মানুষের কণ্ঠস্বর নেই।

পাথরের মতো নৈঃশব্দ্য বহন করে আমরা চড়াই ভেঙে পাহাড়ে উঠতে লাগলুম।"

৬ পিকাসো প্যারিসে

স্পেনের মালাগায় জন্মেছিলেন পাবলো পিকাসো। গরিব ঘরের ছেলে, স্পেনের রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার হাত এড়াতে পালিয়ে আসেন প্যারিসে। যখন গের্নিকার ঘটনা ঘটলো তখনই তিনি পৃথিবীপ্রসিদ্ধ মানুষ, বিরাট শিল্পী। প্যারিসের সাত নম্বর রু্য দ গ্রাঁদ- ওগুস্ত্যাঁ-র এক ফ্ল্যাটে থাকেন তিনি, সেখানেই তাঁর স্টুডিয়ো। গের্নিকা ধ্বংসের খবর যেই তাঁর কাছে পৌঁছোলো, তিন দিন ঘুমোতে পারলেন না। তারপর উন্মাদের মতো ব্যস্ততায় আরম্ভ করলেন টুকরো-টুকরো স্কেচ।

সারা নিউমেয়ার ছবিটির বর্ণনা করছেন এইভাবে: "এ-ছবির অনুবাদ বা ব্যাখ্যা অসম্ভব। শাদা কালো আর ধূসরের ছোপ মিশিয়ে তৈরি, এর বাস্তবতা বা প্রতীকার্থ সবই বিশ্লেষণের অতীত। এটুকু বুঝলেই যথেষ্ট যে স্বাভাবিক শারীরিক রূপের বিকৃতি যেন ফ্যাসিবাদের নৈতিক ও চারিত্রিক বিকৃতিকে তুলে ধরছে—এমন-এ এক-জগতের ছবি যেখানে নৃশংসতা আর বর্বরতার কোনো আগল নেই। এ জগৎ কোনো পরিচিত পৃথিবীর মতো নয়। এখানে মানুষ আর সুদূর কোনো আশা নিয়ে আশ্বাসের প্রতীক আকাশের দিকে মুখ তোলে না, কিন্তু দেখে সেখান থেকে প্রত্যক্ষ ও অমোঘ মৃত্যু নেমে আসছে। গোইয়া এঁকেছিলেন যুদ্ধের ছবি, ফায়ারিং স্কোয়াড মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে তার ছবি। তখন মানুষের যুদ্ধের দিকে তাকিয়ে দেখবার অবসর ছিলো, তার ছবি আঁকারও অবকাশ ছিলো। কিন্তু যখন একমুহূর্তে পুরো একটা শহর বোমাবৃষ্টিতে দীর্ণ হয়ে যাচ্ছে—তা মানুষ দেখবেইবা কখন আর আঁকবেইবা কোন্ পদ্ধতিতে? কে জানতো মানুষ আর

ঘোড়া যখন বোমার বিস্ফোরণে খণ্ড-খণ্ড হয়ে যায় কেমন দেখায় তাদের ? শিল্পীর আঁকা দুঃস্বপ্নও কি ঘৃণায় আতঙ্কে পাল্লা দিতে পারে বুখেনভাল্ট-এর সেই বিকৃত মৃতদেহগুলোর সঙ্গে—যাদের মানুষ বলে আর চেনাই যায় না ? আর-কোনো ছবিতে অচেতন দিব্যদৃষ্টি এমন করে ফুটে ওঠেনি, পিকাসোর এই ছবির মতো।"

প্যারিসের ওয়র্লড ফেয়ার প্যাভিলিয়নে ১৯৩৭-এই দেখানো হ'ল গের্নিকা, সঙ্গে-সঙ্গে সারা পৃথিবীতে এই ছবির তীব্র সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো।

শোনা যায়, এই ছবিটি যখন আঁকছিলেন পিকাসো, তখন তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা চলছে। তাঁর দুই প্রণয়িনী মারি তেরেজ আর দোরা মার-এর মধ্যে স্টুডিয়োর মধ্যেই বিবাদ চলছে, পিকাসো ভ্রূক্ষেপ করছেন না। এমনকী ছবিতে যে-নারীর মুখ জানলায় দেখা যায়, তা নাকি মারি তেরেজের। আরো শোনা যায়, পরে যখন জার্মান বাহিনী প্যারিস অবরোধ করে এবং পিকাসোর ছবির প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করে দেয়, হিটলার পিকাসো প্রভৃতির ছবি নষ্ট পচা বলে ধিক্কৃত করে, তখনও সংস্কৃত-মন্ত নাৎসিরা তাঁর স্টুডিয়োতে এসে ঘুর-ঘুর করতো। পিকাসো নাকি প্রত্যেককে যাবার সময় একটি করে গের্নিকার ফোটো-ছাপা পোস্টকার্ড দিতেন। তখন প্যারিসে হিটলারের প্রতিনিধি অটো আবেট্স। সে একদিন এসে পৌছোল পিকাসোর স্টুডিয়োতে। এসে লোভ দেখিয়ে বলল, "মহাশয় পিকাসো, আপনি তো তেল-কয়লা খাবারদাবার পাচ্ছেন না ঠিক মতো, কষ্ট পাচ্ছেন শুধু-শুধু, ব্যবস্থা করব কিছু ?" পিকাসো খুব শান্ত মুখে তার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেন, দরজা খুলে ধরলেন বেরিয়ে যাবার ইঙ্গিত দিয়ে। আবেট্স ফিরে যেতে গিয়ে পেছন ফিরে তাকাল, চোখ পড়ল গের্নিকার দিকে। বলল, "ও, তাহলে এটা আপনারই কাণ্ড ?" পিকাসো উত্তর দিলেন, "না। ওটা তোমাদের কাণ্ড।"

এই ছবি এক এগজিবিশনের জন্য ধার নিয়ে গিয়েছিল নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট। কিন্তু দীর্ঘদিন সেখানেই এটিকে রেখে দিয়েছিল তারা। সম্প্রতি স্পেন তার এই বহুমূল্য সম্পদ ফিরে পেয়েছে। দীর্ঘ প্রবাসের পর মাদ্রিদ শিল্পশালায় এসে ঠাঁই নিয়েছে গের্নিকা। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের এই চল্লিশ বছর পরে গের্নিকা মানুষকে আর-একবার ক্রুদ্ধ ও আর্ত করে তোলে।

পল এলুয়ার

গের্নিকা

গের্নিকা। বিস্কের এক ছোটো শহর এটি। বাস্ক প্রদেশের বরাবরকার রাজধানী। সেখানেই বাস্ক ঐতিহ্য এবং বাস্ক স্বাধীনতার পবিত্র প্রতীকরূপে দণ্ডায়মান ওক বৃক্ষ। গের্নিকার গুরুত্ব শুধু ঐতিহাসিক এবং আবেগসম্ভূত।

১৯৩৭ সালের ২৬ এপ্রিল, হাটবারের দিন, বিকেলের প্রথম দিকে ফ্রাঙ্কোর সাহায্যে নিযুক্ত জার্মান বিমানবহর ঝাঁকে-ঝাঁকে এসে সাড়ে তিন ঘণ্টা ধ'রে গের্নিকার ওপর বোমাবর্ষণ করে। শহরটা সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হ'য়ে বিধ্বস্ত হ'য়ে যায়। দু-হাজার মানুষ নিহত হয়। তারা সবাই অসামরিক লোক। এই বোমাবর্ষণের উদ্দেশ্য ছিল অসামরিক অধিবাসীদের ওপর বিস্ফোরক বোমা এবং অগ্নিপ্রজ্জ্বালক বোমার একত্রিত বর্ষণের ফল কী হয় তা পরীক্ষা ক'রে দেখা।

আগুনে সুস্থির মুখ ঠাণ্ডায় সুস্থির মুখ
রাত্রির অস্বীকারে সুস্থির মুখ অপমানে আঘাতে সুস্থির মুখ

সবকিছুর সামনে সুস্থির মুখ
এই তো শূন্যতা তোমাদের লক্ষ্য করছে
বলি-দেওয়া হতভাগ্য মুখ
তোমাদের মৃত্যু এখন দৃষ্টান্ত হবে

হৃৎপিণ্ড দলিত হ'য়ে মৃত্যু

ওরা তোমাদের কাছ থেকে
তোমাদের প্রাণের অন্নের দাম আদায় করেছে
ওরা তোমাদের কাছ থেকে
আকাশ পৃথিবী জল ঘুম
এমনকি চরম দুর্দশার দাম আদায় করেছে

সহৃদয় অভিনেতারা অতি বিষণ্ণ অতি মধুরস্বভাব অভিনেতারা
এক চিরন্তন নাটকের অভিনেতারা
তোমরা মৃত্যুর কথা ভাবোনি

বাঁচবার এবং মরবার ভয় এবং সাহস
এত কঠিন এবং এত সহজ মৃত্যু

গের্নিকার লোকরা খুব সাধারণ লোক। বহুকাল ধ'রে গের্নিকায় বাস ক'রে আসছে। একবিন্দু সম্পদ এবং এক সমুদ্র দুর্দশার সমন্বয়ে তাদের জীবন গড়া। তারা তাদের সন্তানদের ভালোবাসে। খুব ছোটো-ছোটো সুখ এবং এক বিরাট দুশ্চিন্তা, আগামীকালের দুশ্চিন্তা—এ-দুয়ের সমন্বয়ে তাদের জীবন গড়া। আগামীকাল খেতে হবে এবং আগামীকাল বাঁচতে হবে। আজ তারা আশা করে। আজ তারা কাজ করে।

কফি খেতে-খেতে সবই তো খবরের কাগজে পড়া গেল: ইয়োরোপের কোনো-এক জায়গায় খুনীদের এক বাহিনী মানুষদের বসতি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। পেট ফেটে গিয়েছে এমন-এক শিশু, মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এমন-এক নারী, এক হিক্কায় শরীরের সমস্ত রক্ত বমি ক'রে ফেলছে এমন-এক পুরুষ। এ-সব দৃশ্য স্পষ্টভাবে কল্পনা করা কঠিন। স্পেন, সে তো অনেক দূরে, সে তো আমাদের দেশের সীমান্তে। কফি খাওয়ার পর কাজে যেতে হবে। অন্য জায়গায় কিছু যে ঘটছে তা কল্পনা করার সময়ই নেই। সুতরাং মনের অনুশোচনা চাপা দিতে হয়।

আগামীকাল যন্ত্রণা এবং ভয় এবং মুখে মৃত্যুর যাওয়ার সময় আসবে
কিন্তু তখন অপরাধ নিশ্চিহ্ন করার সময় আর থাকবে না, খুব দেরি হ'য়ে যাবে

মেশিনগানের গুলি মুমূর্ষুদের খতম ক'রে দেয়
মেশিনগানের গুলি শিশুদের সঙ্গে খেলা করে
বাতাসের চেয়ে ভালোভাবে
লোহা দিয়ে আগুন দিয়ে
মানুষ একটা খনির মতো ধ'সে যায়
জাহাজহীন বন্দরের মতো খোঁড়ল হ'য়ে যায়
অগ্নিহীন অগ্নিকুণ্ডের মতো খোঁড়ল হ'য়ে যায়

নারী ও শিশুদের একই সম্পদ আছে
তাদের নির্মল চোখের মধ্যে
বসন্তের সবুজ পাতার এবং খাঁটি দুধের
এবং স্থিতির সম্পদ

নারী ও শিশুদের একই সম্পদ আছে
চোখের মধ্যে
পুরুষরা যেমনভাবে পারে তাদের রক্ষা করে
নারী ও শিশুদের একই লাল গোলাপ আছে
চোখের মধ্যে
প্রত্যেকে নিজের রক্ত দেখাচ্ছে

হায়-রে আমাদের এতজন ঝড়ে ভয় পেয়েছিল
আজ তো প্রমাণ হ'য়ে গিয়েছে ঝড়ই ছিল জীবন
হায়-রে আমাদের এতজন বিদ্যুতে ভয় পেয়েছিল বজ্রে ভয় পেয়েছিল
আমরা কী সরলবিশ্বাসীই না ছিলাম বজ্র এক দেবদূত আর বিদ্যুৎ তার ডানা,
জলন্ত প্রকৃতির বীভৎসতা না-দেখার জন্যে
আমরা কখনো ভূগর্ভ-ঘরে নামিনি
আজ আমাদের পৃথিবীর অন্তকাল
প্রত্যেকে নিজের রক্ত দেখাচ্ছে

চূড়ান্তভাবে

শিশুরা অন্যমনস্কের মতো হ'য়ে যায়
এবং আমাদের সহজতম প্রকাশে
আমরা বাধ্য হই

হায়-রে আনন্দের অশ্রু দেখা দিল
পুরুষ তার বাহু মেলে দিল অনুরাগিণী স্ত্রীর দিকে
সান্ত্বনা-পাওয়া শিশুরা হাসতে-হাসতে ফোঁপাচ্ছিল
মৃতদের চোখ আতঙ্কের ঘনতা পেয়েছে
মৃতদের চোখ ঊষর ভূমির শীর্ণতা পেয়েছে
যারা শিকার হয়েছে তারা নিজেদের অশ্রু পান করেছে
বিষের মতো

টুপি-পরা জুতো-পরা আদব-কায়দা-জানা সুদর্শন যুবকেরা, ঐ বৈমানিকরা, মনো-যোগ সহকারে তাদের বোমা ফেলে।

মাটিতে সে-এক বিপর্যয়। সবচেয়ে দার্শনিক, যিনি মঙ্গল চিন্তায় মগ্ন, তিনি তা'থেকে কোনো সূত্র উদ্ভাবন করতে পরাঙ্মুখ। কেননা বর্তমানের সঙ্গে অতীত এবং ভবিষ্যৎও ছত্রখান হ'য়ে যায়, এক সম্পূর্ণ ধারাবাহিকতা ভেঙে বিধ্বস্ত হ'য়ে এক গহ্বরে সামিল হয়। জীবনের স্মৃতিই ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া হয় প্রদীপের মতো।

মানুষদের ওপর রক্ত জন্তুদের ওপর রক্ত
এক জঘন্য ফসল তোলা যা জল্লাদদের চেয়েও
আরো পূতিগন্ধময় অথচ তারা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
সমস্ত চোখ গ'লে গিয়েছে সমস্ত হৃৎপিণ্ড নিভে গিয়েছে
পৃথিবী এক মৃতদেহের মতো শীতল

যে-জন্তু মৃত্যুর ঘ্রাণ পেয়েছে তাকে গিয়ে ধ'রে রাখো-না দেখি। মার কাছে গিয়ে তার সন্তানের মৃত্যু ব্যাখ্যা করো-না দেখি। অগ্নিশিখার প্রতি বিশ্বাস জাগানোর চেষ্টা করো-না দেখি। কেমন ক'রে বোঝানো যাবে যে, এই দুনিয়ার বড়ো মানুষদের শত্রু নাকি শিশুরা এবং সেই বড়োরা শিশুশয্যা আক্রমণ করে সমরযন্ত্র আক্রমণ করার মতোই? রাত মাত্র একটাই, তা হ'ল যুদ্ধের রাত, দুর্দশার বড়ো বোন, মৃত্যুর মেয়ে, ঘৃণ্য, বীভৎস।

মানুষরা যাদের জন্যে এই সম্পদ কীর্তিত হয়েছিল
মানুষরা যাদের জন্যে এই সম্পদ নষ্ট হয়েছিল

তোমার মার, তোমার ভাইদের, তোমার সন্তানদের মৃত্যুযন্ত্রণার কথা ভাবো, সেই সংগ্রামের কথা ভাবো যা জীবনকে শেষ ক'রে দেয়, তোমার প্রেমের মৃত্যু-যন্ত্রণার কথা ভাবো। খুনীদের আক্রমণে আত্মরক্ষা করো। নিজের শোকেই মুহ্যমান জীবনের বিরাট সন্ত্রাস-দৃশ্যে একজন শিশু বা একজন বৃদ্ধ অসহায় বোধ করে। হঠাৎ এইভাবে শেষ হ'য়ে যেতে হয় ব'লে তারা বেঁচে থাকবার ইচ্ছার হাস্যকরতা প্রখরভাবে অনুভব করে।

সবই কাদায় ডোবে রোদ কালো হ'য়ে যায়
দুর্গতির সব স্মৃতিসৌধ

বস্তিঘর খনি
আর মাঠের চমৎকার জগৎ

ও আমার ভাইরা তোমরা বদলে গিয়েছো গলিত শবে
ভগ্ন কঙ্কালে
পৃথিবী ঘুরছে তোমাদের অক্ষিকোটরে
তোমরা এক দূষিত মরুভূমি
এবং মৃত্যু ভেঙে দিয়েছে সময়ের ভারসাম্য

তোমরা পোকা আর কাকের খাদ্য হয়েছো
অথচ তোমরা ছিলে আমাদের ঝলমলে আশা

গের্নিকার মৃত ওক গাছের তলায়, গের্নিকার ধ্বংসস্তূপের ওপর, গের্নিকার নির্মল আকাশের নিচে একজন মানুষ ফিরে এসেছে, যার দু-হাতে জড়িয়ে-ধরা এক ডেকে-চলা ছাগলছানা এবং হৃদয়ে এক পায়রা। সে অন্যসব মানুষের জন্যে বিদ্রোহের পবিত্র গান গাইছে, যে-গান প্রেমকে বলছে ধন্যবাদ, অত্যাচারকে বলছে—না। সহজ সরল প্রতিশ্রুতিই সবচেয়ে মহিমময়। সেই গান বলছে, যেমন ওরাদুর, যেমন হিরোশিমা, তেমনই গের্নিকা হ'ল জীবন্ত শান্তির রাজধানী। তাদের ধ্বংসই এমন এক প্রতিবাদ ধ্বনিত করছে যা সন্ত্রাসের চেয়েও প্রবল।

একজন মানুষ গান গাইছে, একজন মানুষ আশা করছে এবং তার যন্ত্রণার ভিমরুল কঠিন নীলিমায় দূরে স'রে যাচ্ছে এবং তার গানের মৌমাছি সব সত্ত্বেও মধু তৈরি করেছে মানুষদের হৃদয়ে।

গের্নিকা : অপাপবিদ্ধতা পরাভূত করবে অপরাধকে।

গের্নিকা।

অনুবাদ : অরুণ মিত্র

ফের্নান্দো আরাবাল

গের্নিকা

[সেকেণ্ড দশেক কুচকাওয়াজ ক'রে চ'লে-যাওয়া সেনাবাহিনীর বুটের আওয়াজ শোনা যায়। তারপর বিমানহানার শব্দ। উড়োজাহাজ আর বিস্ফোরক বোমা। পর্দা যখন ওঠে বিমানহানা শেষ হ'য়ে গেছে। একটি বোমাবিধ্বস্ত বাড়ির অভ্যন্তর: ভেঙে-পড়া দেওয়াল, ধ্বংসস্তূপ, পাথর। ফ্যাঁশো বাড়ির ভেতরে হতাশায় একটা টেবিলের কাছে বসে।]

ফ্যাঁশো: মানিক আমার, মুনুটুসি। [ডানদিকে ব্যর্থভাবে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে খোঁজে] তুমি কোথায়, মুনুটুসি আমার? [খুঁজে চলে]

লিরা: [সকাতরে] সোনামণি।

ফ্যাঁশো: তোমার হিসি করা শেষ হয়েছে?

লিরা: আমি বেরুতে পারছি না। আটকে গেছি। সব ভেঙে পড়েছে। [ফ্যাঁশো বেশ কষ্ট ক'রে টেবিলের ওপর উঠে লিরাকে দেখার চেষ্টা করে। আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। দেখতে পায় এবং তাকে বেশ খুশি দেখায়]

ফ্যাঁশো: আমার দিকে তাকাও। [আবার আঙুলে ভর দেয়]

লিরা: তুমি আছো ওখানে?

ফ্যাঁশো: সাবধানে, মানিক।

লিরা: ও, ওফ্। [বাচ্চাদের মতো কোঁপায়]

ফ্যাঁশো: লাগিয়ে ফেললে নাকি? [নীরবতা; ফ্যাঁশোকে উদ্বিগ্ন দেখায়]

লিরা: [সকাতরে] হ্যাঁ। পাথরগুলো সব আমার উপরে পড়েছে।

ফ্যাঁশো: উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করো।

লিরা: কোনো লাভ নেই। আমি বেরুতে পারবো না।

ফ্যাঁশো: চেষ্টা করো একবার।

লিরা: বলো তুমি এখনও আমায় ভালোবাসো।

ফ্যাঁশো: অবশ্যই, তুমি তো জানোই বাসি। [স্তব্ধতা] দেখবে, তুমি বেরুলে আমরা সব দারুণ-দারুণ নোংরা জিনিশ করবো।

লিরা: করবোই তো। [খুশি শোনায়] তুমি কখনো বদলাবে না। [উড়োজাহাজের আওয়াজ। কয়েক সেকেণ্ড বোমাবর্ষণ হয়। হানা থামে।]

ফ্যাঁশো : আর-কোনো পাথর তোমার উপর পড়েছে নাকি।

লিরা : না। তোমার উপর পড়েছে নাকি মানিক?

ফ্যাঁশো : না। একটু চেষ্টা ক'রে বেরিয়ে এসো-না।

লিরা : পারছি না। [নীরবতা] একটু দ্যাখো তো গাছটার উপর বোমা ফেলেছে কিনা।

[ফ্যাঁশো কষ্টে টেবিল থেকে নামে। বাঁদিকে যায়। তাকে পথ থেকে অনেক ভাঙা ইঁট-কাঠ সরাতে হয়। একটা জানালার কিয়দংশ বেরিয়ে পড়ে। ফ্যাঁশো তা দিয়ে বাইরে তাকায়। তাকে খুশি দেখায়। সে ফিরে আসে। আবার টেবিলে ওঠে।]

ফ্যাঁশো : না, এখনও লাগাতে পারেনি, এখনও আছে। [নীরবতা]

লিরা : [সকাতরে] কী করবো আমি?

ফ্যাঁশো : সাবধানে উঠে দাঁড়াও, খুব সাবধানে।

লিরা : পারবো না।

ফ্যাঁশো : চেষ্টা করো।

লিরা : আচ্ছা দেখছি।

ফ্যাঁশো : [ধীরে ধীরে] সা···ব···ধা···নে, এই তো, খুব সাবধানে। [ইঁট-কাঠ পড়ার আওয়াজ শোনা যায়। লিরা-র করুণ আর্তনাদ] লাগিয়ে ফেললে নাকি? [নীরবতা] কী হ'ল? কিছু বলো। লাগিয়ে ফেললে নাকি?

লিরা : [বিষণ্ণভাবে] হ্যাঁ। [বাচ্চাদের মতো গোঙায়] কতগুলো পাথর আমার হাতের ওপর পড়েছে। রক্ত পড়ছে।

ফ্যাঁশো : রক্ত পড়ছে?

লিরা : হ্যাঁ।

ফ্যাঁশো : অনেক?

লিরা : হ্যাঁ, অনেক।

ফ্যাঁশো : কী, একটা আঁচড়?

লিরা : আঁচড়ই, কিন্তু অনেক রক্ত বেরিয়েছে।

ফ্যাঁশো : আমি একটু তুলো নিয়ে আসি। [ফ্যাঁশো ভাঙাচোরা ইঁট-কাঠ খোঁজে, কিন্তু আরো-আরো ইঁট-বালি ঝ'রে পড়ে। সে হাল ছেড়ে দেয়। আবার ফিরে টেবিলের ওপর ওঠে।] ওয়ার্ডরোবটা রাবিশের তলায় চাপা প'ড়ে গেছে। [লিরা-র আর্তনাদ শোনা যায়।] কেঁদো না। হাতে একটু থুতু লাগিয়ে রুমালটা দিয়ে বেঁধে নাও।

[লিরা কাৎরে ওঠে। ডানদিক দিয়ে ঢোকে সাংবাদিক এবং লেখক। সাংবাদিকের হাতে একটি নোটবই। লেখক ফ্যাংশোর চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে কৌতূহলীভাবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ছাখে। হঠাৎ মঞ্চের মাঝখানে]

লেখক : [সাংবাদিককে] আর এ-কথাও বলতে পারেন যে আমি একটা উপন্যাস লিখছি, হয়তো একটা ফিল্মও স্পেনের গৃহযুদ্ধের উপর···

[লেখক ও সাংবাদিক বাঁদিকে হেঁটে চ'লে যায়]

লেখক : [আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে] এই বীর এবং ধ্বাঁধার মতো জনগণ, যারা লোরকার কবিতার, গোইয়ার ছবির এবং বুনুয়েলের চলচ্চিত্রের প্রাণকে প্রতিবিম্বিত করেন, এই ভয়াবহ যুদ্ধে তাঁরা দেখিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের সাহস, তাঁদের সহ্য করার ক্ষমতা, তাঁদের···

[লেখক ও সাংবাদিক বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। লেখকের গলা দূরে মিলিয়ে যায়।]

ফ্যাংশো : তোমার কি একটু ভালো মনে হচ্ছে ?

লিরা : একটু, [থামে। কাতর স্বরে] কিন্তু বেশি না।

ফ্যাংশো : আচ্ছা যদি তোমায় সুন্দর একটা গল্প বলি যাতে অত আর ব্যথা না-করে তাহ'লে কি তোমার ভালো লাগবে ?

লিরা : তুমি মোটেও ভালো গল্প বলতে পারো না।

ফ্যাংশো : আচ্ছা, যদি তোমায় সেই-যে মহিলা পায়খানায় গিয়ে তলায় চাপা প'ড়ে গিয়েছিলেন, সেই গল্পটা বলি, তোমার কেমন লাগবে ? [থামে] গল্পটা তোমার ভাল্লাগে না ?

লিরা : খুব লাগছে।

ফ্যাংশো : শিগগিরই ভালো হ'য়ে যাবে, দেখো। আমি ভাঁড়ামি ক'রে তোমায় হাসাই বরং। [ফ্যাংশো অদ্ভুতভাবে নাচে এবং নানারকমের মুখভঙ্গি করে। তারপর হাসিতে ফেটে পড়ে।]

ফ্যাংশো : কেমন লাগলো তোমার ?

লিরা : আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না।

[বিমানের শব্দ, হানা ; যখন বিমানহানা চলছে এক মহিলা এবং তার ছোটো মেয়ে মঞ্চ অতিক্রম করে ডান থেকে বাঁয়ে। তাদের রাগত এবং অসহায় দেখায়। (পিকাসোর ছবি দেখুন)। হানা থাকে।]

ফ্যাংশো : ঠিক আছো তো, মুনুটুসি ?

[দীর্ঘ নীরবতা]

লিরা : সোনামণি, আমার যাচ্ছেতাই লাগছে। ম'রে যাবো।

ফ্যাশো : ম'রে যাবে? [নীরবতা] সত্যি ম'রে যাবে? বাড়ির লোকজনকে খবর দিতে চাও?

লিরা : বাড়ির লোকজন মানেটা কী?

ফ্যাশো : ঐরকমই বলে না সবাই?

লিরা : ওঃ, তোমার কী খারাপ স্মৃতিশক্তি! তুমি কি ভুলে গেলে যে আমাদের আর পরিবার বলতে কিছু নেই!

ফ্যাশো : হুম, নেই বটে! তাহ'লে হোসেচো?

লিরা : তুমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছো। তুমি কি সত্যি ভুলে গেছো যে ওকে বুর্গোস-এ গুলি ক'রে মারা হয়েছে?

ফ্যাশো : আমার কোনো দোষ ছিল বলতে পারবে না। আমি তোমায় সব সময়েই ব'লে এসেছি আমি ছেলে চাই না। যখনই কোনো যুদ্ধ বাধে তারা মারা যায়। অথচ একটা মেয়ে থাকলে বাড়িটা এখন বেশ সুন্দর, গোছানো হ'ত।

লিরা : বেশ-বেশ, কেবল খুঁত ধরা। আমার দোষ তো নয়।

ফ্যাশো : রেগে যেয়ো না,-সোনা। আমি তোমায় ব্যথা দিতে চাইনি।

লিরা : আমার জন্য তোমার কখনো দুঃখ হয় না।

ফ্যাশো : হয়—হয়। তুমি ওখান থেকে বেরুলে যদি চাও আরেকবার তোমায় দেবো। তোমার ওপর যে রেগে নেই এটা দেখাবার জন্যে।

লিরা : কিন্তু তুমি তো এখন আর পারো না।

ফ্যাশো : বাঃ, ব'লে যাও, বলো যে আমি আর পুরুষ মানুষ নই।

লিরা : না-না, তা নয়, তোমার শুধু এখন আর দাঁড়ায় না।

ফ্যাশো : পারি না, তাই না? শুধু তোমার কাছেই শুনি। গত শনিবারের কথা মনে নেই?

লিরা : কোন্ শনিবার?

ফ্যাশো : বলো কোন্ শনিবার? এরপর বলবে তাও ভুলে গেছো।

লিরা : ফের জাঁক করতে লাগবে নাকি?

ফ্যাশো : জাঁক করছি না। এটা হ'ল পরিষ্কার নির্জলা সত্য। কিন্তু তুমি স্বীকার করবে না। [নীরবতা]

লিরা : আরেকবার ছাখো তো গাছটাকে হেনেছে কিনা।

[ফ্যাশো টেবিল থেকে নামে। সে জানলার কাছে যায়, খোলে। একজন

পুলিশ অফিসারকে দেখা যায়। তারা গম্ভীরভাবে পরস্পরের দিকে তাকায়। ফ্যাঁশো ভীতভাবে মাথা নিচু করে। অফিসার হাসে, এবং হাতে ধরা হাত-কড়ি নিয়ে খেলে। ফ্যাঁশো মাথা নিচু ক'রেই জানলা বন্ধ ক'রে দেয়। তাকে ভীত দেখায়। টেবিলের ওপর চড়ে।]

লিরা : কী হ'ল? [নীরবতা] কী হ'ল? আছে এখনও?

ফ্যাঁশো : জানি না।

লিরা : জানো না মানে কী?

ফ্যাঁশো : দেখতে পেলাম না।

লিরা : [কাতরস্বরে] চমৎকার! আমি এদিকে এখানে আটকে আছি, তোমাকে শুধু বললাম গাছটায় লাগিয়েছে কিনা শুধু দেখতে আর তাও তুমি করবে না।

ফ্যাঁশো : পারলাম না।

লিরা : বেশ, যা ইচ্ছে করো।

[ফ্যাঁশো টেবিল থেকে নামে। ভীতভাবে জানলায় যায়। উদ্বিগ্নভাবে খোলে। বাইরে তাকায়। ফিরে এসে টেবিলে চড়ে। আঙুলে ভর দেয়। তাকে খুশি দেখায়।]

ফ্যাঁশো : আছে এখনও।

লিরা : [গর্বের সঙ্গে] তোমায় বলেছিলাম থাকবে। [নীরবতা]

[খুব বিমর্ষভাবে] কিন্তু আমায় একটু সাহায্য করো। আমায় একা ফেলে রেখো না।

ফ্যাঁশো : আমায় কী করতে বলো?

লিরা : [কাতরভাবে] কিছুই তোমার মাথায় আসছে না? তুমি কেমন বদলে গেছো। আমায় যে আর ভালোবাসো না তো বোঝাই যাচ্ছে।

ফ্যাঁশো। কিন্তু আমি বাসি, মুনুটুসি। দাঁড়াতে চেষ্টা করো, হাতটা বাড়াও, আমি ধরতে চেষ্টা করছি।

[ফ্যাঁশো যতটা পারে নিজেকে উঁচু করে। হাত বাড়ায়, ফ্যাঁশো যখন লিরার হাত ধরার চেষ্টা করছে অফিসার ডানদিক থেকে ঢোকে, ফ্যাঁশোর দিকে তাকায়। ফ্যাঁশো এদিকে পেছন করে।] চেষ্টা করো। আর-একটু বাড়াতে পারলেই আমি ধরতে পারবো। আরেকটু, এই-যে, ঠিক আছে।

[ফ্যাঁশো আঙুলে ভর দিয়ে। অফিসার পেছন থেকে তাকে ঠেলে উলটে ফেলে দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে যায়। ফ্যাঁশো বহুকষ্টে নিজেকে ওপরে

ঠেলে তোলে। ডানদিকে তাকায়। অফিসারকে জানলায় দেখা যায়। কৌতূহলীভাবে হাসে ও হাতকড়ি নিয়ে খেলে। ফ্যাঁশো জানলার দিকে ভীতভাবে তাকায়। তাদের চোখাচোখি হ'তেই অফিসার হাসি থামিয়ে হাতকড়া নাড়া-চাড়া করে। পরস্পর পরস্পরের দিকে গম্ভীরভাবে তাকায়। ফ্যাঁশো মাথা নিচু করে। অফিসার আবার কৌতুকহীন হাসি হেসে হাতকড়া নিয়ে খেলে। অবশেষে অদৃশ্য হয়। ফ্যাঁশো মাথা তুলে জানলার দিকে তাকায়। তাকে আশ্বস্ত দেখায়]

লিরা : ওফ্, আমায় ফেলে চ'লে গেলে কেন ?

ফ্যাঁশো : পিছলে গিয়েছিলাম। লেগেছে নাকি তোমার, মুন্টুসি ?

লিরা : আরো-কয়েকটা পাথর পড়েছে গায়ে, ও-ও !

ফ্যাঁশো : সরি।

লিরা : তোমরা উপর ভরসা করা যায় না।

ফ্যাঁশো : না-না, যায়। তোমার জন্যে একটা চমক আছে, একটা উপহার।

[ফ্যাঁশো পকেট থেকে একটা সুতো এবং একটা ঢলঢলে জিনিশ বার করে। মুখ দিয়ে ফোলায়। একটা নীল বেলুন। সুতো জড়ায়। সুতোর তলায় একটা ঢিল বাঁধে।]

[খুব খুশি] যে-ঢিলটা ছুঁড়ছি ধরো। [দেয়ালের উপর দিয়ে ছুঁড়ে দেয়] পেয়েছো ?

লিরা : হ্যাঁ।

ফ্যাঁশো : সুতোটা টানো।

[লিরা তাই করে। বেলুনটা তার মাথার উপর স্থির হয়।]

ওপরে তাকাও। দেখতে পাচ্ছো ?

[হানার শব্দ। কানে তালা-লাগানো আওয়াজ। হানা চলাকালীন মহিলা ও বাচ্চা মেয়েটি ডান থেকে বাঁয়ে মঞ্চ অতিক্রম করে। তারা একটা ছোটো ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তার উপরে একটা বাক্স। বাক্সের উপর লেখা ডাইনামাইট। তাদের রাগত এবং অসহায় দেখায়। হানা শেষ হয়।]

মুন্টুসি। [নীরবতা, উদ্বিগ্ন,] মুন্টুসি ?

[বেলুনটা উপরে-নিচে দোলে।]

কিছু-একটা বলো। [দীর্ঘ নীরবতা]

কথা বলবে না আমার সঙ্গে ? রেগে গেছো আমার ওপর ? আমার কোনো দোষ নেই। [থামে] আমার যদি কোনো হাত থাকতো।…[থামে] আমি

তো বাড়িটা ভাঙেনি [খুশি] আর যাই হোক, গাছটাকে এখনও লাগাতে পারেনি। [হঠাৎ] তুমি কি রেগেই থাকবে ? [নীরবতা] ভীষণ রেগেছো ? [নীরবতা] ও, আমায় তুমি এইরকম ভালোবাসো। ঠিক আছে, যা ইচ্ছে করো।

[একগুঁয়ে ভাবে অন্যদিকে তাকায়। বুকে আড় ক'রে হাত রাখে।] আমার কথা শুনতে পেয়েছো আশা করি ? যা ইচ্ছে, করো, আমার কাছে সবই সমান। [থামে] আর পরে আমায় বোলো না যে আমিই শুরু করেছিলাম। আর আমি কেমন গোল পাকাই। এবারে বোঝাই যাচ্ছে। আমি কিছুই করিনি আর তুমিই কথা বলছো না। আমি বুঝেছিলাম তুমি কী করতে চাচ্ছো। প্রথমে শুরু করলে আমি শনিবার পারিনি ব'লে আর এখন কথাও বলতে চাচ্ছো না। [থামে] বেলুনটা নিয়ে খেলতেও কি চাও না ? [ঘুরে তাকায়। বেলুনটা আস্তে-আস্তে দুলছে।] হুঁঃ, মহারানী কথা বলতে পারছেন না, তিনি ক্লান্ত, তিনি শুধু দয়া ক'রে বেলুনটা নিয়ে খেলছেন। ঠিক আছে—আমিও একটা খেলা খেলতে পারি। [থামে] কিন্তু কিছু-একটা বলো। কী ইচ্ছে তোমার বলো-না, এমনকী বিশ্রী কিছুও যদি হয়, বলো-না। [দীর্ঘ নীরবতা] ঠিক আছে। [আবার আহত দেখায়। হাত বুকের উপর ভাঁজ ক'রে উলটোদিকে তাকিয়ে থাকে। ডানদিক থেকে ঢোকে লেখক এবং সাংবাদিক, এখনও নোট-বুক হাতে। ফ্যাঁশোকে সন্ত্রস্ত দেখায়। টেবিলের তলায় আশ্রয় নেয়। লেখক গন্ধ শুঁকে তাকে বের করে। নড়তে দেয় না, সমস্ত কোণ থেকে তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে।]

লেখক : [সাংবাদিককে] কী জটিল, মর্মস্পর্শী লোকজন ! লিখে নিন-না, লিখুন এই নিষ্ঠুর এবং ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে এই মর্মস্পর্শী জনগণের জটিলতা স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে বিকশিত হচ্ছে। [নিজেই খুব খুশি] মন্দ নয়, অ্যাঁ ? [ইতস্তত করে] না। বাক্যটা বাদ দিয়ে দিন। বড্ড জোরালো, আমাকে আরো-নির্দিষ্ট, আরো-সংযত একটা-কিছু ভেবে বার করতে হবে। [ভাবে] চ'লে আসবে, চ'লে আসবে।

[ফ্যাঁশো এখনও মাটিতে শুয়ে আছে। টেবিলের তলায়, আতঙ্কিত লেখক ও সাংবাদিক বাঁদিক দিয়ে বাইরে যায়। গলা দূরে মিলিয়ে যায়।]

লেখক : কী-একখানা উপন্যাস এর থেকে বানাবো। কী-একখানা উপন্যাস। কিংবা হয়তো একটা নাটক, এমনকী একটা ফিল্ম / ছবি, আর কী একখানাই না ফিল্ম।

লিরা : কার সঙ্গে কথা বলছিলে ?

ক্যাশো : মহারানী স্বর ফিরে পেয়েছেন। তিনি আর বোবা নন। আচ্ছা, এবার তোমায় জানানোই ভালো যে এবার আমার কথা বলতে না-চাওয়ার পালা।

লিরা : [কাতরস্বরে] সোনামণি, লাগছে, ভীষণ লাগছে। আমার জন্যে তোমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না।

ক্যাশো : [উদ্বিগ্ন] কী ব্যাপার—তোমার শরীর খারাপ লাগছে ?

লিরা : দেখতে পাচ্ছো না পাথরে একদম চাপা প'ড়ে আছি, নড়তে পারছি না।

ক্যাশো : খেয়াল ছিল না।

লিরা : তুমি আমার কথা ভাবোই না।

ক্যাশো : ভাবি নাই বটে। রুমালে একটা গিঁট দিয়ে রাখতে হবে।

লিরা : আমি না-থাকলে তোমার কী হবে ? তুমি এত দায়িত্বজ্ঞানহীন।

ক্যাশো : [রেগে এবং জাঁক ক'রে] তুমি সবসময়েই তাই বলো। ঠিক আছে। আমি অন্য-কাউকে বরং বিয়ে করি। এখনও লোকের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারি, বুঝলে ? রোজ সকালে যখন রুটি আনতে যাই রুটিওলার বৌ যেভাবে আমার দিকে তাকায় যদি দেখতে !

লিরা : চমৎকার ! খেলা-দেখানো একটা কুত্তি পেলেই একটা তুমি আমায় ঠকাও ? জানতাম তোমায় বিশ্বাস করা যায় না।

ক্যাশো : ও আমার দিকে তাকায়। আমি ওকে পাত্তা দিই না।

লিরা : সে তো তুমি বলছো। দেখতে হয়।

ক্যাশো : দিব্যি গেলে বলছি, কিচ্ছুটি করিনি।

লিরা : রাখো তোমার মতো মাতালের দিব্যি। আমায় হানিমুনে নিয়ে যাবে কথা দিয়েছিলে।

ক্যাশো : ভুলিনি মোটেও। যুদ্ধ থামলেই আমরা বেড়াতে যাবো। তোমায় প্যারিসে নিয়ে যাবো।

লিরা : হুঁঃ, প্যারিস। তোমার আসলে মজা মারার ইচ্ছে।

ক্যাশো : দ্যাখো, তুমি আমার কথা কিছুতেই মানো না।

লিরা : [কাতরস্বরে] ওঃফ ? আরো-কতগুলো পাথর পড়লো।

ক্যাশো : [উদ্বিগ্ন] খুব লাগলো না কি ? [লিরা কাৎরায়] এই যুদ্ধ জিনিশটা মহা ঝামেলার !

লিরা : আমার জন্যে কিছু-একটা করো।

ফ্যাংশো : কী করি ?

লিরা : ডাক্তার ডাকো একটা।

ফ্যাংশো : সবাইকেই তো ওরা ভাগিয়ে দিয়েছে।

লিরা : তার চেয়ে সোজাসুজি বললেই পারো যে আমার জন্যে তুমি কিছু করতে চাও না।

ফ্যাংশো : তুমি কি বুঝতে পারছো না যে একটা যুদ্ধ চলছে এখন।

লিরা : আমরা কারু কোনো ক্ষতি করিনি।

ফ্যাংশো : তাতে কিছু এসে-যায় না। তুমি বলবে আমারই কিছু মনে থাকে না। অবস্থাটা কী-রকম তুমি তো সেটা ইতিমধ্যেই ভুলে মেরে দিয়েছো।

লিরা : আমাদের তো অন্তত ছাড় দিতে পারে। আমরা বয়স্ক লোক।

ফ্যাংশো : কী ভাবো তুমি ? যুদ্ধ একটা সিরিয়াস ব্যাপার। তোমার বিদ্যের দৌড় বোঝাই যাচ্ছে।

লিরা : বেশ-বেশ, এবার আমায় অপমান করো। তার চেয়ে সোজা বললেই পারো আমায় ভালোবাসো না।

ফ্যাংশো : তোমায় ব্যথা দিতে চাইনি, প্রিয়ে।

লিরা : ব্যথা দিতে চাওনি, কিন্তু দিয়েছো। তুমি কেমন বদলে গেছো। আগে আমার জন্যে কিছুই কম ভালোবাসার ছিল না।

ফ্যাংশো : এখনও তাই।

লিরা : আর এই শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারটা, আমার কি মনে লাগে না ?

ফ্যাংশো : আরে, আমি কিছু না-ভেবেই এমনিই বলেছি কথাটা।

লিরা : ফিরিয়ে নাও।

ফ্যাংশো : ফিরিয়ে নিলাম।

লিরা : মনে-মনে কোনো দ্বিধা··· ?

ফ্যাংশো : না, দিব্যি গালছি।

লিরা : কিসের দিব্যি ?

ফ্যাংশো : সাধারণত যার দিই।

লিরা : ঠিক আছে। আশা করি নতুন ক'রে আবার শুরু করবে না ? [নীরবতা]

ফ্যাংশো : দাঁড়াতে পারবে না ? বেরুনোর চেষ্টা করতে ?

লিরা : কিছু নড়লেই পাথর খ'সে পড়ছে যে।

ফ্যাংশো : কিছু-একটা করতেই হয় আমাদের।

[বিমানের শব্দ। হানা। হানা-চলাকালীন মা ও মেয়ে ডান থেকে বাঁয়ে

. মঞ্চ অতিক্রম করে। মা কতগুলি শিকারী বন্দুক বইছেন। মেয়ের কাছে তিনটি। লিরা-র বেলুনটি ফেটে যায়। হানা থামে।]

লিরা : [কাতরস্বরে] আমার বেলুনটা ফাটিয়ে দিল।

ফ্যাশো : জানোয়ারগুলো! তাক না-ক'রেই যেমন-তেমন করে বন্দুক ছুঁড়ছে।

লিরা : ইচ্ছে ক'রেই করেছে।

ফ্যাশো : না, তাক না-ক'রেই ছোঁড়ে, কিছুই এসে-যায় না ওদের।

লিরা : জানোয়ারগুলো! প্রথমে আমাদের বাড়িটা গুঁড়িয়ে দিল, তারপর, সর্বোপরি, আমাদের বেলুনটা ফাটিয়ে দিল।

ফ্যাশো : লোকগুলো একেবারে যা-তা।

লিরা : দ্যাখো তো গাছটায় লাগিয়েছে কিনা?

[ফ্যাশো টেবিল থেকে নামে। জানলায় যায়। অন্য পাশে অফিসার দেখা দেয়। গম্ভীর মুখে ফ্যাশোর দিকে তাকায়। ফ্যাশো আতঙ্কে মাথা নিচু করে। অফিসার কঠোরভাবে হাসে এবং এক আঙুলে হাতকড়া জোড়া ঘোরায়। জানলা থেকে অফিসার অদৃশ্য হয়। ফ্যাশো মাথা তোলে। কাউকে দেখতে পায় না। সাবধানে জানলা দিয়ে মাথা বাড়ায়। গাছের দিকে তাকায়। তাকে খুশি দেখায়। পিছনে তার ডানদিকে হাসির শব্দ। ডানদিকে ঘোরে। অফিসারের বিদ্রূপভরা হাসিমুখ দেখা দেয়। দিয়েই মিলিয়ে যায়। ফ্যাশো ভীত। বুঝতে পারে না কী করবে। বাঁয়ে হাসির শব্দ। বাঁয়ে ঘোরে। বাঁয়ে অফিসারের বিদ্রূপভরা হাসিমুখ দেখা দিয়েই মিলায়। ফ্যাশো ভীত। বুঝতে পারে না কোনদিকে তাকাবে। হাসির শব্দ, প্রথমে বাঁয়ে, তারপর ডাইনে, বাঁয়ে, তারপর ডাইনে, তারপর বাঁয়ে, তারপর ডাইনে, তারপর বাঁয়ে, তারপর ডাইনে। ফ্যাশো আতঙ্কিত, নড়ে না। অফিসার ডানদিক থেকে ঢোকে, তাকে সিরিয়াস এবং স্থির চোখ দেখায়। ফ্যাশোকে নিয়ে যেন সে বড়োই ভাবিত। পকেট থেকে একটা স্যাণ্ডউইচ বার ক'রে রুটি চিবোতে থাকে। আর সর্বক্ষণ তার চোখ আঠার মতো ফ্যাশোর গায়ে লেগে থাকে। গিয়ে ফ্যাশোর কাছে দাঁড়ায়। ফ্যাশো পিছু হঠে। অফিসার আবার স'রে একদম তার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। ফ্যাশো নিরীহভাবে পালাতে চেষ্টা করে। অফিসার তার গায়ে লেগে থাকে, তার উপর থেকে চোখ সরায় না এবং অবশেষে তাকে এককোনায় তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ফ্যাশো এখন নড়তে পারে না। অফিসার হাত বাড়িয়ে তার পথ-

রোধ করে। শান্তভাবে রুটি চিবিয়ে যায় এবং তার ওপর থেকে চোখ সরায় না। দীর্ঘ নীরবতা]

লিরা : করছোটা কী তুমি ?

[ফ্যাঁশো নড়তে পারে না, উত্তরও দেয় না।]

বেশ তো, এবার আমায় একা ফেলে যাও।

[অফিসার উদাসীনভাবে স্যাণ্ডউইচ চিবোয়, ফ্যাঁশোকে এখনও নজর-বন্দী ক'রে রেখেই।] [নরমভাবে] এমন কোরো না, সোনা। [অফিসার খাওয়া থামিয়ে মুখ বিকৃত করে। সমস্ত দাঁত বের ক'রে মনে হয় সে হাসছে কিন্তু আওয়াজ করে না। ফ্যাঁশো-কে ভেড়ুয়ার মতো লাগে। সে মাথা আরো নিচু করে। অফিসার হাসি থামিয়ে আবার খাওয়া শুরু করে।]

তুমি রেগে গেছো ? ঠিক আছে—আচ্ছা, তুমি পেরেছিলে, শনিবারে। [থামে] এবারে খুশি তো ?

[অফিসার খাওয়া থামিয়ে মুখ বিকৃত করে। সমস্ত দাঁত বের ক'রে মনে হয় হাসছে, কিন্তু কোনো আওয়াজ করে না। ফ্যাঁশোকে ভেড়ুয়ার মতো লাগে এবং সে মাথা নিচু করে। অফিসার এবার হাসি থামিয়ে খাওয়া শুরু করে।]

আমি বুঝলাম যে মেয়েদের পটানোয় তুমি ওস্তাদ—বিশেষ ক'রে রুটিওলার বৌয়ের ক্ষেত্রে— ।

[একই ঘটনা ঘটে। অফিসার মনোযোগ সহকারে স্যাণ্ডউইচের অবশিষ্টাংশের ব্যবস্থা করে। সেটাকে খবরের কাগজে মুড়ে নেয়। যত্ন ক'রে ফ্যাঁশোর জ্যাকেটের হাতা দিয়ে মুখ মোছে। ফ্যাঁশোর জ্যাকেটের তলাটা দিয়ে বুট চকচকে ক'রে নেয়। ঘুরে মঞ্চের ডানদিক দিয়ে চ'লে যায়, তাকে খুবই সামরিক দেখায়। ফ্যাঁশো খুশি হ'য়ে হাসে এবং জিভ বার ক'রে ভ্যাঙায়। তারপর তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করে। তাকে ভীত দেখায়। চারদিকে দেখে। নিশ্চিত হ'য়ে নেয় কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। জিভ বার ক'রে এবং নাকে আঙুল রেখে ভ্যাঙচাবার ভঙ্গি করে অনেকবার। খুশি হ'য়ে হাসে এবং ফের টেবিলে ওঠে।]

ফ্যাঁশো : গাছটা এখনও আছে মুনটুসি।

লিরা : এইটে দেখতে তোমার এতক্ষণ লাগলো ?

ফ্যাঁশো : নিখুঁতভাবে কাজ করাটাই আমার পছন্দ।

লিরা : রুটিওলার বৌয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাওনি তো আবার ?

ক্যাশো : কী মনে করো আমাকে ? তোমার কী মনে হয় যুদ্ধের মাঝখানে আমি একটা ফষ্টিনষ্টি বাধাবো ?

[বিমান হানা। বিমান, বোমা। হানাচলাকালীন মা ও মেয়ে ডান থেকে বাঁয়ে মঞ্চ অতিক্রম করে, একটা উঁচু ক'রে কাগজ-বোঝাই প্যারাস্যুলেটর ঠেলে নিয়ে। হানা থামে। দীর্ঘ নীরবতা।]

লিরা আমার। [দীর্ঘ নীরবতা]

লিরা : কী ?

ক্যাশো : আচ্ছা তুমি কখনও প্রেমিক জোটাওনি কেন ?

লিরা : প্রেমিক ? [অল্প হাসে]

ক্যাশো : হ্যাঁ প্রেমিক। [হাসে। তারপর থামে]

লিরা : আমি··· [অল্প হাসে]

ক্যাশো : হ্যাঁ তুমি।

লিরা : কখনও ভাবিইনি !

ক্যাশো : আমার সম্পর্কেও কখনও ভাবো না। তোমার সঙ্গে আমি চালাকি খেলতে পারতাম। [থামে] তোমার অন্তত একটা প্রেমিক থাকা উচিত ছিল। [ভাবে বিষয়টা] কর্নেল একজন।

লিরা : ও কর্নেলই বটে, এমনি তুমি ভালোবাসো আমায়।

ক্যাশো : তুমি সবসময়েই পিছিয়ে আছো।

লিরা : চালাও। অপমানও করো।

ক্যাশো : না, মুনটুসি। [জেদিভাবে] কিন্তু প্রত্যেক আত্মসম্মান-জ্ঞানযুক্ত মহিলারই প্রেমিক আছে। [থামে] আমাকে সাহায্য করার জন্য তুমি কখনও কিছু করোনি। বন্ধুরা যাতে গায়ে হাত দিতে পারে তার জন্য যখন তোমার জামাটামা খুলে দিই তুমি সবসময়েই একটা শোরগোল বাধাও।

লিরা : সর্দি লেগে যায় যে আমার।

ক্যাশো : যাই করি তুমি একটা অজুহাত খুঁজে বের করবে।

লিরা : আর তুমি নিজের কথা ছাড়া আর-কারু কথা ভাবো না। তুমি আত্মকেন্দ্রিক।

ক্যাশো : কিন্তু তোমার জন্যেই তো করি। [নিজেকে নিয়ে বেশ খুশি দেখায় তাকে—তার মাথায় একটা ভালো বুদ্ধি এসেছে।] পরে তুমি নিজের আত্মজীবনী লিখতে পারবে।

লিরা : ও-ও ! [থামে] আবার আমার ওপর পাথর এসে পড়ছে। [কাৎরায়] আর কোনোদিন পা নাড়াতে পারবো না।

ফ্যাঁশো : চেষ্টা করো।

লিরা : [কাৎরে] চাপা প'ড়ে গেছে।

ফ্যাঁশো : অবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে।

লিরা : ব্যস, এই শুধু বলার আছে ? আমার জন্যে কখনও চিন্তা করো না।

ফ্যাঁশো : হ্যাঁ, করি। এখনই তো করছি। [হঠাৎ] তুমি কি আমায় কাঁদতে বলো ?

লিরা : বুঝেছি তোমার মৎলব। আমার সঙ্গে আর-একটা চালাকি খেলবে।

ফ্যাঁশো : না-না, দেখো। চাইলে আমি সত্যি ঠিকঠাক কাঁদতে পারি।

লিরা : আমি তোমায় জানি। আমি ম'রে গেলেই বা তোমার কী ?

ফ্যাঁশো : তুমি বলছো ! তুমি মরলে আমি [ভাবে]…আমি তোমার সঙ্গে পরপর তিনবার শোবো।

লিরা : সেই জাঁক করছো।

ফ্যাঁশো : বলো-না এরই মধ্যে ভুলে গেছো।

লিরা : [উষ্মাভরে তাকে বাধা দিয়ে] হ্যাঁ-হ্যাঁ, জানি, সেই বিখ্যাত শনিবার যখন…

ফ্যাঁশো : [রেগে] এরপর তুমি বলবে আমিই তোমায় খারাপ-খারাপ কথা বলি। [আরো পাথর পড়ে]

লিরা : ও-ও ! [কাৎরানি বাড়ে] সত্যি ম'রে যাবো।

ফ্যাঁশো : যাজক ডাকবো নাকি ?

লিরা : কী বলছো তুমি, যা জ ক ?

ফ্যাঁশো : তাই-ই বলে না লোকে ?

লিরা : ওঃ, কী পচা স্মৃতিশক্তি তোমার। ভুলে গেলে আমরা আর ধর্মে-কর্মে নেই ?

ফ্যাঁশো : [ভীত] কারা ? আমরা ?

লিরা : কিন্তু তুমিই তো ঠিক করলে ? মনে নেই ?

ফ্যাঁশো : [তার কিছুই মনে নেই] ও হ্যাঁ।

লিরা : তুমি বলেছিলে তাহ'লে আমরা আরো [থামে, জোর দিয়ে] পরিণত হবো।

ফ্যাঁশো : [বিস্মিত] পরিণত ? আমরা ?

লিরা : নিশ্চয়ই।

ফ্যাশো : বেশ গোলমালে পড়লাম যা হোক! তুমি মরতে চলেছো—এবার নরকে যাও!

লিরা : চিরকালের জন্যে?

ফ্যাশো : বটেই তো, চিরকালের জন্যে। আর কী-সব শাস্তি! দারুণ কয়েকটা দেখতে পাবে। উনি সব ঠিকঠাক চালিয়ে থাকেন, সত্যি।

লিরা : উনি মানে? কে?

ফ্যাশো : ইয়ে—ভগবান।

লিরা : ভগবান? [অল্প হাসে]

ফ্যাশো : হ্যাঁ, ভগবান। [অল্প হাসে। তারপর দুজনেই ভীতভাবে একসঙ্গে হাসে।]

[বিমান হানা। বিমান চলার এবং বোমা পড়ার আওয়াজ। হানাচলাকালীন মহিলা এবং মেয়েটি ডান থেকে বাঁয়ে মঞ্চ অতিক্রম করে। মহিলার কাঁধে জোড়াতালি দিয়ে তৈরি গোলাগুলির থলে। বাচ্চাটা যতটা পারে তাঁকে সাহায্য করে। হানা থামে।]

লিরা : ও-ও! ও-ও!

ফ্যাশো : কী হ'ল?

লিরা : এখান থেকে আর বেরুতে পারবো না।

ফ্যাশো : আশা ছেড়ো না।

লিরা : কোমর পর্যন্ত পাথরের নিচে।

ফ্যাশো : ভেবো না। দেখো, ঠিক তোমাকে বার করার একটা উপায় বার করবো।

লিরা : সত্যি, আমাদের কপাল একেবারে খারাপ।

ফ্যাশো : তোমারই দোষ সব। তুমি আর তোমার পায়খানায় ব'সে পড়ার শখ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওখানে কাটিয়ে দাও। তোমার যা হয়েছে তাতে আমি একটুও অবাক হইনি।

লিরা : সবই সবসময়েই আমার দোষ।

ফ্যাশো : ও-ভাবে নিয়ো না। তোমার মনে আঘাত দিতে চাইনি।

লিরা : [নীরবতা] বাড়িটা গুঁড়িয়ে দিল কেন?

ফ্যাশো : তোমাকে একই জিনিশ বার-বার বলতে হয়। [প্রত্যেকটা শব্দ

আলাদা-আলাদা ক'রে বলে] ওরা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক এবং আগুনে বোমা পরীক্ষা ক'রে দেখছে। এরপর বলবে আমিই সব ভুলে যাই।

লিরা : অন্য কোথাও পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারতো না?

ফ্যাশো : সবই সোজা ব'লে ভাবো। কোনো শহরের ওপরেই তো ওদের পরীক্ষা করতে হ'ত!

লিরা : কেন?

ফ্যাশো : আবার বলবে তোমায় নিয়ে ঠাট্টা করছি। কিন্তু সত্যি তোমার শিক্ষা ব'লে কিছু হয়নি। কেন! কেন! কেন আর? ওগুলো কাজ করে কিনা তাই দেখতে!

লিরা : তারপর?

ফ্যাশো : তারপর? তারপর? ইচ্ছে ক'রে বোকা সাজছো। একটা বোমায় যদি অনেকগুলো মানুষ মারা যায় তাহ'লে সেটা ভালো বোমা, তাহ'লে তখন সে-রকম আরো-কিছু বানাবে। কিন্তু যদি কাউকে মারতে না-পারে তাহ'লে সেটা দিয়ে কিস্যু হবে না, আর সে-রকম বানাবে না।

লিরা : ও।

ফ্যাশো : তোমাকে সবই বুঝিয়ে বলতে হয়।

লিরা : [বিরক্ত] এ-রকম ক'রে কথা বলছো কেন বুঝি না। তোমার মতো অত যে পড়িনি তা আমি জানি।

ফ্যাশো : [গর্বে ফুলে গিয়ে] সব জানি, অ্যাঁ? লোকে সত্যি মনে করতে পারে আমি বিশ্ববিদ্যালয়েও গেছি। [থামে। নিজেকে নিয়ে বেশ খুশি। মাথায় ভালো বুদ্ধি এসেছে।] যে-কেউ আমায় অধ্যাপক ব'লে ভুল করতে পারে, তাই না?

লিরা : [দ্বিধা এবং সন্দেহের সঙ্গে] হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

ফ্যাশো : সেক্ষেত্রে তুমি হবে অধ্যাপকের বৌ। আর লোকে যখন আমাদের রাস্তায় দেখবে, বলবে: 'অধ্যাপকদের ছাখো।' [থামে] ওদের ওপর একহাত নেওয়া যাবে। আমাদের ভিজিটিং কার্ড থাকবে, আমরা কন্‌ফারেন্সে যাবো। দরকার কেবল একটা বাহারে ছাতা। পায়খানায় যত পড়েছ তাতে তুমি তো বেশ ভালোই লেখাপড়া জানো।

লিরা : আবার শুরু করলে?

ফ্যাশো : তোমার তাই মনে হয় না?

লিরা : আমরা? অধ্যাপক?

ক্যাশো : আমি যাই ভেবে বার করি তোমার সঙ্গে মতে মেলে না। সবসময় এইরকম। যদি আবার শুরু করো তো চললাম একেবারে। [বিরক্ত] অর্থহীন কথা বলে এমন একজনের সঙ্গে তুমি থাকো আমি চাই না। বিদায়।
[ক্যাশো টেবিলের উপর গুঁড়ি মেরে ব'সে এমন আওয়াজ করে যাতে মনে হয় সে চ'লে গেছে।]

লিরা : সোনামণি ? আমায় একা ফেলে যাবে ?
[লিরা কাৎরায়। ক্যাশো নড়ে না। এখনো ব'সে।]
ফিরে এসো সোনা।
[দীর্ঘ নীরবতা। ক্যাশো নড়ে না। তখনও ব'সে।]
সেরেফ ঠাট্টা করেছি কিন্তু। [থামে] তুমি তো ভালো ক'রেই জানো তোমায় কেমন উঁচু চোখে দেখি আমি। [দীর্ঘ নীরবতা] তুমি দারুণ অধ্যাপক হ'তে। [থামে] লোকে যখন তোমার কথা শোনে লোকে তোমায় ক্যাপ্টেন ব'লে ভুল করে বা ভাবে তুমি বুঝি পুরোনো দামি জিনিশের কারবারি। [দীর্ঘ নীরবতা। ক্যাশোকে গর্বিত দেখায়]
সোনা। [থামে] একা ফেলে যাবে আমায় ? [নীরবতা] এসো এখানে। ও, ও, ও-ও [কাঁদে]··· আবার পাথর পড়তে শুরু করেছে।

ক্যাশো : [উদ্বিগ্নভাবে উঠে] কী হয়েছে, পরী আমার ? লাগলো তোমার ?

লিরা : একটু বাদেই পুরো চাপা পড়বো। আর এই সময়ে আমায় ছেড়ে গেলে। তুমি একেবারে হৃদয়হীন।

ক্যাশো : বেশ, তুমিই তো শুরু করলে।

লিরা : ঠাট্টা করেছিলাম তো শুধু।

ক্যাশো : দিব্যি ক'রে বলো আর করবে না।

লিরা : দিব্যি করছি।

ক্যাশো : কীসের দিব্যি।

লিরা : সাধারণত যার করি।

ক্যাশো : মনে কোনো দ্বিধা ?

লিরা : মনে কোনো দ্বিধা না-রেখেই।

ক্যাশো : বেশ। আশা করি আবার শুরু করবে না। [বিমান আক্রমণ। বোমা ও বিমানের আওয়াজ। হানাচলাকালীন মহিলা এবং মেয়েটি ঠেলাগাড়ি নিয়ে মঞ্চের ডান থেকে বাঁয়ে যায়। পুরোনো বন্দুকে ঠাসা। হানা থামে।]

লিরা : ওঃফ, এবার হাতটাও নাড়াতে পারছি না।

ফ্যাঁশো : ভেবো না, তোমায় বের ক'রে আনবো।

লিরা : কিন্তু গলা অব্দি এখন পাথরে ঢেকে গেছে।

ফ্যাঁশো : ভেবো না। কিছু-একটা ভেবে বার করবো।

লিরা : মারা যাবো আমি।

ফ্যাঁশো : উইলের জন্য একজন উকিল নিয়ে আসবো?

লিরা : উকিল? কী বলছো তুমি?

ফ্যাঁশো : তাই বলে না লোকে?

লিরা : আবার শুরু করতে চাও?

ফ্যাঁশো : বানানো উচিত একটা। পড়শিদের দেখাবো।

লিরা : খালি ভাবো কীভাবে কায়দা মারবে।

ফ্যাঁশো : কিন্তু তোমার জন্যেই তো। সমস্ত বড়ো মহিলারাই তাই করেন। তোমার উইল করা উচিত আর শেষ বাণীটাও ভেবে ফেলা উচিত।

লিরা : শেষ বাণী ··মানে?

ফ্যাঁশো : মারা যাবার আগে লোকে কী বলে, তোমায় ব'লে দেবো? তুমি বলতে পারো [থামে, তারপর তাড়াতাড়ি বলে] জীবন সম্পর্কে, মানবজাতি সম্পর্কে···

লিরা : [তাকে বাধা দিয়ে] থামো। বড্ড বোকার মতো কথা বলছো।

ফ্যাঁশো : এটা বোকার মতো কথা হ'ল? তুমি সত্যি···

লিরা : [কাতর স্বরে] আবার আমায় খারাপ-খারাপ কথা বলতে শুরু করলে?

ফ্যাঁশো : না মুনটুসি।

লিরা : এখন একদম নড়তে পারছি না। [কাতরভাবে] কিন্তু যুদ্ধ থামবে কখন?

ফ্যাঁশো : কে জানে? যখন সুবিধে হবে তখনই যুদ্ধটা থামুক।

লিরা : [গুড়িয়ে] ওরা থামাতে পারে না?

ফ্যাঁশো : পারেই না তো। জেনারেল বলেছেন পুরো দেশটা দখল না-ক'রে তিনি ছাড়ছেন না।

লিরা : পুরোটা?

ফ্যাঁশো : অবশ্যই, পুরোটা।

লিরা : এটা বাড়াবাড়ি।

ফ্যাঁশো : জেনারেলরা আধাআধি কিছু করার মধ্যে নেই, হয় পুরোটা, না-হ'লে কিচ্ছু না।

লিরা : আর জনগণ?

ফ্যাশো : জনগণ যুদ্ধ বাধানোর কিছুই জানে না। আর তাছাড়া জেনারেল দারুণ সাহায্যও পাচ্ছেন।

লিরা : এটা আর তাহ'লে খেলা নয় ?

ফ্যাশো : জেনারেল থোড়াই পরোয়া করেন ব'লে ভাবো ?

লিরা : এখন একদম নড়তে পারছি না। আর পাথর পড়লে একদম চাপা প'ড়ে যাবো।

ফ্যাশো : উঃ, কী একঘেয়ে ! [সান্ত্বনা দেয়] ভেবো না। দেখো, শিগগিরই আক্রমণ থেমে যাবে।

লিরা : একদম ?

ফ্যাশো : একদম।

লিরা : কী ক'রে জানলে ?

ফ্যাশো : [আহত হয়] আমার কথায় সন্দেহ আছে ?

লিরা : না। [অবিশ্বাসের সঙ্গে] তোমার কথায় সন্দেহ করবো কেন ?

[তিনটে গোলা ফাটে। পৈশাচিক আওয়াজ।]

[তিক্ত কেঁদে] সোনা ! আমি একদম চাপা প'ড়ে গেছি। এসে বাঁচাও আমায়।

ফ্যাশো : এই মুহূর্তে আসছি, মুনুটুসি। দেখো তোমায় বের ক'রে আনবো।

[ফ্যাশো অতি কষ্টে নামে। লিরা কাঁদে।]

লিরা : এবারে আমি সত্যি মরবো।

ফ্যাশো : ভয় পেয়ো না। আমি আসছি।

[ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে কষ্ট ক'রে এগোয়। যেখানে লিরা সেখানে পৌঁছোয়।]

মুনুটুসি। আমি এসে গেছি। তোমার হাতটা দাও।

লিরা : আমি পাথর চাপা প'ড়ে গেছি। দেখতে পাচ্ছো না ?

ফ্যাশো : এক্ষুনি তোমাকে বের করছি। শুধু একটু অপেক্ষা করো। তোমায় বের ক'রে আনছি।

[দীর্ঘ আক্রমণ। আরো পাথর পড়ে। ফ্যাশোও চাপা পড়ে। আক্রমণ যখন শেষ হ'য়ে আসছে মহিলা ডান থেকে বাঁয়ে যায়। তার কাঁধে ছোটো একটা শবাধার। তাকে অসহায় ও রাগত দেখায়। (পিকাসোর ছবি দেখুন) বাঁয়ে অদৃশ্য হয়। পশ্চাৎপটে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে গের্নিকার স্বাধীনতার গাছটি দেখা যায়। আক্রমণ শেষ। মঞ্চে ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর-কিছু নেই। দীর্ঘ নীরবতা।

ঠিক যেখানে ফঁ্যাশো আর লিরা অদৃশ্য হয়েছে সেখান থেকে দুটি রঙিন বেলুন আলগোছে ভেসে আসে। অফিসার প্রবেশ ক'রে লুইসগান চালায়। কিন্তু বেলুনের গায়ে লাগাতে পারে না।

বেলুন দুটি আকাশে মিলিয়ে যায়। অফিসার আবার গুলি করে। শোনা যায় ওপর থেকে লিরা ও ফঁ্যাশো আনন্দিতভাবে হাসছে। অফিসার ভীত, চারদিকে তাকায়, তাড়াতাড়ি ডাইনে বাইরে চ'লে যায়। লেখক ঢোকে। যেখানে ফঁ্যাশো ও লিরা ছিল জায়গা দুটি পরীক্ষা করে। তাকে খুশি দেখায়। টেবিল থেকে নামে। বাঁদিক দিয়ে বাইরে যায়, প্রায় দৌড়ে, দারুণ খুশি। বলতে-বলতে যায়···]

লেখক : আমি এইসবের থেকে একটা অতি অসাধারণ উপন্যাস বানাবো ! দুর্দান্ত একটা উপন্যাস ! কী-একখানা উপন্যাস !

[তার গলা দূরে মিলিয়ে যায়। বিরতি। কাছেই কুচকাওয়াজ ক'রে যাওয়া সেনাবাহিনীর পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। দূরে, খুব আস্তে, একদল লোক গাইছে, 'গের্নিকাকো আরবোলা।' দলটি ক্রমশ সংখ্যায় বাড়ে এবং তাদের গলা আরো জোরে হয়। এখন বিরাট এক জনতা গাইছে 'গের্নিকাকো আরবোলা', 'গের্নিকা, জীবন্ত গাছ'। যা ক্রমশ বুটের আওয়াজের শব্দ ডুবিয়ে দেয়। পর্দা নামে।]

অনুবাদ : সুনন্দন চক্রবর্তী

গের্নিকার স্বাধীনতার (প্রতীক) গাছটি শহরের ধ্বংসের পরও দাঁড়িয়েছিলো এবং এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

পল এলুয়ার

মানুষের মাপ

কর্নেল Fabien-এর স্মৃতিতে, আর তাঁর বিষয়ে যিনি আমাকে এত করে বলেছিলেন সেই Laurent Casanova-কে।

ওরা মেরেছে একজন মানুষ
একজন মানুষ একদিন শিশু
ছড়ানো গাঁয়ের ধারে
রক্তের রেখা
যেন অস্তপথের সূর্য
নারীর আর শিশুর
মুকুটপরা মানুষ
আমাদের চিরন্তনের জন্য
একেবারে আদর্শ এক মানুষ

ধ্বংস হলো সে
আর তার হৃদয় হলো শূন্য
চোখ তার শূন্য
মাথা তার শূন্য
খুলে গেল তার হাত
কোনো অনুযোগ নয়
কেননা অন্যদের সুখেই
ছিল তার বিশ্বাস
কেননা সে বলেছিল বারবার
মর্মে মর্মে ভালোবাসি তোমায়
তার মাকে তার পালিকাকে
তার সাথীকে তার বন্ধুকে

জীবনকে
আর সে যুঝেছিল
তার আপনজনের কশাইদের বিরুদ্ধে
শত্রুব্যাপারের বিরুদ্ধে

আর সবচেয়ে দুর্দিনেও
সে লালন করেছে তার দুঃখ
তার স্বভাব ছিল ভালোবাসার
আর জীবনকে শ্রদ্ধার
তার স্বভাব ছিল আমারই
এক ঝলক সাহসের চেয়ে বেশি নয়
একটা জাতের মহিমার চেয়ে বেশি নয়

আর ভালোবাসি তোমায় গড়িয়ে যায় মন্দে
কিন্তু তা জীবনেরই কথা বলে
ভালোবাসি তোমায় সেই ছিল স্পেন
সূর্যালোকের জন্য আলোড়িত
সমস্ত পারী
তার খুদে পথগুলি নিয়ে
তার পেলব শিশুদের নিয়ে
আর দুরাচারী সেনাদের বিরুদ্ধে
ঘৃণিত মৃত্যুর বিরুদ্ধে
প্রথম প্রত্যাঘাত
এই রাত সুখহীনতার
আলো কেবলই প্রথম
কেবলই পরম

আরো আরো নম্রতাকে ঘিরে
সংযোগের আলো
উন্মোচিত আর প্রাণিত

বীজ আর ফুল আর ফল আর বীজ
আর ভালোবাসি তোমায় গড়িয়ে যায় ভালোয়
আগামীদিনের মানুষজনের জন্য।

অনুবাদ : শুভা দাশগুপ্ত / শঙ্খ ঘোষ

[এল্যুয়ার লিখেছেন : সতেরো বছর বয়সে Fabien নাম লেখান ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে, আর তলপেটে গুরুতর আঘাত পাবার আগে পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করেন স্পেনে। ফ্রান্সে ফিরে আসবার পর Jeunesses Communistes de la Région Parisienne-এর সেক্রেটারি হন। দখলে থাকার প্রথম মাসগুলি থেকে Fabien আবার যুদ্ধের ভার নেন। চারদিকে ছড়িয়ে দেন বিদ্রোহের সংকেত। ১৯৪১ শেষ হবার মধ্যেই প্রতিরোধ আন্দোলনের শতকরা আশি ভাগই গড়ে তোলেন তিনি। সংগ্রামী এক অংশের নেতৃত্ব দেবার সময়ে তাঁর মাথায় বুলেট বেঁধে। পুরোপুরি আরোগ্যের আগেই তাঁকে বন্দী করা হয় আর অকথ্য নির্যাতন চলে। পালিয়ে যান তিনি। পারীর উত্থানের সময়ে আট-ট্যাঙ্কের পরিচালনাভার নিয়ে Jardins de Luxemburg-এর শক্ত ঘাঁটি ধ্বংস করে দেন। পরে, তিনি যান Ardennes-এ, সেখানে বারো কিলোমিটার লম্বা এক ফ্রন্টকে বাঁচাবার দায়িত্ব নেন। তিনি নিহত হন সেইখানেই। ১৯৪২ সালে Fabien-এর বাবাকে গুলি করে মারা হয়, স্ত্রীকে নির্বাসন দেওয়া হয় আউশভিচে। রেখে গেছেন পাঁচটি সন্তান।]

পল এলুয়ার

গের্নিকার বিজয়

১

আহ্‌, কী চমৎকার জগৎ ধ্বংসের
খনির আর মাঠপ্রান্তরের

২

আগুনের মধ্যে সবল সব মুখ ঠাণ্ডাহিমে সবল সব মুখ
রাত্রির প্রত্যাখ্যানের মুখোমুখি, শাপ-শাপান্ত আর আঘাতগুলো সত্ত্বেও

৩

সবল সব মুখ সবসময়
এখানেই শূন্যতা যেটা তাকিয়ে থাকে তোমার মুখে
তোমার মৃত্যু দৃষ্টান্ত হিশেবেই কাজ ক'রে যাবে

৪

মৃত হৃদয় উলটে পড়েছে

৫

মাটি আর আকাশ, জল আর ঘুম
আর তোমার জীবনের সব দুর্দশার জন্যে
আর তোমার রুটির জন্যে তোমাকে দাম দিতে বাধ্য করে ওরা

৬

ওরা বলে বুদ্ধির জন্যে বাসনা করো
ওরা সবলকে র‍্যাশন ক'রে দিয়েছে পাগলদের বিচার করেছে
ভিক্ষে চেয়েছে হাত পেতে এক কপর্দককে ভেঙে আধলা করেছে
তারা স্বাগত জানিয়েছে মৃতদেহগুলোকে
আর সৌজন্যে একেবারে চেৎভেদ হারিয়ে ফেলেছে

৭

ওরা লেগেই থাকে ওরা কাঁপিয়ে তোলে ওরা আমাদের এই
জগতের কেউ নয়

৮,

নারী আর শিশুদের আছে একই সম্পদ
সবুজ পাতার বসন্তের টাটকা দুধের
আর সময়ের
তাদের শুদ্ধ সব চোখে

৯

নারী আর শিশুদেরই আছে একই সম্পদ
তাদের চোখে
যাকে লোকে রক্ষা করে যতদূর পারে

১০

নারী আর শিশুদেরই আছে সেই একই লাল গোলাপ
তাদের চোখে
প্রত্যেকেই দেখায় তার রক্ত

১১

বাঁচামরার ভয় আর দুঃসাহস
মৃত্যু এত কঠিন মৃত্যু এত সহজ

১২

সেইসব মানুষ যাদের মধ্যে গাওয়া হয়েছিলো এই ঐশ্বর্য
সেইসব মানুষ যাদের সব ঐশ্বর্য গেলো হারিয়ে

১৩

সত্যিকার মানুষ যাদের হতাশা
খাইয়ে দেয় আশার লেলিহান আগুন
এসো আমরা সবাই মিলে খুলে দিই ভবিষ্যতের শেষ মুকুল

১৪

হায়! পারিয়ারা মৃত্যু মাটি আর বীভৎসতা
আমাদের শত্রুদের সকলেরই সেই
একই একঘেয়ে রঙ আমাদের রাত্রির
আমরাই প্রমাণিত হবো ঠিক।

অনুবাদ : অধীর মজুমদার

হৃদয়ে আমার স্পেন





ফেদেরিকো গার্থিয়া লোরকা

ইগ্‌নাথিও সান্‌চেথ মেহিয়াস-এর জন্য শোকোচ্ছ্বাস

আমার প্রিয় বান্ধবী এন্‌কার্‌থিওন লোপেথ হুলভেথ্‌-কে

১. আলোড়ন এবং মৃত্যু

বিকেল পাঁচটায়।
কাঁটায়-কাঁটায় ছিল বিকেল পাঁচটা।
শাদা থান নিয়ে এল একটি বালক
বিকেল পাঁচটায়।
ঝুড়ি ভরে রাখা হল চুন
বিকেল পাঁচটায়।
বাকি ছিল মৃত্যু আর মৃত্যুই কেবল
বিকেল পাঁচটায়।

বাতাস উড়িয়ে দিল পেঁজা তুলো যত
বিকেল পাঁচটায়।
এবং অক্সাইড কিছু স্ফটিক ও নিকেল ছড়ালো
বিকেল পাঁচটায়।
এখন লড়াই করে ঘুঘু আর চিতা
বিকেল পাঁচটায়।
এবং একটি উরু বিষণ্ণ শিঙের সঙ্গে
বিকেল পাঁচটায়।
ঘন্টার গম্ভীর ধ্বনি বেজে ওঠে
বিকেল পাঁচটায়।
আর্সেনিক ঘন্টা আর ধোঁয়া
বিকেল পাঁচটায়।
কোণায়-কোণায় শুধু নির্বাক জটলা
বিকেল পাঁচটায়।

এবং একাই ষাঁড় উল্লসিত।
বিকেল পাঁচটায়।
যে-সময়ে দেখা দিল তুষারের ঘাম
বিকেল পাঁচটায়।
যে-সময়ে আয়োডিনে ঢেকে গেল লড়াইয়ের চক
বিকেল পাঁচটায়।
মৃত্যু ক্ষতস্থানে ঐ ডিম পাড়ে
বিকেল পাঁচটায়।
বিকেল পাঁচটায়।
কাঁটায়-কাটায় ঠিক বিকেল পাঁচটায়।

চাকাওয়া শবাধার শয্যা তার
বিকেল পাঁচটায়
হাড় আর বাঁশি তার কানে বাজে
বিকেল পাঁচটায়।
ষাঁড়ের গর্জন তার কপালে এখনই
বিকেল পাঁচটায়।
যন্ত্রণায় ঘর হ'ল রামধনু-রঙ
বিকেল পাঁচটায়।
বহু দূর থেকে আসে ক্ষতের পচন
বিকেল পাঁচটায়।
সবুজ কুঁচকিতে তার তূর্যধ্বনি
বিকেল পাঁচটায়।
ক্ষতগুলি জ্বলছিল সূর্যের মতন
বিকেল পাঁচটায়।
এবং জনতা সব জানলাগুলি ভাঙছিল
বিকেল পাঁচটায়।
বিকেল পাঁচটায়।
আহা, সেকি ভয়ংকর বিকেল পাঁচটা!
সব ঘড়িতেই ছিল বিকেল পাঁচটা!
ছিল সেই বিকেলের ছায়ায় পাঁচটা!

২. রক্তের প্রবাহ

ও যে আমি দেখতে চাই না !

চাঁদকে আসতে বলে দাও,
ঐ ইগ্‌নাথিওর রক্ত
বালুকায় দেখতে চাই না।

ও যে আমি দেখতে চাই না !

অবারিত পূর্ণিমার চাঁদ।
প্রশান্ত মেঘের ঘোড়া, আর
স্বপ্নের ধূসর ঐ চক
উইলোয় ঘেরা চারিধার।

ও যে আমি দেখতে চাই না !

আমার স্মৃতি যে যায় জলে।
কথাটা জানিয়ে দাও ঐ
ঈষৎ শ্বেতাভ যূথীদলে !

ও যে আমি দেখতে চাই না !

প্রাচীন ধরার ধেনু তার
চেটে দেয় বিষণ্ন জিহ্বায়
বালুকার ওপর গড়ানো
রক্তে মাখা একটি নাসিকা,
আর যত গিসান্দো-র ষাঁড়,
অর্ধ-মৃত্যু অর্ধেক মর্মর,
ডাকে যেন ক্লান্ত দু-শতক
পথ হেঁটে মাটির ওপর।
না।
ও যে আমি দেখতে চাই না !

'নিজের মৃত্যুর বোঝা কাঁধে
ধাপে ধাপে ওঠে ইগ্‌নাথিও।
উষায় সে খুঁজছিল, আর
উষা কিন্তু ছিল না কোথাও।
সে খোঁজে প্রকৃত রূপ তার
স্বপ্ন তাকে দিগ্‌ভ্রান্ত করে।
সুন্দর শরীর খুঁজে তার
নির্গত রক্তের দেখা পেল।
ও আমাকে দেখতে বোলো না!
উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে আসে
ও তো আমি জানতে চাই না;
যে উচ্ছ্বাস আলোকিত করে
ধাপগুলি এবং ছড়ায়
উৎকণ্ঠ বিশাল জনতার
চামড়া আর মখমলের গায়ে,
কে আমায় ডাকে আগে যেতে!
ও আমাকে দেখতে বোলো না!

শিঙের এগিয়ে আসা দেখে
দু-চোখ যায়নি বুজে তার,
ভয়ংকর মাতৃকারা তবু
মাথা তুলে তাকাল আবার।
আর জাগে বাথানে-বাথানে
মৃদু হাওয়া গোপন কণ্ঠের—
ডেকে ওঠে দিব্য ষণ্ডদের
ম্লান কুয়াশার রাখালেরা।
তার তুল্য রাজপুত্র কোনো
সেভিয়া-য় ছিল না কখনো,
তার কৃপাণের মতো ছিল না কৃপাণ
ছিল না এমন এক প্রকৃত হৃদয়।

সিংহের স্রোতের মতো ছিল
আশ্চর্য অজেয় শক্তি তার
আর তার অনন্ত বিচার
মর্মর মূর্তির তুলনীয়।
আন্দালুথীয় রোমের আবহ
সোনায় মাথাটা তার ঘিরে রেখেছিল
যাতে তার মৃদু স্মিতহাসি
যেন-বা রজনীগন্ধা বোধ ও বুদ্ধির।
কী বিরাট ষণ্ডযোদ্ধা লড়াইয়ের চকে!
কী যে খাঁটি পাহাড়িয়া পাহাড়ি অঞ্চলে!
কী কোমল শস্যের মঞ্জরী হাতে নিয়ে!
কী কঠোর নালওলা জুতোপায়ে ঘোড়ার ওপর!
কী যে স্নিগ্ধ শিশিরকণায়!
কী উজ্জ্বল মেলার ভিড়েতে!
কী ভয়াল তিমিরের
অন্তিম বল্লম হাতে নিয়ে!

অথচ এখন সে তো মগ্ন চিরঘুমে
ঘাস আর শৈবাল এখন
খুলে ফেলে অমোঘ আঙুলে
তার করোটির ফুলটিকে।
আর তার রক্ত ঐ গান গেয়ে আসে :
গান গেয়ে জলা আর সবুজ মাঠের পথ ধরে
নেমে আসে সাড়হীন শিঙ বেয়ে-বেয়ে,
কুয়াশায় নিষ্প্রাণ হোঁচট খেতে-খেতে
হাজার খুরের সঙ্গে চোট খেয়ে-খেয়ে
বিরাট, পাণ্ডুর, কালো জিভের আকার
যন্ত্রণার খন্দ এক খুঁড়ে দেবে বলে
তারকিত গুয়াদালকিভিরের পাশে।
আহা, শাদা প্রাচীর স্পেনের!
আহা, কালো যন্ত্রণার ষাঁড়!

আহা, ইগ্‌নাথিওর রক্ত জমাট কঠিন।
আহা, তার শিরার বুলবুল।
না।
ও যে আমি দেখতে চাই না।
ঐ রক্ত ধরে রাখে এমন পবিত্র কোনো পানপাত্র নেই,
ওকে পান করে নেবে এমন বাবুইপাখি নেই,
আলোর তুষার নেই যা ওকে শীতল করে দেবে,
নেই কোনো গান কিংবা ফুলের প্লাবন,
এমন স্ফটিক নেই যা ওকে রুপোয় মুড়ে দেবে।
না।
ও যে আমি দেখতে চাই না!!

৩. উপস্থিত শরীর

পাথর ললাট এক যেখানে স্বপ্নেরা সব গুমরিয়ে কাঁদে
জলের আবর্ত কিংবা হিমে জমা সাইপ্রেসহীন।
পাথর তো কাঁধ যাতে সময়কে বয়ে নেওয়া যায়
চোখের জলের গাছ, ফিতে আর গ্রহদের নিয়ে।

ধূসর বৃষ্টির ধারা তাদের কোমল জীর্ণ হাতগুলি তুলে
দেখেছি ঢেউয়ের দিকে ছুটে যায়, যাতে
কখনো পড়ে না ধরা বিছানো পাথরে, যে-পাথর
রক্ত শুষে না-নিয়েই তাদের প্রত্যঙ্গ সব ক্রমশ শিথিল করে দেয়।

কেননা পাথর শুধু জমায় যতেক বীজ, মেঘ,
চাতকের কঙ্কাল ও নেকড়েবাঘ আলো-আঁধারির :
অথচ আসে না নিয়ে ধ্বনি, অগ্নি অথবা স্ফটিক,
আনে শুধু যুদ্ধচক্র, যুদ্ধচক্র, আরো বহু যুদ্ধচক্র প্রাচীরবিহীন।

অভিজাত ইগ্‌নাথিও শুয়ে আছে পাথরে এখন।
এখন সমস্ত শেষ ; কী যে ঘটে ? চেয়ে দেখ তার ঐ রূপ :

মৃত্যু তাকে ঢেকে দিল মলিন গন্ধকে
এবং বসাল এনে কৃষ্ণ নরবৃষভের মুণ্ড তার মাথার ওপরে।

এখন সমস্ত শেষ। বৃষ্টি তার মুখে ঢুকে পড়ে।
বাতাস উন্মাদ যেন তার শূন্য বুক ছেড়ে যায়,
আর ঐ ভালোবাসা সিক্ত হয়ে তুষার-অশ্রুতে,
নিজেকে উত্তপ্ত করে বাথানের অনেক ওপরে।

ওরা কী বলছে? নামে নিস্তব্ধতা পূতিগন্ধময়।
এখানে আমরা এক ক্ষয়ে-যাওয়া শায়িত দেহের পাশে বসে,
দীপ্ত এক অবয়ব যাতে বহু বুলবুল ছিল
এবং দেখছি সে তো ভরে যায় অথৈ কোটরে।

শবের চাদরে কে-বা ভাঁজ ফেলে? সে যা বলে তা তো সত্য নয়!
এখানে কেউ তো গান গাইছে না, কোণে বসে কাঁদছে না কেউ,
নাল দিয়ে বিঁধছে না, ত্রস্ত করে তুলছে না সাপে;
এখানে আমি তো চাই গোল-গোল চোখগুলি সব
শুধুই শবের দিকে অবিরাম তাকিয়ে থাকুক।

উদাত্ত কণ্ঠের যত মানুষকে এখানে দেখতে চাই আমি।
অশ্বদের বশ করে নদীকে শাসন করে যারা:
তাদের শরীরে অস্থি বেজে ওঠে ধ্বনিত নির্ঘোষে
আর তারা গান গায় মুখে পুরে সূর্য আর চকমকি পাথর।

এখানে তাদের আমি দেখতে চাই। মুখোমুখি ঐ পাথরের।
মুখোমুখি বল্গা-ছেঁড়া ঐ শরীরের।
চাই তারা—মৃত্যুর শেকলে বন্দী ঐ নায়কের
বেরিয়ে যাওয়ার পথ কোনদিকে—দেখাক আমায়।

আমি চাই আমায় দেখাক তারা শোকোচ্ছ্বাস নদীর মতন
কোমল কুয়াশা-ঢাকা, দু-ধারে উত্তুঙ্গ তীরভূমি,

বয়ে নিয়ে যেতে পারে ঐ ইগ্‌নাথিওর দেহ, আর
সে তবে হারিয়ে যাক ষাঁড়ের গর্জন ফের শোনার আগেই।

শৈশবে যে-চাঁদ খিন্ন, নিস্পন্দ জন্তুর ভান করে
সে-চাঁদের বৃত্তাকার যুদ্ধচক্রে হারিয়ে সে যাক ;
হারিয়ে সে যাক তবে মাছের সংগীতহীন রাতে
জমাট ধোঁয়ার শাদা অরণ্য-নিবিড়ে।

আমি তো চাই না তার ঐ মুখ ঢাকা হোক অনেক রুমালে,
আমি চাই, নিজের মৃত্যুর বোঝা সয়ে যাক তার।
যাও তবে ইগ্‌নাথিও : ষাঁড়ের উত্তপ্ত ডাক অনুভব থেকে মুছে যাক।
ঘুমাও, বিশ্রাম করো, উড়ে যাও : সমুদ্রেরও মৃত্যু হয় শেষে।

৪. অন্তর্হিত আত্মা

তোমায় চেনে না ষাঁড় বা ডুমুরগাছ,
চেনে না ঘোড়ারা, চেনে না তোমার ঘরের পিঁপড়েগুলি।
তোমায় চেনে না ঐ যে ছেলেটি চেনে না বিকেলবেলা
কেননা তুমি যে মৃত আজ চিরতরে।

তোমায় চেনে না পাথরের পিঠ, চেনে না ওখানে ঐ
কালো মখমল চুরমার হয়ে যাতে আছো তুমি পড়ে।
তোমায় চেনে না নীরব তোমার স্মৃতি
কেননা তুমি যে মৃত আজ চিরতরে।

শরৎ আসবে শঙ্খ বাজিয়ে, সাথে নিয়ে কুয়াশার
থোকায় থোকায় আঙুর এবং পাহাড়-চূড়ার সারি,
অথচ তোমার দু-চোখে তাকাতে চাইবে না কেউ আর
কেননা তুমি যে মৃত আজ চিরতরে।

কেননা তুমি যে মৃত আজ চিরতরে,
এই পৃথিবীর সব মৃতদের মতো,

মৃতদের মতো বিস্মৃত যারা সব
বিনষ্ট যত কুকুরের স্তূপাকারে।

কেউ তো তোমায় চেনে না। চেনে না। তোমাকেই নিয়ে তবু
গান গাই আমি, আগামী দিনের জন্য তোমার দেহ ও রূপের গান।
বিদিত তোমার প্রজ্ঞার পরিণতি।
মৃত্যুর ক্ষুধা তোমার এবং তার ও-মুখের স্বাদ।
যে বিষাদ ছিল তোমার অমন দৃপ্ত ফুল্লতায়।

বহুকাল ধরে জন্ম নেবে না, জন্মায়ও যদি কভু
এমন মহৎ আন্দালুথীয় এমন কীর্তিমান
শব্দেরা কাঁদে যাতে আমি তার রূপের গরিমা গাই,
মনে পড়ে এক বিষণ্ণ হাওয়া জলপাই বনে-বনে।

অনুবাদ : পুষ্কর দাশগুপ্ত

লুই আরাগঁ

শহিদ স্পেন

মনে প'ড়ে যায় স্পেনের হাওয়ায় সেদিন কিসের গান
হৃৎপিণ্ডের তালে-তালে দিতো ক্রুদ্ধ ঢেউয়ের মিল
সে-গান ছড়াতো শিরায়-শিরায় অগ্নিস্রোতের বান
আর ব'লে যেতো কেন এ-অপার আকাশ নীলিম নীল।

সে তো গান নয়, উর্মিমুখর সাত সাগরের ডাক
মানসযাত্রী হংসকূজন-ছন্দিত সেই গান
শেষ কলি তার চাপা কান্নায় থরোথরো নির্বাক
গান্ধারে তার লবণ ঢেউয়ের প্রতিশোধ-সন্ধান।

কী দুঃসময়, সূর্য ছিলো না, জাগেনি নীলকমল,
বোমার ক্ষুধায় কেঁদেছে বালক, মহামানবের মন,
স্বপ্ন দেখেছে শেষ হবে এই অত্যাচারের কাল
তবু তো শুনেছি সে-আঁধার রাতে এ-গানের গুঞ্জন।

ক্রুশবিদ্ধ সে প্রেমের ঠাকুর স্নিগ্ধ ললাট যাঁর
রক্তিম হ'লো যে-কাঁটার ঘায় সেই সে-কাঁটার গান
হাওয়ায় এনেছে এ-গানের সুর, উত্তাল বেদনার
নীরব সাগরে তুফান তুলেছে, শিউরে উঠেছে প্রাণ।

গুনগুন ক'রে ফিরতো সবাই, সাহস করেনি কেউ
মুক্ত গলায় হানতে হাওয়ায় নিষিদ্ধ সেই গান
বসুন্ধরায় আরাব তুলেছে মারী-মড়কের ঢেউ
তবু তো জ্বালালে হে সূর্য-দিন আশায় অসাড় প্রাণ।

আমি যে বৃথাই খুঁজে ফিরি হায় অলকানন্দা সুর
মারণ-প্রহার বসুন্ধরার দু-চোখে ঝরায় জল

বধির এ-যুগ—উর্মির গান অনেক অনেক দূর
ঝর্নার গান শোনে না তো আর উধাও নদীর জল।

কাঁটার কিরীট, রিক্ত শাখায় আবার জ্বালাও গান
কতদিন হ'লো সেই গান শুনে তুফানে পেতেছি বুক
কেউ বাকি নেই কম্বুকণ্ঠে কে আর ধরবে তান
স্পেনে প'ড়ে আছে গায়কের শব শ্যামল বনানী চুপ।

কী যে সাধ হয় নিশ্বাস ভ'রে বিশ্বাস করি আজ
স্পেনের হৃদয়ে মাটির গর্ভে গুপ্ত রয়েছে গান
কোন সোনাভোরে যুকের কণ্ঠে গ'র্জে উঠবে বাজ
জয়যাত্রায় পঙ্গু শুনবে তূর্যের আহ্বান।

স্বর্ণ-উষার চেল-অঞ্চল মুছে দিয়ে যাবে কাল
মানবশিশুর ললাট-লেখায় রক্ত-ব্যথার দাগ
মুক্ত গলায় জীবনদোলায় সংগীত দেবে তাল
গান ছুঁড়ে দেবে হাওয়ায়-হাওয়ায় কৃষ্ণচূড়ার ফাগ।

অনুবাদ : দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

পল এলুয়ার

স্পেনে

স্পেনে যদি কোনো রক্তমাখা গাছ থাকে
সে-গাছ স্বাধীনতার

স্পেনে যদি একটিও সবাক মুখ থাকে
কথা তার শুধু স্বাধীনতার

স্পেনে যদি এক পেয়ালাও সাচ্চা মদ থাকে
পান করবে তা জনসাধারণই।

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

পল এলুয়ার

নভেম্বর ১৯৩৬

ধ্বংসস্তূপ-নির্মাতাদের ছাখো কীভাবে ওরা কাজ করে
ওরা ধনী ধৈর্যশীল সুশৃঙ্খল অন্ধকারময় আর নির্বোধ
কিন্তু ওরা পৃথিবীতে একলা থাকার জন্মে যথাসাধ্য সচেষ্ট
ওরা মানুষের ধারে এসে তাকে আবর্জনায় আচ্ছন্ন করে
ওরা মস্তিষ্কহীন প্রাসাদ নুইয়ে দেয় মাটি পর্যন্ত।
সবকিছুই মানুষের অভ্যেস হ'য়ে যায়
শুধু এইসব সিসের পাখি ছাড়া
শুধু উজ্জ্বলতার প্রতি ওদের ঘৃণা ছাড়া
শুধু ওদের কাছে হার মানা ছাড়া।

*

আকাশের কথা বলো আকাশ ফাঁকা হ'য়ে যাচ্ছে
হেমন্ত আমাদের কাছে গুরুত্বহীন
আমাদের প্রভুরা পা দিয়ে ঘা মেরেছে
আমরা হেমন্তকে ভুলে গিয়েছি
এবং আমরা ভুলে যাবো আমাদের প্রভুদের।

*

পড়ন্তি শহর বাঁচানো একফোঁটা জল থেকে তৈরি মহাসাগর
পুরো দিনের আলোয় গড়া একটিমাত্র হীরে থেকে তৈরি
মাদ্রিদ তাদের অভ্যস্ত শহর যারা দুঃখ সয়েছে
সেই ভয়াবহ সম্পদের কারণে যা দৃষ্টান্ত হ'তে চায় না
যারা দুঃখ সয়েছে
দুর্দশার কারণে যা সেই সম্পদের ঝলকের পক্ষে অপরিহার্য।

'মুখ তার সত্যের দিকে উজিয়ে যাক
বিরল উচ্ছ্বাস ছেঁড়া শিকলের মতো হাসি
উদ্ভট অতীত থেকে মুক্ত হ'য়ে মানুষ
তার ভাইয়ের সামনে তুলে ধরুক মুখচ্ছবি
এবং যুক্তিকে দিক ভবঘুরে ডানা।

অনুবাদ : অরুণ মিত্র

পল এলুয়ার

পাবলো পিকাসোর প্রতি

কেউ উদ্ভাবন করেছে বিতৃষ্ণা কেউ হাসি
কেউ-কেউ জীবনকে পরাবার জন্যে বানায় ঝড়ের পোশাক
তারা প্রজাপতি খুন করে পাখিদের বদ্‌লে করে আগুন
এবং মরতে যায় অন্ধকারে

তুমি, তুমি তো চোখ খুলে দিয়েছো
সব বয়েসে স্বাভাবিক যে-সব জিনিশ তাদের মধ্যে নিজের পথে চলার চোখ

তুমি স্বাভাবিক সব জিনিশের ফসল তুলেছো
এবং তুমি সব কালের জন্যে বীজ বুনছো
তোমাকে ওরা বাণী দিত আত্মা আর শরীরের
তুমি শরীরের উপর ফের বসিয়েছো মাথা
তুমি ভোগতৃপ্ত মানুষের জিব ফুঁড়েছো
তুমি সৌন্দর্যের প্রসাদী রুটি পুড়িয়ে দিয়েছো
একই হৃদয় জীবন্ত করলো বিগ্রহ আর দাসদের
এবং তোমার আক্রান্তদের মধ্যে তুমি কাজ ক'রে চলেছো
নিষ্পাপ মনে
দুঃখের উপর গজিয়ে-তোলা আনন্দ খতম এবার।

*

এই সব ছেঁড়া পত্রিকার চেয়ে শুক্‌নো কাদা আর কি আছে
যা দিয়ে উষাকে জয় করতে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে
সামান্য বস্তুর উষা
বিগুমান হবার জন্যে যা অপেক্ষা করছিল তাকে তুমি ভালোবাসা
দিয়ে আঁকছো

তুমি শূন্যের মধ্যে আঁকছো
যেমন কেউ আঁকে না

তুমি পরম ঔদার্যে একটা মুরগির আকারকে নানা খণ্ড করলে
তোমার হাত খেলা করলো তোমার তামাকের মোড়ক নিয়ে
একটা গেলাস নিয়ে এক লিটারের বোতল নিয়ে তারা সবাই
আরো মূল্যবান হ'ল

এক স্বপ্ন থেকে বেরিয়ে এল শিশু জগৎ
গিটার আর পাখিদের জন্যে সুবাতাস
বিছানা আর নৌকোর জন্যে
নতুন সবুজ আর নতুন মদের জন্যে একই সংরাগ
স্নানরতাদের জঙ্ঘা উন্মোচিত করে তরঙ্গ আর বেলাভূমিকে
সকালে তোমার নীল খড়খড়ি বন্ধ হ'য়ে যায় রাত্রির উপরে
নালীর মধ্যে ডাহুকের গন্ধ বাদামের মতো
পুরোনো অগস্ট মাসগুলো বিষ্যুদবারগুলো
রংবেরং ফসল গুঞ্জরিত কৃষাণীরা
জলাভূমির উপরকার সব নীড়ের শুকতা

ক্ষুব্ধ বাবুইয়ের ভগ্নস্বর দিনশেষের মুখ

সকাল একটা সবুজ ফলকে জ্বালিয়ে তোলে
সোনালি করে গমকে কপোলকে হৃদয়কে
তুমি তোমার আঙুলের মধ্যে অগ্নিশিখা ধ'রে রাখো
এবং তুমি আঁকো এক অগ্নিকাণ্ডের মতো

শেষ পর্যন্ত অগ্নিশিখাই মিলন আনে অগ্নিশিখাই বাঁচায়।

অনুবাদ : অরুণ মিত্র

রাফায়েল আলবের্তি

রেডিও সেভিইয়ে

শুনতে পাচ্ছো ?   রেডিও সেভিইয়ে !
এ যে কুয়েইপো দে ইয়ানো ঘেউ-ঘেউ ক'রে উঠছে,
গরজাচ্ছে, থুতু ছিটোচ্ছে,
চারপায়ে দাঁড়িয়ে গাঁক-গাঁক করছে।
রেডিও সেভিইয়ে !—"সেনিওরা আর সেনিওরেগণ !
মাইক্রোফোনে আছেন : স্পেনের একজন উদ্ধারকর্তা।
দীর্ঘজীবী হোক মদিরা !   দীর্ঘজীবী হোক বমন।
আজ রাতে আমি দখল করি মালাগা,
সোমবার আমি দখল করবো হেরেথ ;
মঙ্গলবারে, মোন্তিইয়া আর থাথাইয়া ;
বুধবারে, চিনচোন, আর বৃহস্পতিবারে
পাঁড় মাতাল।   আর সকালবেলায়
মাদ্রিদের সব আস্তাবল, সব খোঁয়াড়
নরম হ'য়ে যাবে ঘোড়ার নাদির স্তূপে
আর আমাকে দেবে কোমল শয্যা।
ওহ্, ঘুম কী আনন্দের,
বালিশ হিশেবে
(দূরাগত হ্রেষার শব্দে)
তুই থাক আলফালফা !
জিনের চিহ্ন দেখে
কামারের কাছে যাওয়া কী যে গৌরবের !
কী দুর্দান্ত সুখ
আমার ক্ষুরে নিতে,
পেরেক ঠুকে গাঁথা
সেইসব নাল
ফ্রাঙ্কো যা জিতেছিলো আফ্রিকায় তার অভিযানে !

'এর মধ্যেই আমার তলপেটে টান লাগছে,
এর মধ্যেই আমার পাছা নেচে উঠতে শুরু ক'রে দিয়েছে
এর মধ্যেই গজিয়ে উঠছে আমার কানগুলো,
এর মধ্যেই আমার দাঁতের পাটি বড়ো হ'য়ে যাচ্ছে।
মুখসাজ ছোটো হ'য়ে যাচ্ছে আমার,
লাগাম হারিয়ে ফেলছে নিয়ন্ত্রণ।
কদম-কদম ছুটি আমি···কদম-কদম···আমার রাস্তায় :
কালকেই গিয়ে পৌছুবো মাদ্রিদ।
স্কুল-কলেজ বন্ধ হ'য়ে যাক,
বরং খুলুক সব শুঁড়িখানা।
বিশ্ববিদ্যালয় গোল্লায় যাক,
গোল্লায় যাক সব শিক্ষাভবন!
বরং মদ ছুটুক বন্যার মতো
স্পেনের মুক্তিদাতাকে আপ্যায়ন করতে।"
—শুনছো?
রেডিও সেভিইয়ে।
এই সামরিক বাহিনীর জেনারেল,
গাঁক-গাঁক আকাট
কুয়েইপো দে ইয়ানো
সই ক'রে দিচ্ছে সব।

অনুবাদ : অধীর মজুমদার

রাফায়েল আলবের্তি

তোমরা মরোনি

ম'রে গিয়েছে রোদে, ঠাণ্ডায়, তেতো বর্ষার মধ্যে, জমাট বরফের মধ্যে,
মস্ত সব ছিন্ন গর্তে, বন্দুকের গুলি যে-সব গর্ত খুঁড়ে গিয়েছে,
তোমাদের চুঁইয়ে-পড়া রক্তের তলায়, বীণার তারের মতো, মিহি ঘাস
আবার গান গেয়ে ওঠে হাওয়ায়, তোমাদেরই গান, যা গাওয়া হয়নি,
যা বলা হয়নি।

বিষণ্ণ মাটির একটা টুকরো যে তোমাদের জন্ম দিয়েছিলো, তা থেকে ছিঁড়ে-ফেলা
তোমরা হ'য়ে উঠেছো গর্বিত বীজ যেন, মাটির গভীর ভাঁজের মধ্যে শোয়া।
এই ভাঁজ তোমাদের রুয়ে দেবার জন্যেই তৈরি হয়েছিলো যুদ্ধের লাঙলে
এখন গ্রহণ করে তোমাদের ঋজু তরুণ শরীরগুলো প্রখর নিষ্ঠুর হাতে শুইয়ে দেয়া।

এ তো মৃত্যু নয়, এই বপন। তোমাদের মর্মযাতনায় জন্মেরই যন্ত্রণা।
মাটির কঠিন ঢাকার তলায়, জীবন ক্ষিপ্র হ'য়ে উঠবে, ন'ড়ে উঠবে,
তার সরু ডগা ফুঁড়ে বেরুবে মাটি, গমের খেতের পক্ব সব ফুল।
আর তারুণ্যও তেমনি উঠে পড়বে আবার, তোমরা হ'য়ে উঠবে মরণবিজয়ী।

তোমরা ম'রে গিয়েছো কে বলে? তীক্ষ্ণ তীব্র শিস
যেটা বুলেটের রাস্তা, তাকে ছাপিয়ে, কামানের গর্জন ছাপিয়ে,
ফায়ারিং স্কোয়াডের ঝনঝন ছাপিয়ে, যা অন্ত্যেষ্টির তীব্র বিলাপ,
স্পেন শুনতে পায় মহিমার গান তার মৃত সন্তানদের কাছ থেকে।

ভাইয়েরা, তোমরাই জীবন্ত, আর জীবন্তকে তো কেউ ভোলে না।
আমাদের সঙ্গে গান ক'রে ওঠো এখন, জীবনের মুখোমুখি,
স্বাধীন হাওয়া আর সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে,
গান ক'রে ওঠো অগনিতের সঙ্গে, পাহাড় থেকে, ঢেউ-লাগা গমের খেত থেকে।
তোমরা তো মৃত্যু নও, তোমরাই সেই নতুন তারুণ্য যা আমাদের মুক্তি দেবে
অচিরেই!

অনুবাদ : অধীর মজুমদার

রাফায়েল আলবের্তি

নৈশগীত

যখন নির্ঘুম কেউ, শোকাহত, সারারাত রোষ শুনে-শুনে
যে-রোষ ছুটেছে তার সঙ্গহীন শিরায়-শিরায়,
যখন হাড়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ কাঁপে ঘৃণা ও বিদ্বেষ,
মজ্জায় বিরামহীন প্রতিহিংসা জ্ব'লে যায় শুধু,
তখন শব্দের কোনো অর্থ নেই : তারা শুধু নিছক শব্দই।

বুলেট! বুলেট!

বাষ্পময় ছাপ যত, বিস্মৃত ধোঁয়ার যত মেঘ
তারাই তো ইশতেহার আর যত বাণী ও ভাষণ ;
হাওয়া ঝাপটা দিয়ে তাকে সরাবে সুদূরে ব'লে কাগজের দারুণ যন্ত্রণা।
কালির প্রগাঢ় শোক জল তাকে মুছে দেবে ব'লে।

বুলেট! বুলেট!

আমি আজ কুঁকড়ে যাই দারিদ্র্য, নিচুতা আর তীব্র হতাশায়,
যারা মৃত, ও দুর্ভাগা, তাদের কণ্ঠায় কোনো গহ্বর এখন
এমন ভাষায় ভরা যে শুধু ডুকরোতে চায় সশব্দে, অথচ
চিরকাল চুপ থেকে যায়, কেননা সম্ভব নয় শব্দের উৎসার।

বুলেট! বুলেট!

আজ রাতে মনে হয় সব শব্দ সব কথা মরণেরই ক্ষত।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাফায়েল আলবের্তি

গ্রামের রংরুট

চকমকির মতো এগিয়ে চলেছে তারা, সারি-সারি, কুড়ালের
হামলায় কেটে-যাওয়া বাকলের মতো রং, অপরিবর্তনীয়।
জেদ থেকে ছিটকে-পড়া বোমার টুকরোর মতো, মাথা আর মুখগুলো আঁধার,
কিন্তু তাদের স্বপ্ন থেকে ঝলসে বেরোয় আভা, ফলের খোশার মতো।

জামাকাপড়ের ঝিম-ধরা গন্ধ ওঠে : বৃষ্টিভেজা পশমের বোঁটকা গন্ধ—
মোটা ক্যানভাসের ভোঁতা গন্ধের মতো আর যেন
জড়ো-করা আলুর বস্তার মতো চলেছে
তাদের জুতোর তলির মণ্ডের মধ্যে লেপটে আছে কাদা আর
গোবর আর চামড়াকে শক্ত ক'রে যাচ্ছে ক্ষুরের মতো।

অন্ধকারে তাদের শব্দ কঠিন ও দুর্দম : গাধা আর খচ্চরের মাল-বওয়া দল
ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়-রাস্তায়, নর্দমা আর দরজার মুখ আটকে দিয়ে,
মাঠপ্রান্তর থেকে তারা ঝ'রে পড়ছে খোশা-ছাড়ানো গমের পাহাড়ের মতো,
আর নিজেদের বুনে দিচ্ছে গভীর ট্রেঞ্চে-পরিখায়
জমির ভাঁজের মধ্যে বীজের মতো।

কিছুই তারা জানে না। সামান্যই তাদের বক্তব্য।
তাদের আস্থা ও বিশ্বাস এটাই :
যত-দ্রুত-সম্ভব এগুনো, তাদের তারায় যে-হামলার ভয়
তার ওপর, তাকে মাড়িয়ে
সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয়ে আরেক কাজে খাটা
তাদের মরণের উত্তরে মরণ দিয়ে আর এইভাবে যুদ্ধে জিতে নিয়ে
তাদের জীবন।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মিকলুস রাদনুতি

স্পেন ! স্পেন !

গত দু-দিন ধ'রে এভাবে একটানা বৃষ্টি ঝরেছে, আর আমি যেই
ঝলমল পারীর ছাতে আমার জানলা খুলে দিই
টেবিলে এসে জুড়ে বসে এক মেঘ
আর আমার মুখে ব'য়ে যায় ভেজা আলো।

যারা অনেক নিচে দাঁড়িয়ে আছে নর্দমায়—
সেই বাড়িঘরের ওপর থেকে বর্ষণাহত ঝুলকালি
চীৎকার ক'রে ওঠে আমার ওপর
আর আমি লজ্জায় ভ'রে যাই এই সন্ধ্যার জন্যে,
আলগা কাদা আর খবরে নোংরা।

হায় কালেদোনিয়ার যুদ্ধ, তুমি কেবল চাবকাচ্ছো আমাদের,
সীমান্ত পেরিয়ে উড়ে যায় বিভীষিকা,
কেউ বীজ বোনে না আর, কেউ আর ফসল তোলে না অন্তপাশে
কেউ আর আঙুর তোলে না এখন।

গান গায় না তরুণ পাখি, সূর্য জ্বলে না
আকাশে, মায়েদের সন্তানরা আর জন্মায় না।
স্পেন, শুধু তোমার রক্তাক্ত নদীগুলো
ছুটে চলে আর টগবগ ফোটে।

কিন্তু নতুন সৈন্যরা আসবে, যদি দরকার হয় শূন্যতা থেকে
উন্মাদ কোনো ঘূর্ণিতুফানের মতো,
গভীর খনি আর জখম মাঠগুলো থেকে
সূচনা হবে নতুন-নতুন বাহিনীর।

স্বাধীনতা, লোকে ডুকরে ওঠে তোমার ভবিতব্য ভেবে।
এই অপরাহ্ণে, তাদের গান তোমাকে শূন্যে তুলে নিয়ে গেছে।
পারীর ভেজামুখ গরিবরা
এরই গান গেয়েছে ভারি ও কাতর সব শব্দে।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষ্ণু দে

১৯৩৭

প্রণয় পালালো প্রচণ্ড ভ্রূর ভঙ্গে।
ডুবেছে সাগর-মন্থনে দামি মুক্তা।
রক্তে মুছেছে রুচির হাসির শুচিতা।
অঘোরপন্থী শুধু খোঁজে আজ সঙ্গী।

অগ্নিবাণের চাতাল-ফাটানো হাস্যে
বালির পাহাড়ে ধামা-চাপা গীতাভাষ্য।
খেপা শুধু ঘোরে স্পর্শমণিরই খোঁজে কি
জীর্ণ দেউলে, বিদীর্ণ গম্বুজে কি ?

ঘর ও বাহির আপন ও পর পন্থা
আজকে শুধুই গোপন থাকুক গ্রন্থে।
বন্ধনহীন পথ বেঁধে দেয় গ্রন্থি।
ছিন্নকন্থা-দলেই ভেড়ে সামন্ত।

চাচা-র আপন প্রাণ-বাঁচানোর ক্ষেত্রে
শিং ভেঙে মেশে স্বার্থে শত্রুমিত্র ॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

নির্বাচনিক

ফাল্গুন অথবা চৈত্রে বাতাসেরা দিক্‌ বদলাবে।
কথোপকথনে মুগ্ধ হবে দুটি পার্শ্ববর্তী সিঁড়ি,—
"অবশ্যকর্তব্য নীড়।" (মড়াকাটা ঘর,—স্থানাভাবে ?

নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী ; ট্যাঁকে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি
মাংসের দুর্ভিক্ষ নইলে ঋষি মনে হতো হাবভাবে।
বিকৃতমস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙ্গুল স্বপ্নে অশরীরী।

বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ।
মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবে না।
সাম্য অতি খাশা চিজ !—অনুচিত কিন্তু রাজদ্রোহ !

'জীবন বিস্বাদ লাগে !'—ইত্যাদিতে ইতস্তত দেনা।
এবার আত্মাকে, বন্ধু, করা যাক প্রত্যাহার। (অহো !
সম্প্রতি মাঘের দ্বন্দ্বে ছত্রভঙ্গ দক্ষিণের সেনা।

সদলে বসন্ত তাও পদত্যাগ পত্র পাঠাবে না ?)

পাবলো নেরুদা

বলিভারের গান

আমাদের পিতা, যিনি আছেন পৃথিবীতে
জলে আছেন আছেন অনিলে
আমাদের এই বিস্তৃত নিঃশব্দ অক্ষরেখার প্রস্থে,
সবই তো বহন করে তোমার নাম, পিতা, আমাদের জগতে :
তোমারই নাম ইক্ষুতে হ'য়ে ওঠে মধুর,
বলিভার টিনে ঝলসায় বলিভারের দীপ্তি,
বলিভার পাখি ওড়ে বলিভার অগ্নিগিরির উপরে,
আলু, সোরা, অনন্ত নানা ছায়া,
নানা স্রোত, ফস্‌ফর্ পাথরের শিরাউপশিরা,
আমাদের সবকিছুই সম্ভূত তোমার মৃত জীবনে :
নদনদী, প্রান্তর, আরতির ঘণ্টা তোমারই উত্তরাধিকার,
তোমারই অবদান, পিতা, আমাদের দৈনন্দিন রুটি।

বীর কাপ্তেন তোমার তনু শবদেহ
বিরাটত্বে ছড়িয়ে দিয়েছে তার ধাতব রূপটি ;
হঠাৎ তুষার থেকে তোমার আঙুলগুলি জেগে ওঠে
আর দক্ষিণী জেলেরা হঠাৎ আলোতে তুলে ধরে
তোমার হাসিটি, জালে জালে স্পন্দিত তোমার কণ্ঠ।

সে কোন্ রং হবে গোলাপ যা তোমার হৃদয়ের পাশে রুইব ?
লাল সেই গোলাপ, তাতে তোমার পদপাতের স্মৃতি।

সে কেমন হবে হাতগুলি তোমার ছাই যাদের অঞ্জলি ?
লাল সেই হাতগুলি, তোমার ভস্মে যাদের জন্ম।

আর কেমন সে বীজ তোমার মৃত হৃদয়ের ?
লাল তোমার প্রাণময় হৃদয়ের বীজ।

আর তাই অনেক হাতের চক্র আজ তোমাকে ঘিরে।
আমার হাতের পরে আছে আরেক এবং তারপরে আরেকজনের
এবং আরও অনেক, অন্ধকার মহাদেশের তলা অবধি।
এবং আরেকটি হাত তোমার অজানিতে
আসছে, বলিভার, তোমার হাতে মিলতে।
তেরুয়েল থেকে, মাদ্রিদ থেকে, হারামা থেকে, এব্রো থেকে,
জেলখানা থেকে, হাওয়া থেকে, স্পেনের মৃতদের থেকে
আসছে এই লাল হাত, তোমারই এক সন্তান।

কাপ্তেন, সৈনিক, যেখানেই যে কোনো কণ্ঠে
বেজেছে : স্বাধীনতা, যেখানেই একটি কানেও পশেছে সেই নাম,
যেখানেই একটিও লালযোদ্ধা ভেঙেছে একটিও মেটেরঙা শিরস্ত্রাণ,
যেখানেই মুক্তির লরেল ফুটেছে, যেখানেই
নতুন নিশানে বাহার খুলেছে আমাদের বরেণ্য প্রভাতের রক্তে :
বলিভার, কাপ্তেন, সেখানেই তোমার মুখচ্ছবি!
বারুদের আর ধোঁয়ার মধ্যে জন্মাল আবার তোমার তলোয়ার।
আবার তোমারই পতাকা হ'ল রক্তে চিত্রিত।
দুশমনেরা আবার আক্রমণ করে তোমার বীজকে :
আবার ক্রুশবিদ্ধ হয় মানবের পুত্র।

কিন্তু তোমার ছায়া আমাদের নিয়ে যায় আশার দিকে
তোমার লাল ফৌজের লরেল আর আলো
আমেরিকার রাত্রির উপরে তোমার দৃষ্টি ফেলে।
তোমার চোখ, সাতসমুদ্রের পারে তার প্রহরা পৌঁছোয়
নিপীড়িত ও বিক্ষত সব জাতি ছাড়িয়ে
আগুনে দগ্ধ সব অন্ধকার শহর ছাড়িয়ে
তোমার কণ্ঠ আবার জন্ম নেয়, তোমার হাত আবার ভূমিষ্ঠ :
তোমার ফৌজ রক্ষা করে পবিত্র নিশানগুলি
এবং দুঃখের এক ভীষণ ধ্বনি আসে অগ্রদূত,
তারপরে প্রভাত, মানুষের রক্তে লাল।

'মুক্তিদাতা, তোমার বাহুর মধ্যে জন্মাল শান্তির বিশ্ব।
শান্তি, রুটি, গম জন্মেছিল তোমারই রক্তে :
তোমারই রক্তে আমাদের নবীন রক্তের মধ্যে দিয়ে
আসবে শান্তি আসবে রুটি আর গম বিশ্বের জন্যে আমাদের গড়া বিশ্ব।

দীর্ঘ এক সকালবেলায় দেখা হয়েছিল বলিভারের সঙ্গে
মাদ্রিদে, পাঁচ নম্বর রেজিমেণ্টের মুখে।
'পিতা,' তাঁকে আমি বললুম, 'তুমি আছো না কি নেই? তুমি কে?'
কুয়ার্তেল দে লা মন্তাঞার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,
'আমি জাগি একশো বছরে একবার, যখন জনসাধারণ জাগে।'

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

পাবলো নেরুদা

মিগুয়েল্ এরনান্দেথ্-কে

স্পেনের কারায় নিহত

তুমি আমার কাছে এলে সোজা পূর্বদিগন্ত থেকে। হে রাখাল,
তুমি আমায় এনে দিলে
তোমার ক্ষেতমাড়ানো নির্মলতা,
প্রাচীন পুঁথির নৈয়ায়িক ঋজুতা, একটা গন্ধ
ফ্রাই লুইসের, কম্‌লা ফুলের, পাহাড়ে পাহাড়ে
ঘুঁটে পোড়ার, আর তোমার মুখোশে
খুদকুড়োনো ফসলের তীক্ষ্ণতা,
আর মধু, সারা বিশ্ব যা ভ'রে দিলে তোমার চোখ দিয়ে।

তুমি তোমার মুখে ব'য়ে এনেছিলে বুলবুল।
কম্‌লা-ছোপানো এক বুলবুল, একটা তন্ত্রী
অকলুষ্য স্বরের, পল্লবাবৃত এক শক্তির।

হায় রে কিশোর, বারুদে ঢেলে দিলে আলো,
আর তুমি, বুলবুল আর বন্দুক নিয়ে দেখি চলেছো
লড়াইয়ের চন্দ্র-সূর্যের তলায়।

এখন তুমি তো জানো, হে আমার পুত্র, আমার ছিল যা সাধ্যাতীত
এখন তুমি জানো যে আমার পক্ষে, সারা কাব্যলোকে
তুমি ছিলে নীল শিখাটি। আজকে
আমি মাটিতে মুখ পাতি তোমার গলা শুনতে,
শুনি তোমাকে: রক্তে, গানে, মুমূর্ষু মধুকোষে।

তোমার জাতের চেয়ে ভাস্বর আর দেখিনি,
শিকড় দেখিনি আর অত দৃঢ়, না সৈন্যের হাত আর,
আমি কিছুই দেখিনি তোমার হৃদয়ের মতো জীবন্ময়
আমারই নিশানের রক্তবহ্নিতে আত্মোৎসর্জিত।

চিরন্তন তরুণ, দীর্ঘ অতীতের বিদ্রোহী স্বাধীন মানুষ,
গমের আর বসন্তের বীজে বীজে ঢল-ধোয়া ধারা,
নিহিত ধাতুর মতো খাঁজ খাঁজ অন্ধকার,
প্রতীক্ষমাণ কোন্ মুহূর্তে তোমার সঙ্গিন উঁচাবে।

তোমার মৃত্যুর পর থেকে আমি আর একা নই! আমি
তাদেরই একজন যারা তোমায় খুঁজে ফিরছে। আমি তাদেরই
যারা পৌঁছবে একদিন, তোমার মৃত্যুর প্রতিবিধানে।

তুমি চিনবে আমায় পায়ের ধ্বনি তাদের মধ্যে,
যখন তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে স্পেনের বুকে
কেয়ন্-কে চূর্ণ করতে, যাতে কবর থেকে মুখগুলিকে
ফিরিয়ে পাই আমরা।

ওরা জানুক, যারা তোমায় হত্যা করেছে
এর দাম ওরা দেবে রক্ত দিয়ে।
ওরা জানুক, যারা তোমায় যন্ত্রণায় বিঁধেছে
একদিন ওদের দাঁড়াতে হবে আমার মুখোমুখি

ওরা জানুক, শয়তানের দল, আজ যারা তোমার নাম
ওদের বইতে টোকে, ঐ সব দামাসস্ আর খেরার্দস্
জল্লাদের ঐ সব পাষণ্ড নীরব অনুচরেরা,
জানুক ওরা যে তোমার আত্মোৎসর্গ অবিস্মরণীয়,
তোমার মৃত্যু ওদের কাপুরুষতার পূর্ণচন্দ্রে অমাবস্যা।

আর ঐ যারা পচা লরেলের মালা জড়িয়ে, যারা তোমাকে
মার্কিন মাটিতে ঠাঁই দিলে না, ছড়াতে দিলে না
তোমার নদীখচিত কিরীটের রক্তাক্ত জ্যোতি,
ওদের ছেড়ে দাও আমার হাতে, অবজ্ঞার অবলোপে:
কারণ ওরা তোমার অনুপস্থিতি দিয়ে চেয়েছিল আমাকে বিকল করতে
মিগুয়েল্, ওমুনা কারাগার থেকে দূরে, অত্যাচার থেকে দূরে

যাও ৎসে তুং চালিত করেন তোমারই বিধ্বস্ত কাব্য
জয়যাত্রার যুদ্ধে।

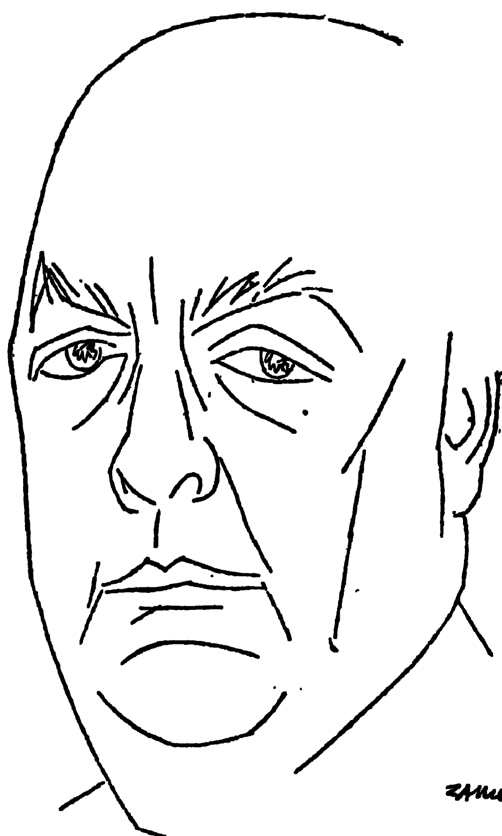
আর গুঞ্জরিত প্রাগ্
রচনা করছে তোমার গানের সেই মধুচক্র ;
শস্যহরিৎ হাঙ্গেরি খামার ঝাড়ে আর নাচে
ঘুমভাঙা নদীর পাড়ে পাড়ে ;
আর ওয়ারসাওয়ার নগ্ন সাইরেন জাগছে, পুনর্নির্মাণের মধ্যে
তার স্ফটিক তলোয়ারটি তুলে ধ'রে।
এবং আরো দূরে মর্ত্যদেশ হ'য়ে ওঠে অতিকায় ;
তোমার গানের মাটি আর তোমার দেশের রক্ষায় ছিল
যে ইস্পাত তা আজ নিরাপদ
স্তালিন আর তাঁর সন্তানসন্ততির অনমনীয় স্থিরতায়
প্রসার পেয়ে পেয়ে।

এরই মধ্যে সে আলো
ছড়িয়ে যায় তোমার বিশ্রামস্থানে।

স্পেনের মিগুয়েল্, বিধ্বস্ত দেশের
নক্ষত্র, তোমাকে আমি ভুলিনি, হে আমার পুত্র,
তোমাকে আমি ভুলিনি।

কিন্তু জীবনকে আমি জানলুম
তোমার মৃত্যুতে : আমার চোখে শোক নামছিল
তখন দেখলুম আমার মধ্যে
অশ্রু নয়
আছে অমোঘ সব অস্ত্র।
তারই অপেক্ষায় থেকো! থেকো আমার প্রতীক্ষায়॥

অনুবাদ : বিষ্ণু দে



পাবলো নেরুদা

তু-চার কথা বুঝিয়ে বলা

জানতে চাইবে : কোথায় গেল লাইলাকেরা ?
আর পপিতে জড়ানো সেই তুরীয়তা ?
আর সেইসব বৃষ্টিধারা, শব্দাঘাতে
গিরিখাত আর পাখির দলকে
জাগিয়ে তুলত যারা ?

আজ তোমাদের বলব আমি ঠিক কীরকম আছি ।

দিন কেটেছে সে-একসময় মাদ্রিদের
শহরতলি জুড়ে, ছিল ঘণ্টা তার
ঘড়িও ছিল, গাছগাছালি ছিল ।

সেখান থেকেই দেখতে পেতাম
কাস্তিলার শুকনো মুখচ্ছবি
সাগর যেন চামড়ায় টান-টান ।

আমার বাড়ির কথায়
লোকে বলত ফুলের বাড়ি, উৎসারিত হয়ে উঠত
জেরানিয়াম, এত
সুরম্য সেই বাড়ি,
সঙ্গে থাকত কুকুর এবং টুকিটাকি ।
রাউল, মনে কি পড়ে ?
মনে কি পড়ে, রাফায়েল ?
ফেদেরিকো, ওইখানে ওই
মাটির নিচে, মনে কি পড়ে ?
মনে পড়ে কি আমার বাড়ির অলিন্দে জুন
ডুবিয়ে দিত ফুলের ঝলক তোমার বুকে ?

ভাই, ভাই আমার !

সমস্ত স্বর
ছিল উদার, হাটবাজারের সুন,
চকমকানো রুটির সমারোহ
আর্গুয়েসের শহরতলির দোকানঘর, ধূসর স্ট্যাচু
দোয়াতদান দেখায় যেমন জেল্লা-দেওয়া সামুদ্রিক মাছের পাশে
চামচভরা তেলের সাঁতার
পথে পথে উপচেপড়া পায়ের কিংবা আঙুলগুলির
উদ্দাম ভিড়,
মিটার লিটার—বেঁচে থাকায় এই সমস্ত
লুব্ধ সারাৎসার,
দোকান জুড়ে লটকে-রাখা মাছ
শীতের রোদে ছাতের বুনোন
রশ্মিফলার ইতস্তত,
আলুগুলির উদ্দীপিত নিখুঁত শাদা,
সাগরজলে টম্যাটো বারবার।

তারপর এক সকালবেলায় সমস্তটাই ঝলসে গেল :
সকালবেলায়
মাটির থেকে বেরিয়ে এল বহ্ন্যুৎসব, আর
গিলে ফেলল সব,
তখন থেকে আগুন কেবল,
বারুদ কেবল তখন থেকে,
তখন থেকে রক্ত কেবল।

আকাশপথে ডাকাত, মূ্যর
মোহরদেওয়া আংটি হাতে লুঠেরাদল, রানী সাহেব
কালো ভিক্ষু দস্যুদল ক্রুসের চিহ্ন আঁকা

মেঘের থেকে বেরিয়ে এল জবাই করতে যাদের কোনো দোষ ছিল না
শিশুর রক্ত ছড়িয়ে পড়ল পথে পথে
স্বচ্ছ ধারায়, শিশুদেরই ধরন যেমন।

শেয়ালদের ঘেন্না করে শেয়াল,
কাঁটাঝোপের তৃষ্ণা থেকে ফিরিয়েদেওয়া পাথুরে থুৎকার
সাপের শত্রু সাপ।

তোমায় দেখে এখন আমি দেখতে পাই
তোমায় বয়ে নেবার জন্যে ছুরি এবং অমান্যতার
স্রোতের বেগে স্পেন
জাগিয়ে তুলছে রক্ত তার।
সেনাপতির দল
দলত্যাগীর দল :
আমার বাড়ির ধ্বংস চেয়ে দেখো
চেয়ে দেখো স্পেনের সর্বনাশ :
মৃত বাড়ির মধ্য থেকে ফুল নয় আর
ঝলসে ওঠে ধাতুর কণা,
চেয়ে দেখো স্পেনের সব পরিখামূল থেকে
জেগে উঠছে স্পেন
শিশুর নিধন থেকে জাগছে বন্দুকের নল
অপমানের থেকে জাগছে বুলেট
যা একদিন বিঁধবে গিয়ে তোমাদের ওই
বুকের ভিতর।

মাটির কথা পাতার কথা
যে দেশ তাকে বইল তার প্রকাণ্ড সব অগ্নিগিরির কথা
নেই কেন যে তার কবিতায় জানবে কি কখনো ?

এসো দেখো রক্তধারা পথে পথে
এসো দেখো
রক্তধারা পথে পথে
এসো দেখো রক্তধারা
পথে পথে।

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

পাবলো নেরুদা

কেমন ছিল স্পেন

প্রখর টানটান ছিল স্পেন, দিনগুলি
ঢাকের চামড়ায় বাঁধা ধ্বনিময় ছায়া,
ঈগলের বাসা ছিল ছড়ানো প্রান্তর, আর
হাওয়ার চাবুকতলে নীরবতা।

কীভাবে চোখের জলে, কীভাবে সমস্ত মন দিয়ে
ধরেছি তোমার দৃঢ় মাটি, ফেলেদেওয়া রুটি,
তোমার মানুষজন, আমার গভীরতম প্রাণে
তোমার গ্রামের ফুল কীভাবে আমারই জন্য বেঁচে থাকে
সময়ের ভিতরে নিথর, আজ নেই
চন্দ্রতলে যুগতলে প্রসারিত
তোমার ঊষর ভূমি
সংকীর্ণ করেছে তাকে কোনো এক অবোধ দেবতা।

তোমারই নিজের হাতে গড়া তোমার সজীব
নির্জনতা, বিবেচনাময়
পাথরের সীমাঘেরা অমূর্ত নীরব,
তোমার মধুর আঙুরেরা, তোমার কষায়
আঙুরেরা, তোমার সুতীব্র আর
সুকুমার তোমার আঙুর।

সৌর এ পাথর, পৃথিবীর প্রান্তরে এসেছে
অনাবিল, সেই স্পেনে
রক্ত আর তেজ দিয়ে টানা দাগ, নীল ও বিজয়ী
পাপড়ি আর বুলেটের শ্রমীদল, দ্বিতীয়বিহীন
আচ্ছন্ন, প্রগাঢ়, সঞ্জীবিত।

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

পাবলো নেরুদা

আন্তর্জাতিক বিগ্রেডের মাদ্রিদে আগমন

ঠাণ্ডা মাসের এক সকালে,
এক যন্ত্রণার মাস কাদা আর ধোঁয়া ভরা,
হাঁটুহীন একমাস, অবরোধ আর দুর্ভাগ্যের করুণ মাস,
যখন আমার ঘরের ভেজা জানালার ভেতর দিয়ে
শোনা যাচ্ছিল আফ্রিকার শৃগালদের
রক্তমাখা দাঁত আর রাইফেলের চিৎকার, তখন,
যখন বারুদের স্বপ্নের চেয়ে বেশি আশা আমাদের ছিল না
যখন আমরা ভেবে নিয়েছিলাম
এই পৃথিবী ভরে গেছে শুধু গিলতে-থাকা দানবে
আর ক্রোধে,
তখন. মাদ্রিদের ঠাণ্ডামাসের জমে-যাওয়া জলকণা ভেঙে
ভোরের
কুয়াশায়
দেখলাম আমার এই চোখ দিয়ে, আমার এই হৃদয় দিয়ে
দেখলাম,
আমি আসতে দেখলাম স্পষ্ট, শক্তিমান যোদ্ধাদের
ক্ষীণ আর কঠিন আর ম্লান আর উৎসাহী প্রস্তর বিগ্রেড।

সে ছিল এক দুঃসময়, যখন নারীরা
ভয়ংকর কয়লার মতো নিসঙ্গ ভয়ে দিন কাটাচ্ছিল,
আর স্পেনের মৃত্যু
—অন্য সব মৃত্যুর চেয়ে অনেক তিক্ত, অনেক তীব্র—
আচ্ছন্ন করে ফেলছিল তখনও-পর্যন্ত-গ্রামে-সমৃদ্ধ প্রান্তরগুলি।

রাস্তায় রাস্তায় মানুষের ভাঙা-রক্ত মিশে যাচ্ছিল
ভিটেবাড়ির বিধ্বংস বুকের থেকে উপচে-ওঠা জলস্রোতে :

ছিন্নবিচ্ছিন্ন শিশুদের হাড়, জননীদের
বুকভাঙা কালো-পোশাকের নীরবতা, চিরকালের জন্য
বুজে-যাওয়া অসহায় মানুষের চোখ,
দুঃখ আর ক্ষতির মতো, থুথুতে ধিক্কার দেওয়া বাগানের মতো,
চিরকালের জন্য নিহত বিশ্বাস আর ফুল।

কমরেড
সেই সময়
আমি তোমাদের দেখলাম,
আজও আমার চোখ ভরে আছে সেই গর্বে
কারণ আমি দেখলাম কুয়াশাভরা সকাল ভেদ করে তোমরা পৌঁছলে
কাস্তিল্‌ইয়ার নিষ্কলঙ্ক কপালে
নীরব এবং দৃঢ়
উষার আগের ঘণ্টাধ্বনির মতো
গম্ভীর, নীলচক্ষু
এলে দূর, কতদূর থেকে,
এলে তোমাদের গ্রামগঞ্জ থেকে, তোমাদের
        হারানো পিতৃভূমি থেকে
                তোমাদের স্বপ্ন থেকে
জ্বলন্ত সৌজন্যে আর বন্দুকে ঢেকে
স্পেনের সেই নগর রক্ষায়, যেখানে অবরুদ্ধ স্বাধীনতা
        পশুদের কামড়ে পতন ও মৃত্যুর সম্মুখীন।

ভাইরা, আজ থেকে
তোমাদের পবিত্র মন, তোমাদের বীর্য, তোমাদের মহৎ কাহিনী
জানুক শিশুরা, যুবকেরা, নারীরা, বৃদ্ধরা
পৌঁছুক আশাহীন সব মানুষের কাছে, ছড়িয়ে যাক
        গন্ধভরা বাতাসে দূষিত খনির নিচে,
উঠুক ক্রীতদাসের অমানবিক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে,
সমস্ত নক্ষত্র, কাস্তিল্‌ইয়ার আর পৃথিবীর সমস্ত ফুল
লিখুক তোমাদের নাম, তোমাদের কঠিন সংগ্রামের

আর লাল ওকের মতো বলিষ্ঠ এবং পার্থিব বিজয়ের কথা।
কারণ তোমাদের আত্মোৎসর্গে তোমরা পুনরুজ্জীবিত করেছ
লুপ্ত বিশ্বাস, অমনস্ক হৃদয়, পৃথিবীর প্রতি নির্ভরতা,
তোমার প্রাচুর্য, তোমাদের মহত্ত্ব, তোমার মৃতদের মধ্য দিয়ে
যেন এক কর্কশ রক্তাক্ত পাহাড়ি উপত্যকার ভেতর দিয়ে
ইস্পাতের আশা আর কপোত উড়িয়ে বয়ে চলেছে এক মহানদী।

অনুবাদ : শিশিরকুমার দাশ

পাবলো নেরুদা

মৃত সৈনিকদের জননীদের জন্য গান

ওরা মরেনি! ওরা আছে
বারুদের মধ্যে,
দাঁড়িয়ে আছে জলন্ত সলতের মতো।

ওদের নিষ্কলঙ্ক ছায়াগুলি জমছে
তামাটে রং-এর মাঠে
সাঁজোয়া-ঢাকা বাতাসের পর্দার মতো
ক্রোধের রং-এর বেড়ার মতো,
ঠিক যেন আকাশের অদৃশ্য হৃদয়ের মতো।

জননীরা! ওরা দাঁড়িয়ে আছে গমের মধ্যে,
মধ্যাহ্নের গভীরতার মতো দীর্ঘ
বিশাল প্রান্তরের ওপর প্রবল দাপটে!
ওরা কালো-আওয়াজের গীর্জার ঘণ্টা
ইস্পাতে খুন-করা শরীরগুলোর ওপর দিয়ে বয়ে-যাওয়া
শব্দে বাজছে আমাদের বিজয়ধ্বনি।

ঝরে-পড়া
ধুলোর মতো, ভেঙে-পড়া
বুক তোমাদের,
বোনেরা, বিশ্বাস রাখো এই মৃতদের প্রতি!
রক্ত-রাঙানো পাথরের নিচে
এরা শুধু শিকড় মাত্র নয়,
এদের গুঁড়িয়ে যাওয়া হতভাগ্য হাড়গুলি
অবশ্যই মাটি চষে, কিন্তু শুধু তাই নয়,
এদের মুখগুলি এখনও কামড়ে ধরে শুকনো বারুদ

লোহার সমুদ্রের মতো আছড়ে পড়ে আক্রমণে, এখনও
তাদের উদ্যত মুষ্টি অস্বীকার করে মৃত্যু।
কারণ এই এত শরীর থেকে জন্ম নেয়
এক অদৃশ্য জীবন। জননীরা, পতাকারাশি, পুত্ররা!
সেই একটি শরীর জীবনের মতো জীবন্ত :
একটি মুখ ভাঙা-চোখে জেগে থাকে অন্ধকারে
ঐহিক আশার তরবারি নিয়ে।

ফেলে দাও
তোমাদের শোকের পোশাক, পুঞ্জীভূত করো
তোমাদের সব অশ্রু, যতক্ষণ না তাদের বদলে দিতে পারো ধাতুতে :
কারণ ওখানে আমরা আঘাত করি সারা দিন আর সারা রাত
ওখানে আমরা লাথি মারি সারা দিন আর সারা রাত
ওখানে আমরা থুথু ছেটাই সারা দিন আর সারা রাত
যতক্ষণ না ঘৃণার দরজাগুলো ভেঙে পড়ে!
আমি তোমাদের দুর্ভাগ্য ভুলিনি, আমি চিনি
তোমাদের সন্তানদের,
তাদের মৃত্যুর জন্য যদি গর্ববোধ করে থাকি
তাদের জীবনের জন্যও আমি গর্বিত।
ওদের হাসি
ঝিলিক দেয় বোবা কারখানায়
মাটির তলার রাস্তায় ওদের পদধ্বনি

শব্দ তোলে আমার পাশে প্রত্যেক দিন, আর
লেভান্তের মালভূমি থেকে আসা কমলার পাশে, দক্ষিণ থেকে
আসা জালের পাশে, ছাপাখানার কালির পাশে, বাড়িঘরের
সিমেন্টের পাশে
আমি দেখেছি ওদের বহ্নি আর তেজেভরা হৃদয় জলছে দাউ দাউ।

ঠিক তোমাদের বুকের মতোই, জননীরা,
আমারও বুকের মধ্যে এত শোক আর এত মৃত্যু

যেন রক্তে ভেজা বনভূমির মতো
এই রক্তই হত্যা করেছিল ওদের সব হাসি
সেই বনের মধ্যে ঢুকতে থাকে প্রহরার উগ্র কুয়াশা
সঙ্গে তার দিনের করুণ নিঃসঙ্গতা।

অনুবাদ : শিশিরকুমার দাশ

পাবলো নেরুদা

ফেদেরিকো গার্থিয়া লোরকার উদ্দেশে ওড

যদি পারতাম কোনো একা বাড়িতে ভয়ে কেঁদে উঠতে,
যদি পারতাম আমার চোখ দুটো উপড়ে ফেলে গিলে ফেলতে,
আমি তাহ'লে তা-ই করতাম, আর্ত কমলাগাছের মতো
তোমার কণ্ঠস্বরের জন্যে
আর তোমার কবিতার জন্যে যা উঠে আসে তা শুধু চীৎকারেরই উচ্চারণ।

কারণ তোমারই জন্যে ওরা হাসপাতালগুলো রাঙিয়ে ফেলছে নীল
আর সব স্কুল সমুদ্রতীরের সব শহরতলি গাজিয়ে উঠছে,
আর আহত দেবদূতেরা পালক দিয়ে নিজেদের সাজিয়ে নিচ্ছে
নতুন-ছাঁটা পালকে,
আর মৎস্যদম্পতি গায়ে চড়াচ্ছে আঁশ,
আর আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে কড়ি ও শ্যাওলা :
তোমারই জন্যে তাদের কালো ঝিল্লিসমেত দর্জির দোকানগুলো
নিজেদের ভর্তি ক'রে ফেলছে চামচেয় আর রক্তে,
আর গিলে খাচ্ছে ছেঁড়া ফিতে, আর
মেরে ফেলছে নিজেদের চুমোয়-চুমোয়
আর সেজে উঠছে শাদায়।

যখন তুমি উড়ে যাও জামের মতো গোলাপি সেজে,
যখন তুমি হেসে ওঠো ভাতের ঘূর্ণিতুফানের অট্টহাসি,
যখন গান গেয়ে উঠতে গিয়ে তুমি ঝাঁকাও ধমনী আর দাঁত,
গলা আর আঙুল,
আমি ম'রে যেতে পারি সেই মাধুর্যের জন্যে যা আসলে তুমিই,
আমি ম'রে যেতে পারি লাল ঝিলগুলোর পাশে,
যেখানে, মধ্যহেমন্তে, তুমি বেঁচে আছো
প'ড়ে-যাওয়া ঘোড়া আর রক্তাপ্লুত কোনো দেবতার সঙ্গে,

আমি ম'রে যেতে পারি গোরস্থানগুলোর পাশে
যা ভস্মনদীর মতো ব'য়ে যায়
জল আর কবরগুলি নিয়ে,
রাত্তিরে, ডুবে-যাওয়া ঘণ্টার শব্দের মধ্যে ;
অসুস্থ-সব সৈন্যে ভরা শিবিরগুলোর মতো
নদী, যা হঠাৎ উপচে ব'য়ে যায়
মরণের দিকে, মর্মর সংখ্যা
আর পচা-সব মুকুট আর অন্ত্যেষ্টির তেল নিয়ে :
আমি ম'রে যেতে রাজি রাত্তিরে তোমায়
দেখতে, তুমি তাকিয়ে দেখছো বন্যাহত ক্রুশগুলো ঢ'লে যাচ্ছে,
দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁদছো তুমি,
কারণ তুমি যে মরণনদীর পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদো,
পরিত্যক্ত, আহত
তুমি কান্নাকেই কাঁদো, তোমার চোখ ভরা থাকে
অশ্রুতে, অশ্রুতে, অশ্রুতে ।

যদি পারতাম, রাত্তিরে, অন্তহীন একা,
কালো এক কুপি দিয়ে
স্তূপ ক'রে রাখতে ছায়া আর ধোঁয়া আর বিস্মরণ
সব রেলগাড়ি আর জাহাজের ওপর,
ভস্ম চিবিয়ে,
আমি তবে তা-ই করতাম, কারণ তুমি যে-গাছের ওপরে গজিয়ে ওঠো,
সোনালি জলের যে-নীড়ের জন্যে যা তুমি জড়ো ক'রে আনো,
আর যে-আঙুরলতা জাপটে জড়িয়ে থাকে তোমার সব অস্থি
তোমাকে রাতের গোপন রহস্য ব'লে দিয়ে—তার জন্যে ।

ভেজা পেঁয়াজের গন্ধেভরা সব নগরী
অপেক্ষা ক'রে আছে তোমার জন্যে, কখন তুমি পথ দিয়ে যাবে
ঘন গাঢ় গলায় গান গাইতে-গাইতে,
আর সবুজ সোয়ালোরা বাসা বেঁধেছে তোমার চুলে,
আর তোমাকে তাড়া ক'রে যায় তিমি, স্তব্ধ সব জাহাজ,

আর তাছাড়া সব শামুক আর সপ্তাহগুলো,
কুণ্ডলিপাকানো মাস্তুল আর চেরি
সংশয়বিহীন ছড়িয়ে যায় যখন তোমার বিবর্ণ শির
ভীষণ জাহির হ'য়ে পড়ে তার পনেরোটা চোখ সমেত
আর মুখ অর্ধেক ডোবা থাকে রক্তে।

যদি পারতাম সব পুরভবনকে ঝুলকালিতে ভরিয়ে দিতে,
আর, ফুঁপিয়ে কেঁদে, হিঁচড়ে ছিঁড়ে নামাতে পারতাম যদি ঘড়িগুলো
তবে আমি তা-ই করতাম, যাতে দেখতে পাওয়া যেতো
কেমন ক'রে তোমার বাসায়
বসন্ত আসে তার ছিন্ন ওষ্ঠাধর নিয়ে,
আসে অনেক অতিথি মরণোন্মুখ পোশাক প'রে,
আসে বিষাদময় জমকালো মহিমার সব অঞ্চল,
আসে মরা সব লাঙল আর আফিমফুল,
আসে কবরখনক আর ঘোড়সোয়াররা
আর গ্রহ-উপগ্রহ আর সব মানচিত্র রক্তময়,
আসে ভস্মমাখা যত ডুবুরি,
আসে মুখোশধারীরা ছদ্মবেশীরা কুমারীদের হিঁচড়ে টেনে
দীর্ঘ ছুরিকায় এফোঁড়-ওফোঁড় বেঁধানো,
আসে যত শিরা ও শিকড়, হাসপাতাল,
যত কূপ, যত পিঁপড়ে
আসে রাত তার শয্যা নিয়ে যার ওপরে
এক নিঃসঙ্গ হুসার ম'রে যায় মাকড়শাগুলোর মাঝে
আসে ঘৃণার এক গোলাপ আর যত ছুঁচ,
আসে এক হলদেটে জাহাজ,
আসে একটি শিশুকে নিয়ে হাওয়াগর্জানো দিন,
আসি আমি, সঙ্গে ওলিভেরিও, নোরা,
ভিসেন্তে আলেইহান্দ্রে, দেলিয়া,
মারুকা, মালভা মারিনা, মারিয়া লুইসা আর লারকো,
লা রুবিয়া, রাফায়েল উগার্তে,
খোতাপোস, রাফায়েল আলবের্তি,

কার্লোস, বেবে, মানোলো আল্‌তোলাগুইর্‌রে,
মোলিনারি,
রোসালেস, কোন্‌চা মেন্‌দেস,
আর আরো অন্যরা যাদের নাম আমার এখন মনেও নেই।

তোমার অভিষেক করতে দাও আমায়, স্বাস্থ্য
আর প্রজাপতির তারুণ্য চিরকালস্বাধীন
বিদ্যুৎঝিলিকের কালো ডোরার মতো বিশুদ্ধ তারুণ্য,
আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি ক'রে
এখন যখন কেউ আর নেই পাথরের মধ্যে
আমাদের সব কথা হ'য়ে উঠুক সহজসরল, যেমন আমি আর তুমি :
শিশিরের জন্যেই যদি না-হয় তবে কোন্ কাজে লাগে কবিতা ?
কোন্ কাজে লাগে কবিতা যদি-না তা হয় সেই রাত্রির জন্যে
যখন এক তেতো উত্তেজক আমাদের তাতিয়ে দেয়
সেই দিনটির জন্যে, সেই প্রদোষের জন্যে, সেই ভাঙা মোড়টার জন্যে
যেখানে মানুষের আহত হৃদয় নিজেকে প্রস্তুত করে মৃত্যুর জন্যে ?

সর্বোপরি, রাত্রিবেলায়,
রাত্রিবেলায় যখন এত তারা,
সব একটা নদীর ভেতর,
গরিব লোকে ভরা বাড়িঘরের
জানলার পাশে একটা ফিতের মতো।

কেউ-একজন ম'রে গিয়েছে, হয়তো
তারা চাকরি খুইয়েছে আপিশে,
হাসপাতালে, এলিভেটরে,
খনির মধ্যে,
মানুষ কষ্ট পায়, প্রচণ্ড আহত,
আর আছে অভিপ্রায় আর সবখানেই কান্না
যখন তারারা ছুটে যায় এক অন্তহীন নদীর প্রবাহে,
জানলায়-জানলায় কত-যে কান্না

কান্নায় সব চৌকাঠ অব্দি খ'য়ে গিয়েছে
ঘরগুলো সব কান্নায় ভেজা
যে-কান্না আসে ঢেউয়ের মতো ফরাশ ভাসিয়ে।

ফেদেরিকো,
ছাখো তাকিয়ে জগৎকে, রাস্তাঘাটগুলো।
আঙুরলতা,
স্টেশনে-স্টেশনে বিদায়
যখন ধোঁয়া তুলে দেয় তার সিদ্ধান্তময় সব চাকা
সেইখানটার উদ্দেশে যেখানে শুধু আছে
পাথর, রেললাইন, বিচ্ছেদ।

সবখানে প্রশ্ন শুধোয়
এত লোক
রক্তাক্ত অন্ধ মানুষ আর রাগি মানুষ আর হতাশ মানুষ,
আর হাভাতে ও হাঘরেরা, কাঁটাওয়ালা গাছ,
পিঠে হিংসে নিয়ে যত বান্দোলেরো।

জীবন এইরকমই, ফেদেরিকো—
এইই সব
যা বিষণ্ন কোনো পুরুষমানুষ তোমায় দিতে পারে।
এর মধ্যেই তুমি নিজে-নিজেই শিখে ফেলেছো কতকিছু,
আর বাকি সবকিছুও তুমি শিখে ফেলবে আস্তে-আস্তে
যত দিন যাবে।

অনুবাদ : অধীর মজুমদার

জন কর্নফোর্ড

তিয়েৰ্জে পূর্ণিমা

(উয়েস্কা দখলের পূর্বাহ্নে)

অতীত তো হিমবাহ। আঁকড়ে ছিল পর্বত-প্রাকার,
এবং কালের গতি ইঞ্চি-মাপা। বেবাক আঁধার!
অবশেষে এইখানে এ-গণ্ডির প্রত্যন্তে কখন
দ্বান্দ্বিক নিয়ম-নিষ্ঠ পরিবর্তনের ক্ষণ
রবিকরে বিচ্ছুরিত, বিচূর্ণিত, ভাঙে শতধার।

বর্তমান, সে জলপ্রপাত। উৎস থেকেই শক্তি তার
থরোথরো যাত্রাপথে ভাঙছে দু-পাড়।
আমাদের হাতে-হাতে সোচ্চার প্রত্যয় মোটে নমনীয় নয়।
তবু যে প্রত্যয়ে-গড়া ইতিহাসও গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়।
শেষ যাত্রার দোলে আমরাই এসো ওকে দোলাই এবার।

যেন পরস্পরছেদী রেখা গোটাকয়—অনিশ্চিত অভিমুখ যার,
সেই তো ভবিষ্যকাল। দেশোত্তীর্ণ, শুদ্ধ নিরাকার।
গন্তব্য যে-পথ আমাদের—সর্পিল যেন তারই মতো :
আর ঋজু, যেমন বুলেট ছোটে আমাদের সামনে সতত।
আমরাই ভবিষ্যৎ। শেষ যুদ্ধের মুখোমুখি এসে বাঁধি সার।

২

দিনের আলোর মতো ফুটফুটে ছায়া ফেলে ধীরে
উয়েস্কার মাঠে ভরাচাঁদ। এখুনি অচিরে
এই শান্ত প্রান্তরের নিষ্পাপ সারল্য, হায়,
মুছে যাবে স্বেদাক্ত রক্তাক্ত বেদনায়,
আমাদের এ-মোক্ষম ঘাঁটিটির হারজিত ঘিরে।

আরাগঁর উষর পাহাড় জুড়ে ওই যায় শোনা
আমাদের পরীক্ষার প্রারম্ভ-ঘোষণা।
সত্য হোক, মিথ্যা হোক, জীয়ন্ত কি মৃত,
সপ্তম কংগ্রেসে হ'ল যে-বাণী রণিত
সেই কণ্ঠস্বর আজ অভিদ-র পথে-পথে অসির ঝনঝনা।

তিন বছর আগে ডিমিট্রফ একচোট লড়লেন একাই।
আমাদের মাথা উঁচু ক'রে গেল জয়ী সে-লড়াই।
কিন্তু আজ লাইপজিগের ড্রাগন-দশন
অঙ্কুরেই দৃঢ় আর মৃত্যুর বিরুদ্ধে সুশোভন।
সেদিন একজন ছিল। লড়ছে আজ গোটা ফৌজটাই।

যুদ্ধারম্ভের পাঠ আমরা নিয়েছি যত্ন ক'রে,
কমরেড মরিস থোরে দেখালেন পথ আলো ধ'রে।
তবু আজ আরাগঁর পাহাড়গুলিতে
আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি নিঃসঙ্গ আঁধারে আচম্বিতে!
পৃথিবীর নবতম গ্রহ যেন রথে চেপে সারারাত ঘোরে!

৩

কমিউনিজম ছিল আমার প্রাত্যহিক ঘুম-ভাঙানি ভোর—
আলোয়-আলোয় ভ'রে ওঠার আগেই ঘরদোর,
পূর্ণতায় ধরা দেবার আগেই দৃশ্যপট।
সহায়কারী তবু ছিল কাছে-পিঠেই, হঠাৎ খেলে হোঁচট।
আর আজ? আমার পার্টির সাথে আমি রই নিঃসঙ্গে জাগর।

অতএব, আমার স্নায়ুর সাথে আমার এ একান্ত লড়াই,
বেদনার ভয়, যার বেদনার উপশম নাই,
যে-প্রেম আমার সারা সত্তার শিকড় ধ'রে টানে,
আমার যে-নিঃসঙ্গতা অন্ত্রগুলো ছিঁড়ে-খুঁড়ে আনে—
সমস্ত সামিল হোক আমাদের সংগ্রাম-লালিত এই সংযুক্ত ময়দানে।

হে বীর ! অজেয় হও পরাক্রান্ত স্থর্যের প্রতীক,
আমার এ-বন্দুকের মতো হও ইস্পাত নির্ভীক,
আমার এ-পদক্ষেপ যেখানেই ফসকে নিষ্ফল,
ট্রেনের ঝটিকাবেগ সেখানেই আপন প্রবল
ছন্দের দোলায় তবে অক্টোবর-দিন এনে দিক !

৪

এখন জার্মানি জুড়ে ঘনায় তো একই রাত, এই একটাই !
আকাশ সেখানে বুঝি অনুভূতিহীন। আর অবিরত,
নিরপেক্ষ নক্ষত্রের রূপের রোশনাই
নরম আলোয় ভরে বন্দীশিবির আর আজাদীর কুটিল ক্ষতের দাগ যত।
আমরা পারছি না দিতে এ-ব্যথার উপশমে কোনো অবদান,
তবু, এ-যন্ত্রণা ব্যর্থ যে হয়নি তার রেখে যাই তপ্ত প্রমাণ।

একই চাঁদের নিচে ইংল্যাণ্ড—সে-ও আজ নিশ্চুপ, নিশ্চল !
এতটুকু সাড়া কই ওয়েলসের খনিখাদে, ক্লাইডের বাঁকে ?
স্বাধীনতা—ওই ছাখো নিক্তিতে—আমার দেশেও টলোমল,
ভালোমানুষির মুখোশ এ-কথা আড়ালে লুকিয়ে রাখে।
বড়ো দেরি হওয়ার আগেই বুঝে নাও সোজা কথা :
বিনা রণে কোনোদিন অচলা ছিল না স্বাধীনতা।

'স্বাধীনতা' এই শব্দ উচ্চারণে খই ফোটে মুখে।
বাস্তব কঠিন কিন্তু। এখানে স্পেনের বুকে
জিতছি না এ-লড়াই
যতক্ষণ দুনিয়ার সমস্ত শ্রমিক ভাই
উয়েস্কার মাঠে এসে সঙ্গে না-দাঁড়ায়,
যতক্ষণ শহীদের রক্তের তর্পণে, সাম্য আর স্বাধীনতা চেয়ে,
উর্ধ্বে জয়দৃপ্ত লাল ঝাণ্ডা না-ওড়ায় ॥

অনুবাদ : অমলেন্দু গুহ

জন কর্নফোর্ড

মার্গট হেইনমানকে

রিক্ত-হৃদয় পৃথিবীর হৃদয়,
হৃদয় আমার !
তোমার ভাবনাই পাশতলায় ব্যথা হয়,
দৃষ্টিতে শীতার্তি ছায়ার ।

বিকেলে শনশনিয়ে বাতাস বয়,
মনে পড়িয়ে দেয়—শরৎ কাছেই ।
তোমাকে হারাই, সতত ভয় ।
শঙ্কা আমার এই শঙ্কাকেই ।

উয়েস্কা অভিমুখে এই যে শেষ মাইল,
শেষ যে ফাঁকটুকু আমাদের গরবে,
দরদী ধ্যানে তার-ই, প্রেয়সি, ভরো দিল
যেন গো পাশে পাই তোমাকে অনুভবে ।

আর ভাগ্যের দোষে নেহাতই যদি
আধ-খোঁড়া কবরেই শুতে হয় আমাকে,
পারো তো ভালোই শুধু মনে রেখো নিরবধি,
ভুলো না আমার ভালোবাসাকে ॥

অনুবাদ : অমলেন্দু গুহ

মিগুয়েল এরনানদেথ

ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের বীরদের প্রতি

যদি এমন কোনো আত্মা থাকে যা পার হয়ে যায় সীমান্ত
যার বিস্তীর্ণ ভ্রূযুগলে ছায়া রাখে দুনিয়ার ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের টান
যার প্রসারিত দৃষ্টিতে ধরা দেয় দিগন্ত, জাহাজ আর গিরিমালা
আর বালি ও তুষার—তবে তোমরা, তোমরাই সেই মানুষ।

তোমাদের জন্মভূমি তোমাদের ডাক দিয়েছিল পতাকা তুলে
তোমাদের প্রাণবায়ু স্মৃতিস্তম্ভ দিয়ে পৃথিবীকে আশীর্বাদ ক'রে যাবে
ময়ালের রক্তৃষ্ণা চিরকালের মতো ঘুচিয়ে দিতে এসেছিলে তোমরা
তাই সমস্ত সূর্য আর সহস্র সমুদ্রের অমিত বিক্রম নিয়ে
ঝাঁপ দিলে তার কঙ্কাল চক্রের ওপর।

স্পেন তোমাদের বুকে ক'রে রাখে, কারণ তোমরাই দেখালে
মহাদেশকে পরিমাপ করতে পারে বৃক্ষের মতো শৌর্য
তোমাদের অস্থি-র ভিতর দিয়ে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠবে অলিভ গাছ
আর মাটির ভিতর ক্রমাগত সঞ্চারিত করতে থাকবে দৃঢ়তম মূলগুলি
কারণ তোমরাই হলে মানুষের প্রতি অনুগত সার্বিক মানুষ।

অনুবাদ : রাম বসু

পল রোবসন

আমেরিকার জন্য গান

এই আমাদের দেশের প্রবল, এই আমাদের দেশের নবীন
এই আমাদের দেশের মহান গান এখনো হয়নি গাওয়া…
প্রতারণার ভিতর থেকে, কোলাহলের ভিতর থেকে
হত্যা এবং অত্যাচারের ভিতর থেকে
ফাঁপা কথার ভিতর থেকে, দেশোদ্গারের ভিতর থেকে
অনিশ্চয় আর দোলাচলের ভিতর থেকে…
জাগবে আবার গান।
জাগবে আবার সেই আমাদের অভিযানের গান,
প্রিয় সুরের মতো সহজ, উপত্যকার মতো গভীর
পাহাড়চূড়ার মতো উঁচু এবং তাদের মতোই প্রবল
বানায় যারা সেই আমাদের গান।—

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

স্পেনের গৃহযুদ্ধকালে রচিত। পল রোবসন কণ্ঠে এই গান গেয়েছিলেন।

আন্তোনিও মাচাদো

অচির অতীত

মফস্বলের ক্লাবের সারাক্ষণের অলংকার, এই লোকটা—
যে দেখেছিলো কারাঞ্চা উদ্যত দাঁড়িয়েছিলো একদিন
ষাঁড়টা শেষ ক'রে দেবে ব'লে—
এই লোকটার গায়ের চামড়া শুকিয়ে কুঁচকে গিয়েছে, চুলে পাক ধরেছে,
চোখের দৃষ্টি মোহহীনতায় ঘোলাটে, আর ধূসর
তার গোঁফের তলায়, ঠোঁট বেঁকিয়ে আছে
বিবমিষায়, আর ভঙ্গিটাই
কেমন করুণ অথচ বিষণ্ণ তা মোটেই নয়,
বরং তার চাইতে অনেকবেশিকিছু, এবং কম : তার
মাথার মধ্যেকার ফাঁকায় জগতেরই শূন্যতা। সে এখনও পরে
তিনপাল্লা মখমলে-পাকানো কিশমিশ-লাল
স্পোর্টস জ্যাকেট, যোধপুরীর তলা ঢেকে দিয়ে
বুটজুতো, আর একটা ক্যারামেল
করদোবা টুপি, ডগা ওলটানো, দারুণ সাজানো।
তিনবার সে উত্তরাধিকার পেয়েছিলো, তারপর হারিয়েছে সবটাই
তিনবার তাশের বাজিতে আর দু-বার
বিপত্নীক হয়েছিলো। দৈবের তিনটি বেআইনি দফাই শুধু
তাকে উজ্জ্বল ক'রে তুলবে সবুজে পশমিনার
টেবিলে শুইয়ে,
আরেকবার ধমনীতে রক্ত ছুটতে শুরু করে
যখন তার মনে পড়ে জুয়াড়ির ভাগ্য
কিংবা কোনো তোরেয়োর অপরাহ্ণ,
জীবনের এক আখ্যান থেকে পান ক'রে নেয়
পথের এক বেপরোয়া দস্যুর কথা
কিংবা ছুরির রক্তরাঙা দক্ষতা।
হাই তুলে সে ব্যঙ্গ করে সরকারের.

প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি আর তারপর
ভবিষ্যৎবাণী করে লিবারেলরা আবার ক্ষমতায় আসবে
যেমন ক'রে সারস ফিরে আসে ঘণ্টাঘরের মিনারে।
এখনও সম্পন্ন চাষীর কিছু আছে তার, সে তাকায়
আকাশে, ভয় পায় সে আর মাঝে-মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে
তার জলপাইয়ের কথা ভেবে, আর, সান্ত্বনাহীন,
আবহাওয়ায় লক্ষণ খোঁজে যখন বর্ষা আসতে দেরি করে,
বাকি সমস্তটাই একঘেয়ে, বিরক্তিকর। মৌন,
বেশি ওষুধ খাবার বাতিক,
বর্তমানের আর্কাদিয়ায় বন্দী,
আর তার কপালে
শুধু ধোঁয়ারই আনাগোনা ফুটিয়ে তোলে
চিন্তার ভঙ্গিমা। এই লোকটা
গতকালকের নয় আগামীকালেরও নয়,
বরং কোনো না-কালের। এস্পানি ঝাড়, তবু সে
এমন ফল নয় যেটা পাকে কিংবা প'চে যায়
বরং সে এক ছায়া-ফল
এমন-এক স্পেনের যে-স্পেনের জন্ম হয়নি
যে-স্পেন হারিয়ে গিয়েছে, অথচ, যে-স্পেন মরা,
সে সারাক্ষণ আমাদের হানা দেয় তার পাকা চুলে ভরা মাথা নিয়ে।

অনুবাদ : অধীর মজুমদার

ডিলান টমাস

যে-হাত কাগজে স্বাক্ষর করেছিল

একটি নগরীকে ভূপাতিত করল কাগজে স্বাক্ষর করেছিল যেই হাত ;
পাঁচটি রাজকীয় আঙুল নিংড়ে নিল নিশ্বাসের বায়ু,
একটি দেশকে অর্ধেক করল, মৃতের পৃথিবীকে বাড়াল দ্বিঘাত,
এই পাঁচ রাজা শেষ করল আরেকজন রাজার পরমায়ু।

ঝুঁকে-পড়া কাঁধে গিয়ে শেষ হয় শক্তিশালী হাত,
খড়ি জমে শক্ত হয়ে আছে আঙুলের গাঁট ;
একটি হাঁসের পালক হত্যায় ঘটাল যতিপাত
যেই হত্যা চুকিয়েছে সংলাপের পাট।

একটি জ্বরের জন্ম দিল চুক্তিতে যেই হাত করল দস্তখত ,
এবং দুর্ভিক্ষ বাড়ল, ছেয়ে এল পঙ্গপাল,
এ-কথা মানতেই হবে এই হাত সত্যিই মহৎ
একটি আঁচড়ের জোরে যে নির্ণয় করে মানুষের ত্রিকাল।

পাঁচ রাজা মড়া গোণে কিন্তু করে না প্রশমিত
চুমটি-পড়া ক্ষত, কিংবা কপালে রাখে না স্নেহে হাত,
এক হাত করুণাকে শাসন করে আর অন্য হাতে হয় অমরা শাসিত,
হাতেদের সেই অশ্রুপাত।

অনুবাদ : সুনন্দন চক্রবর্তী

হিউ উইস্টান অডেন

স্পেন

গতকাল সমস্ত অতীত। বাণিজ্যসড়ক বেয়ে
চীন পৌঁছে গেল ব্যাপ্তির ধারণা ; ছড়িয়ে পড়ল
যন্ত্রগণক ও প্রস্তরপীঠিকা। রৌদ্রপ্রধান দেশে ছায়াবিদ্যার প্রসার—
এই সবই গতকাল।

গতকাল তাসের খেলা থেকে নিশ্চিতির নির্ধারণ।
জলে ভবিষ্যৎ দেখা। গতকাল সৃষ্টি হ'ল চাকা ও দোলকঘড়ি।
পোষ মানল ঘোড়ারা। গতকাল দুনিয়াটা ছিল
শশব্যস্ত নাবিকদের।

গতকাল নাকচ হয়ে গেল পরী ও দৈত্যকুল,
উপত্যকাকে নিশানা করল থমকানো ঈগলের মতো দুর্গ ;
অরণ্যে গজাল উপাসনাগৃহ ;
বাটালিতে কুঁদে তোলা হ'ল দেবদূত ও করাল কীর্তিমুখ—সেও গতকাল

গতকাল পাথুরে থামের ফাঁকে ধর্মদ্রোহীদের বিচারসভা,
পানশালায় শ্রুতিশাস্ত্র নিয়ে মারামারি,
আর ঝরনার জলে অলে অলৌকিক রোগমুক্তি,
গতকাল বসেছিল ডাকিনীচক্র। আজ লড়াই।

গতকাল উদ্বোধন হ'ল বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ঘূর্ণযন্ত্রের,
ঔপনিবেশিক সাহারায় খুলল রেলসড়ক,
গতকাল হয়ে গেল মানবজাতির অভ্যুত্থান নিয়ে
ধ্রুপদী বক্তৃতা। আজ লড়াই।

গতকাল বিশ্বাস ছিল গ্রীসের পরম মূল্যবত্তায়।
যবনিকা নেমে এসেছিল নায়কের মৃত্যুদৃশ্যের ওপর ;

গতকাল সূর্যাস্তের কাছে স্তব,
ও উন্মাদদের উপাসনা। আজ কিন্তু লড়াই।

সরলবৃক্ষের মধ্যে সচকিত, অথবা এলানো জলপ্রপাতের
নিবিড় গান যেখানে, অথবা টান-টান দাঁড়িয়ে
শৈলসানুতে, হেলানো মিনারের পাশে, কবি যেমন
মর্মরধ্বনিতে বলে : 'ও আমার স্বপ্ন!
নাবিকের বর দাও দাও আমাকে!'

আর সন্ধানী তার যন্ত্রপাতির মধ্য দিয়ে উঁকি মারে
অমানবিক প্রদেশে, ছাখে বীর্যবান্ জীবাণু বা
বিশাল বৃহস্পতিকে শেষ হয়ে যেতে :
'কিন্তু আমার বন্ধুদের জীবন? প্রশ্ন করছি, আমি প্রশ্ন করছি!'

আর হাভাতেরা তাদের জ্বালানিহীন ডেরায়
সান্ধ্য দৈনিকের পাতাগুলো খসাতে-খসাতে বলে :
'আমাদের দিন আমাদের লোকসান,
দেখাও সেই ইতিহাসের মুখ যে চালক, যে সংগঠক,
দেখাও সেই সময়কে যা সঞ্জীবনী নদী!'

আর রাষ্ট্রের মধ্যে সংহত হয় একক স্বরগুলি
যারা জীবনকে ডাক পাড়ে প্রতিটি গর্ভকে আকৃতি দিতে,
আর যার-যার গোপন নৈশ বিভীষিকাকে উসকে তুলতে—
'স্পঞ্জদের এই নগররাষ্ট্রের স্থপতি কি তুমিই নও,
হাঙর ও বাঘেদের বিশাল সব ফৌজি সাম্রাজ্য কি
গড়ে তোলোনি তুমিই, কায়েম করোনি রবিনপাখির ড'াটালো শিবির?
হস্তক্ষেপ করো। পারাবতের মতো অবতীর্ণ হও,
কী রেগে-আগুন বাবা, কী প্রশান্ত যন্ত্রবিদের মতো। তবু অবতীর্ণ হও।'

আর জীবন—যদি-বা জবাব দেয়, তার সাড়া আসে কলজে
আর চোখ আর ফুশফুশ থেকে,

'না, আমি চালক নই,
আজ নই, তোমার কাছে নই। তোমার কাছে আমি হলাম
আজ্ঞে-হুজুর এক গেলাসের ইয়ার, যাকে ভাঁওতায় ভোলানো সোজা।
আমি তা-ই তুমি যা করো। আমি তোমার ভালো হবার শপথ,
তোমার মজার কিস্‌সা। তোমার আনুষ্ঠানিক কণ্ঠস্বর, তোমার বিবাহ।

কী প্রস্তাব তোমার? ন্যায়ের রাজ্য স্থাপন করা? তাই হবে।
মঞ্জুর। না তুমি চাও আত্মহত্যার চুক্তি, এক রোমান্টিক মৃত্যু?
তাই হোক, মেনে নিলাম; কেননা আমিই তোমার
নির্বাচিত পথ। তোমার সিদ্ধান্ত। হ্যাঁ, আমিই স্পেন!'
অনেকে শুনল সেই স্বর দূর উপদ্বীপ, ঘুমন্ত সমভূমি
ও পথভোলা জেলেদের চর, আর শহরের
ঘুণধরা হৃদয় থেকে। শুনল আর ভেসে পড়ল
যেন অভিযাত্রী গাংচিল বা উড়ন্ত ফুলের বীজ!

চলল পাখির মতো ঝুলতে-ঝুলতে অসৈরণের দেশ
আর রাত্রি আর আল্‌প্‌স্‌-ফোঁড় সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে
টাল খেতে-খেতে-চলা দ্রুতগামী ট্রেনের কানা আঁকড়ে।
ভেসে এল সমুদ্রপথে। গিরিপথ মেরে দিল পায়ে পায়ে।
সবাই অঞ্জলিতে তুলে দিল তাদের জীবন।

আমাদের চিন্তাগুলি দেহ পায় সেই বিশুষ্ক চত্বরে
তপ্ত আফ্রিকার থেকে যে-টুকরোটি ছিঁড়ে নিয়ে যেমন-কে-তেমন
ঝালাই করে দেওয়া হয়েছিল ফন্দিপটু ইউরোপের সঙ্গে,
নদীচিহ্নিত সেই মালভূমির ওপর জোরো ভয়ের আকৃতি প্রকট ও জ্যান্ত।

ওষুধের বিজ্ঞাপন ও শীতকালীন সমুদ্রভ্রমণের পুস্তিকাকে
সাড়া দিতাম আমরা যে ভয়ের তাড়নায়,
তারাই এখন আগ্রাসী সৈন্যবাহিনী।
আর আমাদের মুখ—প্রতিষ্ঠান-মার্কা মুখ, বিপণিশৃঙ্খল ও আমাদের পতন,
লালসায় উদ্দীপ্ত হয় কোতলসেনা ও বোমার চেহারায়।

মাদ্রিদ হ'ল হৃদয়। কোমলতার মুহূর্তগুলি আমাদের
প্রস্ফুটিত হয় সেবাসন আর বালির বস্তায়।
আমাদের মৈত্রীর প্রহর এক জনগণতান্ত্রিক বাহিনীতে।

আগামীকাল সম্ভব ভবিষ্যৎ। ক্ষয়ের মাত্রা ও মোড়ক-বানানো
শ্রমিকদের গতিবিধি নিয়ে চর্চা, তেজস্ক্রিয়তার অষ্টকের সব-কটির আবিষ্কার,-
আগামীকাল চেতনা আরো প্রসারিত হতে পারে
সুসমঞ্জস খাদ্য ও বিধিমতো শ্বাসপ্রশ্বাসের সাহায্যে।
আগামীকাল নতুন করে আবিষ্কার হবে দুরাশ্রয়ী প্রেম,
ছবি তোলা হবে দাঁড়কাকদের, স্বাধীনতার মহিমান্বিত ছায়ায়
চলবে আমোদ। আগামীকাল দিন আসবে
বহুরূপী ও সংগীতকারের,
গম্বুজের নিচে শোনা যাবে বৃন্দগানের অপরূপ গর্জন।
টেরিয়ার-পালনের টুকিটাকি বিনিময় করা হবে,
আর সভাপতি নির্বাচন হঠাৎ-উত্তোলিত
হাতের অরণ্যে।

বোমার মতো ফেটে-পড়া তরুণ কবিদের জন্য আগামীকাল
হ্রদের ধারে হাঁটার অবকাশ আর সপ্তাহের পর সপ্তাহ নিটোল
সংবেদন। আগামীকাল গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে
মফস্বল-জোড়া সাইকেল প্রতিযোগিতা। আজ লড়াই।

আজ সুচিন্তিতভাবে বেড়ে যায় মৃত্যুর মাত্রা,
অমোঘ খুনের পর মেনে নিতে হয় সজ্ঞান অপরাধ বোধ আজ আয়ুক্ষয়
আলুনি তাৎক্ষণিক ইস্তাহার ও দীর্ঘসূত্রী আলোচনাসভার পিছনে।

আজকের জন্য আনুতাবড়ি সান্ত্বনা : ভাগাভাগির সিগারেট,
গোলাবাড়িতে মোমের আলোয় দু-হাত তাস, ক্যাঁকো-করা বাজনা,
পুরুষালি চুটকি.; আজ এলোমেলো অসমাপ্ত আলিঙ্গন
জখম করার ঠিক আগেই।

নক্ষত্রগুলি মৃত। জন্তুরা ফিরেও তাকাবে না।
আমাদের দিন হাতে করে আমরা নিঃসঙ্গ, সময়
সংক্ষেপ, আর ইতিহাস পরাজিতদের জন্য দীর্ঘশ্বাস
ফেলতে পারে, কিন্তু তার সাধ্য নয় সাহায্য বা ক্ষমা।

অনুবাদ : মালিনী ভট্টাচার্য

স্টিভন স্পেনডার

একটি শহরের পতন

দেয়ালের সব ক-টা পোস্টার
রাস্তার সব ক-টা পুস্তিকা
টুকরো-টুকরো হ'য়ে আছে, ধ্বংস, কিংবা ধুয়ে গেছে বৃষ্টিতে,
শব্দগুলো তাদের মুছে গেছে চোখের জলে,
শরীর থেকে তাদের গুটিয়ে আসছে ছাল
জিতে-যাওয়া ঘূর্ণিঝড়ে।

পায়েরা যেখানে মাটি কাঁপাতো আর তাম্রকণ্ঠরা তুলত হুংকার,
সেই হলঘরের সমস্ত নায়কদের নাম
ফক্স ও লোরকা, ইতিহাসের সনদ হিশেবে ঘোষিত ছিল
যা-সব দেয়ালে-দেয়ালে,
ক্ষিপ্তভাবে কেটে-দেওয়া এখন
বা তারা ধুলোয় সমর্পণ করে তাদের ধুলো,
হিরণ্ময় বন্দনা থেকে বাদ।

কোটের কলারের ভাঁজ-করা অংশ আর হাত থেকে ছিঁড়ে-নেওয়া
সমস্ত পরিচয়চিহ্ন আর অভিবাদন
তাদের পরিধেয় ছিল যে-মানুষী বস্তা ছুঁড়ে
ফেলে দেওয়া হয়েছে সে-সবের সঙ্গে
বা মনের গভীরতম স্তরে
একটি হাসি দিয়ে ধোয়ানো হয়েছে তাদের
জয়ের মুহূর্তে উদ্বুদ্ধ করে যা বিজেতাদের।

সব পাঠ শেখা শেষ, সব পাঠ বিস্মৃত;
তরুণেরা, যারা শিখেছিলো পড়তে, আজ তারা
অন্ধ ক'রে দেয় নিজেদের চোখ এক সেকেলে আস্তরণে।
গাধার ডাক অনুসরণ ক'রে

চাষী ফিরে আসে ফের হোঁচট-খাওয়া সুরে ;
এরা মনে রাখে কেবল ভুলবে ব'লেই।

কিন্তু কোথাও কোনো শব্দ চাপ দেয়
করোটির ফটকে, আর এক
অপ্রতিসরণীয় চোখের কোনো কোণে
কোনো-এক বৃদ্ধের স্মৃতি পৌঁছোয় এক শিশুর কাছে
—তেজোদীপ্ত দিনগুলোর একটি কণা।
শিশুটি তা আঁকড়ে আগলে রাখে মর্মন্তুদ খেলনার মতো।

অনুবাদ : শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টিভন স্পেনডার

বিমান হানার সময়ে কিছু চিন্তা

অবশ্যই, গোটা চেষ্টাটাই হ'লো
ঐ যাকে বলে পরিসংখ্যানতত্ত্ব, তার সাধারণ সীমার
বাইরে নিজেকে রাখার। জনা-একশো মারা গেছে
শহরতলিতে। যেতে দাও, আমি তো টি'কে আছি।
যতক্ষণ এই মস্ত 'আমি'টা অধিষ্ঠিত আছে
এই চারধারে বাঁধা বিছানায়—শবাধারের মতো অনেকটা যা,
হোটেল বেডরুমে, ফুলে ফুলময় ওয়ালপেপার যার
শবমাল্যে গাঁথা মাথার ওপরে, ততক্ষণ আমি উপেক্ষা করতে পারি
কাগজের পাতা ওলটালেই যে, আমার আঙুলের তলায়
ঐ সব ভারি আর কালো নামগুলোর চাপ,
আরামঘরের বাইরে বেতারের যে-বিলাপ।
তবু, কথার কথা আর কী, একটা বোমা যদি নেমেই আসে
আর সটান এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে দিয়ে যায় এই বিছানাটা, আমি
শায়িত তখন তার ওপর—
ভাবনাটা অশ্লীল। তবু, অনেকেই আছে
যাদের কাছে আমার মৃত্যুটা হবে নিছকই একটা নাম,
একটা কলমে একটা সংখ্যা মাত্র। মোদ্দা কথাটা হ'লো
প্রতিদিন 'আমি' যেন আলাদা থাকে, বিচ্ছিন্ন,
ফুলের নিচে ঠেকনা-দেওয়া, কাউকে যেন ভুগতে না-হয়
প্রতিবেশীর জন্য। সকলের জন্যই তাহ'লে মুলতুবি থাকবে
আতঙ্কটা, যদ্দিন-না গেড়ে বসছে তা তার ওপরে
টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে সেই অবাঙ্‌গোচর শোকের দিকে
পুরোদস্তুর রহস্য যা কিংবা বেবাক শূন্য।

অনুবাদ: শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

লরি লী

একটি ইস্পানি শহরে গান

রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম আমি বেহালা সঙ্গে নিয়ে
উদ্যত এক বন্দুক যেন কাঁধে,
দীপ্ত তারেরা ব্যগ্র আমার ট্রিগার হাতটি দিয়ে
তাগ করে এক কবেকার নাচ সান্ধ্য দেয়ালে-দেয়ালে।

লবণ-সফেদ বাড়িগুলো সব ক্রমিক সমাধিস্তম্ভ
থমথমে সব জানলার বুকে রক্তের ক্রুশচিহ্ন ;
সুরেরা আমার বোমার মতন ফেটে পড়ে চারদিকে
উচিত যে-কালে মৃতদের ভয়ে গোঙানো নিরবচ্ছিন্ন।

কেঁপে ওঠে তাই আমার আঙুল, নিহত পাখির
শরীরের মতো ছুটে ফেরে রোদ্দুরে,
যখন আমার গানগুলো হায় নিষ্ফল খোঁজে রাস্তায় মরে ঘুরে

সহসা পায়ের দুদ্দাড় ধ্বনি
শিশুরা আমাকে ঘেরে,
শোনে তারা সব, দুষিত দু-কানে, ফোঁড়া আর ব্রণ নিয়ে
ছাখে তারা সব, ফাঁকা ঠোঁট আর শান্ত দু-চোখ দিয়ে।

অনুবাদ : শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

লরি লী

যুদ্ধের একটি মুহূর্ত

রাতটা একটা লাল তেনার মতো
দু-চোখের ওপর টেনে দেওয়া,
দেহের মাংস মর্মন্তুদ বেঁধা
মরিয়া প্রহরায়
রক্ত তোৎলাচ্ছে ভয়ে।

তোমরা বন্দনা করো কেঁচোদের নিরাপত্তার
আর ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা চামড়াগুলোর,
তোষামোদ করো লুকোনো রসের
আর হারিয়ে-যাওয়া না-ফুটে-বেরুনো মাছেদের ডিমগুলোর!

হাতগুলো গ'লে যায় দুর্বলতায়
বন্দুকের গরম লোহায়,
দেহ গ'লে যায় করুণায়,
শক্ত হ'য়ে আছে মুখ, যত
গন্ধ আর অন্তিম যন্ত্রণার চুম্বনের জন্য।

তোমরা ঈর্ষা করো নারীদের শান্তির,
যারা বিয়োয় আর প্রেম বিলোয় খেলনার মতো
পুরুষদের হাতে!

মুখ প'চে যায় পানসে খিস্তি-খেউড়ে,
পেটের নাড়িভুড়ি লড়াই করে একদঙ্গল ইঁদুরের মতো,
পায়েরা ভাবে তারা যদি ঘাস হ'তো
ছড়ানো, শান্ত।

হে ক্রাইস্ট, হে মাতা!

কিন্তু অন্ধকার তোমার জন্য একটা ছুরির মতো খোলে
তোমাকে তাক্ ক'রে রেখেছে তোমার স্পন্দমান মস্তিষ্ক

এবং বিচ্ছিন্ন,

আর তোমার নিশ্বাস,

তোমার নিশ্বাস হ'লো বিস্ফোরণ, বুলেট,
আর অন্তিম আকাশ।

অনুবাদ : শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

নিকোলাস গিয়েন

এস্পানিয়া,—চার মর্মযাতনা আর একটি আশার কবিতা

মর্মযাতনা এক : পাথর আর ধাতুর চাউনিগুলি

এখন যখন কোনো কোর্তেস বা পিসারো নেই,
নেই কোনো আস্‌টেক অথবা ইন্‌কা সমবেতভাবে যারা খাবে চাবুক ;
এখন তাহ'লে ভালো হবে তাদের বেপরোয়া জোয়ানদের পক্ষে
—বছরগুলোর বেড়া ডিঙিয়ে যারা এসেছে—
এখানে তাদের ঢাল নিয়ে আসা,
এখানে তাদের শক্ত কড়া পরা হাতগুলো সমেত ; এখানে
আমাদের পদতলে এইসব সুদূর ফৌজের লোক, তাদের নালগুলো
তাদের ঘোড়ার চামড়ায় গভীর প্রোথিত ; এখানে শেষকালে আমাদের সঙ্গে,
এইসব সুদূর সৈনিকেরা, এইসব তেতে-ওঠা লোকগুলো
এইসব ঘনিষ্ঠ ভাইদের সঙ্গে যারা বাঁধন-পরা, রক্তাপ্লুত।

তাদের সবচেয়ে-সাহসী ভল্লের
ঝোড়ো লোহা সমেত ;
সেইসব তলোয়ার সমেত যাদের ডগা ডুবে যায় ঊষার ভেতর ;
তাদের সেই পুরোনো উদ্ভাবননিপুণ দুর্দান্ত বন্দুক সমেত ;
গরিমাময় বিজয়ী পায়ের
ছুঁচোলো গজাল আর ঘোড়ার নাল সমেত ;
তাদের মাথার খুলি সমেত, শিরস্ত্রাণের মুখঢাকা সমেত,
তাদের পুরু হাঁটুরক্ষক সমেত,
সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী ধাতু সমেত,
যারা পাক খায় আর হোঁচট খায় এই জ্বলন্ত জলে
যেখানে শ্রমিক, সৈনিক ও শিল্পী
হাওয়া থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে বুলেট তাদের কামানে ব্যবহার করবার জন্যে।

এখন যখন নেই কোনো কোর্তেস অথবা কোনো পিসারো
একসঙ্গে মিলে চাবুক খাবার মতো নেই যখন কোনো ইন্‌কা অথবা আস্‌টেক,
এখন বরং ভালোই হবে তাদের সব বেপরোয়া জোয়ানদের
—বছরগুলোর বেড়া টপকে—এখানে তাদের ঢাল সমেত নিয়ে আসতে
এই এস্পানিয়ার দিকে তাকাতে, ছিন্নভিন্ন ভগ্ন জীর্ণ ;
তাকাতে এই পাখিগুলোর দিকে যারা এই ধ্বংসের ওপর চক্কর দিচ্ছে ;
আর ফ্যাসিবাদের দীর্ঘ বিকৃত জুতো,
আর মোড়ে-মোড়ে যত আলোবিহীন লণ্ঠন,
আর মুষ্টি উদ্যত শূন্যে, হৃদয় জেগে-ওঠা,
আর কামান কেঁপে উঠছে অ্যাসফল্টে,
এমন স্থির আর মৃত ঘোড়াগুলোর ওপর ;
তাকাতে এইসব সিন্ধুরচিত অশ্রুর দিকে,
লবণাক্ত, ঝ'রে পড়ছে ছিটকে ছড়িয়ে এইসমস্ত দুয়ারে ;
আর বিভীষিকার আর্তচীৎকার আড়চোখে-তাকানো
সব গলা থেকে বেরিয়ে আসছে
ক্রুদ্ধ, বিস্ফারিত চোখে, পাথর আর ধাতুর চাউনি নিয়ে।

মর্মযাতনা দুই : তোমার শিরাগুলো, আমাদের সব গাছের শেকড়

আমার গাছের শেকড়, দুমড়ে-যাওয়া, মুচড়ে-যাওয়া,
তোমার গাছের শেকড়, কোম্পানিয়েরো, আমাদের সকল গাছের,
রক্ত খাচ্ছে, রক্তে ভিজে আছে,
আমার গাছের শেকড়, তোমার গাছের, কোম্পানিয়েরো।
আর আমি তা টের পেয়ে যাই
—আমার গাছের শেকড়, তোমার গাছের,
আমাদের সকলের গাছের—
আমি তা টের পাই
আমার দেশের গভীরতম মাটিকে আঁকড়ে ধ'রে,
আঁকড়ে ধ'রে সেখানে, আঁকড়ে ধ'রে থেকে
সেই তলা আর তুলে ধ'রে আমাকে আর আঁকড়ে ধ'রে থেকে

আমাকে সজোরে আর আমার সঙ্গে কথা বলে,
বিলাপ করে আমার কাছে, এই শেকড়— তোমার গাছের, আমার গাছের।

আমার দেশে ঠুকে লাগানো
পেরেকে-পেরেকে এখন যত লোহার,
বারুদের আর পাথরের,
আর জলন্ত জিহ্বায় কুসুমিত হ'য়ে উঠছে
আর খাওয়াচ্ছে ডালপালাকে যেখানে শ্রান্ত পাখিরা
রচনা ক'রে দেয় দুঃখভারাতুর সব ভূষণে ; আর
ডালপালা ও ফুলের শিরায়-শিরায়
বন্যার মতো ছুটে চলে ; আমাদের যত শিরা, তোমার যত শিরা, শেকড়
যত আমাদের অনেক গাছের।

মর্মযাতনা তিন : আর আমার হাড়গুলো কুচকাওয়াজ ক'রে যাচ্ছে
তোমাদের সৈন্যদের মধ্যে

মরণ প'রে নেয় এক দরবেশের ছদ্মবেশ ;
আমার এই গ্রীষ্মগুলের জামা অত্যাচার ক'রে
লেপটে আছে আমার গায়ে ঘামের সঙ্গে ; আমি আমার নাচকে হত্যা করি
আর ধাওয়া ক'রে যাই মৃত্যুকে তোমার জীবনের জন্যে।
তোমার দুই রক্ত, যা আমার মধ্যে মিশে যায়,
আমি ফিরিয়ে দিই তোমাকে, যেহেতু
তোমার কাছ থেকেই তারা এসেছিলো
আর তোমার জলজলে ক্ষতগুলোর মধ্যে দিয়েই তারা আমায় জেরা করে।

এই হ'লো জনগণ, মুকুটের বিরুদ্ধে, রাজদণ্ডের বিরুদ্ধে
আংরাখা শোকপোশাকের বিরুদ্ধে, আলখাল্লার বিরুদ্ধে আর
আমি তোমার সঙ্গে
আর আমার গলায় আমার হৃৎপিণ্ড চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে তোমাকে :
আমি যে তোমার বন্ধু, বন্ধু আমার ; আ মি ই যে তোমার বন্ধু

ছিঁড়ে ফ্যালো আমার চামড়া তোমার ব্যাণ্ডেজ বানাতে
ধূসর পাহাড়গুলোয় আর লাল রাস্তাগুলো ধ'রে, ভাঙা পথগুলো ধ'রে,
আর তোমার সৈন্যদের মধ্যে আমারই হাড়গুলি কুচকাওয়াজ ক'রে চলেছে।

মর্মযাতনা চার : ফেদেরিকো

ফেদেরিকো গার্থিয়া লোরকা, জিপসিদের কবি,
গ্রানাদার কবি আর আন্দালুসিয়ার কবি,
আধুনিক এস্পানিয়ার মহত্তম কবি,
মারা গেলেন / নিহত হলেন এক অগস্ট রাত্রে,
ফ্যাসিবাদী রাইফেলের সামনে। তাঁর অপরাধ :
তিনি ছিলেন জনগণের কবি…

এখন আমি কড়া নাড়ছি এক পুরোনো এস্পানিওল গাথার দুয়ারে ;
'ফেদেরিকো কি এখানে থাকে ?' এক তোতা বলে :
'চ'লে গেছে। ফেদেরিকো চ'লে গেছে।'

এক স্ফটিকের দরজায় আমি ঘা মারি :
'ফেদেরিকো কি এখান দিয়ে গেছে ?' একটা হাত
এগিয়ে আসে উত্তরে : 'নদীতে,
ওরা তাকে ফেলে এসেছে নদীতে।'

আর এখন আমি নামহীন এক জিপসির দরজায় ধাক্কাই :
'ফেদেরিকো কি এখানে আছে ? বলো আমায়, ও কি এখানে আছে ?'
কোনো উত্তর নেই কোথাও ; কেউ কোনো কথা বলে না…
আমি কষ্টে ককিয়ে উঠি : 'ওহ্ ! ফেদেরিকো ! ফেদেরিকো !'

কিন্তু অন্ধকার বাড়িটা প'ড়ে আছে ফাঁকা ;
দেয়ালগুলোয় ভেজা শ্যাওলা ;
কাঠের বালতি যা দিয়ে জল তোলা হ'তো প'ড়ে আছে
শ্যাওলার মধ্যে পঙ্গু ,
আর বাগান ছুটে বেড়াচ্ছে ছোট্ট সবুজ-সব গিরগিটির সঙ্গে :

আগাছা-গজানো মাটির ওপর
ছোটো শামুকেরা বুকে হাঁটে আস্তে ;
আর জুলাইয়ের লাল হাওয়া
খোঁচা দেয় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ।

ওহ্ ! ফেদেরিকো ! ফেদেরিকো !
কোথায় যায় মরতে কোনো জিপসি ?
কোথায় তার চোখগুলো বদ্‌লে যায় রুপোলি তুষারে ?
কোথায় সেটা সম্ভব যে সে আর ফিরে আসে না ?
ওহ্, ফেদেরিকো ! ফেদেরিকো !

একটি গান

সে চ'লে গিয়েছে রবিবারে, তখন বেলা যে নয়টা ;
সে চ'লে গিয়েছে রবিবারে, তখন যে ছিলো রাত্রি ;
সে চ'লে গিয়েছে রবিবারে, আসবে না ফিরে কখনও !
তার হাতে ছিলো গাঢ়-নীল সে যে অপরাজিতা,
তার চোখে ছিলো জলন্ত কোনো জ্বর ;
অপরাজিতা সে বদ্‌লে গিয়েছে রক্তে,
রক্ত—মরণে !

আরেকটি গান

ওহ্, কোথায় আছে তবে ফেদেরিকো—চিরহরিৎ আর মোম
আর জলপাইগাছ আর গোলাপ আর চাঁদের শাদা তুষারে ।
এই তো ছিলো ফেদেরিকো, গোলাপ আর বসন্ত ।

যেন কোনো পথের পাশে ছুঁড়ে-ফেলা গান,
যেন ধারালো নিঃসঙ্গতা, সে ঘুমিয়েছিলো
তার দোভাষী লেবুগাছের দ্ব্যর্থক ছায়ার মধ্যে ।

রাত ছিলো তুঙ্গে, জ্ব'লে উঠছিলো তারায়-তারায়,
পৃথিবীর সব রাজপথের ওপর
তাদের প্রাঞ্জল কাঁটাগুলোকে হিঁচড়ে টেনে।

আর গম্ভীর বিশাল হাতে
আস্তে-আস্তে যেতে-থাকা জিপসিরা
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো 'ফেদেরিকো!' গম্ভীর রাতের কাছে।

তাদের রক্ত-ঝ'রে-পড়া ধমনী থেকে এমন স্বর!
এমন উৎসাহ তাদের অসাড় আড়-ধরা শরীরে!
এমন কোমলতা তাদের পায়ে-পায়ে, তাদের পদক্ষেপে!

আর আমার সবুজ-হ'য়ে-যাওয়া সদ্য-আঁধার-হওয়া ইন্দ্রিয়গুলো
তাদের কঠিন অমেরুদণ্ডী পথে ছিলো জুতোবিহীন!

ওঠো ফেদেরিকো, আলোয় ধোয়া;
ফেদেরিকো, তার গ্রানাদা, তার বসন্ত;
আর চাঁদের সঙ্গে আর গোলাপের আর চিরহরিৎ আর মোম
তাদের পেছন-পেছন যায় সুগন্ধি পাহাড়ের ওপর দিয়ে।

আশার গান : এক উল্লসিত গান যা দূরে ভাসছে

আমরা সবাই জানি রাস্তা;
আমাদের রাইফেলগুলো তেল দেয়া;
আমাদের বাহুগুলো তৈরি :
আর এখন আমরা কুচকাওয়াজ ক'রে যাচ্ছি!
কী এসে-যায় যদি আমরা ম'রে যাই শেষে,
কারণ মরণ নিজে তো এমন-কোনো বিরাট জয় নয়,
তার চেয়ে ঢের খারাপ বেঁচে-থাকা আর এই বাঁচনের ভেতর
এক গোলাপের হাঁটু-নোয়ানো।

আছে তো ঐ তারা যারা বিছানায় ম'রে যায়
দীর্ঘ বারোমাস ভুগে-ভুগে,
আর আছে তারা যারা ম'রে যায় গান গাইতে-গাইতে
বুকে দশটা তীক্ষ্ণ বুলেট।

কিন্তু আমরা সবাই জানি রাস্তা :
আর আমাদের রাইফেলগুলো খুব ভালো তেল দেয়া ;
আমাদের বাহুগুলো পরামর্শ পেয়ে গেছে
আর এখন আমরা যাচ্ছি কুচকাওয়াজ ক'রে !

আর বিভিন্ন শক্তি আমাদের জন্যে এটাই উদ্ভাবন করেছে যে
আমরা এইভাবেই ছেড়ে যাবো,
হেঁটে-হেঁটে, ভীষণ হেঁটে, হেঁটে উষার আলোয়
সেজে ; আমাদের ঝলমলে নতুন জুতোর শব্দ বেজে উঠবে আর ব'লে উঠবে
কম্পাতুর অরণ্যকে : 'আমরা ভবিষ্যৎ, এ-পথ দিয়ে যাচ্ছি !'

আমরা জানি রাস্তা…
এখন আমাদের সব রাইফেল প্রস্তুত·

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নিকোলাস গ্যিয়েন

মাদ্রিদ

গন্ধকে-জলা মেঘের তলায়
ম'রে প'ড়ে আছে এক নাগরিক যোদ্ধা,
সে-এক যুবক অথচ এখনই বৃদ্ধ,
চিৎ প'ড়ে আছে মৃত
তার বুক থেকে গজিয়ে উঠেছে গাছ।
—বুঝতে কি পারো তুমি ?
—বুঝি।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

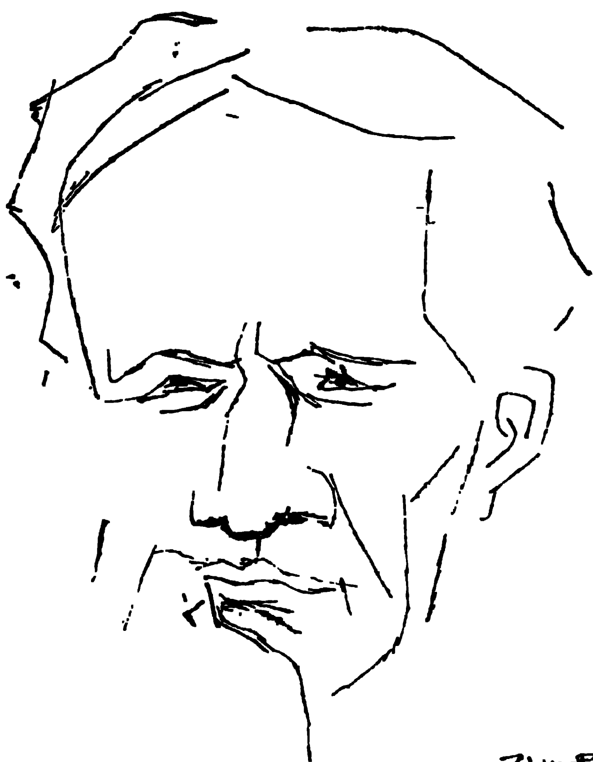
পাবলো পিকাসোর ছবি

ফ্রাঙ্কোর দুঃস্বপ্ন ও মিথ্যা



এস্পানিয়া, আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও এ-পানপাত্র





সেসার ভায়েহো

সেসার ভায়েহো

এস্পানিয়া, আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও এ-পানপাত্র

১ রিপাবলিকের স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশে স্তব

এস্পানিয়ার স্বেচ্ছাসেবক, নিরেট অস্থিময়
নাগরিকযোদ্ধা, যখন তোমার হৃদয় কুচকাওয়াজ ক'রে এগোয় মৃত্যুর দিকে,
যখন সে কুচকাওয়াজ ক'রে এগোয় তার নিখিল-
যন্ত্রণা দিয়ে মারতে, আমি সত্যি বুঝে উঠতে পারি না
কী করা উচিত, কোথায় রাখা উচিত আমাকে ; আমি ছুটে বেড়াই,
লিখি, শাবাশ দিই,
চেঁচিয়ে উঠি, তাকিয়ে দেখি, ভাঙচুর করি, ওরা আলো নিভিয়ে দেয়, আমি
আমার বুককে বলি এর শেষ-হওয়া উচিত, ভালো হোক, আসুক,
ছন্নবিহীন ক'রে দিতে চাই নিজেকে ;
আমি উন্মোচন ক'রে দিই আমার নৈর্ব্যক্তিক কপাল এতটাই
যে ছুঁয়ে ফেলি আমার রক্তের ধমনী, ধ'রে ফেলি আমি নিজেকে,
আমার আকার থমকে গিয়েছে স্থপতিদের ঐসব পতনে
যা দিয়ে আমাকে সম্মান করে জন্তু আসলে সম্মান করে নিজেকেই ;
আমার স্বজ্ঞা তুমুল ব'য়ে যায় তাদের দড়িতে,
হুল্লোড় ধূমায়িত হ'য়ে ওঠে আমার কবরের সামনে,
আর, আরো-একবার, কী-করবো না-জেনে, শূন্য, কিছু-ছাড়াই,
ছেড়ে দাও আমাকে,
আমার অলিখিত ফাঁকা পাথর থেকে, ছেড়ে দাও,
একা,
চতুষ্কেশর, কাছে গা-ঘেঁষা, দূরে অনেক,
আমি গেয়ে যাই তোমার দীর্ঘ উল্লাসের ক্ষণ আমার হাতগুলোয় যা আঁটে না,
আর তোমার দু-মুখো-ধার গতির বিরুদ্ধে
আমি ছিটকে মারি জমকালো-সাজা আমার ক্ষুদ্রতা, আমার একরত্তিদশা।

আহ্নিক, স্বচ্ছ, তন্ময়, উর্বর একদিন,
হায়, অনুনয়ের ঐসব দাগি-কালো ষাণ্মাসিকতার দ্বিবাৎসরিক
যার মধ্য দিয়ে বারুদ গিয়েছিলো তার কনুই কামড়ে !
হায়, কঠিন দুঃখ আর কঠিনতর চকমকি !
হায়, লোকে যেমন চিবোয় সশব্দে লাগামের কড়িয়াল !
একদিন জনতা ঘষেছিলো তাদের বন্দী দেশলাই, আর প্রার্থনা
করেছিলো সরোষ
আর রাজসিকভাবে ভরাট, বর্তুল,
আর বাছাই হাতে দ্রুত শেষ করেছিলো তাদের জন্মদিন ;
স্বৈরাচারীরা তারই মধ্যে পেছন ধ'রে এসেছিলো কুলুপের
আর কুলুপের ভেতর তাদের যত মরা রোগজীবাণু…

সংগ্রাম ? না-না ! প্রবল সংরাগ ! আর সংরাগের আগে
এসেছিলো শোক সঙ্গে আশার ডোরা,
এসেছিলো সাধারণ লোকের শোক সঙ্গে মানুষের আশা !
শান্তির জন্যে, সাধারণলোকের, মরণ আর সংগ্রাম !
জলপাইবনের মধ্যে যুদ্ধমৃত্যু আর সংরাগ, এই তো সরল, ভুল ব্যাখ্যা
কোরো না তার !
এভাবেই তোমার শ্বাসেপ্রশ্বাসে বাতাস বদ্‌লে ফ্যালে জলহাওয়ার কাঁটা
আর তোমার বুকের মধ্যে চাবি পালটায় কবর,
শহিদত্বের প্রথম শক্তিতে জেগে ওঠে তোমার সম্মুখ, তোমার কপাল।

জগৎ বিস্ময়ে বলে : 'শুধু এস্পানিওলেরা !' আর তা-ই তো সত্যি !
বুঝে ছাখো,
জমাখরচ মিলিয়ে, সরাসরি, এক্ষুনি,
মরা এক উভচরের ল্যাজে ঘুমিয়ে-পড়া কাল্‌দেরোন,
কিংবা সেরভানতেস, বলছেন : 'আমার রাজত্ব এই মর্তেই, তবে
অন্য জগতেরও' : দ্বৈতভূমিকায় ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে আছে লক্ষ্যবিন্দু আর কিনার !
ধ্যান করো গোইয়াকে, আয়নার সামনে প্রার্থনারত, নতজানু,
ছাখো কোলকে, প্রাসাদরক্ষী, যাঁর কার্তেসীয় হামলায়
অলস পদক্ষেপও ভ'রে যায় মেঘমালার ঘামে,

কিংবা তাকাও কেভেদোর দিকে, ডাইনামাইট-ছুঁড়িয়েদের
তাৎক্ষণিক পিতামহ,
কিংবা কাহাল, তাঁকে খ্যাখো, তাঁর ছোট্ট অসীমটার গলাধঃকৃত,
অথবা এমনকী
খ্যাখো তেরেসাকে, নারী এক, ম'রে যায় যে কিছুতেই ম'রে যাচ্ছে না ব'লে,
কিংবা খ্যাখো লিনা ওদেনাকে, তেরেসার সঙ্গে যার একাধিক
বিষয়ে বিরোধ···
(সকল অমায়িক কাজ বা ঝকঝকে স্বর আসে তো জনতার মধ্য থেকেই
কিংবা তাদের দিকেই যায়, সরাসরি অথবা
পুনরাবৃত্ত তড়িৎপ্রবাহের মতো সূক্ষ্ম-সব ছিলকার মধ্য দিয়ে, ব্যর্থ যত
তিক্ত সংকেতবাক্যের গোলাপি ধোঁয়ায় ভেসে-ভেসে ।)
এভাবেই তোমার শিশু, যোদ্ধানাগরিক, এভাবেই তোমার রক্তহীন জীর্ণ শিশু,
নিশ্চল ঢেলার ঘায়ে ন'ড়ে উঠে,
বিসর্জনে আর দূরত্বে বড়ো হ'য়ে ওঠে,
ওপরের দিকে পড়ে ক্ষয় হ'য়ে, জেগে ওঠে অদাহ্য শিখায়,
উঠে আসে দুর্বলের দিকে,
ষাঁড়গুলোর কাছে এস্পানিয়াকে ভাগ ক'রে বিলিয়ে,
আর ষাঁড়গুলোকে পায়রার কাছে···

বিশ্বই অসুখ ব'লে ম'রে যায় যে প্রলেতারীয়, কোন্ তুলকালাম স্বরসংগতিতে
শেষ হবে তোমার গরিমা, তোমার পরম দৈন্য, তোমার অনুপ্রাণিত ঘূর্ণিজল,
তোমার পদ্ধতিনিপুণ হিংসাহিংস্রতা, তোমার তাত্ত্বিক আর
ব্যবহারিক বিশৃঙ্খলা,
তোমার দান্তেমার্কা উৎকাঙ্ক্ষা, যা কিনা এত-গভীর-এস্পানি,
এমনকী কৃতঘ্নতাতেও যা প্রেমেপড়ায় শত্রুর সঙ্গে !

শেকলেমোড়া মুক্তিদাতা
যার শ্রম ছাড়া আজও যত জমির প্রসার হ'তো হাতলবিহীন,
নখ যাযাবর ঘুরে বেড়াতো কবন্ধ,
দিন, প্রাচীন, মন্থর, আরক্তিম,
আর আমাদের যত করোটি, শিরস্ত্রাণ, অসমাহিত !

মানুষের জন্যেই, তোমার শ্যামল পত্রপুট নিয়ে,
তোমার কড়ে আঙুলটার সামাজিক বাঁকচুরের স্বর নিয়ে,
যা থেকে যায় তোমার সেই বলদ নিয়ে, তোমার পদার্থ আর প্রয়োগ নিয়ে,
আর পাচনের গায়ে বাঁধা তোমার কথা নিয়ে,
আর তোমার ভাড়া-করা আকাশ নিয়ে
আর তোমার ক্লান্তির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া কাদার তাল নিয়ে
আর নখের তলায় কাদা নিয়ে,
হেঁটে চলেছে ভূপাতিত চাষী !
শশব্যস্ত পিঁপড়ের দঙ্গলেভরা অসীমে
কৃষির
নির্মাতারা, সামরিক, বেসামরিক : এটাই তো লেখা ছিলো যে
মৃত্যুর মধ্যে তোমার চোখ আধোনিমীলিত ক'রে
তুমিই সৃষ্টি করবে আলো ;
যে, তোমার মুখগুলোর নিষ্ঠুর পতনেই,
সাত রেকাবি ভর্তি আসবে প্রাচুর্য, জগতের
সবকিছুই হ'য়ে উঠবে আচমকা সোনা
আর সোনা,
তোমার চুঁইয়ে-পড়া গোপন রক্তের কাতর-সব ভিখারি,
আর ঠিক তখনই সোনা রচিত হবে সোনায় !

সব মানুষ ভালোবাসবে পরস্পরকে
আর তোমার করুণ রুমালের কোণা চেপে ধ'রে তারা খাবে
আর তোমার দুর্ভাগা গলাগুলোর নাম ক'রে
তারা পান করবে।
এই পথ ধ'রে চলতে-চলতেই তারা পাবে বিশ্রাম,
তারা ফুঁপিয়ে কাঁদবে তোমার কক্ষপথ ভেবেই, তারা ভাগ্যবান
হ'য়ে উঠবে আর তোমার
জঘন্য, বেড়ে-ওঠা, সহজাত প্রত্যাবর্তনের শব্দে, এক অজাত কুসুম,
আর তারা কাজগুলো সব মানিয়ে নেবে আগামীকাল,
তাদের স্বপ্নে-দেখা গান-ক'রে-ওঠা সব মূর্তি !

সেই একই জুতোগুলো তার পায়ে মাপে-মাপে লেগে যাবে
যখন মানুষ কোনো-পথচিহ্নহীন উঠে যাবে নিজের শরীরে
যখন মানুষ নেমে আসবে নিজের আত্মারই রূপাবয়বে !
পরস্পরকে জড়িয়ে কথা ব'লে উঠবে বোবা, পঙ্গু হেঁটে যাবে পায়ে-পায়ে !
অন্ধ, ফিরে এসে, দেখতে পাবে
আর, দপদপ করতে-করতে, শুনতে পাবে বধির !
অজ্ঞান হ'য়ে উঠবে মনীষী আর মনীষী অজ্ঞান !
তুমি যা দিতে পারোনি দেয়া হবে সেই চুম্বন !
শুধু ম'রে যাবে মরণ ! পিঁপড়ে নিয়ে আসবে
রুটির গুঁড়ো তার পাশব কোমলতায় বন্দী হাতির কাছে ; গর্ভে-নষ্ট শিশু
আবার জন্ম নেবে নিখুঁতসুঠাম, ব্যাপক
আর সব মানুষ কাজ করবে,
সব মানুষ জন্ম দেবে,
সব মানুষ বুঝতে পারবে !

শ্রমিক, পরিত্রাতা, আমাদের উদ্ধারকারী,
ক্ষমা কোরো, ভাই, আমাদের সব দেনা, সব গণ্ডিলঙ্ঘন !
যেমন গড়িয়ে যেতে-যেতে কোনো ঢাক বলে, তার প্রবচনে :
'কী যে ক্ষণজীবী এক কখনো-না, তোমার পিঠ !
'কী-যে বহুরূপী এক চিরকাল, তোমার পার্শ্বমুখ !'

ইতালীয় স্বেচ্ছাসেবক, যার যুদ্ধের জন্তুগুলোর মধ্যে
খোঁড়াচ্ছে এক হাবশি সিংহ !
সোভিয়েৎ স্বেচ্ছাসেবক, তুমি কুচকাওয়াজ ক'রে চলেছো তোমার বিশ্বজনীন
বুকের পুরোভাগে !
স্বেচ্ছাসেবক—দক্ষিণ থেকে, উত্তর থেকে, প্রাচী থেকে
আর তুমি প্রতীচীবাসী, উদার অন্ত্যেষ্টিগান থামিয়ে দিচ্ছো তোমরা !
চিরচেনা যোদ্ধা, যার নাম
সার ধ'রে চ'লে যায় আলিঙ্গনের শব্দে !
মাটি যাকে লালিত করেছে সেই যোদ্ধা, মাটি-পৃথিবী তোমাকে
সশস্ত্র ক'রে তুলছে ধুলো দিয়ে,

সদর্থক চুম্বকের নাল পরিয়ে দিচ্ছে তোমায়,
শক্তিতে তোমার ব্যক্তিগত-সব বিশ্বাস,
স্পষ্ট সুচিহ্নিত তোমার চারিত্র, অন্তরঙ্গ তোমার শাসনদণ্ড,
অব্যবহিত তোমার চামড়া,
তোমার ভাষা কুসুমিত পাক দিয়ে জড়িয়ে আছে তোমার কাঁধ
আর তোমার আত্মা প'রে আছে নুড়ির মুকুট।
স্বেচ্ছাসেবক, তোমার নিজের হিমশীতল
নাতিশীতোষ্ণ তপ্ত মণ্ডলের মেখলাপরা,
সবখানের বীর,
বিজেতাদের এক স্তম্ভের শিকার;
এস্পানিয়ায়, মাদ্রিদে, ওরা তোমাদের ডাকছে
হত্যা করতে, তোমরা যারা জীবনের স্বেচ্ছাসেবক!

যেহেতু ওরা হত্যা করে এস্পানিয়ায়, অন্যরা হত্যা করে
শিশুকে, তার খেলনা—যে এখন থেমে গিয়েছে,
ঝলমলে জননী রোসেন্দোকে,
বুড়ো আদানকে যে চেঁচিয়ে কথা বলতো তার ঘোড়ার সঙ্গে,
আর সেই কুকুরকে যে ঘুমোতো সিঁড়িতে।
ওরা খুন করেছে পুথি, গুলি ছুঁড়েছে তার উপক্রিয়াপদ তাগ ক'রে,
গুলি ছুঁড়েছে তার সহায়বিহীন প্রথম পাতাটিকে।
ওরা খুন করেছে মর্মরমূর্তির যথাযথ কারক ও বিভক্তিকে,
মনীষীকে, তাঁর যষ্টিকে, তাঁর সহযোগীকে,
পাশের বাড়ির পরামানিককে—হয়তো সে আমারও চুল ছেঁটেছে,
কিন্তু ভালো মানুষ ছিলো, আর, তাছাড়া, ছিলো দুর্ভাগা;
সেই ভিখিরিকে, যে কালও গান করেছিলো রাস্তার ওপাশে,
সেই নার্সকে, যে আজ কাঁদতে-কাঁদতে চ'লে গেলো পাশ দিয়ে,
সেই যাজককে, গোঁয়ার হাঁটুর উচ্চতায় যে টালমাটাল…

জীবনের জন্যে, ভালোমানুষদের জন্যে—
স্বেচ্ছাসেবকেরা—
হত্যা করো মৃত্যুকে, হত্যা করো অধমদের।

সকলের স্বাধীনতার জন্যে করো এই কাজ,
শোষিত আর শোষক—দুয়েরই জন্যে,
বেদনাবিহীন শান্তির জন্যে—আমি যখন ঘুমোই
আমার ভুরুর পাশে
আর, আরো, যখন গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ঘুরে বেড়াই
তাকে আমি ঝিলিক দেখে চিনে ফেলেছিলাম
আর, করো এ-কাজ, আমি চলতেই থাকি,
যার উদ্দেশে আমি লিখি সেই নিরক্ষরের খাতিরে,
সেই খালি-পা প্রতিভা আর তার মেষের খাতিরে,
ভূপাতিত-সব কামারাদাদের খাতিরে,
যাদের ছাই জড়িয়ে আছে রাস্তার এই লাশ!

যাতে তোমরা,
এস্পানিয়ার আর সারা জগতের স্বেচ্ছাসেবক, তোমরা আসতে পারো,
আমি স্বপ্ন দেখেছি আমি ভালো আছি, আর তোমাদের রক্ত
দেখবার যোগ্য আমি আজ, স্বেচ্ছাসেবক…
সেই থেকে, প্রার্থনার লগ্নে, আসে কত বুক,
কত উদ্বেগ, যুগের কত উট।
শিখায়িত মঙ্গল আজ কুচকাওয়াজ ক'রে যায় তোমার নামে,
স্নেহাতুর তোমাকে অনুসরণ করে পরিব্যাপ্ত চোখের পাতার সরীসৃপ
আর, দুই-পা দূরে, এক-পা পেছনে,
নিজের শেষ সীমা জ্ব'লে উঠছে এটা দেখবে ব'লে ছুটে যায় জলের সেই লক্ষ্য।

২

এস্ত্রেমাদুরার মানুষ,
তোমার পায়ের তলায় আমি শুনতে পাই নেকড়ের ধোঁয়া,
প্রজাতির ধোঁয়া,
শিশুর ধোঁয়া,
গমের দুই অঙ্কুরের নিঃসঙ্গ ধোঁয়া,
জেনিভার ধোঁয়া, রোমের ধোঁয়া; বার্লিনের ধোঁয়া,

পারীর ধোঁয়া, তোমার যন্ত্রণাময় উপাঙ্গের ধোঁয়া,
আর সেই ধোঁয়া, যা, অবশেষে, আসে ভবিষ্যৎ থেকে।
হে জীবন! হে মাটি-পৃথিবী! হে এস্পানিয়া!
তোলা-তোলা রক্ত,
মিটার-মিটার রক্ত, তরল-তরল রক্ত,
ঘোড়ার পিঠে রক্ত, পায়েচলার রক্ত, দেয়ালচিত্রে, পরিধিবিহীন,
চৌদিকে চোঁয়ানো রক্ত, সজল রক্ত
আর জ্যান্ত রক্তের ভেতর মরা রক্ত!

এস্ত্রেমেনিও, হায়, এখনও সেই-মানুষ-হওয়া নয়
যার জন্যে জীবন বধ করেছিলো তোমায় আর মৃত্যু জন্ম দিয়েছিলো তোমার
আর শুধু তোমাকে এভাবে দেখবার জন্যে থেকে-যাওয়া, এই নেকড়ে থেকে,
কেমনভাবে হাল চ'ষে যাও তুমি আমাদের বুকে!
এস্ত্রেমেনিও, তুমি তো জানো
শব্দের উভয় স্বরেরই গোপন কথা, জনপ্রিয় আর স্পর্শাতুর!
যে অন্তের একটা বিন্দুর কাছে বড়ো-কোনো নেকড়ের মতো
আর-কিছুই এত দামি নয়!
এস্ত্রেমেনিও, তোমার কনুইতে, যেন আত্মা পালিয়ে যাচ্ছে তাই সে দেখাচ্ছে,
তোমার কনুইয়ের ওপর তাকিয়ে
দেখতে পাই মরণের মধ্যে জীবনের এক জোড়!

এস্ত্রেমেনিও, এবং সেই না-থাকা জমি যার ওপর
পড়বে তোমার হালের চাপ, হালের ভার,
দুই যুগের মাঝখানে তোমার জোয়ালের রঙের চাইতে আরো-
কোনো জগৎও নয়;
তোমার মরণোত্তর দলবলের মধ্যে শৃঙ্খলা যে নেই, এই বোধ!
এস্ত্রেমেনিও, তুমি আমায় দেখতে দিয়েছিলে
এই নেকড়ে থেকে তোমায় দেখতে, শক্তি দিয়েছিলে সহ্যের,
দিয়েছিলে সকলের জন্যে লড়াই, আর এই লড়াই
যাতে ব্যক্তি হ'য়ে ওঠে মানুষ,
যাতে মালিকরা হ'য়ে উঠতে পারে মানুষ,

যাতে সবাই হ'য়ে উঠতে পারে মানুষ, আর যাতে
এমনকী জন্তুরাও হ'য়ে উঠতে পারে মানুষ,
ঘোড়া—সে-এক মানুষ,
সরীসৃপ—সে-এক মানুষ,
শকুন—সে-এক সৎমানুষ,
মাছি—সে-এক মানুষ, আর জলপাইগাছ—সেও এক মানুষ,
আর এমনকী নদীর পাড়—সেও এক মানুষ,
আর এই চেনা আকাশ, এক সমগ্র অখণ্ড ছোটো-মানুষ!

তারপর, তালাভেরা থেকে পেছিয়ে আসার সময়,
একাই একেকজন একেক বাহিনী, বুভুক্ষায় সশস্ত্র, একজনের জনতায়,
বুক থেকে কপাল দিয়ে সশস্ত্র,
বিমানহীন, যুদ্ধবিহীন, বিদ্বেষবিহীন,
অপচয় পেছনে
আর লাভ শিশের চেয়েও নিচু, সম্মানবোধের মরণ-ঘা,
ধুলোয় উন্মাদ, পায়ের ওপর বাহু,
অনিচ্ছুক ভালোবেসে,
এক এস্পানিওল ধরনে জয় ক'রে নিচ্ছে মাটিপৃথিবী,
আরো পেছিয়ে এসে, আর এই-যে না-জানা
কোথায় লুকোবে তাদের কাঙ্ক্ষিক চুম্বন,
কোথায় যে রুইবে তাদের পকেটমাপের জলপাইগাছ!

কিন্তু এখান থেকেই, পরে,
এই তরাইয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে
শয়তানি মঙ্গল ব'য়ে যায় যার দিকে সেই শোক থেকে,
গের্নিকার মহান যুদ্ধ দেখা যাবে।
বিচারবুদ্ধি-দিয়ে-মেনে-নেয়া এক হাতাহাতি, অপূর্বদৃষ্ট,
শান্তিতে হাতাহাতি, দুর্বল আত্মার হাতাহাতি,
দুর্বল শরীরের বিরুদ্ধে, এমন-এক হাতাহাতি যেখানে শিশু ঘা মারে,
তাকে কেউ বলেনি ঘা মারতে তবু,
তার অসহ্য যৌগিক স্বরের তলায়,

আর তার অতিস্বচ্ছতুর ল্যাণ্ডটের তলায়,
আর যেখানে এক মা ঘা মারে তার আর্তচীৎকারে, অশ্রুর এক পিঠ দিয়ে,
আর যেখানে রুগী ঘা মারে তার অসুখ দিয়ে, তার বাড়ি আর
তার ছেলে দিয়ে,
আর যেখানে বৃদ্ধ ঘা মারে
তার পাকাচুল দিয়ে, তার শতাব্দী দিয়ে তার হাতের লাঠি দিয়ে
আর যেখানে যাজক ঘা মারে তার ঈশ্বর দিয়ে।
গের্নিকার নীরব রক্ষকেরা !
হায় দুর্বলেরা, হায় মর্মাহত কোমলেরা,
যারা উঠে দাঁড়ায়, বড়ো হয়, ভ'রে দেয় সারা জগৎ তাদের
শক্তিশালী দুর্বলদের দিয়ে !

মাদ্রিদে, বিলবাওয়ে, সান্‌তান্‌দেরে,
কবরখানাতেও বোমা পড়েছিলো,
আর অমর মৃতেরা,
প্রহরীসজাগ অস্থি আর চিরন্তন কাঁধ নিয়ে, তাঁদের কবর থেকে,
আর মৃতেরা, অনুভব করার পর দেখার পর শোনার পর
কত-যে নিচু অশুভ অমঙ্গল, কত-যে মৃত কত-যে দীনদুঃখী হামলাবাজেরা,
আবার শুরু ক'রে দিলেন তাঁদের অসমাপ্ত মনস্তাপ,
শেষ করলেন কান্না, শেষ করলেন
আশা-করা, শেষ করলেন
ব্যথাকাতরতা, শেষ করলেন বাঁচন,
শেষ করলেন, অবশেষে, মরণশীলতা !

আর বারুদ—সে হঠাৎ হ'য়ে গেলো কিছুই-না,
চিহ্ন আর মোহর ক্রুশ কাটাকুটি করে পরস্পরকে,
আর বিস্ফোরণের সামনে আবির্ভূত হ'লো এক পদক্ষেপ
আর চারপায়ে পালাবার সময়, আরেক পদক্ষেপ
আর প্রলয়ের আকাশের মুখে, আরেক পদক্ষেপ
আর সপ্তধাতুর সামনে, একতা—
সরল, ন্যায়পরায়ণ, সমবায়ী, চিরন্তন।

পিতৃমাতৃহীন মালাগা
ঘুড়িহীন, চুল্লিহীন, শ্বেতকুষ্ঠ রবিহীন !
মালাগা প্রতিরোধহারা, যেখানে জন্মালো আমার মরণ পায়ে হেঁটে
আর আমার জন্ম ম'রে গেলো তীব্র সংরাগে !
তোমার পায়ের পেছনে হাঁটে মালাগা, অভিপ্রয়াণে,
অশুভের তলায়, ভীরুতার নিচে, অবতল অনুচ্চার্য ইতিহাসের নিচে
তোমার হাতের ডিমকুসুম নিয়ে : জৈব পৃথিবী !
আর ডিমের শাদা নিয়ে তোমার চুলে : সমগ্র বিশৃঙ্খলা !
মালাগা পলায়মান,
পিতা থেকে পিতায়, চেনা, তোমার পুত্র থেকে তোমার পুত্রে,
সেই সমুদ্রের তীর ধ'রে, যে-তীর সমুদ্র থেকে ছুটে পালায়,
সেই ধাতুর মধ্য দিয়ে, যা পালিয়ে যায় শিশে থেকে,
মাটির সঙ্গে একই তলে, যে-তল পালিয়ে যায় ধুলো থেকে,
এবং হায় ঈশ্বর !
যে-নিগূঢ় জ্ঞান এককালে তোমায় ভালোবাসতো
তারই হুকুমে !
মালাগা—সে আঘাতের তলায়, মর্ত রক্তজমাটের তলায়,
দস্যুথিকথিক, নরকাহত,
আকাশকশাহত,
কঠিন সুরার ওপর হেঁটে যাচ্ছে অগণিত,
একজন-একজন ক'রে, লাইলাক গাঁজলার ওপর দিয়ে,
আরো-লাইলাক ও নিশ্চল ঘূর্ণিতুফানের ওপর দিয়ে,
আর চার কক্ষপথের ছন্দেতালে যা ভালোবাসে
আর দুই পাথরের ছন্দে যা খুন করে পরস্পরকে !
আমার সূক্ষ্ম রক্তের মালাগা
আর আমার বিশাল-দূরত্বের বর্ণময়তার মালাগা,
জীবন এক দামামা নিয়ে অনুসরণ করে তোমার পিঙ্গলবসন সম্মান,
হাউই নিয়ে অনুসরণ করে, তোমার শিশুরা,
আর স্তব্ধতা নিয়ে, তোমার শেষ দামামা,
কিছুই-না নিয়ে, তোমার আত্মা
এবং আরো-কিছু-না নিয়ে, তোমার দীপ্ত বক্ষপঞ্জর !

মালাগা, দোহাই, তোমার নাম নিয়ে চ'লে যেয়ো না !
কারণ যদি তুমি যাও,
তবে যাও
পুরোপুরি, তোমার নিজের দিকে, সমগ্রতার মধ্যে অসীম সমগ্রতায়,
তোমার নির্দিষ্ট আকারের সমপরিমাণ যা আমাকে খেপিয়ে দেয়,
যাও তোমার উর্বর জুতোর শুখতলি আর তার গর্ত নিয়ে
আর তোমার অসুস্থ কাস্তের গায়ে বাঁধা তোমার প্রাচীন ছুরি নিয়ে
আর হাতুড়ির গায়ে বাঁধা তোমার খুঁটি নিয়ে !
মালাগা আক্ষরিক ও মালাগুয়েনীয়,
মিশরের দিকে পলায়মান, যেহেতু তুমি গজাল মেরে আটকানো
বিলম্বিত ক'রে দিচ্ছো অনুরূপ বেদনায় তোমার নৃত্য,
নিজের মধ্যেই মিলিয়ে দিচ্ছো গোলকের ত্রৈমাত্রিক আয়তন,
হারিয়ে ফেলে তোমার জলকলস, তোমার ভজনপুজন, পালিয়ে যাচ্ছো
তোমার বাহ্যিক এস্পানিয়া আর তোমার সহজাত জগৎ নিয়ে !
মালাগা—সে তার আপন অধিকারেই
আর জীববিদ্যার বিতানে, সে-এক অধিকতর মালাগা !
শুধু পথের ধর্মেরই মালাগা,
যে-নেকড়ে তোমার পিছু নিয়েছে তাকে নজরে রেখে.
আর যে-নেকড়েশাবক অপেক্ষা ক'রে আছে তোমার জন্যে !
মালাগা, কেমন কাঁদছি আমি !
মালাগা, আমি কেমন কাঁদছি আর কাঁদছি আর কাঁদছি ।

৩

সে তার বড়ো আঙুল দিয়ে হাওয়ায় লিখতো :
'দির্ঘজিবি হোক সব কোম্পানিয়েরো ! পেদ্রো রোহাস ।'
মিরান্দা দে এব্রো থেকে, পিতা ও মানুষ,
স্বামী ও মানুষ, রেলশ্রমিক ও মানুষ
পিতা ও আরো-মানুষ, পেদ্রো আর তার দুই মরণ !

হাওয়া কাগজ, সে খুন হ'য়ে গেছে : আরেক হাতে যাও
মাংস কলম, সে খুন হ'য়ে গেছে : আরেক হাতে যাও
'আমাদের সব কোম্পানিয়েরোকে পরামর্শ দাও তুরন্ত !'

তার খুঁটি যেখানে ফাঁসিতে লটকেছে, লেপ্টে থাকো,
সে খুন হয়েছে ;
সে খুন হয়েছে তার বিশাল আঙুলের পায়ের তলায় !
ওরা খুন করেছে, এক ঘায়ে, পেদ্রো আর রোহাসকে !

তার লিখিত হাওয়ার মুখে
দির্ঘজিবি হোক সব কোম্পানিয়েরো ।
বেঁচে থাকুক তারা এই গৃধিনী গৃ নিয়ে পেদ্রো আর রোহাসের
বীর আর শহিদের—আঁতের মধ্যে, নাড়িভুঁড়ির মধ্যে !

তাকে—মৃত—তল্লাশ ক'রে ওরা তাক লেগে গেলো
যখন তার শরীরে পেলো এই জগতের আত্মার মাপে তৈরি
এক বিশালতর শরীর
আর তার কুর্তায় একটা মরা চামচে ।

পেদ্রোও খেতো
তার মাংসের প্রাণীদের মধ্যে, সাফসুতরো করতো, রং
করতো টেবিল আর বাঁচতো সুমধুর
সকলের প্রতিনিধি হিশেবে,
আর এই চামচেটা থাকতো তার কুর্তায়,
সজাগ কিংবা যখন সে ঘুমোতো, সবসময়,
মৃত জ্যান্ত চামচে এক, এটা আর তার সব প্রতীক ।
পরামর্শ দাও আমাদের সব কোম্পানিয়েরোকে তুরন্ত !
এই চামচের পায়ের তলায় চিরকাল দির্ঘজিবি হোক সব কোম্পানিয়েরো !

সে খুন হ'য়ে গেছে, ওরা তাকে বাধ্য করেছে মরতে,
পেদ্রো, রোহাস, শ্রমিক, মানুষ, সেই একজন

একদিন যে জন্মেছিলো একরত্তি এইটুকু এক বাচ্চা, আকাশের দিকে তাকিয়ে,
এবং পরে যে বড়ো হ'য়ে উঠেছিলো, মুখটা লাল ছিলো তার,
আর যে যুঝেছিলো তার যত বন্দীশালার বিরুদ্ধে, তার যত না,
তার যত অথচ, তার যত ক্ষুধা, তার যত টুকরোর বিরুদ্ধে।

সে খুন হ'য়ে গেছে আস্তে কোমল
তার স্ত্রীর চুলে, যার নাম হুয়ানা ভাথ্‌কেথ্‌,
আগুনের লগ্নে, বন্দুকের গুলির বৎসরে,
এবং যখন সে এর মধ্যেই রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে সবকিছুর কাছে!

পেদ্রো রোহাস, এইভাবে, ম'রে যাবার পর,
উঠে দাঁড়ালো, চুমু খেলো তার রক্তছিটেলাগা সম্পুট,
ডুকরে উঠলো এস্পানিয়ার জন্যে
আর আবার তার আঙুল দিয়ে লিখলো হাওয়ায়:
'দির্ঘজিবি হোক সব কোম্পানিয়েয়ো। পেদ্রো রোহাস।'

বিশ্ব দিয়েই ভরাট তার মৃতদেহ।

৪

এস্পানিয়ার জন্যে লড়াই করছে ভিখিরিরা
পারী, রোমা, প্রাহায় ভিক্ষে চাইতে-চাইতে
আর এইভাবে শুদ্ধ ব'লে প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে, কাকুতিকাতর গথিক হাতে,
দূর-প্রচারকদের পা ধ'রে, লণ্ডনে, নিউ-ইয়র্কে, মেহিকোয়।
সানৃতানৃদের-এর জন্যে
নারকীয়ভাবে অনুনয় করছে তারা ঈশ্বরকে, নাম লেখাচ্ছে,
যুদ্ধ করছে, এমন দ্বন্দ্বে যেখানে এখনও কারু হার হয়নি।
নিজেদের তারা অর্পণ ক'রে দেয়
প্রাচীন বেদনার কাছে, ব্যক্তির পায়ের তলায়
তারা মুখ খিঁচিয়ে ছোঁড়ে নাছোড়-কাঁদা সামাজিক শিশে,
আক্রমণ করে গোঙানিতে,
শুধু ভিখিরি হ'য়েই হত্যা করে।

পদাতিকবাহিনীর সওয়াল
যেখানে ধাতু থেকে উঠে আসে অস্ত্রের ওজর,
কৈফিয়ৎ দেয় রোষ, দুর্বার খ্যাপা বারুদের চেয়েও কাছে।
মৌন-সব বাহিনী, যারা মরণশীল মূর্ছনা দিয়ে
গুলি ছোঁড়ে তাদের নম্রতা
চৌকাঠ থেকে, নিজেদের মধ্য থেকে, হ্যাঁ!, নিজেদের ভেতর থেকে।
সম্ভাবনাময় সব যোদ্ধা
তাদের খালি পায়ে জুতো পরাচ্ছে বজ্রনাদ,
শয়তানবৎ, অসংখ্য,
হিঁচড়ে নিয়ে আসছে তাদের শক্তির খেতাব, তাদের সুনিয়মিত নাম,
বেল্টের তলায় রুটির গুঁড়ো,
এক দোনলা রাইফেল : রক্ত আর রক্ত!
কবি সেলাম জানায় সশস্ত্র বেদনাকে!
...

৫

মরণের এস্পানিওলা মূর্তি

ঐ সে চলেছে! ডাকো ওকে! এ-যে তারই পাশ!
ঐ যে চলেছে ইরুনের মধ্য দিয়ে মরণ :
তার অ্যাকর্ডিয়ন পদক্ষেপ, তার অভিশাপ,
তার মিটারজোড়া বসন যার কথা আমি বলেছি,
তার সেই ওজনের কত গ্রাম যার কথা আমি বলিনি...যদি তা সত্যি হয়!

ডাকো ওকে! শিগগির! সে আমাকে হন্যে খুঁজছে রাইফেলের মধ্যে,
যেহেতু সে ভালোই জানে আমি কোথায় ওকে হারিয়ে দিই,
কী আমার দুর্দান্ত কৌশল, আমার প্রতারক সংহিতা,
আমার ভয়ংকর গূঢ়লেখ!
ডাকো ওকে! মরণ—সে হেঁটে চলেছে, ঠিক যেন এক মানুষ,
বন্য জন্তুদের মধ্য দিয়ে,
সে হেলান দেয় সেই বাহুতে যা পেঁচিয়ে ধরে আমাদের পা
যখন আমরা ঘুমোই পরিখায়
আর সে থমকে দাঁড়ায় স্বপ্নের স্থিতিস্থাপক ফটকে!

চ্যাচায় ! চ্যাচায় ! সে চেঁচিয়ে ওঠে তার সহজাত সংজ্ঞাবহ চীৎকার !
সে চেঁচিয়েছে লজ্জা থেকে, কেমন সে থুবড়ে পড়েছে লতাপাতায় তাই দেখে,
কেমন সে ছিটকে পেছিয়ে আসে পশু থেকে তাই দেখে,
কেমনভাবে আমরা বলি : এ যে মরণ ! তাই শুনে,
আমাদের যাবতীয় পরম স্বার্থ জখম করা থেকে !
(কেননা এ তো তারই যকৃৎ যে নির্মাণ করেছিলো পতন, যার কথা
আমি বলেছি, কামারাদা ;
কেননা সে চিবিয়ে খায় আমাদের প্রতিবেশীর সত্তা ।)

ডাকো ওকে । ওকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে
শত্রুপক্ষের ট্র্যাঙ্ক বরাবর,
কারণ মরণ এমন-এক হওয়া যা হ'য়ে ওঠে গায়ের জোরে, জুলুমে,
যার স্থচনা আর শেষ আমি বহন করি
আমার সব বিভ্রমের মাথায় খোদাই-করা,
যদিও সে এই স্বাভাবিক ঝুঁকিটা নেয় যে তুমি,
যে তুমি জানো
আর যদিও সে আমাকে পাত্তাই না-দেবার ভান করতে ভান করবে ।

ডাকো ওকে ! হিংস্র মরণ তো হওয়া নয়,
বরং, কোনো অতিসংক্ষিপ্ত ঘটনাও যেন নয় ;
বরং সে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার ধরণধারণ যেন
সরল তুলকালামের দিকেই ঝুঁকে পড়ে, কোনো কক্ষপথ বা
সানন্দ গান ছাড়াই ;
বরং তার স্পর্ধিত সময় এগুতে চায় বেঠিক কানাকড়ি
আর বধির ক্যারাট-এর দিকে, স্বৈরাচারী হাততালির দিকে ।
ডাকো ওকে ! কারণ তীব্র রোষ, সমস্ত শরীর দিয়ে ওকে ডেকেই
তুমি ওকে সাহায্য করো ওর তিন হাঁটু হেঁচড়ে চলতে.
যেমন, সময়-সময়,
মাঝে-মাঝে, ব্যথা দেয় আর ফুটে যায় বিশ্বজোড়া ধাঁধাজাগানো ভগ্নাংশ,
যেমন, কখনো-কখনো, আমি নিজেকে ছুঁই আর নিজেকে টেরই পাই না !

ডাকো ওকে! শিগগির! সে আমাকে হন্তে খুঁজছে
তার কোনিয়াক দিয়ে, তার নৈতিক কপোলাস্থি দিয়ে,
তার অ্যাকর্ডিয়ন পদক্ষেপে, তার অভিশাপে।
ডাকো ওকে! ওর জন্যে আমার অশ্রুর এই সুৎলি যেন হারিয়ে না-যায়।
তার গন্ধ থেকেই উঠে আসে, হা ঈশ্বর, আমার ধুলো, কামারাদা!
তার পুঁজ থেকেই উঠে আগে, হা ঈশ্বর, আমার আংটা, লিউটেনাণ্ট!
তার চুম্বক থেকেই নেমে আসে, হা ঈশ্বর, আমার সমাধি!
...

৬

বিলবাও দখলের পর শোভাযাত্রা

আহত আর মৃত, ভাই,
সত্যবৎসল, রিপাবলিকপন্থী, ওরা তোমার সিংহাসনের ওপর হাঁটছে,
যেদিন তোমার শিরদাঁড়া থুবড়ে পড়েছিলো দুর্দান্ত, সেদিন থেকে;
ওরা হাঁটছে, বিবর্ণ, তোমার কৃশ আর বার্ষিক বয়সের ওপর দিয়ে,
বাতাসদের সামনে শ্রমকাতরতায় অভিভূত।

উভয় শোকেরই যোদ্ধা,
বোসো, শোনো, আকস্মিক লাঠির পাশে শুয়ে থাকো,
তোমার সিংহাসনের পাশেই;
পাশ ফেরো;
নতুন গুজনিগুলো অদ্ভুত;
ওরা হাঁটছে, ভাই, ওরা হাঁটছে।

ওরা বলেছিলো: 'কেমন ক'রে? কোথায়?...' পায়রার
পিণ্ডস্বরে কথা ব'লে,
আর ছোটোরা চ'লে যায় তোমার ধুলো অব্দি কোনো কান্নাকাটি না-ক'রেই
এর্নেস্তো থুনিইগো, তোমার হাত প'রেই ঘুমোও তুমি,
ঘুমোও তুমি তোমার ধারণা গায়ে দিয়ে,
বিশ্রামে তোমার শান্তি, তোমার যুদ্ধ শান্তিতে।

জীবন দিয়ে মরণান্তিক আহত, কামারাদা,
কামারাদা ঘোড়সোয়ার,

মানুষ আর বন্যজন্তুর মধ্যে কামারাদা ঘোড়া,
চমৎকার ছেঁড়া তেনায় ভূষিত
এস্পানিওলা জাঁকজমকে-
ভরা তোমার পেলব-সব অস্থির দুর্ধর্ষ ও বিষণ্ণ বিন্যাস।

বোসো, তাহ'লে, এর্নেস্তো,
শোনো কেমন ক'রে ওরা হাঁটছে, এখানে, তোমার সিংহাসনে,
সেই যবে থেকে তোমার গোড়ালিতে গজিয়েছিলো শাদাচুল।
কোন্ সিংহাসন ?
তোমার ডানপায়ের জুতো ! তোমার জুতো !

৭

কয়েকদিন ধ'রেই, কোম্পানিয়েরোরা,
অনেকদিন ধ'রেই বাতাস বদ্‌লাচ্ছে হাওয়া,
মাটি, তার ধার,
তার স্তর, রিপাবলিকপন্থী রাইফেল।
কয়েকদিন ধ'রেই এস্পানিয়াকে দেখাচ্ছে এস্পানিওনলা।

কয়েকদিন ধ'রেই অশুভ
ডেকে জড়ো করছে তার দলবল, তার সব কক্ষপথ, সংযমবিরতি,
ওদের শুনে-শুনে অভিভূত ক'রে দিচ্ছে তার চোখ।
কয়েকদিন ধ'রেই, নগ্ন ঘাম দিয়ে প্রার্থনা ক'রে,
নাগরিকযোদ্ধা ঝুলে আছে মানুষ থেকে।
কয়েকদিন ধ'রেই, জগৎ, কামারাদা,
জগৎকে দেখাচ্ছে এস্পানিওল আমরণ।

কয়েকদিন ধ'রেই গুলিগোলা মরেছে এখানে
আর শরীর মরেছে তার আধ্যাত্মিক ভূমিকায়
আর আত্মা, কোম্পানিয়েরো, হ'য়ে উঠেছে আমাদেরই আত্মা।
কয়েকদিন ধ'রেই আকাশ,
এই আকাশ, এই দিনের, বিশাল থাবার।

কয়েকদিন ধ'রেই, গিহোন ;
অনেকদিন ধ'রেই, গিহোন ;
অনেককাল ধ'রেই, গিহোন ;
অনেক তরাই জুড়েই, গিহোন ;
অনেক মানুষ জুড়েই, গিহোন ;
আর অনেক ঈশ্বর জুড়েই, গিহোন,
অনেক এস্পানিয়া জুড়েই, হ্যাঁ !, গিহোন।

কয়েকদিন ধ'রেই, কামারাদা,
বাতাস বদ্‌লাচ্ছে হাওয়া।
...

৮

পেছনে এইখানে,
রামোন কোইয়ার,
তোমার বাড়ির লোক সেইভাবেই আছে দড়ি থেকে দড়িদড়ায়,
সেই একই চলেছে,
যখন তুমি যাও দেখা করতে, তুমি, ঐ ওখানে, সাত তলোয়ারের সঙ্গে, মাদ্রিদে,
মাদ্রিদের রণক্ষেত্রে।

রামোন কোইয়ার, বলদচালক
এবং তার শ্বশুরের জামাই না-হওয়া অব্দি যোদ্ধা,
স্বামী, পুরোনো মানবপুত্রের পুত্র হবার সীমারেখায় !
বেদনার রামোন, তুই, দুর্জয় কোইয়ার,
মাদ্রিদের প্রাসাদরক্ষী আর তা শুধু স্পর্ধাতেই। রামোনেতে,
এখানে পেছনে,
তোমার গাঁয়ের লোক তোমার চুলের ছাঁট নিয়ে অনেক ভাবে !

কেমন উৎকণ্ঠিত, একটুতেই কান্না, যখন অশ্রু !
আর যখন দামামা, তারা হাঁটে ; তারা কথা বলে
তোমার বলদের সামনে, যখন মাটি !



পিকাসোর আঁকা সেসার ভায়েহোর ছবি

রামোন ! কোইয়ার ! তোমাকেই ! যখন তুমি প্রথম,
যদি তুমি তলিয়ে যাও, মন্দ হোয়ো না কিন্তু ; সামলে রেখো নিজেকে !
পেছনে এইখানে,
ছোটো-ছোটো বাক্সের মধ্যে তোমার সামর্থ্য ;
পেছনে এইখানে,
তোমার ময়লা পাঁৎলুন, কিছু পরেই,
এর মধ্যেই জেনে ব'সে আছে কেমন চলতে হয় একেবারে একা,
কেমন ক'রে প'রে-প'রে খইয়ে দিতে হয় ;
পেছনে এইখানে,
রামোন, তোমার শ্বশুর, সেই বুড়ো,
তার মেয়ের সঙ্গে যতবার দেখা হয় একটু-একটু ক'রে হারায় তোমাকে !

আমি বলছি তোমাকে, এখানে পেছনে ওরা তোমার মাংস খেয়েছে,
না-বুঝেই,
খেয়েছে তোমার বুক, না-বুঝেই,
তোমার পা ;
কিন্তু সবাই তোমার ধুলোর মুকুটপরা পদক্ষেপ নিকে ভাবে সারাক্ষণ !

ওরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে,
পেছনে এইখানে ;
ওরা বসেছে তোমার খাটে, তোমার নিঃসঙ্গতা
আর তোমার টুকিটাকির মধ্যে গলা খুলে কথা বলেছে ;
তোমার হাল কে নিয়েছে আমি জানি না, আমি জানি না কে
তোমার পেছন-পেছন গিয়েছিলো, কিংবা কে ফিরে এসেছিলো
তোমার ঘোড়া থেকে !
পেছনে এইখানে, রামোন কোইয়ার, অবশেষে, তোমার বন্ধু :
সেলাম, ভাইমানুষ, হত্যা করো আর লেখো !

৯

রিপাবলিকের এক বীরের জন্য ছোট্ট-এক প্রার্থনা

তার মরা কোমরের কিনারে থেকে গিয়েছে এক পুঁথি,
এক পুঁথি অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠছে তার মরা লাশ থেকে।
ওরা ব'য়ে নিয়ে গেছে বীরকে,
আর ভুতুড়ে, অলুক্ষুণে, তার মুখ ঢুকে পড়েছে আমাদের শ্বাসে ;
আমাদের নাভির ভারে আমরা সবাই ঘেমে নেয়ে উঠেছি ;
চাঁদেরা ভ্রমণ করেছে আমাদের পেছন-পেছন ;
মৃত মানুষটিও ঘেমে যাচ্ছিলো বিষণ্ণতায়।

এবং একটা পুঁথি, তোলেদোর যুদ্ধে,
একটা পুঁথি, সামনে এক পুঁথি, ওপরে এক পুঁথি, পাতা ছড়াচ্ছে লাশ থেকে

লাল গালের কবিতা, বলা
আর না-বলার মধ্যেটায়,
তার হৃদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে গেছে যে নৈতিক বাণী তার কবিতা।
পুঁথি র'য়ে গেছে এবং আর-কিছুই না, কেননা
তার কবরে কোনো পোকা নেই,
আর হাওয়া থেকে গেছে তার আস্তিনের কিনারে ভরিয়ে দিচ্ছে নিজেকে
আর হ'য়ে উঠছে বাষ্পময়, অসীম।

আমরা সবাই আমাদের নাভির ভারে ঘেমে নেয়ে উঠছি,
মৃত মানুষটিও ঘেমে উঠেছে তার বিষণ্ণতায়,
এবং একটা পুঁথি, আমি দেখেছি তাকে অনুভূতি দিয়ে,
একটা পুঁথি, পেছনে এক পুঁথি, ওপরে এক পুঁথি
লাশের এক হঠাৎ মঞ্জরী।
...

১০

তেরুয়েলের যুদ্ধে শীত

জল ঝ'রে পড়ছে ধোয়া রিভলভার থেকে।
জলের সে ঠিক
ধাতব লাবণ্য,

আরাগোনের নিশীথ বিকেলে,
নির্মিত সব ঘাস,
তেরিয়া শাকসব্জি, কারখানার উদ্ভিদ সত্ত্বেও।

এ একেবারে
রসায়নের শান্ত অবিচল শাখা,
একটা চুলে বিস্ফোরণের শাখা,
পর-পর সব মোটরগাড়ি আর বিদায়শুভেচ্ছার শাখা।

এইভাবেই সাড়া দেয় মানুষ, এইভাবেই সে সাড়া দেয় মরণকে,
এইভাবেই তাকায় সামনে আর পাশ দিয়ে শোনে,
এইভাবেই জল, রক্তের বিপরীত, জলে তৈরি,
এইভাবেই আগুন, ভস্মের উলটো, মসৃণ ক'রে যায় তার জাবর-কাটা হিম।

কে যায় ওখানে, বরফের তলায়? ওরা কি মারছে? না।
এ একেবারে
ঝাপটাচ্ছে জীবন, তার দ্বিতীয় দড়ি দিয়ে।
আর যুদ্ধ এক চূড়ান্ত বিভীষিকা, সে তাতিয়ে দেয়,
সে মানুষকে কামনাময় ক'রে তোলে, সবটাই চোখ,
যুদ্ধ সৃষ্টি করে কবর, সৃষ্টি করে পতন,
সৃষ্টি করে বানিয়ে নিয়ে এক অদ্ভুত নরাকৃতি লাফ!
ঠিকই তার গন্ধ পাচ্ছো তুমি, কোম্পানিয়েরো,
আনমনাভাবে লাশগুলোর মধ্যে তোমার বাহুতে পা ফেলেই;
তুমি তাকে দেখতে পাও, কারণ তুমি ছুঁয়েছো তোমারই অণ্ডকোষ,
লজ্জায় প্রখররাঙা;
তুমি তাকে শুনতে পাও তোমার স্বাভাবিক সেনানী-মুখে।

চলো তবে যাই, কোম্পানিয়েরো,
তোমার সজাগ ছায়া অপেক্ষা ক'রে আছে আমাদের জন্যে,
তোমার চারটুকরো ছায়া অপেক্ষা ক'রে আছে আমাদের জন্যে,
মধ্যদিন কাপিতান, রাত্রি সাধারণ সেনা…

সেইজন্যেই, এই মর্মযন্ত্রণা উল্লেখ ক'রে
আমি নিজের কাছ থেকে পেছিয়ে যাই তুমুল চীৎকার ক'রে উঠে :
আমার লাশ মুর্দাবাদ !...আর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি আমি।
...

১১

লাশটার দিকে তাকিয়েছিলাম, তার দৃশ্যমান দ্রুত শৃঙ্খলার দিকে
আর তার আত্মার অতিমন্থর বিশৃঙ্খলার দিকে ;
দেখলাম সে টি'কে আছে ; তার মুখে
দুটি মুখের টালমাটাল যুগ।
ওরা চেঁচিয়ে তার নশ্বর ছুঁড়েছে তার দিকে : টুকরো-টুকরো।
ওরা চেঁচিয়ে তার ভালোবাসা ছুঁড়েছে তার দিকে : যথেষ্ট নয় এও !
ওরা চেঁচিয়ে তার গুলি ছুঁড়েছে তার দিকে : এইমতো মৃত !

আর তার পরিপাকশক্তি থমকে দাঁড়ালো নিশ্চল
আর তার আত্মার বিশৃঙ্খলা, পেছনে, খামকাই।
তারা ছেড়ে গেলো তাকে শুনলো উৎকর্ণ, আর সেই তখনই
যেন লাশটি
গোপনে বেঁচে উঠলো, মুহূর্তের জন্যে ;
কিন্তু ওরা মনে-মনে কান পেতে শুনলো তার বুক—শুধু কতগুলো শেষ তারিখ
...

১২

খ্রিস্টযাগ

যুদ্ধের শেষে,
যখন ম'রে প'ড়ে আছে যোদ্ধা, এগিয়ে এলো এক মানুষ
আর বললে : 'মোরো না ! দোহাই ! আমি তোমাকে এত ভালোবাসি !'
কিন্তু, হায়, লাশ—সে মরতেই থাকলো।

আরো-দুজন এলো তার কাছে আর বারে-বারে বললে আবার :
'ছেড়ে যেয়ো না আমাদের ! সাহস চাই ! ফিরে এসো জীবনে !'
কিন্তু, হায়, লাশ—সে ম'রেই চললো।

বিশ, একশো, হাজার, পাঁচশো সহস্র ছুটে এলো তার কাছে
আর্ত চেঁচিয়ে : 'এত ভালোবাসা অথচ মরণের বিরুদ্ধে কোনো উপায় নেই!'
কিন্তু, হায়, লাশ—সে ম'রেই চললো।

তাকে ঘিরে দাঁড়ালো লক্ষ লোক,
সকলেরই এক অনুনয় : 'ভাই, থাকো!'
কিন্তু লাশ—সে, হায়, মরতেই থাকলো।

তারপর পৃথিবীর সকল মানুষ
তাকে ঘিরে দাঁড়ালো ; লাশ তাদের দেখলো বিষণ্ণ, নাড়া খেলো ;
উঠে দাঁড়ালো আস্তে,
আলিঙ্গন করলো প্রথম মানুষকে, শুরু ক'রে দিলো হাঁটতে…
…

১৩

তুরাজ্যের ধ্বংসের উদ্দেশে অন্ত্যেষ্টিদামামা

এস্পানিয়ার মাটি থেকে ওঠে পিতা ধূলিকণা,
রক্ষা করুন ঈশ্বর তোকে, মুক্ত করুন, মাথায় পরান মুকুট,
আত্মা ছাপিয়ে উঠে আসে এই পিতা ধূলিকণা।

বহ্নিশিখার মাঝ থেকে ওঠে পিতা ধূলিকণা,
রক্ষা করুন ঈশ্বর তোকে, উপহার দিন অবলম্বন, সহায়, সিংহাসন,
যে তুমি রয়েছো স্বর্গসুধামে পিতা ধূলিকণা।

ধোঁয়ার মহান প্রপৌত্র তুমি পিতা ধূলিকণা,
রক্ষা করুন ঈশ্বর তোকে, উচ্চে তুলুন অসীমে,
ধোঁয়ার মহান প্রপৌত্র তুমি পিতা ধূলিকণা।

পিতা ধূলিকণা ন্যায়বিচারের উপসংহার তুমি,
রক্ষা করুন ঈশ্বর তোকে, আবার আসুন বিশ্বে,
পিতা ধূলিকণা ন্যায়বিচারের উপসংহার তুমি।

জন্ম যে নেয় তালীবন ধ'রে পিতা ধূলিকণা,
রক্ষা করুন ঈশ্বর তোকে, সাজান বিশাল বুকে,
পিতা ধূলিকণা, তুই আতঙ্ক সকল শূন্যতারই।

পিতা ধূলিকণা রচিত ধাতুতে সুকঠিন লোহা দিয়ে
রক্ষা করুন ঈশ্বর তোকে, দিন মনুষ্যরূপ,
পিতা ধূলিকণা সার বেঁধে যায় জ্বলন্ত শিখাময়।

পিতা ধূলিকণা সর্বহারার পারিয়ার চপ্পল,
রক্ষা করুন ঈশ্বর তোকে, কখনো যেন না নির্বন্ধন হোস,
পিতা ধূলিকণা সর্বহারার পারিয়ার চপ্পল।

পিতা ধূলিকণা বর্বর দিয়ে তাতানো ঘূর্ণিময়,
রক্ষা করুন ঈশ্বর তোকে, ঘিরুন দেবতা দিয়ে,
পিতা ধূলিকণা সদল চলেছে পরমাণু পরিবৃত।

পিতা ধূলিকণা, শবাচ্ছাদন, কাফন সকল জনের,
চিরযুগ ধ'রে রক্ষা করুন ঈশ্বর তোকে অশুভ শক্তি থেকে,
এস্পানিওল পিতা ধূলিকণা, আমাদের তুমি পিতা!

পিতা ধূলিকণা যে-জন চলেছে ভবিষ্যতের দিকে,
ঈশ্বর তোকে রক্ষা করুন, চালিত করুন, ডানা দিন উত্তাল,
পিতা ধূলিকণা যোজন চলেছে ভবিষ্যতের দিকে।
...

১৪

অবহিত থেকো, এস্পানিয়া হে, তোমারই নিজের এস্পানিয়ার!
অবহিত থেকো, হাতুড়িবিহীন কাস্তের।
অবহিত থেকো, কাস্তেবিহীন হাতুড়ির।
অবহিত থেকো, নিজে সত্ত্বেও বলি-শিকারের
অবহিত থেকো, নিজে সত্ত্বেও জল্লাদদের
অবহিত থেকো, নিজে সত্ত্বেও দায়হীন উদাসীনদের!

অবহিত থেকো, তিন-তিনবার মোরগ ডাকার আগেই
তোমাকে ফেরাবে তিন-তিনবারই যে-জন !
অবহিত থেকো জঙ্ঘার হাড় না-থাকা সে করোটির !
অবহিত থেকো, করোটিবিহীন জঙ্ঘার হাড়টিরও !
অবহিত থেকো, নতুন নৃপতি, নতুন স্বৈরাচারীর !
অবহিত থেকো, কে খায় তোমার লাশ !
অবহিত থেকো, যে খায় তোমার জীবিতকে গোগ্রাসে !
অবহিত থেকো, শতকরা শত যে তোমার অনুগত !
অবহিত থেকো, হাওয়ার এপাশে আকাশের
আবহিত থেকো, আকাশ পেরুনো হাওয়াদের !
অবহিত থেকো, সে-কারা তোমাকে চিরকাল ভালোবাসে !
অবহিত থেকো, বীর যারা, যারা নায়ক !
অবহিত থেকো, কারা সে তোমার মৃত !
অবহিত থেকো, এই সে রিপাবলিক !
অবহিত থেকো, অনাগত দিন, আগামী ভবিষ্যৎ !...
...

১৫

এস্পানিয়া, আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও এ-পানপাত্র

জগতের শিশু
—এস্পানিয়া যদি পড়ে—ধ'রে নাও, যদি—
যদি আকাশ থেকে পড়ে
তার পুরোবাহু, যেন দুই
পার্থিব চাদর তাকে প্রসারিত লুফে নেয়
শিশুরা : ঐ অবতল কপালে সে-কোন্ যুগ !
রৌদ্রে সে-কত সকালে তোমাদের কাছে আমাদের সন্দেশ !
কী তুরন্ত তোমাদের বুকে আদিম কোলাহল !
কত পুরোনো তোমার ২ খাতার পাতায় !

জগতের শিশু, জননী এস্পানিয়ার
উদর একটা বোঝার মতো ;
তিনি দাঁড়িয়ে আছেন শিক্ষিকার মতো তাঁর বেত হাতে

জননী এবং শিক্ষিকা,
ক্রুশ আর কাঠ, কারণ তিনিই তোমাদের দিয়েছেন উচ্চতা
ঘূর্ণিরোগ, বিভাজন, যোগ—মনে রেখো, শিশুরা—
এ তাঁরই বিষয়, জানবেন বাক্‌ছলবাগিশ পিতামাতা !

যদি সে পড়ে—ধ'রে নেয়া যাক, যদি—এস্পানিয়া
পড়ে পৃথিবী থেকে
কেমন ক'রে বড়ো-হওয়া বন্ধ করবে তোমরা, বাছারা !
কেমন ক'রে বৎসর শুধরে দেবার জন্যে সাজা দেবে তার মাসগুলোকে !
কেমন ক'রে দাঁত গুচ্ছ বাঁধবে দশের, দশাটির বেশি দাঁত কখনও
তোমার হবে না,
কলমের আঁচাড় যৌগিক স্বর, কাঁদবে পদকভূষণ !
কেমন ক'রে থাকবে তবে ছোট্ট শেষ
বিশাল দোয়াতে যার পা বাঁধা !
কেমন ক'রে তোমরা নামবে বর্ণমালার ধাপ বেয়ে
সেই হরফে যেখানে জন্ম নিয়েছিলো বেদনা !

বাছারা,
যোদ্ধার ছেলেরা, একটু নামাও
তোমাদের গলা এখন, কারণ ঠিক এই মুহূর্তেই এস্পানিয়া ভাগ ক'রে নিচ্ছে
শক্তি প্রাণিজগতে,
ছোটো-ছোটো ফুলেমুকুলে, উল্কায়-উল্কায়, মানুষে-মানুষে
গলা নামাও, কেননা গভীর তিনি তলিয়ে আছেন
তাঁর তীব্র মগ্নতায়, কারণ তিনি যে মহান আর তিনি জানেন না
কী করতে হবে তবে এখন, আর তাঁর হাতে
আসলে করোটি কথা ব'লে যাচ্ছে বলছে তো বলছেই,
করোটি, বিনুনি-বাঁধা এক
করোটি, জ্যান্ত, জীবনেরই সে একজন !

গলা নামাও, আমি বলছি তোমাদের :
চুপ করাও স্বর, অক্ষরের গান, বস্তুর

বিলাপ আর পিরামিডের দুস্বতর মর্মর, আর এমনকী
দুই পাথরের তলায় চাপা-পড়া তোমার কপালের মর্মর !
নামাও তোমার শ্বাস, আর যদি
তাঁর পুরোবাহু নেমে আসে,
যদি তাঁর বেত শপাং পড়ে, যদি এ হয় রাত,
যদি আকাশ এঁটে যায় দুই পার্থিব লিম্বোতে,
যদি দরজার শব্দে থাকে কোলাহল
যদি আমি পৌঁছুই দেরিতে
যদি তোমরা কাউকে দেখতে না-পাও, যদি ভোঁতা পেনসিল
তোমাদের আঁৎকে দেয়, যদি প'ড়ে যায়
এস্পানিয়া জননী—ধ'রে নেয়া যাক, যদি—
জগতের শিশুরা, বেরিয়ে এসো বাইরে, এসো, তাঁকে খুঁজে বার করো···

প্রাসঙ্গিক তথ্য :

সেসার ভায়েহো সম্ভবত এই কবিতাপর্যায়ের ন-টি কবিতা লিখেছিলেদ ১৯৩৭-এর সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে। তবে সেসার ভায়েহো যেহেতু কবিতার 'চূড়ান্ত পাঠ' তৈরি করবার পরই তারিখ দিতেন, তারিখ তাই এটা বোঝায় না যে কবিতাটি পুরোপুরি সেদিনই লেখা হয়েছে; হয়তো অনেকদিন ধ'রেই লেখার কাজ চলছিলো, চলছিলো সংস্কার, পরিমার্জনা, সংযোজন—তারপরই কবিতাটি তাঁর যখন মনে হ'তো শেষ হ'য়ে গিয়েছে তখন তিনি তারিখ বসাতেন। 'খ্রিস্টযাগ' কবিতাটি ভায়েহোর স্ত্রীর মতে রচিত হয়েছিলো ১৯২৯এ, এই তথ্যটা এখানে উদাহরণ হিশেবে উপস্থাপিত করা যায়। বাকি ছটি কবিতার তলায় কোনো তারিখ নেই; আর অন্তত একটি কবিতা যে সেপ্টেম্বর-নভেম্বর রচনাকালের পরে রচিত হয়েছিলো, তার কারণ তেরুয়েলের যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো ডিসেম্বরে, ১৯৩৮-এর ২২ ফেব্রুয়ারি অব্দি চলেছিলো। আসলে বইটির প্রথম সংস্করণের সঙ্গেই রচনাকালের এই রহস্য জড়িয়ে আছে: প্রথম সংস্করণটি ছাপিয়েছিলেন রিপাবলিকপন্থী সৈন্যরা, নিজেরাই তাঁরা সবদিক দিয়ে ছাপার কাজের তত্ত্বাবধান করেছিলেন, কিন্তু সরকারিভাবে প্রকাশিত হবার আগেই কাতালোনিয়ার পতন হ'লো—ফ্রাঙ্কোর ফাশিস্ত বাহিনী বইয়ের সব কপি পুড়িয়ে বহ্ন্যুৎসব করেছিলো। ভায়েহো এদিকে এপ্রিল ১৯৩৮-এ পারীতে মারা গেলেন। ১৯৪০-এ হুয়ান লারেয়ার ভূমিকা

সংবলিত একটি সংস্করণ প্রকাশিত হ'লো মেহিকোয়—কিন্তু তা থেকে বোঝবার উপায় নেই ভায়েহো স্বয়ং রিপাবলিকপন্থী সৈন্যদের যে-পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে মেহিকোর এই সংস্করণটির কতটা মিল আছে। সত্যি-বলতে, পরবর্তী নানা সংস্করণে একটা খটকা আরো তৈরি হ'য়ে গেছে : বর্তমান পাঠে যেটিকে ১৫ নম্বর কবিতা ধরা হয়েছে, সেটি কোথাও-কোথাও ১৪ নম্বর ব'লে গৃহীত—আর ১৪ নম্বর কবিতাটি কোথাও-কোথাও হ'য়ে উঠেছে ১৫ নম্বর কবিতা।

সেসার ভায়েহো যখন এই কবিতাপর্যায় লিখছিলেন, ততদিনে, ১৯৩৭-এই, কুবার নিকোলাস গিয়্যেনের, 'এস্পানিয়া, পোয়েমা এন্ কুয়াত্রো আঙ্গুনিস্তোস ই উনা এস্‌পেরান্‌সা' (এস্পানিয়া : চার মর্মযাতনা ও এক আশায় রচিত একটি কবিতা) বেরিয়ে গেছে। আর ভায়েহোর কবিতার পরে বেরুবে পাবলো নেরুদার 'এস্পানিয়া এন এল কোরাসোন' (হৃদয়ে আমার স্পেন)। স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে রচিত লাতিন আমেরিকার এই তিন কবির রচনাই প্রায় মহাকাব্যিক আয়তন লাভ করেছে—এবং তিনজনের কবিতাতেই মহাকাব্যের বিশাল প্রসারে আছে নাটকীয়তার উত্তাল মুহূর্ত, গীতিকবিতার আর্তি ও স্বপ্ন—সত্যি-বলতে, ক্যারিবিয়নের কবি মার্তিনিকের এমে সেজেয়ার কালো মানুষের সরূপ ও শিকড় নিয়ে যে 'দেশে ফেরার খাতা' (১৯৩৮) লিখেছিলেন সেটাও মহাকাব্যিক প্রসারে নাটকীয়তা ও গীতিকবিতার স্ফুরণ ঘটিয়েছিলো : ইওরোপ যে-জনরব প্রচার করেছিলো, এখনকার কালে আর বড়ো কবিতা হয় না, আমেরিকার এডগার অ্যালান পোও যে-মতের পোষণ করতেন, এই কবিতাগুলো ছিলো সেই মতবাদের প্রোজ্জ্বল প্রতিবাদ।

সেসার ভায়েহো জন্মেছিলেন উত্তর পেরুর একটা ছোট্ট শহর, সান্‌তিয়াগো দে চুকো-য়, ১৮৯২ সালে। যদিও গরিব ঘরের ছেলে তবু ভায়েহো ত্রুহিয়ো বিশ্ববিদ্যালয় ও লিমার সান্ মার্কোস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯২০ সালে তাঁকে রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার করা হয়, তখন তাঁকে কয়েকমাস জেলে কাটাতে হয়েছিলো। এই জেলখানার অভিজ্ঞতা তাঁর অনেক কবিতায় ঘুরে-ফিরে এসেছে; তাঁর রাজনৈতিক চেতনাকেও স্পষ্ট ও পুরোপুরি গ'ড়ে দিয়েছিলো এই জেলবাস। ১৯২৩-এ ভায়েহো ফ্রান্‌সে চ'লে আসেন, এবং ১৯২৮ ও '২৯-এ দু-বার সোভিয়েৎ দেশে ভ্রমণ করেন, আর যদি-বা তখনও তাঁর কোনো রাজনৈতিক দ্বিধা বা খটকা থেকে থাকে, এই সোভিয়েৎ দেশে ভ্রমণ তাঁকে পুরোপুরি রচিত ক'রে দেয়—

তিন-এর দশকে ভায়েহো হ'য়ে ওঠেন কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য—ফ্রান্স্ থেকে তাঁকে বার ক'রে দেয়া হয়, ভায়েহো চ'লে আসেন স্পেনে। ১৯৩৩-এ আবার পারী এসেছিলেন ভায়েহো, কিন্তু স্পেনের গৃহযুদ্ধের সূচনা হবামাত্র তিনি স্পেনে ফিরে যান, প্রথমে রিপাবলিকপন্থীদের দখল-করা অঞ্চল দেখতে, পরে আন্তর্জাতিক লেখক সমাবেশে। আর সেই সময়েই, ঝড়ের বেগে এই বিস্ফোরকের মতো কবিতা তিনি লেখেন—সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ১৯৩৭-এ যে প্রায় অধিকৃত মানুষের মতো এই কবিতা পর্যায়ের অধিকাংশ অংশ রচিত হ'য়ে যায়, সেটা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

লক্ষ করা যাবে, এই কবিতাপর্যায়ের সবগুলোর শিরোনাম নেই। কিন্তু যেখানে আছে সেখানে তা কবিতার মর্মোদ্ধারের পক্ষে জরুরি। লাতিন আমেরিকায় যাঁকে আধুনিক কবিতার জনক ব'লে গণ্য করা হয়, সেই রুবেন দারিও-র 'জীবন ও আশার গান' বইতে লাতিন আমেরিকার বিদ্রোহী কবিতার মূল কতগুলো সূত্র প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গিয়েছিলো। ঐ বইতে 'আশার গান' কবিতায় আমরা দেখতে পেয়েছিলাম জিশু খ্রিস্টই বিপ্লবের দূত, রুশ বিপ্লবের পরে আলেক্সান্দর ব্লক-এর 'বারোজন' কবিতাতেও যা আমরা দেখতে পাবো। আজ আমরা বারে-বারে যে 'লিবারেশন থিওলজি' বা মুক্তির ধর্মতত্ত্বের কথা শুনছি, যার কথা ব্রাজিলের পাউলো ফ্রেয়েরি লিখেছেন, বা নিকারাগুয়োর এর্নেস্তো কার্দেনাল লিখেছেন, তার সূচনা সেখানেই হয়েছিলো। খ্রিস্ট, বিপ্লবের সহযোদ্ধা, 'কোম্পানিয়েরো'দেরই একজন। ভায়েহোর এই কবিতার নামটিই নেয়া হয়েছে মথি লিখিত সুসমাচার থেকে (২৬ / ৩৯), গেৎশিমানী বাগানে জিশুর মর্মান্তিক দুঃখ থেকে, যেখানে তাঁকে বেইমানি ক'রে ধরিয়ে দেয়া হবে শত্রুর হাতে : 'হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক ; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক,' দুঃখার্ত ও ব্যাকুল জিশুর এই উচ্চারণ থেকেই ভায়েহোর এই কবিতা পর্যায়ের সূচনা ও নামকরণ।

১ রিপাব্লিকের স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশে স্তব

পঙ্‌ক্তি ২ : 'মিলিসিয়ানো' কথাটির তর্জমা করা হয়েছে 'নাগরিকযোদ্ধা' কেননা মিলিশিয়া বলতে আজ যা বোঝায়, রিপাবলিকের স্বেচ্ছাসেবকেরা তা ছিলো না—সাধারণ লোক, সিভিলিয়ানরা, নাগরিকেরা

স্বেচ্ছায় ফ্রাঙ্কোর ফাশিস্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে নাম লিখিয়েছিলেন।

পঙ্‌ক্তি ৭ : 'পেচো' শব্দটির আক্ষরিক মানেই 'বুক'—কিন্তু এই কবিতার আগাগোড়া একে নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে : হৃদয়, হৃৎপিণ্ড, সাহস, গর্ব ইত্যাদি। ভায়েহো বুক কথাটি দিয়ে সম্ভবত এই সবগুলো অনুষঙ্গই জাগাতে চেয়েছিলেন।

পঙ্‌ক্তি ৮ : ভায়েহো ব্যবহার করেছিলেন 'দেস্‌গ্রাসিয়াদুমে'—নিজের মধ্য থেকে 'গ্রেস' বা শ্রী বা ছন্দ সব নিষ্কাশন ক'রে দেয়া—কিংবা হয়তো এও বোঝাতে চেয়েছিলেন 'দুর্দশা-দুরবস্থার বোধ'। এখানে তার তর্জমা করা হয়েছে 'ছন্নবিহীন'।

পঙ্‌ক্তি ১৮-২১ : 'দুমুখো-ধার গতি' আর 'জমকালো-সাজা'—এর ভেতর দিয়ে ভায়েহো বুলফাইটের অনুষঙ্গ এনেছেন—পিকাদোর ও মাতাদোরের জমকালো সাজ, ষাঁড়ের দু-মুখো গতি—আক্রান্ত ও আক্রমণ-উৎসুক—যার মধ্যে দিয়ে কবিতায় আনা হয়েছে জটিলতা, দ্বন্দ্ব, মৃত্যুকে। এই গৃহযুদ্ধ তো আর কোনো ফুলবাগানে বেড়াতে যাবার মতো কোনো ব্যাপার ছিলো না।

পঙ্‌ক্তি ২৩ : গৃহযুদ্ধের আগের দু-বৎসরকে বলা হ'তো 'এল বিয়েনিও নেগ্রো'—কালো দ্বি-বৎসর—অর্থাৎ ১৯৩৪-১৯৩৬।

পঙ্‌ক্তি ৪২ : পেদ্রো কাল্‌দেরোন দে লা বার্থা (১৬০০-১৬৮১) স্পেনের সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার। পরবর্তী পঙ্‌ক্তি ক-টিতে অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে ভায়েহো স্পেনের অতীত ও সাম্প্রতিক ইতিহাসের মহান প্রতিভাদের নাম করেছেন। মিগেল দে সের্‌ভান্‌তেস বা ফ্রান্‌সিসকো গোইয়ার নাম শুধু স্পেনের প্রথাপ্রচলদ্রোহী ঐতিহ্যকে বোঝাবার জন্যে করা হয়েছে।

পঙ্‌ক্তি ৪৬ : আন্তোনিও কোল (অথবা কোই), গৃহযুদ্ধের এক জনপ্রিয় নায়ক। বাড়িতে তৈরি বোমা নিয়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে তিনি প্রথম উড়িয়ে দিয়েছিলেন ইতালীয়দের সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক।

পঙ্‌ক্তি ৪৮ : ফ্রানসিস্‌কো দে কেভেদো (১৫৮০-১৬৪৫) বিখ্যাত ব্যঙ্গ কবি।

পঙ্‌ক্তি ৪৯ : সান্‌তিয়াগো রামোন ই কাহাল (১৮৫২-১৯৩৪)—১৯০৬তে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ; মনুষ্য

শরীরের স্নায়ুব্যবস্থায় জীবকোষগুলো নিয়ে ছিলো তাঁর বিখ্যাত গবেষণা। অনুবীক্ষণের তলায় তাঁর কাছে বিস্ফারিত হয়েছিলো এক 'ছোট্ট অসীম জগৎ'।

পঙ্‌ক্তি ৫০ : তেরেসা দে হেসুস (১৫১৫-১৫৮২) ছিলেন বিখ্যাত অতীন্দ্রিয়বাদী কবি, 'আমি মরি যেহেতু আমি না' এই সনেটটি তিনিই লিখেছেন ব'লে মনে করা হয়।

পঙ্‌ক্তি ৫১ : লিনা ওদেনা ছিলেন গৃহযুদ্ধের জনপ্রিয় নেত্রী—দক্ষিণের রণক্ষেত্রে ফাশিস্তদের হাতে তিনি নিহত হন।

পঙ্‌ক্তি ১ : স্পেনের পশ্চিম প্রত্যন্তের প্রদেশ—গরহাজির জমিদার আর নিদারুণ দারিদ্রের জন্যে সারা স্পেনে তার বিশেষ স্থান ছিলো। গৃহযুদ্ধের প্রথম বড়ো লড়াই হয় এখানেই।

পঙ্‌ক্তি ৪৩ : তালাভেরা দে লা রেইনা, তোলেদো প্রদেশের একটি শহর; মাদ্রিদ যাবার পথে ফাশিস্ত বাহিনী এই শহর দখল ক'রে নেয় ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬।

পঙ্‌ক্তি ৫৯ : গের্নিকা, উত্তর স্পেনের শহর—বাস্কদের কাছে সে ছিলো তীর্থধাম। তার সামরিক কোনো গুরুত্ব না-থাকলেও ফ্রাঙ্কোর হুকুমে জার্মান বোমারু বিমান ১৯৩৭-এর ২৬ এপ্রিল এ-শহর সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ ক'রে দেয়। পাবলো পিকাসোর ছবি সেই ধ্বংসস্তূপকে স্মরণীয় ক'রে রেখেছে—যাতে ফাশিস্তদের আমরা কখনও না-ভুলি।

পঙ্‌ক্তি ৯২ : ইতালীয় বাহিনীর জেনারেল রোয়াত্তার সেনারা ১৮৩৭-এর ৮ ফেব্রুয়ারি মালাগা দখল ক'রে নেয়। নগরীর হাজার-হাজার মানুষ সমুদ্রতীর ধ'রে আলমেরিয়ার দিকে যখন যাচ্ছিলো তখন জার্মান নৌসেনা ও জার্মান ও ইতালীয় বোমারু বিমান প্রায় কচুকাটা ক'রে অধিকাংশকেই মেরে ফ্যালে।

পঙ্‌ক্তি ২ : পেদ্রো রোহাস সম্ভবত কাল্পনিক কোনো মানুষ একেবারেই সাধারণ মানুষদের মধ্য থেকে উঠে-আসা, দরিদ্র, দীন, শ্রমিক ও অশিক্ষিত—পেদ্রো রোহাস সম্ভবত সদ্য লিখতে শিখেছেন। সব

বানান শুদ্ধ ক'রে লিখতে পারেন না এখনও। আমরা 'দির্ঘজিবি' বা 'পরামর্ব' এই বানান দিয়ে মূল কবিতার এই দিকটিকে বোঝাতে চেয়েছি।

৫ মরণের এস্পানিওলা মূর্তি

পঙ্‌ক্তি ২ : ইরুন, ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তে অবস্থিত একটি বাস্ক শহর—সমুদ্র, ডাঙা, আকাশ—তিন দিক থেকে হিংস্র আক্রমণ ক'রে ফাশিস্ত সেনা এ-শহর দখল ক'রে নেয় ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬।

৬

স্পেনের উত্তর বাস্কের সবচেয়ে বড়ো শিল্পনগরী ছিলো বিলবাও—১৮ জুলাই এ-শহর ফাশিস্তদের হাতে পড়েছিলো।

৭

পঙ্‌ক্তি ১৮ : গিহোন, উত্তরে, আস্তুরিয়াস প্রদেশের শহর। দীর্ঘদিন গিহোন ফাশিস্তদের প্রতিরোধ করেছিলো।

৮

পঙ্‌ক্তি ২ : রামোন কোইয়ার সম্ভবত কাল্পনিক কোনো চরিত্র, মাদ্রিদ প্রতিরোধের একজন চাষীযোদ্ধার প্রতীক।

১০ তেরুয়েলের যুদ্ধে শীত

গৃহযুদ্ধের সবচেয়ে ভয়ংকর লড়াই চলেছিলো তেরুয়েলের জন্যে। আবহাওয়া ছিলো প্রচণ্ড (শূন্যের নিচে ২০ ডিগ্রি ঠাণ্ডা ছিলো অনেকদিন) ১৯৩৭-এর ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৮ এর ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এখানে লড়াই চলেছিলো।

১২ খ্রিস্টযাগ

খ্রিস্টযাগ, অর্থাৎ মাস। সাধারণ নামহীন রিপাবলিকপন্থী যোদ্ধারা যেন নামহারা জিশুরই প্রতীক। মৃত্যু ও পুনরুত্থান—এই দুইয়ের মধ্যে দিয়ে লিবারেশন থিওলজির একটি বড়ো রূপককে ফুটিয়ে-তোলা হয়েছে, যেটা পরে ব্যবহার করেছেন নিকারাগুয়ার যাজক, বিপ্লবী ও কবি এর্নেস্তো কার্দেনাল।

১৩ দুরাঙ্গোর ধ্বংসের উদ্দেশে অস্ত্যেষ্টিদামামা

ভিস্কাইয়ার বাস্ক প্রদেশের একটি শহর; অবিশ্রাম জার্মান বোমারু বিমানের হানায় এ-শহর ধ্বংস হয় গের্নিকারই সমসময়ে—২৬ এপ্রিল, ১৯৩৭।

১৫ এস্পানিয়া, আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও এ-পানপাত্র

হেসুক্রিস্তো, বা জিশুর, গেৎসিমানেয় মনস্তাপ (মথি ২৬/৩৯)। কিন্তু ভায়েহো এখানে এটাকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে দেশের মাটিই খ্রিস্টের পিতা হ'য়ে উঠেছে—আকাশ বা স্বর্গবাসী কেউ নয়। দেশের মাটিই মাতা-পিতা সব। 'স্পেন যদি পড়ে', এই শঙ্কার মধ্যেও পুনরুত্থানের পূর্বাভাস আছে—এস্পানিয়া, সে পিতা, সে মাতা ও শিক্ষিকা, কিন্তু যদি সে পড়ে তবে তাকে খুঁজে বার ক'রে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায় আমাদের সকলেরই।

প্রতিরোধে ! প্রতিরোধে !



রবিন পাল

স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও ভারতীয় বুদ্ধিজীবী

বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিজীবীদের পথ-পরিক্রমার ইতিহাসে রুশবিপ্লবের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। স্পেনের গৃহযুদ্ধের গুরুত্বও কম নয়। জনৈক ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে স্পেনের এই যুদ্ধ দেশে-দেশে সৃজনশক্তির এক অসামান্য বিস্ফোরণ সম্ভব করেছিল[১]; জনৈক সমকালীন, গৃহযুদ্ধের প্রথম কয়েকটি মাসে, স্পেনে লক্ষ করেছেন এক নতুন পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি[২]; আর জনৈক কবি স্পেনের চলকে-পড়া রক্ত কীভাবে চুম্বকের মতো ইতিহাসের এক মহান পর্বের কবিতায় কম্পন তুলেছে সে-কথা উল্লেখ করেছেন।[৩]

১৯৩৬-র মধ্য-জুলাইয়ে সেনাপতিদের বিদ্রোহ, ফ্রাঙ্কোর আগ্রাসন এবং যুক্ত-ফ্রন্ট সরকারের প্রতিরোধ স্পেনকে করে তুলেছিল সারা দুনিয়ার বাম ও গণতন্ত্রী আকাঙ্ক্ষা ও বিবেকের রণাঙ্গন। এ ছিল সেদিনের যুববিদ্রোহ, সংস্কৃতিচর্চাকারীদের আত্ম-আবিষ্কারের ঝলকে-ওঠা মুহূর্ত। কিন্তু লেখক, কবি, শিল্পী, গায়কদের মধ্যে এই ব্যাপক আলোড়নের কারণ কী? তাঁদের অবচেতনে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক রচনার যে-ইচ্ছে ছিল এ-লড়াইয়ে তা পূরণের সুযোগ ঘটল। পাউণ্ড, সান্তিয়ানা বা ক্লোদেলের মতো দু-চার জন বিভ্রান্তের কথা বাদ দিলে এই সাধারণ-সূত্রেই মিলিত হয়েছিলেন ভিন্ন পথ ভিন্ন মত ভিন্ন রুচির কবি, বিজ্ঞানী, শ্রমিক ও শিল্পী। একসঙ্গে নেমেছেন তাঁরা ফ্যাসিস্ট সভায় পিকেটিং-এ, পত্রিকা বিক্রির জন্য রাস্তায় বা বিতর্কসভায়। তাছাড়া শ্রমজীবী শ্রেণীর রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্নও তাঁদের টেনেছিল স্পেনের পথে-প্রান্তরে। বার্সেলোনায় পৌঁছে অরওয়েল লিখেছিলেন—এ-শহরে শ্রমিকরা যেন চালকের আসনে বসেছে। শ্রমিক অধিকৃত প্রতিটি অট্টালিকায় দেখি লাল পতাকা, প্রতিটি দোকান ও কাফেতে সমবায়ত্বের ঘোষণা, লোকজনের গায়ে শ্রমিকসুলভ শস্তা পোশাক, মনে হচ্ছে বিত্তবানদের দিন আর নেই। অরওয়েল, কোয়েসলার, হেমিংওয়ে, স্পেণ্ডার সাংবাদিক হিশেবে স্বপ্নসম্ভবের বিবরণী লিখতে ছুটে আসেন। লেখক ও শিল্পীরা গাড়ির ড্রাইভার, গাড়ি-মেরামতকারী, শুশ্রূষাকারী এবং ডাকবিভাগের কাজে নির্দ্বিধায় নেমে পড়েন। শুধু লেখক ও সাংবাদিক নয়, চিত্রকর, সংগীতজ্ঞরাও মোটেই নিষ্ক্রিয় থাকেননি। এ-ব্যাপারে পিকাসো, মিরো, রোবসন প্রভৃতির নাম প্রথমেই মনে পড়ে। এবং রণাঙ্গনে আত্মাহুতি

দিয়েছিলেন কডওয়েল, কর্নফোর্ড, ফক্স প্রভৃতি তরুণের দল। স্পেনের গৃহযুদ্ধে অনেক উল্টোপাল্টা ঘটনা ঘটেছে। তা নিয়ে নানা জটিল ব্যাখ্যা এবং তথ্যের কারচুপি ঘটেছে। কিন্তু স্পেনের এই সংগ্রাম যেমন লেখক কবি শিল্পীকে কলম ও তুলি ধরতে প্রবুদ্ধ করেছিল তেমনি আন্তর্জাতিক বাহিনীতে নাম লেখানোর জন্য দলে-দলে তরুণেরা ভিড় করেছিল এ-বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধতা নেই।[৪] সুতরাং সি. ডে. লুয়িসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি—স্পেনের গৃহযুদ্ধ ছিল আলো আর অন্ধকারের দ্বৈরথ।

সংবাদপত্র এবং পত্রিকা পুস্তিকা মারফৎ এই যুদ্ধের এলোমেলো খবর নিশ্চয়ই কলকাতায় তাড়াতাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল। আজ পঞ্চাশ বছর পরে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীমানসে স্পেনের যুদ্ধের তৎকালীন প্রতিক্রিয়ার একটি সংক্ষিপ্ত, তবে অসম্পূর্ণ, রূপরেখা চেষ্টা করা যেতে পারে।

১৯৩২-৩৪ লণ্ডনে প্রবাসী তরুণ ভারতীয়দের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে ভারতবর্ষীয় প্রগতি লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি সংগঠন গড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের সপ্তম অধিবেশনে ডিমিট্রভের যুক্তফ্রণ্ট বিষয়ক বক্তব্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নানা ভঙ্গি গঠনে উদ্দীপনের কাজ করে। এ এক বছর আগের ঘটনা। ১৯৩৬-এই লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময় ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম অধিবেশন, তেসরা সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রফুল্ল রায়, প্রেমচন্দ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নরেশ সেনগুপ্ত, নন্দলাল বসু প্রভৃতি বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষরসহ একটি আবেদনপত্রের প্রকাশ প্রসঙ্গত স্মর্তব্য।

ফ্যাসিজম ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ জনমত গঠনের প্রচেষ্টা চলছিল ইউরোপে, **League Against Fascism and War** এই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়। এর ভারতীয় শাখার উদ্যোগে কলকাতায় সাতাশে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬-এ কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে প্যালেস্টাইন ও স্পেন দিবস উদ্‌যাপনের জন্য একটি জনসভা হয়। সেখানে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল "স্পেনের জনগণের পপুলার ফ্রণ্ট গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট বিদ্রোহীদের অভ্যুত্থানে যে-পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে" তাতে গভীর আতঙ্ক প্রকাশ, স্পেনের জনগণের বীরোচিত সংগ্রামের প্রতি "ভারতবর্ষের একাত্মবোধে"র কথা। জগৎবরেণ্য ফরাশি কথাসাহিত্যিক এবং ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধ বিরোধী বিবেকের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রোমাঁ রোলাঁ স্পেন সম্পর্কে একটি আবেদন প্রচার করেছিলেন। ১৯৩৬, বিশে নভেম্বরের এই আবেদনটি ভারতবর্ষেও প্রচারিত হয়। এতে মাদ্রিদের ধূমায়িত প্রস্তর-স্তূপ থেকে আর্তের ক্রন্দন, সহস্র-সহস্র নারী ও শিশুর জীবন্ত দহনের উল্লেখ করে রোলাঁ আবেগস্পন্দিত কণ্ঠে

বলেছিলেন—"মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব। আজ আমি তোমার দ্বারে ভিখারী। এসো স্পেনকে সাহায্য করো। আমাদের সাহায্য করো। তোমাদের সাহায্য করো। কেননা তুমি আমি সকলেই আজ বিপন্ন।...আজ যদি তোমরা হাসপাতাল, যাদুঘর, শিশুদের ক্রীড়াউদ্যান, ঘন জনপূর্ণ অঞ্চলে বোমাবর্ষণ বন্ধ না-করো—তাহলে হে জগতের অধিবাসীবৃন্দ, শীঘ্র হোক, বিলম্বে হোক, তোমাদের ভাগ্যও অনুরূপ হবে।"

জাতি, দল, ধর্মের উর্ধ্বে উঠে কল্যাণ-আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একযোগে পীড়িতের সাহায্য ও সেবায় হস্ত-প্রসারণে রোলাঁর এই আবেদন ভারতীয় বিবেকবান চিত্তে সাড়া জাগিয়েছিল বলে শোনা যায়। রোলাঁর আবেদন-পত্রটির ব্যাপক প্রচারের জন্য পূর্বোক্ত সংঘের পক্ষ থেকে P. P. Francis Jourdain 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে একটি পত্র দেন। জানুয়ারি, ১৯৩৭-এ প্রকাশিত ওই পত্রে মাদ্রিদে বোমাবর্ষণের উল্লেখ করে সম্পাদক মহাশয়কে কিছু মন্তব্য করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত বলা যায় 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় স্পেনের নানাবিধ সংবাদ নিয়মিত প্রকাশিত হত। ভারতবর্ষ থেকে প্রেরিত একটি অ্যাম্বুলেন্সের ছবিও ছাপা হয়। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পূর্বে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট, সোসালিস্ট ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা মিলে যুদ্ধ ও ফ্যাসি-বিরোধী সংঘের একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেন যা পরে একটি সর্বভারতীয় কমিটিতে রূপ নেয়। নেপাল মজুমদার লিখেছেন, এই কমিটিই বিশ্বশান্তি কংগ্রেস, আবিসিনিয়া, প্যালেস্টাইন ও স্পেনের ব্যাপারে বাংলাদেশে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন।[৫] কিন্তু সেই নেতৃত্ব কাজের কাজ কতটুকু করেছিল এ-কথা ভেবে পরবর্তী প্রজন্ম মনঃক্ষুণ্ণ হতে পারে সংগত কারণেই। যা-হোক, পূর্বোক্ত সংঘের সভাপতি পদ গ্রহণের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ সম্মতি দেন। স্পেনের দুর্গতিতে বিচলিত কবি ফ্যাসিস্ট বর্বরতার তীব্র নিন্দা করে রিপাবলিকান সরকারের সাহায্যের জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান। 'স্টেটসম্যানে' তেসরা মার্চ, ১৯৩৭ প্রকাশিত এই আবেদন মারফৎ রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিজমকে রোখার, জ্ঞানোন্নতি বিরোধিতা ও জাতিবিদ্বেষ প্রভৃতিকে চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যান করার কথা স্পষ্ট করে বলেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন স্পেনীয় গণতন্ত্রের সাহায্যার্থে লক্ষ-লক্ষ মানুষ এগিয়ে আসবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লক্ষ-লক্ষ মানুষ কি এগিয়ে এসেছিল? অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রেও (২০।৯।১৯৩৯) 'নন-ইণ্টারভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে করে দেওয়ার' কথা আছে।[৬] সমকালে তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একাধিক বিবৃতির

কথাও প্রসঙ্গত স্মরণীয়। এই সময় কলকাতা থেকে বারবুস, রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের ছবি ও এই আবেদন সহ *Spain* নামে একটি প্রচারপুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। স্পেন বিষয়ক একটি কবিতা সংকলন প্রকাশের কথাও শোনা যায়। ১৯৩৭ সালের এগারোই মার্চ পূর্বোক্ত সংঘের উদ্যোগে সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে একটি জনসভা হয়, যেখানে সভানেত্রী ছাড়াও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা স্পেনে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

ঐ দিনই সভায় 'স্পেন সাহায্য ভাণ্ডারের' উদ্বোধন হয়। এই সাহায্য ভাণ্ডারের সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল জহরলাল এবং 'লীগ এগেনস্ট ফ্যাসিজম অ্যাণ্ড ওয়ার'-এর উদ্যোগে। অ্যালবার্ট হলের সভায় দেশবাসীর কাছে অকাতরে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছিল। বাংলার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা স্পেন সংগ্রামের তাৎপর্য ও শিক্ষা জনগণের মধ্যে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় এক সপ্তাহব্যাপী সভাসমিতি ও মিছিলের কার্যসূচি নিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। বারোই এপ্রিল 'বঙ্গীয় স্পেন সাহায্য কমিটি'র উদ্যোগে স্পেন সপ্তাহের প্রথম দিন উপলক্ষে এক বিরাট সভা হয়, যার সভাপতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। এ-সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণদা মজুমদার প্রভৃতি। পরদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয়েছিল বলে শোনা যায়। এইসব সভা প্রভৃতি মারফৎ সংগৃহীত সাহায্য স্পেনে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছিল।[৭] অবশ্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্পেনে সাহায্য পাঠানোর আবেদন জানানো হয়েছিল ইতিপূর্বেই। এ-ব্যাপারে জহরলাল নেহরুর ভূমিকা ছিল সদর্থক। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—স্ত্রী-বিয়োগের পর য়ুরোপ থেকে ফেরার কালে রাজনীতিতে তিনি সাময়িকভাবে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ-সংবাদ শুনে তিনি সংগঠনে অধিকতর আত্মনিয়োগের দায়িত্ব অনুভব করেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল আবিসিনিয়া, স্পেন ও মধ্য-ইউরোপের সমস্যার সঙ্গে ভারতের ভাগ্য জড়িত।[৮] এইসব দেশের সমর্থনে নানাস্থানে সভা, মিছিল, ঔষধ ও খাদ্য পাঠানোর চেষ্টার কথাও তিনি বলেন। ১৯৩৮-র গ্রীষ্মে রিপাবলিকান সরকারের আমন্ত্রণে জহরলাল অল্পদিনের জন্য বার্সেলোনায় যান। এখানে এক হোটেলে থাকাকালীন নিত্য বিমান আক্রমণ-সংকেত, বিমানধ্বংসী বন্দুকের শব্দ সত্ত্বেও তাঁর লেখা থেকে আমরা জানি যে, শহরের মানুষদের জীবনযাত্রা ছিল পূর্ববৎ। তাঁদের অদম্য নৈতিকতা, প্রতিরোধস্পৃহা ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তীব্র ঘৃণার দিকটা এই ভারতীয় রাজনীতিনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টি আদৌ এড়িয়ে যায়নি। যেমন তিনি

স্পষ্টত স্পেন প্রসঙ্গে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করেছিলেন।[৯] নেপাল মজুমদার মহাশয় তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে জানিয়েছেন—"বলা বাহুল্য স্পেনের ব্যাপারে দীর্ঘকাল ভারতে এই আন্দোলন চলিতে থাকে।" কিন্তু সত্যিই কি তা চলেছিল? তার বিবরণ আমরা কোথায় পাবো? বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতিদান, সংগঠন, বক্তৃতা-সভা, চাঁদা তোলার এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বস্তুত বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নানা দেশেই ঘটেছিল। শুধু এটুকুর কার্যকারিতা কতটুকু সকলেই জানে। কিন্তু তারপর? দু-দিক থেকে ব্যাপারটা দেখা দরকার। প্রথমত, এই যুদ্ধের সংবাদে আন্তর্জাতিক সংহতির স্বার্থে ক-জন ভারতবাসী ছুটে যেতে পেরেছিলেন বা তাগিদ অনুভব করেছিলেন? দ্বিতীয়ত, এমন-একটি যুদ্ধ আমাদের সংস্কৃতিভক্ত হৃদয়কে কতটা বিচলিত করেছিল? তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পালা-বদল কি ঘটেছিল? প্রথম প্রশ্নের উত্তর—তরুণ মরাঠী কমিউনিস্ট বালমুকুন্দ ও হুদ্দার আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগ দেন। আরেক লেখক জানান এদের একজন ব্রিটেন ও অন্যজন আমেরিকা থেকে যুদ্ধে যোগ দেন ও দ্বিতীয় জন নিহত হন। এঁদের এই আত্মবলিদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু আর-কেউ? মুল্‌করাজ আনন্দের রচনার এক গবেষক জানান মুল্‌করাজও নাকি যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু এ-তথ্য সমর্থিত নয়। তবে তিনি স্পেনে গিয়েছিলেন এবং ১৯৩৭ সালে জুলাই মাসে মাদ্রিদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রগতিপন্থী লেখক-সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন এ-কথা জানান ষ্টিফেন স্পেণ্ডার।[১০] এবার আসা যাক দ্বিতীয় প্রশ্নে। কবিতা ও যাবতীয় শিল্পের পুষ্টি ও বিকাশ ঘটে দেশ ও বিদেশের নানা ঘটনাপ্রবাহের ধাক্কায়। স্পেনের সংগ্রাম কতটুকু আনুকূল্য করেছিল আপাতত সেটুকুই আমাদের আলোচ্য।

প্রথমেই কবিতার প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। ষ্টিফেন স্পেণ্ডার এ-যুদ্ধকে একদা *a poet's war* বলেছিলেন।[১১] এই আবেগপ্রবণ উক্তিকে যদি আমরা পুরোপুরি গ্রাহ্য না-করি, তাহলেও স্বীকার করতে হবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্পেনের, তার গৃহযুদ্ধকে নিয়ে রচনার মধ্যে কবিতার সংখ্যাই সর্বাধিক। রবীন্দ্রনাথের সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী বহু আলোচিত কবিতাগুলির মধ্যে আমরা শুধু "আফ্রিকা" (১৯৩৬), 'প্রান্তিকে'র শেষ দুটি কবিতা (১৯৩৭), "প্রায়শ্চিত্ত" (১৯৩৮) ও "অপঘাত" (১৯৩৯) এর উল্লেখ করছি। এ-সব কবিতায় ক্ষুধাতুর আর ভুরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাতের, মানুষজন্তুর হুহুংকারের কথা অবশ্যই আছে। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই বিরোধিতা করেছেন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির। অবন্তী সান্যাল আমাদের জানিয়েছেন —"স্পেন ও চীন তরুণতম কবির চিত্তে আলোড়ন তুলেছিল।"[১২] চীন বিষয়ক

বহু কবিতা চোখে পড়ে। কিন্তু স্পেন? তেমন চোখে পড়ে কি? শুনেছি ১৯৩৮ নাগাদ প্রকাশিত 'অগ্রণী' পত্রিকায় স্পেন-বিষয়ক কিছু বাংলা কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। জন কর্নফোর্ড, র‍্যালফ ফক্স, কডওয়েল প্রভৃতি লেখকের যুদ্ধে অংশ-গ্রহণ ও মৃত্যুবরণে বিচলিত হয়ে 'অগ্রণী' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ সংখ্যায় "অসি ও মসী" নামে একটি কবিতা লেখেন সরোজ দত্ত। সেটি নিম্নরূপ—

"মৃত্যুরে যে প্রাণ বলে ধ্বংস আনে সৃষ্টিছলে
তারি প্রাণ বিনাশের লাগি,
প্রাণের পরিখাদ্বারে নিশীথের অন্ধকারে
যারা রহে প্রহরায় জাগি'—
তাদের অসির আলো ঘুচালো মসীর কালো
অসি মসী এক হয়ে মেশে,—
গাণ্ডিবী রবে না আর রাজকন্যা উত্তরার
ক্লীব-সখি বৃহন্নলা বেশে।"

এই একই মনোভাব থেকে জাপানি সাম্রাজ্যবাদের কথা স্মরণে রেখে আহ্‌সান হাবীব লিখেছিলেন—"হে বাঁশরী অসি হও।" ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রতিরোধ' পত্রিকার শারদীয়া ১৩৪৯ সংখ্যায় সৈয়দ নুরউদ্দিন লিখেছিলেন "ট্রেন্‌চে" নামে একটি কবিতা যা স্পেনের যুদ্ধে নিহত জন কর্নফোর্ডের **"Full Moon at Tierz : Before the Storming of Huesca"** কবিতাটি মনে পড়িয়ে দেয়, যদিও দুটি কবিতার পার্থক্যও নেহাৎ কম নয়। তরুণ সুকান্তের কবিতায় ফ্রান্স, ইটালি, রাশিয়ার কথা একাধিকবার থাকলেও স্পেনের কথা নেই। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। তবে 'পদাতিক' কাব্যের "নির্বাচনিক" কবিতায় আমরা দেখি সুভাষ বুর্জোয়াদের বিপ্লব নিয়ে বাক্‌বিলাসের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে বলেছেন—

"বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ।
মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবে না।
সাম্য অতি খাশা চিজ!—অনুচিত কিন্তু রাজদ্রোহ!"

বিষ্ণু দে নিঃসন্দেহে সাম্যবাদী, যদিও তাঁর কবিতায় দেশকাল পরিপার্শ্বের প্রতি-ক্রিয়া ফোটে অপ্রত্যক্ষ ইঙ্গিতে-ইশারায় বুদ্ধির অতিনিপুণ ভঙ্গিমায় যার ব্যাখ্যা নিয়ে প্রাজ্ঞমহলে তর্ক বেঁধে যেতো। তবু প্রগতিশিবিরের শক্তিমান ও খ্যাত কবিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র (আমার ভুল হতে পারে) যিনি স্পেনের দুর্গতি নিয়ে একটা গোটা কবিতা লিখেছিলেন। এ-ব্যাপারে

অডেনের সঙ্গে তিনি অংশত তুলনীয় সেটি হল 'পূর্বলেখ' কাব্যের "১৯৩৭—স্পেন" নামক কবিতাটি। এ-পর্বেই যেমন তাঁর কবিতায় সামাজিক জগৎ প্রসারিত হয়েছে, তেমনি ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ও বিকাশ যেমন তাঁকে দুশ্চিন্তিত করেছে, তেমনি রাশিয়ার উন্নয়নপ্রকল্প তাঁকে আশান্বিত করেছে। এই পটভূমির প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে 'সেকাল থেকে একাল' গ্রন্থের "জনৈক লেখকের কৈফিয়ৎ" শীর্ষক গদ্যরচনায় বিষ্ণু দে চীন-জাপানের লড়াই, মুসোলিনি-হিটলারের ফ্যাসিজম এবং স্পেনে "সভ্যতার বীরত্ব ও প্রতিক্রিয়ার জোটের কাছে শেষ পর্যন্ত লজ্জাকর হারে"র কথা বলেন। বিষ্ণু দে-র আলোচ্য কবিতাটি সম্পর্কে বিশেষত অরুণ সেন লিখেছেন—"ফ্যাসিবাদের চক্রান্তের 'জীবনজয়ী' সাফল্যে—'প্রণয়' যখন পালায় 'প্রচণ্ড ভ্রূ-র ভঙ্গে' এবং 'রুচির হাসির শুচিতা' মুছে যায় 'অঘোরপন্থী'র 'রক্তে'—তখন সেই প্রবাদবিখ্যাত ক্ষ্যাপা শুধু খুঁজে ফেরে স্পর্শমণি। এই 'স্পর্শমণি'ই 'স্বল্পসত্য'। স্পেনকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞায় 'আন্তর্জাতিক বাহিনী' সেই স্পর্শ-মণিরই খোঁজ পায়, স্বল্প সত্য হ'য়ে ওঠে সাবলীল—'বন্ধনহীন পথ বেঁধে দেয় গ্রন্থি।' কিন্তু অন্য দিকে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে অশুভ আঁতাত গড়ে ওঠে, ভেঙে দিতে চায় ঐ 'স্বল্প সত্যে'র বনিয়াদ। ফ্রাঙ্কোকে মদত দিয়ে চলে প্রত্যক্ষ-ভাবে হিটলারের জর্মানি, মুসোলিনির ইতালি, পরোক্ষভাবে 'মিত্রশক্তি ও ব্রিটেন ও আমেরিকা। 'শিং ভেঙে মেশে স্বার্থে শত্রু মিত্র'।" বিষ্ণু দে আন্তরিক ভাবেই চান—"মানসে আসুক বিরাট বিশ্বচিত্র।" এই টানেই সংগ্রাম ও শত্রুতার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যচেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তিনি বার-বার ফরাশি প্রতিরোধ-আন্দোলনের কবি পল এল্যুয়ারের কথা পাড়েন। এই টানেই "অন্বিষ্ট" নামক দীর্ঘ কবিতার ৪র্থ অংশেও এসে যায় স্পেনের কথা—

> "দৃষ্টি বুঝি পিকাসোর? আল্‌হামব্রার জ্যোৎস্নাও গের্নিকার দহনে ভাস্বর
> ধ্বংসেই বাসর।"

এই টানেই লেখা হয় 'সাতভাই চম্পা' কাব্যের "ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকায় ছায়ায়" কবিতাটি যাতে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময় লোরকার নিষ্ঠুর মৃত্যু স্মরণ ক'রে কবি স্বপ্ন দেখেন ভবিষ্যতের স্বপ্নসম্ভব সমাজে স্বাভাবিক শয্যায় সহজ মৃত্যুর। এ-প্রসঙ্গে আমরা নিশ্চয়ই স্মরণ করবো তাঁর অনুবাদের কথা। যদি স্পেনের গৃহযুদ্ধ প্রসঙ্গ হয় তাহলে অবশ্যই উল্লেখ করা যেতে পাবে এল্যুয়ারের "স্পেনে", লোরকার অনেকগুলি কবিতা, নেরুদার লেখা স্পেনের কারাগারে নিহত "মিগুয়েল এর্নানদেথকে", নিকোলাস গিয়েনের কবিতার অনুবাদের কথা। বিষ্ণু দে-র

কবিতাটির পাশে উল্লেখ করব কোন কবিতা ? মণীন্দ্র রায় "ভিয়েতনাম" কবিতায় প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এ-ভাবে—

"ঐ সারা পৃথিবীর কোটি কোটি অজানা তরুণ—
স্পেনের প্রান্তরে, গ্রীসে, মহাচীনে, কোরিয়ার মাঠে,
এ জীবন জ্বেলে দিয়ে সমিধের কাঠে
তারাই তো ঘরে ঘরে অনির্বাণ প্রাণের আগুন।"

এমনই উল্লেখ দিনেশ দাসের "স্বাক্ষর" কবিতায়ও :

"আমার বেদনা তাই চীন হতে স্পেন সীমা ঘোরে,
এশিয়ার মতো করে ভিড়
আফ্রিকার মতন গভীর।"

স্পষ্টত বোঝা যায় স্পেন এখানে একটি নাম মাত্র। ভিন্নশিবিরের কবিদের মধ্যে আপাতত আমরা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নামোল্লেখ করতে পারি। সুধীন্দ্রনাথের মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ "যে ব্যাপক মাৎস্যন্যায়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তার সঙ্গে পরবর্তী কবিতাসমূহের সম্পর্ক অকাট্য।" 'সংবর্ত' কাব্যের ভূমিকাধৃত এই উক্তি শিরোধার্য করে আমরা দেখতে পাই এই বইয়েই সুধীন্দ্রনাথের ১৯৩৭-৩৮ সালের কবিতায় ব্যক্তজীবনের আততিতে বিশ্বজীবন ও রাজনীতির তরঙ্গ প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৯৩৮ এর সাতাশে জুলাই লেখা "নান্দীমুখ" কবিতায় পাই—

"স্পেনেও হয়তো এমনই অঙ্গভঙ্গি
চিত্রার্পিত অসংহতির সঙ্গী ;
সেখানেও আজ নিভৃতবিলাস লঙ্ঘি,
পণে উপবনে পরদেশী অনীকিনী।
স্পেন থেকে চীন প্রদোষে বিলীন ;
অথচ তাদের চিনি।"

দেখা যাচ্ছে কবি 'পরদেশী অনীকিনী'র কোনো স্তরভেদ করেননি : আন্তর্জাতিক ব্রিগেড এবং ফ্রাঙ্কোর সহায়ক বিদেশী বাহিনীর পার্থক্য তো তাঁর অজানা থাকবার কথা নয়, কারণ একই সময়ে 'পরিচয়ে'র পাতায় এ নিয়ে লেখালিখি হয়েছে, 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক বৈঠকেও এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাই 'স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে / শুদ্ধির তাণ্ডবে' নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিক প্রয়াস, সামূহিক নয়। ১৯৪০ সালের ছয়ই সেপ্টেম্বর "সংবর্ত" কবিতাটি কবি শেষ করছেন এইভাবে—

"রুষের রহসে লুপ্ত লেনিনের মামি,
হাতুড়ি নিষ্পিষ্ট ট্রটস্কি, হিটলারের সুহৃদ স্ট্যালিন,

মৃত স্পেন, ম্রিয়মাণ চীন,
কবন্ধ ফরাসী দেশ। সে এখনও বেঁচে আছে কিনা,
তা স্বদ্ধ জানি না।"

ফ্যাসিজম কম্যুনিজমকে সমার্থক করে তোলার ভ্রান্তি বারট্রাণ্ড রাসেলের ক্ষেত্রে সাময়িক হলেও সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা হয়নি। ১৯৪৫ সালের দশই এপ্রিল লেখা হয়েছে "১৯৪৫", যেখানে বিপ্লবী কণ্ঠের 'জয় হবে জয় হবে' ঘোষণার সার্থকতা না-দেখতে পেয়ে তিনি বিচলিত। এখানে একজায়গায় আছে "রাইনে জুড়ায় বার্সেলোনার দাহ / স্পেনে নিষিদ্ধ যদিও ধর্মঘট।" ইতিহাস-নিষ্ঠ পাঠক-মাত্রেই বুঝবেন রিপাবলিকান সরকারের পতন এবং ফ্রাঙ্কোর রাজত্বের আগ্রাসনের কথা এসেছে এখানে। হয়তো যে-কাল বিপ্লবে (বিশেষত স্পেনে) সাময়িক পিছু-হঠার কাল। সংগ্রামের বাইরে থাকলে এবং জনতার মিতালিকে জঘন্য মনে হলে নিখিল নাস্তিতে নৈরাশ্যের যে-গাঢ় তমিস্রা নেমে আসে, সুধীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যেন তারই প্রতিধ্বনি। এই কবি 'জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে / বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে / নিরুত্তর' হয়ে পড়েছিলেন, যাকে কোয়েসলারি বা অরওয়েলি ভ্রান্তি মনে করে কেউ দুঃখিত, কেউ-বা আত্মপ্রসন্ন হতে পারেন। দেখা যাচ্ছে স্পেনের গৃহযুদ্ধ বাঙালি কবিদের মনে তেমন গভীরভাবে রেখাপাত করতে পারেনি। যদিও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কবিদের প্রতিক্রিয়াই সর্বাধিক, কিন্তু কেন?—সে-প্রশ্নের উত্তর দেবার কথা ঐতিহাসিকের, আমরা আজও তার অপেক্ষায় আছি। স্পেনের গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, নিগৃহীত বা নির্বাসিত কবিদের কবিতা কেন ব্যাপকভাবে অনুবাদ করা হয়নি, বিশেষত চতুর্থ দশকে, তা-ও জানি না। পুরোনো পত্রিকার পাতায় দেখি ইংরাজ শহিদ কবি কর্নফোর্ডের কথা অনেকেই উচ্চারণ করেছেন; কিন্তু আর-সব? পেরুর সাম্যবাদে দীক্ষিত কবি সেসার ভায়েহো সহমর্মিতায় লিখেছিলেন পনেরোটি কবিতা, রিপাবলিকান সৈন্যরাই মুদ্রণের উদ্যোগ নিয়েছিল; স্পেনের বিখ্যাত কবি রাফায়েল আলবের্তি চারণের ভূমিকা নিয়েছিলেন দেশে-দেশান্তরে। ১৯৩৭-এর মাদ্রিদ লেখকসম্মেলনে তিনি শুনিয়েছিলেন ফ্রাঙ্কো-বিষয়ক এক স্বরচিত ব্যালাড। সম্মেলনস্থলের অদূরেই ছিল বোমাবিধ্বস্ত প্রজ্জ্বলিত গৃহস্থালি। আরেক বিস্ময়কর কবি মিগুয়েল এরনান্‌দেথ, যিনি রিপাবলিকান সৈন্যদের সঙ্গে একযোগে ট্রেঞ্চে যুদ্ধ করেছেন, অনুকূল মুহূর্তে শুনিয়েছেন স্বরচিত কবিতা। যুদ্ধান্তে ফ্রাঙ্কো তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। বন্ধুদের হস্তক্ষেপে ক-বৎসরের বন্দীত্বের পর্ব চলে বিভিন্ন জেলে, যক্ষ্মায় মৃত্যুও হয় গরাদের আড়ালে। লুই সেরনুদা, পেদ্রো গারফিয়াস, হোর্হে গিয়েন জনজীবনের

কবিতা লেখার জন্যই দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। পাবলো নেরুদার একটা গোটা কবিতার বইই তো স্পেন নিয়ে। সৈন্যরা হাবিজাবি জিনিশ থেকে কাগজ বানিয়ে বইটি ছাপিয়েছিল। স্পেন নিয়ে এ-সব এবং আরো-অনেক উদ্দীপক গল্পও কেউ করেনি আমাদের কবিদের জন্য। বিশ্ববিপ্লবের বাঁকে-বাঁকে বাঙালি কবির শব্দসচয়নের অতিপ্রজ প্রয়াস কোন দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন করে কে জানে।

এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক সৃজনশীল সাহিত্যের আরেকটি দিক কথাসাহিত্যের দিকে। আপাতত চোখে পড়ছে বামপন্থীলেখক গোপাল হালদারের 'অন্য এক-দিন' (১৯৫০) উপন্যাসের কয়েকটি উল্লেখ। ইতিহাসের ছাত্র ও মার্কসবাদী বুদ্ধি-জীবী নায়ক অমিতের উদ্ভাসিত কল্পনায় স্পেন বেশ কয়েকবার রেখাপাত করে গেছে। যেমন—(ক) "অমিত তাড়াতাড়ি কাগজ খুলিয়া বসিল···মাদরিদ এখনো স্পেনের প্রজাতন্ত্রীরা রক্ষা করিতেছে। ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগ্রেড···মানুষের ভালো করিতেছে কি তাহারা?" এইসূত্রেই তিনি মিলিয়ে দেন বাংলা ও স্পেনকে—"মানুষের ভালো কিরূপে তবে করিবে তুমি, অমিত : রক্তের সঙ্গে রক্ত ঢালিয়া এ-যুগের যৌবন ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড-এ কি তাহারই ইঙ্গিত স্পেনে লিখিতেছে?" (পৃ. ৫০) অন্যত্র বিশ্ববীক্ষা ও বিপ্লবী বিশ্বাসে আত্মস্থ অমিত অনুভব করে—"চিন্তাশীল, সৃষ্টিশীল ইউরোপ শেষে এই মন্দার দুর্যোগে সাম্যবাদী চিন্তা ও প্রয়াসের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। অন্যদিকে উহার প্রতিক্রিয়ায় মাথা তুলিয়াছে হিটলার ফ্রাঙ্কো। আর আগামী দিনের আগমনী স্বরূপ উঠিয়াছে ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড।" (পৃ. ১৫৬) উপন্যাসটির শেষাংশে বিপর্যস্ত স্পেনের সমসাময়িকতায় সংকটাপন্ন সুনীল ভাবে—"সে সমস্যার যে স্বরূপ বোমাবিধ্বস্ত গুয়েনিকা, বার্সিলোনার মধ্য দিয়া স্পেন তাহার সম্মুখে ধরিয়াছে তাহাই কি সুনীলের আপন সমাজ, আপন সংসারও তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরে নাই—ললিতার নির্যাতনের মধ্য দিয়া!" (পৃ. ২৮২) অনেকদিন পরে স্মৃতিচারণাসূত্রে গোপাল হালদার এ-কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি যে—"পৃথিবীব্যাপী ফ্যাসিজম-এর তাণ্ডবলীলা আমরা বই-কাগজে পড়েছি। ঘটনার দুঃসহ সাক্ষ্য ও রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীদের উদাত্ত আহ্বান, এ-সবই তো শুরুতেই হয়েছে। কিন্তু এই মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষের ভাগ্যও যে গঠনের সুযোগ এ-কথা বুঝতে চাইনি। প্রথম মহাযুদ্ধে তখনকার বিপ্লবীরা অপ্রস্তুত হলেও দেশের ভাগ্য গঠনের কথা ভেবেছিল। কিন্তু এই ত্রিশের দশকে আমাদের জাতীয় নেতারা যুগসমস্যা ও যুদ্ধসমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে চাননি; আর জেলে বসে আমরাও গুরুত্ব দিয়ে এই সমস্যার কর্তব্য চিন্তা করিনি।"[১৪] রাহুল সাংকৃত্যায়নের একটি উপন্যাসের নাম "জীনে কে লিয়ে" (১৯৩৯)। সাম্যবাদী

উপলব্ধিতে উত্তরণপ্রয়াসী এই উপন্যাসের নায়ক দেবরাজ লড়েছিলেন ফ্রাঙ্কের রণাঙ্গনে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গিনী, এবং পরে স্ত্রী, জেনি ব্রাউন ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে প্রাণ দেন। মুল্‌করাজ আনন্দ ভারতীয় প্রতিনিধি হিশেবে মাদ্রিদ লেখকসম্মেলনে গিয়েছিলেন ১৯৩৭ সালে। স্পেনের যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার প্রভাব নিশ্চয়ই পড়েছে তাঁর যুদ্ধবিষয়ক উপন্যাস ত্রয়ীতে—*The Village,* (১৯৩৫) *Across the Black Water* (১৯৩৬) এবং *The Sword and the Sickle* (১৯৩৮)-এ। মুল্‌করাজ পার্টি সদস্য ছিলেন না, দায়বদ্ধ লেখক বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না কিন্তু তবু আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিজগতের সঙ্গে প্রগতিমূলক যোগস্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁর নাম উচ্চারিত হবে। স্মৃতিসঞ্চারী উপলব্ধির সঞ্চয় *Apology for Heroism* বইতে তিনি লেখেন—"যখন উৎকট পুঁজিবাদের সারবস্তু ফ্যাসিবাদ মানুষের মৌলিক স্বাধীনতার 'পরে থাবা বাড়াতে শুরু করেছে, যখন ইতিপূর্বেই আক্রমণ আরম্ভ করে দিয়েছে মাঞ্চুরিয়া, আবিসিনিয়া, স্পেন ও ইউরোপ মহাদেশের অন্য অংশে, তখন এই কালে আমি যত বিকশিত হয়েছি, এক নাগরিক চেতনাসম্পন্ন লেখক হিশেবে আমার দায়িত্ববোধও বেড়ে গেছে।" (পৃ. ১২৯) অন্যত্র কিঞ্চিৎ স্বরান্তরে তিনি বলেছেন, "নান্দনিক দিক থেকে, ত্রিশের দশক—এখন যাকে সমাজতান্ত্রিক ভাবাপন্ন কালপর্ব বলা হয়ে থাকে—ছিল ব্যর্থ, কারণ সে-সময় যতটা বীরসুলভ ভঙ্গিমা প্রদর্শন ছিল, ততটা বীরত্ব ছিল না।" (পৃ. ১৯৬) এই সূত্রে আমরা 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি অনুবাদ গল্পের কথা উল্লেখ করতে পারি। প্রথম গল্পটি জনৈক অজ্ঞাতপরিচয় লেখকের লেখা। *Peace* পত্রিকার মার্চ ১৯৫১ সংখ্যার গল্পটি 'পরিচয়ে' শ্রাবণ ১৩৫৮ তে প্রকাশিত হয়। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়াকু স্বামীর স্ত্রী এণ্টোনিয়া জেলের মধ্যে এক মেয়ের জন্ম দেয়, বন্দিনীরা যার নাম দেয়—আশা। ১৯৩৭ সাল থেকে বন্দিনী এক যক্ষারোগগ্রস্ত বৃদ্ধা সবাইকে বলে—জীবনকে ভালোবাসতে হবে নিবিড়ভাবে, মুক্তমানুষের থেকেও বেশি মাত্রায়। শিশু মেয়েটি ছাখে স্পেনের প্রজাতন্ত্র ঘোষণার দিন উদ্‌যাপন উপলক্ষে পতাকা নিয়ে উল্লাস করায় মায়েরা মার খায়, তারা গান গাইতে-গাইতে, জিন্দাবাদ দিতে-দিতে বধ্যভূমিতে যায়। ফ্রান্স থেকে উপহার আসে, স্থানীয় কারখানার শ্রমিকরা ভরসার কথা শোনায়। প্রচারমূলক স্পষ্ট গল্পটির অবিচলিত মনোভঙ্গিটুকু নিশ্চয় কারু দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। স্পেনের গৃহযুদ্ধকালে চার্লস চ্যাপলিনও একটি গল্প লিখেছিলেন, 'পরিচয়' বৈশাখ ১৩৬৯-এ যার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এক তরুণ লয়ালিস্ট মৃত্যুদণ্ডের প্রতীক্ষায়। ফায়ারিং স্কোয়াডের ভারপ্রাপ্ত অফিসার তাকে চেনে, কিন্তু স্মৃতি-রোমন্থন,

বিচার-বিবেচনা আজ অনর্থক। আদেশ দেবার সময় হঠাৎ তার মনে হল বন্দুক-ধারী সৈন্যরা অনড় হয়ে গেছে। তার পালাতে ইচ্ছে করল। অথচ অস্ফুটভাবে সে আদেশ দেওয়ায় সৈনিকরা বন্দুক বাগাল। দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে অফিসার ভাবল হয়তো মৃত্যুদণ্ড স্থগিতের আদেশ আসছে। সে উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে সৈনিকদের থামতে বললেও তারা যন্ত্রের মতো গুলি চালিয়ে দিল। ফ্যাসিস্ট সৈনিকের যান্ত্রিকতাকে এইভাবে চ্যাপলিন সংগ্রামপ্রিয় জনমানুষের ঘৃণার বিষয় করে তোলেন।

কবিতা ও কথাসাহিত্যের দৈন্য কিছুটা মিটেছে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে। ১৯২৬ সালের কিছু আগে থেকেই এ-দেশে প্রগতিমূলক সাহিত্যসংগঠনগুলিতে সাম্রাজ্য-বাদ, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি বিষয়ে যেমন আলোচনা শুরু হয়, তেমনি সংগঠনের লেখকদের প্রবন্ধে সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও প্রগতিশীলতা নিয়ে মন্তব্য বা যুক্তিস্থাপনা দেখা যেতে থাকে। ইংলণ্ডের লেফট্ বুক ক্লাবের মতো সুসং-গঠিত প্রয়াস হয়তো ছিল না, কিন্তু কলকাতার কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে কয়েকটি দোকানে বামপন্থী সংস্কৃতিবিষয়ক বইপত্র পাওয়া যেতে শুরু করে।কিছু-কিছু গোষ্ঠীতে গুরুত্ব-পূর্ণ আলোচনা হত। এই মনোভঙ্গি গঠনে ম্যাক্সিম গোর্কি এবং রোমা রোলাঁর রচনা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যেমন ১৯৩৭ সালে প্রগতিলেখক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রগতি' নামক সংকলনের অন্তর্ভুক্ত "প্রগতি সাহিত্যের রূপ" প্রবন্ধের লেখক বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় জানান তাঁর প্রবন্ধটি রোলাঁ, গোর্কি ও ফক্সের রচনাপাঠের ফল। 'পরিচয়' ১৩৪৩ ফাল্গুনে মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত "১৯৩৬-৩৭" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যাতে আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতির বিবরণ দিতে গিয়ে স্পেনের প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা হয়েছিল : "স্পেনের গণতন্ত্রকে বিধ্বস্ত করার জন্যে জার্মানী আর ইটালী একরকম খোলাখুলিই লড়াইয়ে নেমেছে। … ইংরেজ সরকারের চাপে ফ্রান্সে 'পীপলস্ ফ্রন্ট' স্পেনের গণ-সাধারণের সাহায্যে যেতে পারছে না বটে, কিন্তু স্পেনের গণ-আন্দোলন আজ পৃথিবীকে দেখাতে পেরেছে যে আয়োজনের অভাব, নেতৃত্বের দৌর্বল্য, বিদেশী ফ্যাসিস্টদের দৃপ্ত হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও জনগণের সাফল্য সুনিশ্চিত।" লেখক এই প্রসঙ্গে ইংরেজ সরকারের অনাক্রমণ কৌশলের অন্তর্নিহিত দুরভিসন্ধির কথা যেমন বলেন তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সহধর্মীদের মৈত্রীবদ্ধ প্রতিরোধ-প্রচেষ্টার কথা বলেন। স্পেনের পরিস্থিতি নিয়ে এরূপ স্পষ্ট বিশ্লেষণ সমকালে 'পরিচয়'-এর পাতায় সহজে চোখে পড়ে না। অবশ্য এইসূত্রে একটি "পুস্তক পরিচয়"-এর কথা উল্লেখ করতেই হবে। এই ১৩৪৩ সনেই 'পরিচয়ে' হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

Reporter in Spain **(Frank Pitcairn),** ***Spain in Revolt*** **(Harry Gannes and Theodore Repard),** ***Spanish Front*** **(Carlos Prieto)** ***Behind the Spanish Barricades*** **(John Langdon Davies),** ***The Nazi Conspiracy in Spain*** বই কয়টির আলোচনা করেছিলেন। হীরেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন—স্পেনের "সংগ্রামে একদিকে আছে গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি, আর অন্যদিকে ফ্যাশিজম ও প্রগতিদ্রোহ।" দ্বিতীয় বইটি থেকে পাওয়া যায় "স্পেনের চাষীদের কথা, সেখানকার প্রায় আজগুবি সামরিক ব্যবস্থা···, সে-দেশের চার্চ, শ্রমিক আন্দোলন, প্রাদেশিকতা"র কথা। তৃতীয় বইটিতে আছে স্পেনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তৎকালীণ গণতান্ত্রিক সরকার, তাদের নির্বাচনে জয়লাভ ইত্যাদি। প্রথম বইতে আছে "সভ্য মানুষের সাধারণ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে নির্ভয় আত্মোৎসর্গ আজ চলেছে, তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা।" এইভাবে স্পেনের গৃহযুদ্ধ সূচনাকালীন পরিস্থিতির একটি সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গলিপি যেমন তিনি রচনা করেন তেমনি মন্তব্য করেন—"সভ্যতার আলো নিভাবার চেষ্টা করছে ফ্যাশিস্ট বর্বরেরা, তাই যেন আজ সূর্যের আলোকে এই অপমান সইতে হচ্ছে।" লেখকের "আশা হয় যে আমাদের দেশেও যথাযথ চেষ্টা হবে যাতে ফ্যাশিস্ট শত্রুরা রক্তের বন্যায় স্পেনের জনশক্তিকে হত্যা না-করতে পারে।" এই আশা অবশ্য ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত 'তরী হতে তীর'-এ নেই, সেখানে শুধু "স্পেনে ফ্যাশিস্ট বর্বরতার নিন্দা করে অ্যালবার্ট হলে" বক্তৃতা দেওয়ার (পৃ. ২৯৫) এবং অডেন, স্পেণ্ডার, ডে লিউয়িস, ম্যাকনীস প্রভৃতি কবিদের 'রক্তপতাকাবিলাস' ও 'সাময়িক চমক-জাগানো'র কথা (পৃ. ৩১১) আছে। 'পরিচয়' চৈত্র ১৩৪৩-এ অপরূপ মুখোপাধ্যায়ের "স্পেইনের ছবি" বলে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। তাতে স্পেনীয় চিত্রকলার ধ্রুপদী ঐতিহ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে, কিন্তু গৃহযুদ্ধকালীন স্পেনের চিত্রকলা বা সৃজনশীলতার কোনো কথা নেই। প্রগতিশিবিরের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'অরণি' পত্রিকার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষ। এ-রকম কয়েকটি প্রবন্ধ তাঁর 'ফ্যাশিজম্ ও জনযুদ্ধ' (১৯৪২,) নামের গ্রন্থে সংকলিত হয়। এর মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধটির নাম—"স্পেনের জনসেনা।" হয়তো স্পেনের আন্তর্জাতিক সৈন্যবাহিনী ও তাদের স্বরূপ সম্পর্কে বাংলায় এটি প্রথম বিবরণ। প্রবন্ধের শুরুতেই লেখক বলেন—"মাদ্রিদ ও বার্সিলোনায় ফ্যাশিস্ট মহাযুদ্ধের সতর্কঘণ্টি বাজে ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে।" "বনেদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির শাসকবর্গের নিরপেক্ষতার নিষ্ক্রিয়তার, ক্লীবতার ও ফ্যাশিস্টদের সুদৃঢ় মৈত্রীবন্ধনের" একমাত্র

প্রতিদ্বন্দ্বী হ'লো সশস্ত্র ও স্বাধীন জনসেনাবাহিনী। এরপর আসে অতিসংক্ষেপে এই পরিস্থিতির উদ্ভবের ঘটনাপর্যায়গুলি। এই সূত্রে তিনি দেখান "এই জনসেবাবাহিনীর কোনো ব্যারাক নেই, সরকারী ডিপো নেই অস্ত্রশস্ত্রের। যেখানে-সেখানে তারা ঘুমিয়ে থাকত, রেস্তোরাঁ ও কাফেতে খেত, দোকানদার ও দেশভক্ত অধিবাসীদের কাছ থেকে পোশাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ করত।" নানা উদ্দেশ্যসিদ্ধির মানুষ মিলেছিল এই সেনাবাহিনীতে। তাদের লক্ষ্য কিন্তু একটাই—ফ্যাশিজমের ধ্বংস। স্পেনের নবগঠিত সরকারের স্বার্থদ্বন্দ্বই ফ্রাঙ্কোর জয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল এ-কথার সঙ্গে বিনয় ঘোষ ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে আগত ইংল্যাণ্ডের কতিপয় বুদ্ধিজীবীর নাম করেন এবং জনসেনা কর্তৃক প্রতিরোধের উদ্দীপনাসঞ্চারী বিবরণ দেন। প্রবন্ধের শেষে দু-বছর পর মাদ্রিদের আত্মসমর্পণ, ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের ফিরে-যাওয়ার কথা বলে তিনি প্রশ্ন তোলেন—"ভারতের প্রত্যেকটি নগর ও গ্রাম মাদ্রিদে পরিণত হবে না কি?" বস্তুত স্পেন সংক্রান্ত প্রতিটি প্রবন্ধেই তিনি সংগ্রামী ভারতবাসীর কর্তব্যের কথা তোলেন।[১৫] যেমন—"আজ আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের সঙ্গে পৃথিবীর এই বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীর জীবনপণ সংগ্রামের কোনো পার্থক্য আছে কি?" ফ্যাশিজম জয়ী হলে, সোভিয়েত, চীন পর্যুদস্ত হলে ভারতের স্বাধীনতা শুধু স্বপ্ন থেকে যাবে এ-কথাও বলা হয়। ("শক্তি চাই") আরেকটি প্রবন্ধে পপুলার ফ্রণ্টে প্রগতিশীল দলগুলির অংশগ্রহণ, বিপর্যয়ের কারণসন্ধান, কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান সভ্যসংখ্যার কথা বলে তিনি মন্তব্য করেন—"আন্তর্জাতিক ফ্যাশিস্টবিরোধী ফ্রণ্টে সাম্রাজ্যবাদীরা মিলেছে নিজেদের স্বার্থে, ভারতবাসী যেন তার মুক্তিসংগ্রামের নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য গুলিয়ে না-ফেলে।" ("একতাই শক্তি") অন্যত্র বলেন—"এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ফ্যাশিস্টবিরোধী ফ্রণ্টে ও আমরা সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করতে পারি কি না। উত্তর হ'লো নিশ্চয়ই পারি এবং পারা উচিত।" ("জনযুদ্ধ কেন") বিনয় ঘোষের এই স্পষ্ট, দায়বদ্ধ উপস্থাপনা, উদ্বুদ্ধকরণ-প্রচেষ্টা, সাধ্যমতো তথ্য ও বিশ্লেষণ-নিষ্ঠা এখনও আমাদের কাছে দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হতে পারে।

বিজন রায় ছদ্মনামে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে "জাপানী শাসনের আসলরূপ' নামে সুশোভন সরকার যে-প্রবন্ধ লেখেন তাতে অবশ্য স্পেনের কোনো উল্লেখ নেই তবে তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে নানা দেশের বিপ্লবসম্ভাবনার কথা আছে। প্রসঙ্গত ফ্যাসিজম কী, কোথায় এর প্রথম উদ্ভব, ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরশিপ কী প্রকার ইত্যাদি সহজ করে বুঝিয়ে দিয়ে ফ্যাসিজমের মুখোশ ছিঁড়ে না-ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই এ-কথা জোর দিয়ে বলেন। সুশোভন সরকারের এ-বিষয়ে সবচেয়ে

তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় "স্পেনে অন্তর্বিরোধ" নামে (পরিচয়, ১৯৩৬ সেপ্টেম্বর)। এখানে তিনি স্পেনের অতীত ইতিহাস অতি-সংক্ষেপে উল্লেখ করে চলে আসেন গৃহযুদ্ধকালীন স্পেনের দক্ষিণমার্গীয় চারটি ও বামমার্গীয় চারটি দলের পরিচয়-দানে। কিন্তু স্পেনে দু-পক্ষেই একাধিক দল ছিল এ-কথা আজ অজানা নেই। লেখক বামমার্গীয় দলগুলির অন্তর্বিরোধ এবং সোভিয়েত স্পেনের সম্পর্ক নিয়ে কিছু লেখেননি বলে অনুযোগ তোলা বৃথা, কারণ ১৯৩৬-এর বাংলায় বসে সে-বিষয়ে লেখা সম্ভব ছিল না যদিও সাম্প্রতিক ঘটনার বিবরণধর্মী বহু বইই কলকাতায় আসছিল এ-কথা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন। ১৯৩৭ অক্টোবর 'পরিচয়ে' তাঁর লেখা "স্পেন ও ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতি" প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি জার্মান, ইংরেজ ও রুশ সরকারের সঙ্গে স্পেন সরকারের সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করেন, যদিও পরবর্তীকালে এ-বিষয়ে বহু জটিল তথ্য গত পঞ্চাশ বছরে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৪৪ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় অন্য চারিটি বই সমেত E. Varga-র *The New Fascist Order* বইটি আলোচনাসূত্রে ফ্রান্স ও স্পেনে প্রতিরোধ-আন্দোলনে পপুলার ফ্রন্টের ভূমিকার কথা তিনি বলেন। ১৯৪৫-এর "যুদ্ধান্তের জগৎ" (পরিচয়) প্রবন্ধে প্রশ্ন তোলেন—"এই সেদিন পর্যন্ত স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও চীনের প্রতিরোধ আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু আজকের দিনের শিক্ষিত বাঙালী ইউরোপের অধুনাতম জনজাগরণকে অবহেলা বা ভয়ের চোখে দেখেন কেন ?" সুশোভন সরকার আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ করেছেন বাংলা দেশে কেউ-কেউ বলছেন 'ফ্যাশিজম এমনই বা কি দোষের ?' এই শঙ্কার কথা পূর্বোক্ত মণীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধে বারট্রাণ্ড রাসেল প্রসঙ্গেও বলা হয়েছিল। ১৯৪৬ 'পরিচয়ে' আর্থার কোয়েসলার রচিত ***The Yogi and the Commissar*** গ্রন্থের আলোচনা সূত্রে সুশোভন সরকার বলেছেন, "বামপন্থী লেখক হিসাবে কেস্‌লার খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে তিনি প্রগতিশীলদের দলে লড়েছিলেন, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন।" যদিও ১৯৫৩ সালে কোয়েসলার রচিত আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড ***The Invisible Writing***-এ লড়াইয়ের কথা নেই। যে-কোনো পাঠক দুঃখ করতেই পারেন যে, এই প্রবন্ধগুলি তিনি আরো পরিমার্জন ও সংযোজন করলেন না কেন ?

'লীগ এগেনস্ট্ ফ্যাসিজম অ্যাণ্ড ওয়ার'-এর ভারতীয় শাখা কর্তৃক ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত 'স্পেন' নামক পুস্তিকায় "**The Facist Aggression in Spain**" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যার লেখক সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ-প্রবন্ধে ফ্যাসিস্ট

অত্যাচারে ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবিশেষের সরাসরি সাহায্য এবং কোনো-কোনো সাম্রাজ্যবাদীর অনাক্রমণ ঘোষণার দুরভিসন্ধি উন্মোচন করা হয়েছে। এই নগ্ন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী শক্তিসমূহের সক্রিয়তার কথাও তিনি বলেছেন। ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধ-বিরোধী সংঘের আন্তর্জাতিক তৎপরতার কিছু উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন এ-যুদ্ধকে শুধু দুই বিবদমান স্পেনীয় দলের যুদ্ধ হিশেবে না-দেখে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়াশীল ও গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকামী শক্তির সংঘাত হিশেবে দেখা উচিত। উদাত্ত আহ্বান রেখেছেন যাতে ভারতীয় শ্রমিক, কৃষক, যুবকবৃন্দ স্পেনের সাহসী যোদ্ধাদের পিছনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়।[১৬]

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন-খ্যাত অনন্তলাল সিং 'পরিচয়' (শারদীয় ১৩৫৩) পত্রিকায় "ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড" নামের একটি রচনায় বলেন—আন্দামানে থাকাকালীন "আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারায় স্পেনের গৃহযুদ্ধের শিক্ষা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করেছিল।...ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড এই নতুন নামের নতুন ফৌজ কিছুদিনের মধ্যেই স্পেনের যুদ্ধের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বস্তু হয়ে উঠল—সমস্ত পৃথিবীতে এবং আন্দামানের বন্দীশালায়ও।...প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মতোই উপলব্ধি করলাম, কমিউনিস্ট আন্দোলনের নৈর্ব্যক্তিক প্রাণশক্তি সেই ব্রিগেডের কমিউনিস্ট সৈনিকদের বীরত্ব, ত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা ও মানবতার মূর্ত পরিচয়ের মধ্য দিয়ে।" এই সূত্রেই তিনি বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির চরিত্রগত ঐক্য ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে যাচাই করার এক নতুন মাপকাঠি খুঁজে পান।

তৃতীয় দশকের ইংল্যাণ্ডে বামপন্থী সংস্কৃতি প্রসারে লেফট বুকক্লাব এবং কতিপয় প্রকাশনার সক্রিয় প্রয়াসের কথা অনেকেই জানেন। স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় জুলাই ১৯৩৬ এ, লেফট রিভিয়ু পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যাতেই এ-বিষয়ে দুটি গল্প ও একটি কবিতা বেরিয়েছিল এবং নভেম্বরেই রিপাবলিকান পন্থীদের সমর্থনে বিভিন্ন জমায়েতে "স্পেন" নামে একটি কবিতা অভিনয়ভঙ্গিতে বিভিন্ন জনকে পাঠ করানো হত, পরের মার্চে আন্তর্জাতিক বাহিনী বিষয়ে একটি একাঙ্ক এবং জন লেম্যান-কৃত স্পেনীয় কবিদের যুদ্ধবিষয়ক কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এ-সব বাংলাদেশে কতদূর পৌঁছেছিল জানি না। তবে র‍্যালফ ফক্স এবং ক্রিস্টোফার কডওয়েলের মূল্যবান সংস্কৃতিবিষয়ক প্রবন্ধ যে এখানে তাঁদের আত্মদানের দু-এক বছরের মধ্যে পৌঁছেছিল এ-কথা অনুমান করা যায়। এ-দুজন মার্ক্সবাদী সমালোচকই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য, দুজনেই ১৯৩৭ সালে স্পেনের রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেই শহিদ

হন। এ-ক-জন লেখকের এই আত্মদান আমাদের সাহিত্যসেবীদের কারু-কারু মনে নিশ্চয়ই তরঙ্গ তুলেছিল। জন লেম্যান সম্পাদিত র‍্যালফ ফক্সের নির্বাচিত রচনা ও সমসাময়িক শ্রদ্ধা উচ্চারণের সংকলনটি এ-সময়ই ভারতে পৌঁছেছিল, কিন্তু হয়তো বহুল প্রচারিত হয়নি। কডওয়েলের 'ইলিউসন অ্যাণ্ড রিয়্যালিটি' বরং তাত্ত্বিকগ্রন্থ হিশেবে অধিকতর সমাদৃত ও উল্লিখিত হয়েছে সারা বাংলাতেই।

১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ ঢাকায় ফ্যাসিবিরোধী কর্মীসম্মেলনের প্রাক্কালে রেলশ্রমিকদের মিছিল নিয়ে আসার সময় প্রতিশ্রুতিবান তরুণ লেখক সোমেন চন্দ নৃশংসভাবে নিহত হন। সোমেন চন্দর মূল্যায়ন করতে গিয়ে সতীশ পাকড়াশী লিখেছিলেন—"বিশ্বমানবের কল্যাণে ইংলণ্ডের তরুণ বিপ্লবী সাহিত্যিক র‍্যালফ ফক্সের আত্মদান গণমানবের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বছর চারেক আগেকার কথা। ঢাকা বুড়িগঙ্গার তীরে বসে তরুণ যুবক সোমেনের সাথে এই কথাটাই হচ্ছিল, আগ্রহভরা গভীরপ্রাণে সোমেন ভাবছিল—স্পেনে গণসমষ্টির জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস—আন্তর্জাতিক বাহিনী—ব্রিটেনের গণসাহিত্যিক, ব্রিটেনের বিপ্লবী কমিউনিস্ট র‍্যালফ ফক্সের স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগদান—স্পেনের জনগণের ধনসম্পদের মালিক ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম, বিদেশী কবি সাহিত্যিক অধ্যাপক ও রাজনীতিকর্মীদের জীবন-উৎসর্গ—এইসব টুকরো-টুকরো কথাগুলি একত্রে মিলিয়ে সোমেনের মনে এক অপূর্ব ভাব, বিস্ময় ও পুলকের সঞ্চার হল।" সোমেন চন্দ মরণের মাঝে সাহিত্যিকদের ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা শুনে উত্তেজিত হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিল এঁরাই সত্যিকারের সাহিত্যিক। দেখা যাচ্ছে তরুণ সোমেন চন্দ এই 'প্রকৃত' জীবনচর্যার পথ বেছে নিচ্ছিলেন, এমন সময় তিনি প্রাণ হারান। সোমেন চন্দ যে কডওয়েল লিখিত 'ইলিউশন অ্যাণ্ড রিয়্যালিটি' পড়ে বোঝবার চেষ্টা করছেন সে-কথাও জানা যাচ্ছে।[১৭] কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'একতা'-য় (১০ই মার্চ, ১৯৭৩) একটি প্রবন্ধে সোমেনের নিহত হওয়ার প্রসঙ্গে তাঁকে র‍্যালফ ফক্স ও কডওয়েলের সঙ্গে তুলনা করেন। সোমেন চন্দর বন্ধু কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছিলেন—"স্পেনে গণতন্ত্রীদের পতন হবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারলেন যে ফ্যাসিস্টদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আরো জোরদার ও মজবুত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।"[১৮] (এখানে 'তাঁরা' অর্থাৎ বাঙালি প্রগতিশীল লেখকবৃন্দ) শ্রীসরলানন্দ সেন সোমেন চন্দর হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ বিবরণ দিতে গিয়ে মন্তব্য করেন, ফ্যাসিবাদীরাই সোমেন চন্দর ঘাতক এবং স্মরণ করিয়ে দেন যে "জার্মানিতে হিটলার, ইটালিতে মুসোলিনি এবং স্পেনে ফ্রাঙ্কোর অভ্যুদয়ের সময় অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে সভা ভাঙিয়া

ফেলিয়া এবং অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অপসারিত করিয়া ফ্যাসিবাদী দল জনসাধারণ এবং গভর্নমেণ্টকে একেবারে হতবুদ্ধি করিয়া দিয়াছিল… ।"[১৯] দক্ষিণ কলকাতা ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সোমেন চন্দের স্মৃতিতে 'প্রাচীর' নামে একটি সংকলন বার করা হয়, তাতে একটি প্রতিবেদনের শীর্ষনাম ছিল "No Passaran"। এই প্রতিবেদনের শুরুতেই ছিল— "স্পেনের গণশক্তি একদিন ফ্রাঙ্কোর হঠকারিতার জবাব দিয়েছিল ধারালো বেঅনেটে। মাদ্রিদ জ্বলেছে, ফ্যাসিস্টদের বর্বর অভিযান প্রতিহত করতে গিয়ে দেশের শ্রেষ্ঠ যুবকেরা মৃত্যুবরণ করেছে। হিটলার, মুসোলিনির মারণাস্ত্র নিয়ে ফ্রাঙ্কো জয়ী হয়েছে, কিন্তু স্পেনের গণতন্ত্রীরা টলেনি। আন্তর্জাতিক বাহিনীর রক্তে দেশে-দেশে মুক্তিকামী রক্তবীজ জন্ম নিয়েছে।" এরপর চীন, সোভিয়েতের প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে বলা হয় ভারতবর্ষেও একটা প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে উঠছে।[২০] রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন ঢাকার প্রগতি লেখকশিবিরের অন্যতম সহযোগী। 'প্রতিরোধ' পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় অর্থাৎ পয়লা আষাঢ় ১৩৪৯ সংখ্যায় তিনি "যুদ্ধসাহিত্যের রূপান্তর" বলে একটি ছোটো প্রবন্ধ লেখেন। তাতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন যুদ্ধসাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে লেখেন— "জীবনের মর্যাদা-রক্ষার জন্য এই বলিষ্ঠ ও কার্যকরী প্রয়াসের মধ্য থেকেই এল যুদ্ধসাহিত্যের রূপান্তর। স্পেন ও চীনের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে এই সাহিত্যধারা প্রবলবেগে উৎসারিত হলো। যুদ্ধকে চিরকালের জন্য নির্বাসিত করার উদ্দেশ্যে, যুদ্ধের ভিত্তিতে ধ্বংস করার আবাহন ঘোষিত হলো।" এই প্রবন্ধে থিয়োডোর ড্রাইজার, আলেক্সি টলস্টয় বা শলোকভের নামোল্লেখ থাকলেও স্পেনের গৃহযুদ্ধে যে-সব লেখক ও শিল্পী অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু কেন? হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত পুস্তকপরিচয়ে লিখেছিলেন—"স্পেন সম্বন্ধে সম্প্রতি এত বই বেরিয়েছে যে একটা ছোটোখাটো লাইব্রেরি শুধু তাই দিয়ে প্রায় ভরানো চলে।" এ ১৩৪৩ সনের কথা। রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধের তথ্যাভাব খানিকটা মিটিয়েছেন নীরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর "স্পেনে গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি" শীর্ষক রচনায়।[২১] স্পেন গৃহযুদ্ধের দশম বার্ষিকী স্মরণে রচিত এই তাৎপর্যপূর্ণ রচনায় নীরেন্দ্রনাথ সংগত ভাবেই বলেন—"বিশ্বসংস্কৃতির ইতিহাসে ইহার (অর্থাৎ ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড) অনুরূপ কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।" এরপর বায়রন, শেলি, সুইনবার্নের প্রসঙ্গ উত্থাপন করার সঙ্গে-সঙ্গে আন্দ্রে মালরো, অডেন ও হেমিংওয়ের প্রগতিকামী প্রয়াসের কথা তিনি বলেন। এইসূত্রে তিনি স্পেনযুদ্ধে

নিহত বিজ্ঞানের প্রতিভাধর ছাত্র ডেভিড গেস্ট, ইতিহাসের কৃতী ছাত্র জন কর্নফোর্ড এবং প্রখ্যাত সমালোচক র‍্যালফ ফক্সের উল্লেখ করেন ও বলেন এঁরা তিনজনই মধ্যবিত্ত সন্তান ও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু কডওয়েল এসেছিলেন নিম্নবিত্তশ্রেণী থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ না-নিলেও প্রতিভা ছিল প্রথম শ্রেণীর। নীরেন্দ্রনাথ সেই কালেই কডওয়েলের রচনার মার্কসীয় বীক্ষার সামর্থ্য পরিমাপ করতে পেরেছিলেন। রচনার শেষে তাঁর আহ্বান—"বৈদেশিক মন্ত্রী বেভিন আর কতকাল আপন পক্ষপুটে এই ক্ষুদে হিটলারকে আগলাইয়া রাখিবেন? ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবী জনসাধারণ আর কতকাল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির এই ব্যভিচার সহ্য করিবেন?" অন্য-একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন—"দৃপ্ত মনুষ্যত্বের অপরাজেয় বাণী একমাত্র যে কবির কাব্যে মেলে তা হল—জন কর্নফোর্ড, যে একুশ বছরের তরুণ কমিউনিস্ট প্রাণ দিল স্পেনের গৃহযুদ্ধে। কর্নফোর্ডের উল্লেখে স্বভাবতই মনে পড়ে আমাদের দেশের সুকান্তর কথা, যে কুড়ি বছরের তরুণ কমিউনিস্ট দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রাণ দিল যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে।"[২২]

নীরেন্দ্রনাথের এই সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এবং সংগ্রামী মনোভাব নিশ্চয়ই বিকাশমান বাঙালি সংস্কৃতিজীবীকে চঞ্চল করেছিল। একই সুরের অনুরণন, হয়তো একটু তীব্রতায় পাওয়া যাবে ১৯৪৯ সালের বাইশে থেকে এপ্রিল অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের চতুর্থ সম্মেলনে চিন্মোহন সেহানবীশ পঠিত "সাহিত্য ও গণসংগ্রাম" প্রবন্ধে। সেখানে একটি জায়গায় চিন্মোহন সেহানবীশ লেখেন—"বাস্তবিক অন্য কর্মীদের মতো গণসংগ্রামের সৈনিক হলে শিল্পসাহিত্যের স্রোত রুদ্ধ হবেই—এ-কথাটা বিচারসহ নয়। আরাগঁর পক্ষে সব থেকে ফলপ্রসূ সময় হল রক্তাক্ত প্রতিরোধের বছর কটি। স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভেসে এল কর্নফোর্ডের অবিস্মরণীয় কবিতা। নাৎসী পদানত ফ্রান্সে পিকাসোর তুলি থামেনি যদিও অন্তরীক্ষচারীদের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিল অব্যাহত।" রাজনীতি-সম্পৃক্ত জীবনের একাংশেই তাঁর সবচেয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল রচনাপর্ব—কডওয়েল প্রসঙ্গে টমসনের এমন মন্তব্যও তিনি উল্লেখ করেন। সমর সেনের সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ে সরোজ দত্ত তাঁর "অতি আধুনিক বাংলা কবিতা" প্রবন্ধের একজায়গায় লিখেছিলেন—"কর্নফোর্ড, কডওয়েল ও হেণ্ডারসনের লেখায় কোথায় ইলিয়টকে বিপ্লবী কাব্যের পুরোধা বলা হইয়াছে জানাইলে সুখী হইব। কডওয়েলের 'ইলিউশন অ্যাণ্ড রিয়ালিটি' যদি সাম্যবাদী সমালোচনার স্ট্যাণ্ডার্ড হয় তবে অডেন, স্পেণ্ডার ও ডে-লুইসকে সাম্যবাদী লেখক বলা চলে না, অতএব উঁহাদের রচনা বিতর্কের মধ্যে না-আনাই ভালো। ইংল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক কাব্যের সমালোচনায় কর্নফোর্ডের

কথাটি আবার স্মরণ করি : 'There is no middle position between Revolution and Reaction'। এই মূলসূত্রই ইউনাইটেড ফ্রন্ট আন্দোলনের ভিত্তি।"[২৩] ('অগ্রণী', মে ১৯৪০)

তৃতীয় দশকে সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিবাদবিরোধী সংস্কৃতিরচনার প্লাবনে অনেকেই মিলেছিলেন উদার প্রাঙ্গণে। মৃত্তিকাস্পর্শী তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে ততটা নয়, কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর সক্রিয়তা সত্যই বিস্ময়কর। কারণ বুদ্ধদেবের সাহিত্যপ্রয়াসে প্রগতিপন্থা পূর্বাপর চোখে পড়ে না। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুই লিখেছিলেন 'সভ্যতা ও ফ্যাশিজম' নামে একটি পুস্তিকা, যা ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ থেকে প্রকাশিত হয়। সেই ব্যতিক্রমী প্রবন্ধে এক জায়গায় বুদ্ধদেব লিখেছিলেন—"এই স্পেনের যুদ্ধে যেটুকু আমার চোখ খোলবার বাকি ছিলো সেটুকুও খুলে গেলো, বোঝা গেলো, পৃথিবীতে লোভ উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে ; বিশেষ একটি শ্রেণীর স্বার্থ সম্পূর্ণ বজায় রাখবার জন্য শুধু যে দুর্বল বিদেশী জাতির উপরেই অত্যাচার চলে তা নয়, স্বজাতিকেও রক্তস্রোতে ভাসানো হয়।" আরেক জায়গায় লেখেন স্পেনের যুদ্ধ থেকে অন্যান্য শিল্পী-সাহিত্যিকদের মতো তিনি শিখেছেন যে জীবিকা, জীবন, চিন্তা ও আত্মপ্রকাশের যেটুকু স্বাধীনতা বিপন্ন হয় শুধু যুদ্ধে জড়িয়ে-পড়া দেশটিতে নয়, অন্যত্রও তার প্রভাব পড়ে। এই প্রবন্ধেই তো তিনি স্বীকার করেছিলেন "আজকের দিনে নতুন আলো জ্বলেছে রাশিয়াতে।" তারাশঙ্কর 'অভিবাদন' পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় অর্থাৎ পৌষ-মাঘ ১৩৪৯ "সংগ্রাম ও শিল্পী" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার একজায়গায় আমরা দেখি লেখক বলছেন—"ফ্রয়েড আইনস্টাইনের দুর্দশা ও অপমান, মেয়েদের অধিকার লোপ, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, চীনের বিরুদ্ধে জাপানের অভিযান দেখলাম। মনে-মনে বার-বার প্রশ্ন করেছিলাম—মানুষ কি এই সহ্য করবে ?" তারাশঙ্করও উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয় শিল্পীর সংগ্রাম জনসংগ্রামের অংশ আর ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম বিশ্বসংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত।[২৪] বুদ্ধদেব বসু বা তারাশঙ্কর চতুর্থ দশকে লেখা এ-দুটি প্রবন্ধকে পরবর্তীকালে আর গুরুত্ব দেননি। কিন্তু কী প্রগতি, কী প্রগতিবিরোধী শিবিরে স্পেনের গৃহযুদ্ধের বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন, গৃহযুদ্ধকালীন বা প্রাসঙ্গিক রচনার অনুবাদ বা সে-সম্পর্কে আলোচনা বাংলা পত্র-পত্রিকায় তেমন চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না।

এক বিদেশী প্রাবন্ধিক স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"কোনো-কোনো যুদ্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কারণ সেগুলি আমাদের চেতনাকে নাড়া দিয়ে যায়।"[২৫] স্পেনের গৃহযুদ্ধ ছিল এমনি এক যুদ্ধ। বামপন্থী লেখক

ও সংস্কৃতি জগতের এক সংগঠক বলেছিলেন—"স্পেনে সত্যি-সত্যি কী ঘটছে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য যখন ক্রমে-ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল…আমার মনে হয় তখন ব্রিগেডে যোগ দিয়ে কে কতটা বেশি কাজে লাগতে পারে এ-বিষয়ে প্রতিটি তরুণ লেখক নিজের সঙ্গে নিজে বিতর্ক শুরু করে দিয়েছিল।"[২৬] এই পথ বেয়েই কিন্তু ইউরোপে বামপন্থী বৈঠকখানা-বিলাস থেকে জনজীবনের পথে নামার সুযোগ ঘটেছিল আরেকবার। আরেকজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন—"জনগণের উপযোগী ভঙ্গিতে, জনগণের স্বরসাম্যে লেখার চেষ্টা এক অসাধারণ, সংকটপূর্ণ, অপরাধ বোধে ভরপুর অবস্থা থেকে ইংরেজ কবিদের মুক্তি দিয়েছিল শুধু নয়, ইংরেজি কবিতাকে যুদ্ধস্তুতির প্রবণতা থেকেও ফিরিয়ে এনেছিল।"[২৭] অবন্তী সান্যাল পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বলেছিলেন—পরাধীনতার কারণেই নাকি আমাদের তরুণ লেখক শিল্পীরা স্পেনীয় ব্যাপারে বেশি আগ্রহ দেখাননি। কথাটা কি সত্যি? তা যদি হত তাহলে চীন ও রাশিয়ার মরণজয়ী সংগ্রাম ভারতীয় লেখক কবি শিল্পী-গায়কদের মনে তীব্র তরঙ্গ তুলত না। শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্তের বাঁচা-মরার সংগ্রামে সামিল হয়ে সে স্মরণীয় শিল্পরচনার স্বাক্ষর রাখতে পারত না। কারণ যাই হোক, সে-প্রয়োজন যে দুর্ভাগ্যমলিন পৃথিবীতে ফুরিয়ে যায়নি, স্পেনের গৃহযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরে আমরা যেন তা ভুলে না-যাই।

তথ্যপঞ্জি :

১ *The Spanish Civil War*—Hugh Thomas, p. 617.

২ *The Thirties*—Julian Symons. p. 109

৩. *Memoirs*—Pablo Neruda, p. 128.

৪ ইটালির কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান লুইজি লোংগো জানান, ১৯৩৬-এর শরৎ থেকে ১৯৩৮-র গ্রীষ্ম পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ থেকে আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন ত্রিশ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবী। লীগ অভ নেশনস্-এর মিলিটারি কন্ট্রোল কমিশনের সতর্ক হিসেব অনুযায়ী সংখ্যাটা হল ৩২,১০৯—*International Solidarity with the Spanish Republic*, Moscow, P. 18, 370.

৫ 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' (৪র্থ)—নেপাল মজুমদার, পৃ. ১৬৩

৬ 'চিঠিপত্র', ১১শ খণ্ড, পৃ ৩০৪-০৫

৭ নেপাল মজুমদারের পূর্বোক্ত বই, পৃ ১৭৭

৮ *An Autobiography*—Jawaharlal Nehru, p. 601

৯ *Selected Works of Jawaharlal Nehru* (Vol : 9), গ্রন্থে সংকলিত প্রতিবেদন, p. 17, 25

১০ *The Thirties and Afier*—Stephen Spender, P. 70.

১১ পরবর্তীকালে স্পেণ্ডার অবশ্য তাঁর অন্য কয়েকজন সতীর্থ বন্ধুর মতো এ-বিষয়ে মতামত কিছুটা বদলে ফেলেছিলেন। যদিও কোয়েসলার বা অর-ওয়েলের মতো এই বদলানো মতামত অতটা তীব্রতিক্ত নয়।

১২ 'পরিচয়' জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ সংখ্যায় প্রকাশিত "ফ্যাসিবিরোধী দশক" প্রবন্ধ।

১৩ 'বিষ্ণু দে : এব্রতযাত্রায়'—অরুণ সেন, পৃ. ৮৯

১৪ 'পরিচয়', ১৩৮৯-এ প্রকাশিত "রূপনারাণের কূলে" নামক ধারাবাহিক স্মৃতিকথা।

১৫ রোমাঁ রোলাঁ যে-আবেদনপত্র রচনা করেছিলেন (এ-প্রবন্ধে উল্লিখিত) তাতে এই সুর ছিল। ১৯৩৬ সালের জুনমাসে বিশ্বখ্যাত লেখকবৃন্দের একাংশ "To the writers and Poets of England, Scotland, Ireland and Wales" নামে একটি আবেদনপত্র রচনা করেন। তাতে বলা হয়েছিল—"আজকে পক্ষাবলম্বন একান্তই জরুরি। স্পেনে যে-সংগ্রাম চলছে তা অন্য দেশেও ঘটতে পারে। সুতরাং এ-প্রশ্ন আমরা তুলছি—তুমি কি রিপাবলিকান স্পেনের জনগণের আইনানুগ সরকারের পক্ষে না বিপক্ষে, তুমি কি ফ্রাঙ্কো এবং ফ্যাসিবাদের পক্ষে না বিপক্ষে?" বিনয় ঘোষ তাঁর প্রবন্ধে এই প্রবণতারই পরিচয় দিয়েছেন। এই এই আবেদনপত্রটি *The Penguin Book of Spanish Civil War Verse* গ্রন্থের ভূমিকায় উদ্ধৃত, p. 49-50

১৬ প্রবন্ধটি পাওয়া যাবে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত *Against the Stream* (Vol 1 & 2] নামক গ্রন্থে।

১৭ সমীন্দ্রকুমার ছোড়, "প্রতিরোধ" ১৩৫০, সোমেন স্মৃতিসংখ্যা, 'সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ' (২য়), সম্পাদনা—দিলীপ মজুমদার, গ্রন্থে উদ্ধৃত।

১৮ সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ (২য়), পৃ. ১৯৮

১৯ সরলানন্দ সেন, "প্রতিরোধ" ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯, দিলীপ মজুমদারের গ্রন্থে উদ্ধৃত।

২০ 'বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য', মনীষা, পৃ. ৪৭

২১ 'পরিচয়', শ্রাবণ ১২৫৩

২২ "সাহিত্যবিচারে মার্ক্সবাদ", 'পরিচয়', বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫৫.

২৩ 'অগ্রণী', মে ১৯৪০; প্রবন্ধটি বর্তমানে পাওয়া যাবে ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত 'মার্কসবাদী সাহিত্যবিতর্ক' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে।

২৪ বুদ্ধদেব বসু এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দুটি পাওয়া যাবে 'বাংলার ফ্যাশিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য', মনীষা

২৫ *The Auden Generation*—Samuel Hynes, p. 242.

২৬ *The Whispering Gallery*—John Lehmann. p. 27-35

২৭ *The Penguin Book of Spanish Civil War Verse*—Valentine Cunningham-এর ভূমিকা p. 87

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

ফ্যাসিবাদ, স্পেন এবং রবীন্দ্রনাথ

ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে স্পেনের রিপাবলিকান সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান শুরু হয় ১৯৩৬ সালের ১৮ জুলাই। তার ঠিক একমাস আগে ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যু হয়—১৮ জুন ১৯৩৬। স্পেনের খবর ভারতে এসে পৌঁছুতে নিশ্চয়ই কিছু সময় লেগেছিল সেকালে। কিন্তু এদেশে ফাসিস্ট মানসিকতা সম্বন্ধে সচেতনতা স্পেনে ফ্রাঙ্কোর অভ্যুত্থানের অপেক্ষায় ছিল না। তার সামান্য প্রমাণ পাওয়া যাবে ওই বছরেরই ২৮ জুলাই লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'পরজাতির শাসনভারপ্রাপ্ত সমস্ত য়ুরোপীয় জাতির মধ্যে' ইংরেজের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে ফ্যাসিবাদের কথা উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রনাথ এ আলোচনার ভূমিকায় এই চিঠিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে 'পোলিটিকাল আন্দোলনে যোগ দেওয়া আমার স্বধর্মবিরুদ্ধ। এতকাল ধরে আমি যে কর্মের ভূমিকা রচনা করেছি আমাদের দেশের পোলিটিকাল আলোড়নের আঁধি তার হাওয়াকে আবিল করে দিতে পারে' এ-আশঙ্কা তাঁর মনে বরাবর ছিল। কিন্তু এ হল পোলিটিকাল আলোড়নের আঁধি থেকে তাঁর স্বধর্মে সনিষ্ঠ থাকার প্রসঙ্গ। তাই বলে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার কোনো বিভ্রান্তি বা অস্পষ্টতা ছিল এ-কথা মনে করবার কারণ নেই। এই চিঠিতেই তিনি লিখছেন, 'ভারতশাসনযন্ত্র ইংরেজজাতি দ্বারা চালিত। এই কারণে এই শাসন যখন আমাদের কোথাও পীড়া দেয় তখন তার আন্দোলনে স্বভাবতই সমস্ত ইংরেজজাতির 'পরেই আমাদের বিরুদ্ধভাব প্রবল হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্রনাথ এই প্রবণতার বিপদ সম্বন্ধে অতীব সচেতন। তিনি বললেন, 'সমস্ত জাতির 'পরে এই অবিচার করার মধ্যে যে অন্যায় আছে যে অসত্য আছে তা আমাদের মনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। তাতে যে প্রমাদ ঘটায় অন্যদিকে তার অনৌচিত্য বিচার না করলেও বলা যেতে পারে যে আমাদের রাষ্ট্রমঙ্গলসাধনায় সে প্রতিকূল।' রবীন্দ্রনাথ যে রাষ্ট্রমঙ্গলসাধনার প্রতিকূলতার ইঙ্গিত করতে ফ্যাসিবাদের আশঙ্কাই করেছিলেন, চিঠির পরবর্তী অংশে সে-কথা আর অস্পষ্ট থাকেনি, য়ুরোপে আরও কয়েকটি বড়ো-বড়ো মহাজাতি আছে, পরদেশীয়দের শাসন করবার ক্ষেত্র আছে তাদের অধীনে। তারা যে আমাদের শাসনকর্তা নয় অন্তত এ-কথাটা আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই স্বীকার

করতে হয়।...রাগ করলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নিজের জাতিধর্ম যতই বিস্মৃত হোন তবু...জোর করে বলতে পারে না আমাদের যা খুশি তাই করব। অনায়াসে বলতে পারত নবাবরা বাদশারা...এবং আজ বলতে পারে য়ুরোপের অধিকাংশ কড়া কড়া জাতি।...ইংরেজের মধ্যে যাঁরা মহৎ তাঁদের অনেককে আমি দেখেছি। তাঁরা স্বজাতিকৃত বা পরজাতিকৃত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হন না।... ইংলণ্ডে রাষ্ট্রচালনা যদি তাঁদের দেশের মহত্তর দলের বিচারবুদ্ধিকে নগণ্য করতে পারতেন তা হলেই মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ আজ হয়তো তাঁদের দ্বারা ভূমিসাৎ হতে পারত। যেমন হয়েছে জর্মানিতে, ইটালিতে, যেমনটা ঘটাতে হাত নিশপিশ করেছে ইংলণ্ডের নবদন্তোদ্গত ফাসিস্টদের। বলা যায় না কালক্রমে ইংলণ্ডে যদি এই ফাসিস্টের রাস্তাই প্রশস্ত হয় তা হলে আন্দামানে লোক-বিরলতা ঘটবে না এবং কৌন্সিলের সকল সভ্যেরই বুলি সমান নম্রমধুর হয়ে উঠবে, যেমন হয়েছে জর্মানিতে, যেমন হয়েছে ইটালিতে।' যাঁরা 'নির্ভয়ে স্বজাতির অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই স্বজাতির সম্মান বৃদ্ধি করেছেন' তাঁদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে জর্মানিতে থাকলে সে-সব মানুষের 'সরকারি বাসা নির্ধারিত হত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে'। মহত্তর ইংরেজ চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা তখন পর্যন্ত অটুট থাকলেও যে 'ইম্পিরিয়ালিজমের বিরাট জালে' জড়িত বিদেশী রাজ্যশাসন ভারতের পক্ষে স্বভাবতই অশুভকর সে-কথা ঘোষণা করতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'আজ শতাধিক বৎসর ইংরেজশাসনের পরেও গ্রামে গ্রামে যে অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, আরোগ্যবিধানের অভাব, পথঘাটের দুর্গতি, শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষীণতা, যে সুগভীর নিরানন্দ, তার দুর্বিসহ পরিব্যাপ্তি চোখের সামনে থেকে আমাকে হতাশ করেছে।' একদিকে জর্মানি ইটালির ফাসিস্টতন্ত্র, অপরদিকে শতাধিক বৎসরের ইংরেজশাসনের শোচনীয় নৈরাশ্য— তার মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি সেদিন বলতে দ্বিধা করেননি, 'সোভিয়েট রাশিয়ার নাম করা এদেশে অপরাধবিশেষ। কিন্তু এই উপলক্ষে না করেও থাকতে পারি নে। বিশাল রাজ্যের অন্নসংস্থান, শিক্ষার ব্যবস্থা, রোগনিবারণ কী অসাধারণ উদ্যমনৈপুণ্য ও যত্নের সঙ্গে সেখানে নির্বাহ করা হচ্ছে তার বিচার করে মনে শ্রদ্ধামিশ্রিত ঈর্ষা না হয়ে থাকতে পারে না।' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ফ্যাসিস্ট দেশের প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে এ-চিঠি লেখার দশ বছর আগে ১৯২৬ সালে মুসোলিনির ইটালিতে। সেই ইটালি ভ্রমণ এবং মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে যে তর্ক-বিতর্ক কোনো কোনো মহলে আজও অব্যাহত তার ভিতরে প্রবেশ না করে ১৯২৬ সালে ইটালি প্রসঙ্গে অ্যাণ্ড্রুজকে লিখিত একটি চিঠি উল্লেখ করা যেতে

পারে। সে-চিঠির উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'It is absurd to imagine that I could ever support a movement which ruthlessly suppresses freedom of expression, enforces observances that are against individual conscience and walks through a blood-stained path of violence. I have said it over and again that the aggressive spirit of Nationalism and Imperialism, religiously cultivated by most of the nations of the West, is a menace to the whole world.' এ-কথাগুলি যে কেবল সমসাময়িকতর্কের জবাবদিহি মাত্র নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে প্রায় দশবছর আগে (১৯১৭) লেখা *Nationalism* গ্রন্থে।

ইতালি ভ্রমণের অনেকদিন পরে (১৯৩৫) তাঁর কোনো স্নেহাস্পদা মুসোলিনিকে তাঁর পুরাতন বন্ধু বলে উল্লেখ করলে তাঁকে আবার লিখতে হয়, 'তোমার চিঠিতে মুসোলিনিকে আমার পুরাতন বন্ধু বলে উল্লেখ করেছ। একদিন প্রকাশ্যভাবে আমার বন্ধুর অত্যাচারের নিন্দা করেছি—সেই অবধি তাঁর রাজ্যে আমার প্রবেশ করা নিরাপদ নয়, তাঁর প্রজারা আমাকে সম্মান ভয় দেখাতে পায়, ইটালিতে আমার ছবি অনেককে গোপন করতে হয়েছে। এই বন্ধুর সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য করে আমি প্রিয়বাক্য বলিনি।'

...

হিটলার-মুসোলিনির দৃষ্টান্ত তিনি ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেছেন। ১৯৩১ সালে সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন সূত্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বের মধ্যে দুর্গতি দেখে লিখেছেন, 'অবশেষে আজ, এমনকি, কন্‌গ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারি নীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল। ছোঁয়াচ লেগেছে।...স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্যে যে বেদী উৎসৃষ্ট সেই বেদীতেই আজ ফাসিস্টদের সাপ ফোঁস করে উঠেছে। মনে হচ্ছে আমি এক জায়গায় লিখেছিলুম, "Proud power tries to keep truth safe in its own exclusive hand with a grip that kills it." ডান হাত দিয়ে নেশনের স্বাধীনতার টুঁটি চেপে ধরে বাঁ হাত দিয়ে তাকে স্বাধীনতার ঢোঁক গিলিয়ে দেবার আশ্বাস দেওয়া কেবল ব্যক্তি বিশেষেরই অধিকারায়ত্ত এই সর্বনেশে মত দেশকে খোকা করে রাখবার উপায়।...ফাসিস্ট দলপতি দলের বুদ্ধির প্রতি একটুও বিশ্বাস রাখে না। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণেরা যখন শূদ্রদের একেশ্বর অধিনেতা ছিলেন তখন সর্বাগ্রে তাদের বুদ্ধিকে পায়ের তলায় চেপে

রেখেছিলেন—হুকুম ছিল পদধূলি পাবে, কিন্তু ছাড়া পাবে না, মেনে চলবে কিন্তু ছাড়া পাবে না, মেনে চলবে কিন্তু ভেবে চলবে না। পৃথিবীতে বোধহয় সেই সর্বপ্রথম ফাসিস্ট নীতির প্রবর্তনা।' এ-চিঠির ছ-মাস বাদে একই প্রসঙ্গে আবার লিখেছেন, 'ইম্পিরিয়ালিজম বলো, ফাসিজম বলো অন্তরে অন্তরে নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে। কন্‌গ্রেসের অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি।' সেবারে কংগ্রেস মঞ্চ থেকে হিটলারের প্রসংসাসূচক বক্তৃতা করা হয়। এমনকি 'মহাত্মাজী কি জয়! হিন্দুস্থানকী হিটলার কি জয়!' ধ্বনি শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথ এ-প্রসঙ্গে নীরব থাকতে পারেননি। তিনি লিখলেন, 'ভিতরে ভিতরে কন্‌গ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তিপূজার বেদী গড়ে উঠছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাইনি যখন মহাত্মাজীকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলিনি ও হিটলারের সমকক্ষ বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন। সত্যের যজ্ঞে যে-কন্‌গ্রেসকে গড়ে তুলেছেন তপস্বী তার বিশুদ্ধতা কি তাঁরা রক্ষা করতে পারবেন শক্তিপূজায় নরবলি সংগ্রহের কাপালিক মুসোলিনি ও হিটলার যাঁদের আদর্শ।'

২

মুসোলিনির কর্তৃত্বে ইতালি আবিসিনিয়া (আজকের ইথিওপীয়া) দখল করে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে বহু ইথিওপীয়কে ইতালির ফাসিস্টরা নির্মমভাবে হত্যা করে। এরই কিছু আগে অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।

স্পেনে ফাসিস্ট আক্রমণের এক বছরের মধ্যে League Against Fascism and War সংস্থার ভারতীয় শাখা গঠিত হয়। সভাপতি হন রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলকাতা থেকে League Against Fascism and War -এর ভারতীয় শাখা আঁরি বারবুস, রোমাঁ রোলাঁ এবং রবীন্দ্রনাথের ছবিসহ *Spain* নামে এক প্রচারপুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই আবেদনে বলা হয়:

To The Conscience of Humanity

In Spain. The world civilisation is being menaced and trampled under foot. Against the democratic government of the Spanish people Franco has raised the standard of revolt. International Fascism is pouring men and money in aid of the rebels. Moors and foreign legionaries are sweeping over the beautiful plains of Spain, trailing behind them death, hunger and desolation.

Madrid, the proud centre of culture and art, is in flames. Her priceless treasures of art are being bombed by the rebels. Even hospitals and creches are not spared. Women and children are murdered, made homeless and destitiute.

The devastating tide of International Fascism must be checked. In Spain this inhuman recrudescence of obscurantism, of racial prejudice, of rapine and glorification of war must be given the final rebuff. Civilisation must be saved from its being swamped by barbarism.

At this hour of the supreme trial and suffering of the Spanish people, *I appeal to the conscience of humanity.*

Help the peoples' front in Spain, help the Government of the people, cry in million voices 'Halt' to reaction, come in millions to the aid of democracy, to the succour of civilisation and culture.

রবীন্দ্রনাথের নামে এই বিবৃতি সংবাদপত্রেও প্রচারিত হল। কয়েকদিনের মধ্যেই সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে কলকাতায় অ্যালবার্ট হলে এক সভায় স্পেন সাহায্য ভাণ্ডারের উদ্বোধন হল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই ঘটনার কয়েকমাস আগে ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে রোমাঁ রোলাঁ দেবদাস গান্ধির এক চিঠির জবাবে লেখেন—'All our forces in Europe are absorbed by

the tragic events in Spain and the threat of war weighing over the whole of the West—the whole of Europe. I am sending you a copy of an *Appeal* which I am sending to every people in aid of the victims of the Madrid massacres. India should at least learn something from the spectacle of the follies and crimes under whose weight Europe is succumbing. She must become aware of the mortal danger in imperialist and racialist Fascisms, which carry the torch of war everywhere and crush every liberty.... Be ware of the German-Italian-Japanese pact! Asia has suffered much under European imperialisms, but those of yesterday still had to take account of certain legal principles written into their democratic nations. Those of tomorrow, founded by Fascist movements, will trample under foot, the last traces of humanity. We in France, over the last two years, have given up our party political qnarrels (Socialists, Communists, Radical Republicans, Catholic Demócrats etc.) to form a Popular Front alliance against Fascism. I call upon you to do the same in India. All over the world, liberty and progress—our great hopes, our reasons for living—are in danger!' এ-চিঠি বস্তুতপক্ষে গান্ধিজির উদ্দেশে প্রেরিত। এ-চিঠিতে রোলাঁর মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই নিবন্ধের সূচনায় উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের চিঠি রোলাঁর এ-চিঠি সমসাময়িক। সাহায্য করার ব্যাপারে গান্ধিজির মত যদিও ছিল ভিন্ন। মারি রোলাঁর আবেদনের জবাবে গান্ধিজি তাঁর পাণ্ডুলিপি বা স্বাক্ষর বিক্রয়ার্থে পাঠাননি। তিনি লেখেন: 'You have asked for my authograph for the purpose of selling it in aid of the stricken women and children of Spain. While that unhappy people has my whole-hearted sympathy, I am not sending my autograph. I am not convinced of the right of employing such means for obtaining money for a good cause. People snould subscribe willingly for such without expecting any return.'

রবীন্দ্রনাথ এর কয়েকমাস আগে প্রগতি লেখকসংঘের পক্ষ থেকে ব্রুসেলস শান্তি সম্মেলনে প্রেরিত এক ইশতেহারে স্বাক্ষর করেছেন। সে ইশতেহারে বলা

হয়েছিল, 'ভারতে ও বিদেশে যে-সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা আশঙ্কা ও উদ্‌বেগ-জনক। সভ্যতার ভাগ্য লইয়া সমরবাদ ও প্রতিক্রিয়া খেলা করিতেছে। তাহাতে সংস্কৃতি লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। সংস্কৃতির প্রতি যাহাদের মমতা আছে, তাহাদের প্রতিনিধিরূপে প্রতিবাদ জানানো আমরা উচিত মনে করিতেছি। এ-সময়ে নীরব থাকা অপরাধ হইবে।...ফাসিস্ট ডিক্‌টেটরি খাদ্যের পরিবর্তে অস্ত্র জোগাইয়া এবং সংস্কৃতির সুযোগের পরিবর্তে সাম্রাজ্য গঠনের প্রলোভন দেখাইয়া নিজের সমর-বাদের মুখোশ খুলিতেছে। আবিসিনিয়াকে পদানত করিতে ইতালি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহাও সভ্যতার প্রতি বিশ্বাসী সকলকে আঘাত করিয়াছে। ...আমরা অন্যান্য দেশবাসীর সহিত সমস্বরে বলিতেছি, আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং তাহা বর্জন করিতে চাহি, যুদ্ধে আমাদের কোনো স্বার্থ নাই।' এই আবেদনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু প্রমুখ অনেকে স্বাক্ষর করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র একটি বাণীতেও প্রসঙ্গত স্পেনের উল্লেখ করেন, 'The groan of peace in Abyssinia is no less ghastly than the howl of war in Spain.'

মুসোলিনির এক ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৭ সালে। ফাসিস্ট আক্রমণের স্মৃতি কবিকে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এর পরের বৈশাখে (১৩৪৫।১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখছেন, 'আমার জীবনের শেষ পর্বে মানুষের ইতিহাসে এ কী মহামারীর বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুতগতিতে সংক্রামিত হয়ে চলেছে—দেখে মন বীভৎসতায় অভিভূত হল। একদিকে কী অমানুষিক স্পর্ধা আর একদিকে কী অমানুষিক কাপুরুষতা। মনুষ্য-ত্বের দোহাই দেবার কোনো বড়ো আদালত কোথাও দেখতে পাইনে। জগৎ-জোড়া গৃধ্নুতার তাড়নায় এক পক্ষে অভ্রভেদী স্পর্ধা অন্য পক্ষে ভূলুণ্ঠিত সেলাম—কী অসহ্য কুশ্রী—। ধ্বংস মহাসাগরের মুখের এই ভাঁটার টান একদিন হয়তো থমকে যাবে।...সেই শুভ লক্ষণ দেখে যেতে পারব কিনা কে জানে।...মানুষের এতকালের বিশ্বাস একটা শ্বাসরোধকর আঁধির মধ্যে উড়িয়ে দিয়ে চলল।...এই বিশ্বব্যাপী আশঙ্কার মধ্যে আমরা আছি ক্লীব নিষ্ক্রিয়ভাবে দৈবের দিকে তাকিয়ে... মনুষ্যত্বের এই দারুণ ধিক্‌কারের মধ্যে আমি পড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্ম বৎসরে।' সেবারের ২৫ বৈশাখে লেখা কবিতাতেও পাওয়া গেল এর প্রতিধ্বনি—

শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।

তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।

জীবনের পথে যে 'চলতি ছবি পড়ে চোখের পরে 'তার মাঝে যেমন' 'দেখে গেলেম,' গ্রামের মেয়ে 'কলসি-মাথায়-ধরা, রঙিন-শাড়ি-পরা' আবার সেই চলতি ছবির ধারাতেই ধরা পড়ে—

যুদ্ধ লাগল স্পেনে,
চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নীবাণ হেনে।
সংবাদ তার মুখর হল দেশ-মহাদেশ জুড়ে,
সংবাদ তার বেড়ায় উড়ে উড়ে
দিকে দিকে যন্ত্র গরুড়-রথে
উদয়রবির পথ পেরিয়ে অস্তরবির পথে।

জীবনের শেষ পর্বে ফাসিবাদ বা স্পেনকে কিছুতেই তিনি বিস্মৃত হতে পারছেন না। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিখেছেন, 'এ যেন বিশ্বজুড়ে একটা দুঃস্বপ্ন। চোখের সামনে মানুষের ভদ্রনীতির মূল কাঠামোটা দেখতে দেখতে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুতরকমে তেড়ে বেঁকে যাচ্ছে।...দেখলুম ঐ স্পর্ধিত সাম্রাজ্যশক্তি নির্বিকার-চিত্তে অবিসীনিয়াকে ইটালির হাঁ করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জার্মানির বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোস্লোভাকিয়াকে, দেখলুম ননইণ্টরভেনশনের কুটিলপ্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে করে দিতে—দেখলুম ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ করে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে।...পদে পদে শত্রুর হস্তকে বলিষ্ঠ করে তুলে আজ নামতে হল দারুণ যুদ্ধে।...মানব-ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসি-জমের কলঙ্ক প্রলেপ আর সহ্য হয় না।' এ-চিঠির সাতদিন পরে আবার স্পেন প্রসঙ্গ উঠেছে নর্মান এঞ্জেলের একটি প্রবন্ধের সূত্রে। নর্মান এঞ্জেল ব্রিটেন যেভাবে

অত্যাচারিতকে রক্ষা করার দায়িত্ব অস্বীকার করেছে, তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মাঞ্চুরিয়া, অবিসীনিয়া, চীন, স্পেন এবং চেকোস্লোভাকিয়ার যেভাবে স্বাতন্ত্র্যনীতি আক্রান্ত হয়েছে তার উল্লেখ করে।

তাঁর আশি বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে জন্মোৎসবে যে-অভিভাষণ দিয়েছিলেন 'সভ্যতার সংকট' নামে সেখানেও তিনি স্পেনের প্রসঙ্গ ভুলতে পারেননি। ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে 'যখন বয়স অল্প ছিল' তখন 'অন্তরে অন্তরে ছিল' গভীর বিশ্বাস। কিন্তু 'আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল'। তার কারণস্বরূপ ইংরেজের বহু কুকর্মের সূত্রে তিনি স্মরণ করেছেন, 'এক সময় স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্নমেণ্টের তলায় ইংলণ্ড কী রকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে।' যদিও সে-সময়ে তিনি এও দেখেছেন যে 'একদল ইংরেজ সেই বিপদ্‌গ্রস্ত স্পেনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন।' স্বভাবতই তখন তাঁর মনে জেগেছিল র‍্যালফ ফক্স এবং ক্রিস্টফার কডওয়েলের মতো মানুষের আত্মত্যাগের কথা।

সূত্র : 'চিঠিপত্র' একাদশ খণ্ড। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র

'সেঁজুতি', ১৯৩৮

'সভ্যতার সংকট', ১৯৪১

Romain Rolland and Gandhi Correspondence, Publications Division,

'রবীন্দ্রজীবনী', চতুর্থখণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৭১

'ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ', চতুর্থখণ্ড, শ্রী নেপাল মজুমদার

সোমেশ্বর ভৌমিক

নো পাসারান : ১৯৩৬-১৯৩৯

'Let the heart of Spain beat in your breast !' – Rafael Albert

কস্তি কোস্তা-গাভ্‌রা-র ছবি 'জী'-র (Z) চিত্রনাট্যকার জর্জ সেমপ্রঁা, যিনি আরো কয়েকটি বিখ্যাত রাজনৈতিক ছবিরও চিত্রনাট্যকার, এ-পর্যন্ত একটিই ছবি তৈরি করেছেন স্বাধীনভাবে—একটি তথ্যচিত্র 'টু মেমরীজ'। জন্মভূমি স্পেনের রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের (জুলাই ১৯৩৬—মার্চ ১৯৩৯) স্মৃতিমুখর এই ছবিতে কোনো পক্ষ অবলম্বন করেননি সেমপ্রঁা।—'যদিও এটা একটা তথ্যচিত্র, কিন্তু এখানে ধারাভাষ্য নেই। আমি ইচ্ছে করেই ধারাভাষ্য বাদ দিয়েছি। এর ফলে, ছবিতে যাকে ইণ্টারভিউ করা হচ্ছে দর্শকরা শুধু তার কথাই শুনতে পায়। যেমন, ১৯৩৭ সালের মে মাসে বার্সেলোনার ঘটনা সম্পর্কে ক্যারিয়ো-র গলায় তার বক্তব্য শোনা যায়, তারপর কাট্‌···এবং তারপরেই পোউম-নেতা সোলানো-র কণ্ঠস্বর, ওই ঘটনা সম্পর্কে যার বক্তব্য সম্পূর্ণ উলটো। এর মাঝখানে ধারাভাষ্যকার এসে কিন্তু বলেননি যে ইনি সত্যি বলছেন বা উনি মিথ্যে বলছেন। আমি শুধু শুনেছি। যদি কেউ প্রশ্ন করে, কিন্তু সেমপ্রঁা-র বক্তব্যটা কী, তাহলে আমি বলবো, এই প্রশ্নটাই অত্যন্ত ছেলেমানুষি প্রশ্ন। আমার কাছে এঁই পরস্পরবিরোধী সত্যি এবং মিথ্যেগুলোকে দর্শকের সামনে উপস্থিত করাটাই জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।'[১] আশ্চর্য নয় কী যে এই সেমপ্রঁা-ই যৌবনে ফ্রাঙ্কো-বিরোধীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন ফ্যাসিবাদ রুখতে। কিন্তু এখন, মূল সংকটকে অনেকখানি পেছনে ফেলে আসার সূত্রে, সেমপ্রঁা-র কাছে যুক্তিসংগত হয়ে উঠেছে নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান।

উত্তেজনার আগুন পোয়াতে যে-দলিল রচনা করেছিলেন জরিস ইভেন্স, তাতে কিন্তু নেই এমন 'বৈচিত্র্যের সমাবেশ'। সরাসরি গণতন্ত্রীদের সমর্থনেই তিনি ব্যয় করেছিলেন তাঁর সমস্ত উদ্যম। 'দ্য স্প্যানিশ আর্থ' (১৯৩৭) ছবিতে একজায়গায় ভাষ্যকার আর্নেস্ট হেমিংওয়ে শত্রুদের চিহ্নিত করেন এইভাবে: 'কিন্তু ওরা হলো পেশাদার সৈন্য, সশস্ত্র জনসাধারণের সঙ্গে তাদের লড়াই। ওরা সেনাবাহিনীর ইচ্ছেকে জোর করে চাপিয়ে দিতে চায় জনগণের ইচ্ছের ওপর

আর তাই জনগণ ওদের এত ঘৃণা করে। ওরা দক্ষ, ওরা বীর, যে-কাজে এসেছে সে-কাজে লেগে থাকার মতো অধ্যবসায় এবং ধৈর্যও ওদের আছে। কিন্তু ইতালি আর জার্মানির অবিরাম সাহায্য ছাড়া ওদের এই অভ্যুত্থান ছ-সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হতো।'[২] ফ্যাসিবাদী অত্যাচারে দেশত্যাগী জার্মান চলচ্চিত্রকার এর্নস্ট লুবিশ 'দ্য স্প্যানিশ আর্থ' ছবিতে ইভেন্স-এর পক্ষাবলম্বন সমর্থন করেও জিগেস করেছিলেন, কেন ইভেন্স বিরোধীপক্ষকেও ছবিতে জায়গা দেননি। ইভেন্স-এর সহজ উত্তর: বিপক্ষসীমানায় ঢুকে ছবি তুলছেন এই অবস্থায় তাঁকে আবিষ্কার করলে শত্রুরা সরাসরি গুলি করে মারতো। আসলে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে বেছে নিতেই হবে কে শত্রু, কে মিত্র। নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষকের বা অন্য কোনোরকমের ভূমিকাই সেক্ষেত্রে বিপজ্জনক, হয়তো সুবিধেবাদেরই নামান্তর।—১৯৩৫ সালেই যে-হেমিংওয়ে যে-কোনোরকম যুদ্ধ থেকে নিজেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন এই যুক্তিতে যে যৌবনভর সমস্ত উদ্যম-উৎসাহ সমাজ, গণতন্ত্র ইত্যাদি আদর্শের জন্যে ব্যয় করে তিনি ক্লান্ত, এবং হতাশ, তিনিও মত-পরিবর্তন করে স্পেনের রণক্ষেত্রে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন নির্দ্বিধায়। আমাদের মনে পড়ে যেতে বাধ্য, এমনকী 'হাসির রাজা' চ্যাপলিনও সেইসময় তাঁর ভবঘুরে চরিত্রটি সম্পর্কে বলছেন, 'আমার নতুন ছবিতে সে ঠিক ততটাই ভালোমানুষ থাকবে না আর। চরিত্রটিকে আরো ধারালো করছি আমি। এতদিন কোনো কারণ ছাড়াই যারা তাকে ভালোবেসেছে, তাদের এবার মনস্থির করতে হবে।'[৩] আর কী কঠিন বিদ্রূপেই না চ্যাপলিন বিদ্ধ করলেন ফ্যাসিবাদ আর তার প্রশ্রয়দাতা পুঁজিবাদকে, তাঁর তিনটি ছবি 'মডার্ন টাইম্‌স্‌' (১৯৩৬), 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর' (১৯৪০) আর 'মঁসিয় ভের্দ্যু'-তে (১৯৪৭)।

আজকে, সময়ের নিরাপদ ব্যবধানে বসে, স্পেনের গৃহযুদ্ধের চুলচেরা বিশ্লেষণ সম্ভব; কারণ হাতে পাওয়া যাবে 'পুঙ্খানুপুঙ্খ' তথ্য। কিন্তু সমসাময়িক অগ্নি-গর্ভ পরিস্থিতিতে ছিল শুধু এক অন্ধকার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় রেখেই আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব-সমাধানের পথ পাওয়া যাবে, না কি তার জন্যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দর্শনকে রূপায়িত করতে হবে, এই প্রশ্নে উদ্বেল পৃথিবীর জনমানস নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিলো স্পেন হলো নিছক গবেষণাক্ষেত্র, এখানে তৈরি হচ্ছে আরো-বড়োমাপের কোনো মোকাবিলার ছক। সেই উপলব্ধিরই সূত্রে, নিজের-নিজের শিক্ষা-বোধ-রুচি অনুযায়ী মানুষ পক্ষ নিয়েছিলো।

তবে এই যুদ্ধ যেভাবে গণতন্ত্র এবং প্রগতিশিবিরের শিল্পী, বুদ্ধিজীবী আর সংস্কৃতিকর্মীদের লড়াইয়ের ময়দানে সামিল করেছিলো, তেমন ঘটনা আগে আর কখনো ঘটেনি। সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন অনেকে—সকলেই যে তাঁরা স্পেনীয় ছিলেন, তা নয়। আর এই অগ্রগণ্যদের পশ্চাদনুসরণ করে, রাইফেল নয়, নিজের-নিজের প্রকাশমাধ্যমকেই যাঁরা হাতিয়ার করে তুলেছিলেন, তাঁরাও কম সাহস এবং দায়িত্ববোধের পরিচয় দেননি। তবে সাহিত্য, নাটক, গান বা চিত্রকলার মতো পুরোনো, প্রথাসিদ্ধ প্রকাশমাধ্যমে যে-কোনো সামাজিক আলোড়ন রূপায়ণের একটা ঐতিহ্য যেহেতু তৈরি হয়েছিলো বহুদিন ধরে, স্পেনের ঘটনাবলি সেই ঐতিহ্যকে পুষ্ট, সমৃদ্ধতর করেছে মাত্র। কিন্তু তখনো পর্যন্ত যে-প্রকাশমাধ্যমটি প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর থেকে খুব বেশিদূর এগোতে পারেনি এবং সামাজিক আলোড়নের ক্ষেত্রে যে-মাধ্যমটির প্রাসঙ্গিকতা আর সংযুক্তির প্রশ্নটি তখনো পর্যন্ত অমীমাংসিত, সেই চলচ্চিত্রমাধ্যমটির পক্ষে স্পেনের ঘটনাবলি হয়ে দাঁড়ালো এক গুণগত উলম্ফনের সূত্র।

...

পুরোনো প্রকাশমাধ্যমের কল্পনানির্ভর শৈলী সিনেমায় জায়গা করে নিয়েছে প্রথম থেকেই। চলচ্চিত্রকর্মী আর দর্শকেরাও আবিষ্ট হয়েছেন কাহিনীচিত্রের ধারায়। সেই ধারায় রূপের স্থান-কাল-পাত্রগত নির্দিষ্টতা থাকলেও, সামগ্রিক সৃষ্টিতে সেই নির্দিষ্টতা অতিক্রমণের আবেগটাই ফুটে ওঠে প্রবল হয়ে। এটা নন্দনতত্ত্বেরই সূত্র অনুসারী। মানুষ অহরহ ছাড়িয়ে যেতে চায়, ছড়িয়ে দিতে চায় নিজেকে; সে ছিন্ন করতে চায় স্থান-কাল-পাত্রের বন্ধন। সঠিক নান্দনিক উদ্দীপনাই পুষ্ট করে তার এই বন্ধনমুক্তির আবেগকে। সেই হিশেবে শিল্প-সাহিত্যের কল্প-নির্ভরতা কার্যকর।

কিন্তু মানুষকে তো পা রাখতে হবে নিজের জমিতেই। তার দায় থাকে নিজের সময়ের কাছে, চারপাশের লোকজনের প্রতিও আছে দায়িত্ব। সমসাময়িক বিশ্বের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ছাড়া সেই দায়িত্ব পালন তার পক্ষে অসম্ভব। পার্থিব অভিজ্ঞতার সূত্রেই সেই পরিচয়ের অধিকাংশ সম্পন্ন হয়। কিন্তু অন্তরের বোধ অনুভূতির রসে সেই অভিজ্ঞতার জারণও তো প্রয়োজন। ব্যাপারটা মূলত রুচি এবং শিক্ষানির্ভর, তবে তাতে নন্দনতত্ত্বেরও থাকতে পারে ভূমিকা—যদি প্রত্যক্ষ বাস্তব আর নির্দিষ্টের গণ্ডিতেই গড়ে ওঠে শিল্প। সেই শিল্পে থাকে না অতি-ক্রমণের দায়। তা শুধুই বিবরণ বিশ্লেষণের সূত্রে গভীর থেকে গভীরতর উপলব্ধিতে পৌঁছে দেবে মানুষকে। শিল্পের সীমানা বিস্তারের তাগিদে এই শতকের দ্বিতীয়

দশক থেকেই ঐতিহ্যবাহী প্রকারমাধ্যমগুলিতে তৈরি হলো রিপোর্টাজ এবং প্রচারধর্মী সৃষ্টির ধারা। অল্পদিনের মধ্যে জনপ্রিয়তাও অর্জন করলো এই ধারাটি। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে নতুন চিন্তার একদল চলচ্চিত্রকারও ভাবতে শুরু করলেন বাস্তবকেন্দ্রিক সিনেমার কথা। তাঁদের অনুপ্রেরণা এলো সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে, যেখানে কাহিনীচিত্রের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা নিয়ে আইজেনস্টাইন-পুডভকিন দভঝেঙ্কোর নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশিই কুলেশভ-ভের্তভরা চালাচ্ছিলেন কিনো গ্লাজ (Kino Glaz—আক্ষরিক অর্থে চলচ্চিত্রচক্ষু), কিনো প্রাভদার (Kino Pravda—চলচ্চিত্রসত্য) পরীক্ষা। প্রত্যক্ষ এবং ঘটমানকে নিয়ে তাঁদের তৈরি রূপকল্প সদ্যোজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করছিলো, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, তাঁদের সেই প্রচেষ্টা, পুঁজিবাদী দেশেও, চলচ্চিত্রকে পৌঁছে দিলো নতুন সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে। ত্রিশের দশকে, চলচ্চিত্রমাধ্যমের অন্যতম শাখা হিশেবে নয়, একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিশেবেই প্রতিষ্ঠা পেলো তথ্যচিত্র।

অবশ্য বিশের দশক থেকেই পাশ্চাত্যে তথ্যচিত্র নির্মাণ শুরু হয়ে গেছে এবং সে-কাজ শুরু হয়েছে সমসাময়িক জনজীবনের সঙ্গে চলচ্চিত্রকে অন্বিত করার তাগিদ থেকেই। সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে তাঁদের নিজের-নিজের অভিজ্ঞতা-বোধ উপলব্ধি-বিশ্বাসকে সম্বল করে কাজে নেমে পড়েছিলেন রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি ('নানুক অব দা নর্থ' ১৯২২, 'মোয়ানা' ১৯২৬), মেরিয়ান কুপার-আর্নেস্ট স্কোয়েডসাক জুটি ('গ্র্যাস' ১৯২৫, 'চ্যাং' ১৯২৭), আলবের্তো কাভালকন্তি ('সিটি সিম্‌ফনি' ১৯২৬), ভাল্টার রুটম্যান ('বের্লিন' ১৯২৭), জঁ ভিগো ('অ্যাবাউট নীস্' ১৯৩০), জন গ্রীয়ারসন ('ড্রিফ্‌টারজ্‌' ১৯২৬)। প্রস্তুতির এই দশ বছরে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো তথ্যচিত্রের জগৎ—এবং হলিউড-এর দৌলতে গড়ে-ওঠা কাহিনীসর্বস্ব বাণিজ্যিক সিনেমার অর্থনৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক ভিত্তিগুলিও সর্বাংশে বর্জিত হলো। তথ্যচিত্র তৈরি হতো নির্মাতাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার তাগিদে, মুনাফার লক্ষ্যে নয়। ফলে হলিউডি কায়দায় কারখানার ঢঙে শ্রমবিভাজনভিত্তিক ব্যাপক উৎপাদনপদ্ধতির বদলে তথ্যচিত্রনির্মাতারা অনুসরণ অনুসরণ করতেন যৌথ বা সংঘবদ্ধ উৎপাদনপদ্ধতির সূত্রগুলি। বাস্তবতা উপস্থাপনের জন্যে নির্দিষ্ট চিত্রসাংবাদিকতার প্রধান সূত্রগুলি ব্যবহৃত হতো রূপায়ণে। সুচিন্তিত, পূর্ব-পরিকল্পিত মুহূর্ত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে নয়, সংঘটনের তাৎক্ষণিক মুহূর্তগুলিকে ধারণ করে সূত্রবদ্ধ ও গ্রন্থিত করতে লাগলেন তথ্যচিত্রকারেরা। দলিল হিশেবে প্রতিটি ফ্রেমের মৌলিকতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে,

সেই চেষ্টা তাঁরা করে গেছেন অবিরাম। প্রামাণ্যের অন্তর্নিহিত গতিছন্দকে (dynamics) আশ্রয় করেই গড়ে উঠতো সামগ্রিক রূপকল্প।

তবে মতাদর্শের প্রশ্নটি অগ্রবর্তী তথ্যচিত্রনির্মাতাদের কাছে তেমন গুরুত্ব পায়নি। সমাজ ও সভ্যতা বিষয়ে সাধারণ কিছু উদ্বেগ আর কৌতূহল নিয়েই তাঁরা মগ্ন হতেন পর্যবেক্ষণে। কিন্তু ত্রিশের দশকের শুরুতেই পৃথিবীব্যাপী মন্দা এবং সামাজিক রাজনৈতিক সংকটের ফলে পরিপ্রেক্ষিত দ্রুত পরিবর্তিত হলো। ১৯২৫ থেকে ১৯২৯, এটা ছিলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩, এই সময়সীমার বৈশিষ্ট্য হলো সংকট এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় জঙ্গি মনোভাব। সমাজ-রাজনীতি প্রাঙ্গণের এই সংগঠিত বিক্ষোভ-প্রতিবাদে অনুপ্রাণিত পাশ্চাত্ত্যের একদল চলচ্চিত্রপ্রেমী চাইলেন সেলুলয়েডের বুকে সেই সংগ্রামী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটাতে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে চলচ্চিত্রকেও যুক্ত করতে। তাঁদের আগ্রহে এবং বামপন্থী রাজনৈতক সংঘগুলির ছত্রছায়ায় পাশ্চাত্ত্যে বিভিন্ন জায়গায় সংগঠিত হলো ওয়ার্কার্স ফিল্ম সোসাইটি। মূলত সোভিয়েত ছবির প্রচারেই এই সংগঠনগুলির আগ্রহ ছিলো। তবে আনুষঙ্গিক কর্মসূচি হিশেবে শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র নির্মাণেও তাঁরা ব্রতী হলেন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬, এই সময়সীমাটি রাজনৈতিক বিচারে বামপন্থী আন্দোলনের সাময়িক পশ্চাদপসরণের যুগ হলেও সমাজসচেতন তথ্যচিত্র নির্মাণের ধারাটি এই সময়ে আরো পুষ্ট হলো। শিল্পকেন্দ্রভিত্তিক শ্রমিক চলচ্চিত্রসংঘগুলি আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরে সংগঠিত হওয়ার সূত্রে তথ্যচিত্র বিষয়ে আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেলো। নির্মাতারাও উৎসুক হলেন এই মাধ্যমটির তাত্ত্বিক ভিত্তি সংগঠনে। এই সময়ে তথ্যচিত্র তৈরিতে অগ্রবর্তী ভূমিকায় যাঁদের আমরা পেয়েছি, তাঁদের অধিকাংশই বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনের সভ্য। তাঁদের উৎসাহে তথ্যচিত্রের ধারাটি কেবল যে রাজনৈতিক মতাদর্শেই পুষ্ট হয়েছে এমন নয়, তাঁদের কাজেকর্মে তাঁরা প্রমাণ করেছেন সংঘবদ্ধ প্রয়োগেরও সুফল।—ব্রিটেনে সংগঠিত হয়েছিলো ফিল্ম অ্যাণ্ড ফোটো লীগ এবং প্রোগ্রেসিভ ফিল্ম ইনস্টিটিউট; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও ছিলো ফিল্ম অ্যাণ্ড ফোটো লীগ, তার সঙ্গে ফ্রন্টিয়ার ফিল্ম গ্রুপ। এই সংগঠনগুলিতে ছিলো কমিউনিস্টদেরই প্রাধান্য। পাশ্চাত্ত্যে অন্যান্য দেশে, যেমন ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, হল্যাণ্ড বা বেলজিয়াম-এ, এত ব্যাপকমাত্রায় রাজনীতি আর চলচ্চিত্র-মাধ্যমের ঐক্যবিধান সম্ভব হয়নি বটে, কিন্তু সে-সব দেশেও সমাজসচেতন তথ্য-চিত্রনির্মাতারা বামপন্থী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজে নেমেছিলেন। তাঁদের উদ্যোগে তৈরি এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ছবি—'হাউজিং প্রবলেম' (১৯৩৫), 'এনাফ্ টু

ইউ' (১৯৩৬), 'চিল্‌ড্রেন অ্যাট স্কুল' (১৯৩৭), 'দ্য স্মোক্ মিনেস' (১৯৩৭), 'বরিনেজ' (১৯৩৩), 'নিউ আর্থ' (১৯৩৪), 'দ্য হাউজেস্ মিজারি' (১৯৩৭)।

এই ধারার বিখ্যাততম তথ্যচিত্রটি অবশ্য তৈরি হয়েছিলো স্পেন-এ ; এবং কিছুদিন পরে সে-দেশেই, গৃহযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে, রাজনৈতিক তথ্যচিত্র বিষয়ে দেড় দশকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার 'সফল' পরিসমাপ্তি !

১৯৩২ সালে, লটারিতে জেতা টাকাকে মূলধন করে এবং বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-দের অর্থ সাহায্যে, লুইস বুনুয়েল তৈরি করেছিলেন 'লাস্ উর্দেস' (ইংরেজি নাম 'দ্য ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড'), যেটি তাঁর তোলা একমাত্র তথ্যচিত্র। তথ্যচিত্রের ইতিহাসে ছবিটি বিশিষ্ট একটি স্থান অধিকার করে থাকলেও, নিজের এই সৃষ্টি সম্পর্কে বুনুয়েল যথেষ্ট বিনয়ী, প্রায় নিরাসক্ত : 'এটা একটা শাদামাটা তথ্যচিত্র— অবশ্য ভীষণভাবে বাস্তবনির্ভর। কিছুই আমি বানাইনি বা কল্পনাও করে নিই-নি। পিয়ের উনিক একখানা বিশ্লেষণাত্মক, তথ্যনির্ভর চিত্রনাট্য তৈরি করে দিয়েছিলেন। (তারই ভিত্তিতে) আমরা দেখিয়েছি স্পেনের সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলটিকে।'[৪] —ষোড়শ শতকের ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে খৃষ্টধর্মাবলম্বী প্রশাসনের অত্যাচারে পালিয়ে আসা ইহুদিরা বসতি করেছিলো উত্তর স্পেনের এই রুক্ষ, পার্বত্য অঞ্চলে—'ভূগোলবিদ্ এবং ভ্রমণকারীদের মতে যা এক বন্ধ্যা, আতিথেয়তাশূন্য দেশ, যেখানে বেঁচে থাকার জন্যে মানুষকে প্রতিমুহূর্ত লড়াই চালাতে হয়।'[৫] পরবর্তী চার শতাব্দী ধরে চরম কষ্ট, দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে কেটেছে তাদের উত্তরসূরিদের জীবন ; তাদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতাও বার-বার ব্যাহত হয়েছে সিরিয়া-আগত খৃস্টান পাদ্রিদের কার্যকলাপে। স্পেনের এই অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যায় সেইসব কারণের সমাহার, যেগুলি দেশটিকে সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেই বন্দী রেখেছিলো—অমীমাংসিত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সময়-উপযোগী বিকাশের অনুপস্থিতি, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, অর্থনৈতিক পশ্চাদ্-পদতা এবং সামাজিক বিক্ষোভ। সম্পদ-পুনর্বিন্যাস এবং পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতির প্রবর্তন এই অবস্থায় ছিলো অসম্ভব। উর্দেস গ্রামের ক্ষেত্রে আরো জটিলতা এনেছিলো যাতায়াতের সমস্যা—'১৯২২ সালে প্রথম উর্দেস-এ যাওয়ার রাস্তা খুলে দেওয়া হয়। তার আগে পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশ, এমনকী স্পেনীয়দের কাছেও দেশটি বস্তুত অজ্ঞাত ছিলো'[৬]। এহেন দুর্গম অঞ্চলে বুনুয়েল কাটিয়েছিলেন চারমাস, তার মধ্যে দু-মাস তাঁর কেটেছিলো শুটিং-এর কাজে। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অঞ্চলটির নির্দিষ্ট অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছিলেন বুনুয়েল, বৈজ্ঞানিক-নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ফলে পার্বত্য অঞ্চলটির নৈসর্গিক

সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেই তিনি পৌঁছতে পেরেছিলেন উর্দানোদের সমাজজীবনের দুরবস্থার মূলে। দুঃখ, মৃত্যু, অসুখ, ক্ষুধা, বন্ধ্যাত্ব আর কষ্টের যে-চিত্রমালা তিনি ধারণ করেছিলেন সেলুলয়েডের বুকে তাতে দর্শককে অভিভূত আচ্ছন্ন করার মতো উপাদান ছিলো প্রচুর। কিন্তু দর্শকের মনে ভীতি বা করুণার উদ্রেক হোক, এটা বুনুয়েল চাননি। রূপ-সংগঠনের কুশলতায় সেই অসুবিধে অতিক্রম করলেন তিনি। দুর্দশার এই চিত্রায়ণের বিপরীতে অলংকারবর্জিত সরল ধারাভাষ্যের মাধ্যমে স্বচ্ছ করলেন সমাজতাত্ত্বিক নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতটিকে। বুনুয়েল-এর এই কৌশল দর্শককেও বাধ্য করলো হৃদয়বৃত্তির বদলে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগে।

উর্দেস গ্রামের পরিচিতিতে বুনুয়েল আমাদের জানান, 'এখানকার জমি খুবই উর্বর। অযত্নে, অবাধে প্রায় ২০০ রকমের গাছ এখানে জন্মায় এবং বাড়ে। তবু এর পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে আগাছা ছাড়া আর খুঁজে পাওয়া যাবে সামান্য কিছু ফলের গাছ।'[৭] এবং এক অনুন্নত, আদিম, জীবনের ব্যাখ্যান তিনি শেষ করেন গাঁয়ের মেয়েদের কথা বলে, যাদের চিন্তার একমাত্র বিষয় হলো মৃত্যু। সমস্যার বৈচিত্র্য আর তীব্রতায় তারা এতই বিব্রত যে এছাড়া অন্য-কোনো চিন্তাতেও প্রবৃত্তি হয় না তাদের। কেন তাদের এই অবস্থা, তার যুক্তি আর ব্যাখ্যা দর্শক খুঁজে পায় মধ্যবর্তী সময়ে দারিদ্র, ক্ষুধা আর মৃত্যুদৃশ্যের অবিরাম মিছিলে—অনশনক্লিষ্ট শিশুদের মুখে ভন্‌ভন্‌-করা মাছি, ত্রিশের কোঠায় পৌঁছনো গলগণ্ড-রোগগ্রস্ত মেয়েদের দেখায় আশির ঘরে পৌঁছে-যাওয়া বৃদ্ধাদের মতো, অপুষ্টিজনিত শিশুমৃত্যু, রুগ্ন নারী-পুরুষের প্রজননক্ষমতার বিলোপ, এইসব দৃশ্য একের পর এক ঝাঁপিয়ে পড়ে দর্শকের ওপর দুঃস্বপ্নের মতো। ব্রাম-এর চতুর্থ সিম্‌ফনি-র আবহে নিরুত্তাপ আবেগবর্জিত কণ্ঠে ভাষ্যকার পরিবেষণ করেন শীতল পরিসংখ্যানের মালা। আদিম কৃষিব্যবস্থা, বৈষম্যমূলক বণ্টনব্যবস্থা, চার্চ-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং অনাধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা-সংক্রান্ত নানা বিবরণীর সাহায্যে বুনুয়েল বুঝিয়ে দেন কীভাবে জন্ম নেয় নেতিবাচক, মৃত্যুকেন্দ্রিক, জীবনাদর্শ। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এ-ও তিনি জানিয়ে দেন: 'এই চলচ্চিত্রটিতে যে-দারিদ্র চিত্রিত হয়েছে, তা দূর করা যায় না এমন নয়। স্পেনের অন্য জায়গাতেই ইতোমধ্যে পাহাড়ি লোকজন, চাষী এবং মজুরেরা তাদের অবস্থার কমবেশি উন্নতি করতে সফল হয়েছে, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এই উদ্যম, যা জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিলো—তার প্রভাব পড়েছে গত নির্বাচনেও। এরই ফলে জন্ম নিয়েছে পপুলার ফ্রন্ট।'[৮] এইভাবে দর্শককে, আচ্ছন্ন নয়, সম্পূর্ণ সজাগ রাখেন বুনুয়েল। সমসাময়িক ঘটনার দৃশ্যগত এবং তথ্যগত আবেদনকে ব্যবহার

করে, গ্রন্থিত করে তথ্যচিত্রকে বিশ্লেষণ তথা উদ্দীপনার হাতিয়ার হিশেবেও যে গড়ে তোলা যায়, তা-ই প্রমাণ করলেন বুন্যুয়েল তাঁর এই ২৭ মিনিটের ছবিতে। অনেক বছর পরে তিনি লিখেছিলেন : 'একজন শিল্পী সামাজিক সম্পর্কের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতটি তুলে ধরেন, যাতে সেইসব সম্পর্ক বিষয়ে তথাকথিত আদর্শ ধারণাগুলি ভেঙে দেওয়া যায়, বুর্জোয়া জগৎ বিষয়ে আশাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করা যায় এবং দর্শকের মনে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন বা সন্দেহ জাগানো যায়। আমার সমস্ত ছবির অন্তর্নিহিত বক্তব্যই হলো তাই। পাছে লোকে ভুলে যায় অথবা মিথ্যে আশায় মজে যায়, তাই বার-বার এ-কথাই আমি বলতে চেয়েছি যে আমরা কিছু আদর্শ পৃথিবীতে বাস করি না।'[৯]

শিল্পীর কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালনের পরেও 'লাস্ উর্দেস' ছবিতে বুন্যুয়েল ভুলে যান না তাঁর সামাজিক দায়িত্ব। ছবির শেষে তাই আসন্ন গৃহযুদ্ধের ছায়াপাত : 'হিটলার ও মুসোলিনির সাহায্যপুষ্ট জেনারেলদের বিদ্রোহ কুলাকদের পূর্বের সমস্ত সুযোগসুবিধা ফিরিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু কৃষক ও শ্রমিকেরা ফ্রাঙ্কো আর তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে জয়ী হবেই। সারা পৃথিবীর ফ্যাসিস্টবিরোধী শক্তির সহযোগিতার এ-সব দ্বীপের মানুষ গৃহযুদ্ধকে অতিক্রম করে শান্তি, কাজ আর সুখ ফিরিয়ে আনতে পারবে ; চিরকালের জন্যে নির্মূল করে দিতে পারবে দারিদ্র্যকে, যা এই চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে।'[১০]

১৯৩৩ সালে মাদ্রিদে এ-ছবির প্রদর্শনী হয়, মাত্র একবার। রোম্যান ক্যাথলিক দলের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থী ফ্রন্টের সরকার আদৌ পছন্দ করেনি বুন্যুয়েল-এর এই বিশ্লেষণাত্মক কৌতূহল, বিশেষ করে অতিরিক্ত নীতিবাগীশ খ্রিষ্টান চার্চের অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক ক্ষমতালিপ্সার প্রতি তাঁর প্রবল কটাক্ষ। ছবিটি 'স্পেনের পক্ষে অসম্মানজনক' এই অজুহাতে তৎকালীন জামোরা প্রশাসন এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৩৭ সালে গণতন্ত্রী সরকার এই নিষেধাজ্ঞা রদ করলেও পরবর্তী ফ্রাঙ্কো-প্রশাসন আবার ছবিটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

পূর্ববর্তী বিবরণের সূত্রে এ-কথা অতএব বলা যায় যে, বিশ্বব্যাপী এক রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে চলচ্চিত্র মাধ্যমটিও এসে পৌঁছেছিলো এক যুগান্তরের সূচনায়। এরপর এটাও দেখতে পাবো যে, স্পেনের প্রান্তরে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কোনো স্থায়ী মীমাংসা না-হওয়া সত্ত্বেও চলচ্চিত্র মাধ্যমটিতে সম্পূর্ণ হবে এক উত্তরণ—রাজনৈতিক তথ্যচিত্রের সুবাদে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কয়েকশো প্রগতিশীল শিল্পী, বুদ্ধিজীবী আর শিল্পকর্মীর সঙ্গে স্পেনে ছুটে এসছিলেন চলচ্চিত্রকর্মীদেরও বেশ কয়েকটি

দল। ক্যামেরাকেই রাইফেলের মতো ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তাঁরা—আত্মরক্ষার কাজে, প্রতি-আক্রমণের কাজে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে ধেয়ে-আসা ফ্রাঙ্কো-বাহিনীর বিরুদ্ধে কী অসমসাহসী লড়াই চালিয়েছেন পূর্ব এবং দক্ষিণ-মধ্য স্পেনে একজোট হওয়া গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, কীভাবে ফ্যাসিবাদী দুই রাষ্ট্রের সাহায্যে পুষ্ট হয়েছে ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনী এবং হস্তক্ষেপ-না-করার এক বিচিত্র সিদ্ধান্তে অনড় থেকে কীভাবে ফ্যাসিবাদী এই আস্ফালনকে প্রশ্রয় দিয়েছে পাশ্চাত্যের 'গণতন্ত্রী' রাষ্ট্রগুলি—এ-সবের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যাবে বহিরাগত তথ্যচিত্র নির্মাতাদের ছবিতে। তাঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্পেনীয় চলচ্চিত্র কর্মীরাও সংগঠিত হলেন তথ্যচিত্রনির্মাণের লক্ষ্যে, কেননা, তাঁরা বুঝেছিলেন, এই মাধ্যমটিকে তাঁদের আদর্শের পক্ষে প্রচারের কাজে ব্যবহার করা যাবে কার্যকর-ভাবে। এই সমবেত উদ্যমে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধকে বিষয় করে মাত্র তিনবছরের মধ্যেই তৈরি হয়েছিলো অন্যূন ৩৫টি তথ্যচিত্র—পাঁচ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের এই-সব ছবির মধ্যে কয়েকটি তৈরি হয়েছিলো তখনকার মতো স্বল্প ব্যবহৃত ১৬ মি. মি. ফর্ম্যাটে, কয়েকটি ছিলো ভাষ্যহীন চিত্রমালা। আকার, আয়তন এবং বিষয়ের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সেগুলির মধ্যে ঐক্যসূত্র হিশেবে কাজ করছিলো গণতান্ত্রিক আদর্শরক্ষার জন্যে উদ্বেগ।

...

তথ্যচিত্রের ইতিহাসই শুধু নয়, চলচ্চিত্রের ইতিহাসই অসম্পূর্ণ থাকবে জরিস ইভেন্স-এর তৈরি 'দ্য স্প্যানিশ আর্থ' (১৯৩৭) ছবির উল্লেখ ছাড়া। এমনকী স্পেনের গৃহযুদ্ধের কোনো বিবরণই পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে না, যদি তাতে বিশেষভাবে এ-ছবির কথা না-বলা হয়। স্পেনের গৃহযুদ্ধের রূপকল্প হিসেবে এর তুলনীয় উদাহরণ পাবলো পিকাসো-র আঁকা 'গের্নিকা'।

'দ্য স্প্যানিশ আর্থ' তৈরির ইতিহাস অনুসরণ করে আমরা দেখতে পাবো ঘটমানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ কীভাবে স্পষ্ট করে তোলে দূরাধিগত পরিচয়ের সীমাবদ্ধতা এবং কীভাবে সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রে নব-উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ মানুষ নিছক দলিল-উপস্থাপনাকেও উন্নীত করতে পারে শিল্পের স্তরে।

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে ইভেন্স ছিলেন আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক শহরে। প্রায় দু-বছর সোভিয়েত ইউনিয়নে কাটানোর পর সেখানে গিয়েছিলেন তিনি তথ্যচিত্র বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে। কিন্তু স্পেনের ঘটনাবলি ইভেন্স-কে অধৈর্য করে তুললো, কেননা সেগুলি আবর্তিত হচ্ছিলো গুরুত্বপূর্ণ এক রাজনৈতিক প্রশ্নকে ঘিরে এবং সেই আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ছিলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে।

আজীবন যিনি সচেতন থাকতে চেয়েছেন চলচ্চিত্রের (বিশেষত তথ্যচিত্রের) সামাজিক দায়িত্ব বিষয়ে, তথ্যচিত্রনির্মাণকে যিনি যুক্ত করতে চেয়েছেন জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে, যিনি তথ্যের গভীরে পৌঁছে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাতে বিশেষ-নির্বিশেষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটি পরিস্ফুট হয়, তাঁর পক্ষে স্পেনের ঘটনায় উদাসীন থাকা সম্ভব ছিলো না। স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকদের সাহায্যে ইভেন্স এবং তাঁর সহযোগী হেলেন ভান ডন্‌জেন্‌ রণাঙ্গন থেকে সাংবাদিকদের পাঠানো ফুটেজ সম্পাদনা করেই দাঁড় করালেন একটি প্রাথমিক বিবরণী 'স্পেন ইন ফ্রেম্‌স্‌' (১৯৩৬)। কিন্তু ছবিতে তথ্যের অপ্রতুলতা এবং অন্তর্দৃষ্টির অভাব ইভেন্স-এর পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ালো। তিনি এ-ও বুঝতে পারলেন, হাতে-কলমে কাজ করার ব্যাপারে স্পেন যে বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে তথ্যচিত্রনির্মাতাদের সামনে, তার পূর্ণ ব্যবহার না-করলে মাধ্যমটির বিকাশের পথই রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে আমেরিকায় ছবি করার জন্যে রকেফেলার ফাউণ্ডেশনের প্রস্তাবিত অর্থসাহায্য প্রত্যাখ্যান করেই ইভেন্স পাড়ি জমালেন স্পেনের পথে। নিউ-ইয়র্ক-এ বসেই সম্ভাব্য চিত্রনাট্যের একটা খশড়া তৈরি করেছিলেন তিনি। এক কৃষক পরিবারকে কেন্দ্রে রেখে সেই চিত্রনাট্যে বর্ণনা করা হলো রাজা ত্রয়োদশ আলফোন্সো-র সিংহাসনত্যাগ এবং পলায়ন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া সরকারের তৈরি প্রগতিশীল কৃষি-আইনের প্রতিক্রিয়া, গ্রামে-গ্রামে সেচব্যবস্থা এবং শিক্ষাপ্রসারের তৎপরতা, বিদেশী সাহায্যপুষ্ট দক্ষিণপন্থীদের গোপন ষড়যন্ত্র—এভাবে গৃহযুদ্ধের প্রাক্‌কথনেই ভরে যায় অর্ধেক চিত্রনাট্য। যুদ্ধের বর্ণনা আসে দ্বিতীয়ার্ধে : ফ্যাসিস্টদের অত্যাচারে গ্রাম থেকে উৎখাত-হওয়া সেই চাষী পরিবারের ছেলেই গণতন্ত্রী সেনাদলকে নেতৃত্ব দিয়ে গ্রামে নিয়ে আসে এবং পুনর্দখল করে গ্রাম। ইভেন্স নিশ্চয়ই আশা করেছিলেন, গড়পড়তা এক চাষী-পরিবারের ভাগ্য-বিবর্তনের সূত্রে তিনি আদ্যোপান্ত প্রকাশ করতে পারবেন গৃহযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত এবং তার প্রভাবকে। কিন্তু যুদ্ধব্যস্ত স্পেনে পা দিয়েই ইভেন্স বুঝলেন, তাঁর সেই বিশদ চিত্রনাট্যের রূপায়ণ বর্তমান পরিস্থিতিতে অসম্ভব। মরণপণ সংগ্রামে নিয়োজিত মানুষগুলিকে তিনি কী করে বলবেন রাজার দেশত্যাগ-পর্ব পুনরভিনয় করতে অথবা যুদ্ধের আগে একটা গড়পড়তা গ্রামের চেহারা কেমন ছিলো তা ফুটিয়ে তুলতে? যুদ্ধ-সংগ্রামের বাইরে আর-কোনো বিষয়েই মানুষগুলোকে কথা বলানো যাবে না, এটাই ছিলো ইভেন্স-এর সবচেয়ে মূল্যবান উপলব্ধি। সামরিক সংঘর্ষ এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি থেকেই তাঁকে তাহলে সংগ্রহ করতে হবে উপাদান।

পরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তন সত্ত্বেও মূল চিত্রনাট্যের সূত্র ধরেই মাদ্রিদ-ভালেন্সিয়ার সংযোগকারী রাস্তার ওপর ফুয়েন্তেদুয়েনা গ্রামটিকে ইভেন্স বেছে নিলেন তাঁর ছবির প্রধান ঘটনাস্থল হিশেবে। যুদ্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিশেবেই শুধু নয়, গণতন্ত্রী সরকারের কৃষি-উন্নতি পরিকল্পনার অন্যতম মুখ্য কেন্দ্র হিশেবেও গ্রামটি আকর্ষণ করেছিলো তাঁকে। গৃহযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সমান্তরালে উপস্থাপিত হলো ফুয়েন্তেদুয়েনায় একটি বাঁধ তৈরির ঘটনা। এই বাঁধ গ্রামবাসীদের মুক্তি দেবে প্রকৃতি-নির্ভর, সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-উৎপাদনব্যবস্থার কবল থেকে। ছবিতে গণতন্ত্রী সরকারের শুভেচ্ছা আর প্রগতিবাদী পরিকল্পনার প্রতীক হয়ে ওঠে এই বাঁধ আর সেটির রূপায়ণের ব্যাপারে গ্রামবাসীদের বিপুল আগ্রহ নিয়ে আসে গণতন্ত্রী সরকারের পেছনের যে প্রবল গণসমর্থন, তার ব্যঞ্জনা। খুব সহজেই এরপর দর্শককে সঙ্গে পেয়ে যান ইভেন্স। যুদ্ধের যে-সব খণ্ডচিত্র তিনি উপস্থিত করেন, দৃশ্যগত বীভৎসতার অতিরেক ছাড়াই সেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের কুপ্রভাব। ইভেন্স দেখান অবরুদ্ধ মাদ্রিদের জনশূন্য পথঘাট, সেগুলির শুনশান নৈঃশব্দ্য আক্রান্ত জীবনচক্রের ব্যঞ্জনায় প্রবল অর্থবহ হয়ে ওঠে; আকস্মিক বিমানহানায় যখন নিহত হয় নিরীহ বইবিক্রেতা, তখন এই যুদ্ধ তার সমস্ত নঞর্থক ব্যঞ্জনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের ওপর। তবে ইভেন্স সবচেয়ে বেশি করে দেখান মানুষের মুখ, আলোড়িত অনুভূতির বিভিন্ন অভিব্যক্তি। কষ্ট, ভয় এবং প্রতিজ্ঞার ত্র্যহস্পর্শে মুখগুলি যে-কোনো সংঘটনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নেপথ্যে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে-র উচ্ছ্বাসবর্জিত ধারাভাষ্য এবং আবহে স্পেনীয় লোকসংগীতের সুর এইসব দৃশ্যের অভিঘাতকে আরো বাড়িয়ে তোলে। ছবিতে রাজনীতি আর মানবিকতা পরস্পর-সম্পৃক্ত এক সত্তায় রূপান্তরিত হয়: 'বিদায়মুহূর্তে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শুভকামনার কথাগুলো যে-কোনো ভাষাতে একই ব্যঞ্জনা বয়ে আনে। মেয়েটি বলে, সে অপেক্ষা করবে। ছেলেটি জানায়, সে ফিরে আসবেই। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মধ্যে এই সমস্ত ভবিষ্যৎচিন্তা কেমন অর্থহীন মনে হয়। কেউ তো নিশ্চিত জানে না ছেলেটি ফিরে আসবে কি না। তবু সে স্ত্রী-কে বলে যায়, বাচ্চাকে ভালো রেখো। মেয়েটি প্রতিশ্রুতি দেয়—যদিও সে জানে ব্যাপারটা অসম্ভব। দুজনেই বোঝে, ট্রাকভর্তি মানুষের সঙ্গে যখন তোমাকে কোথাও পাঠানো হয়, তোমার একমাত্র গন্তব্য হতে পারে যুদ্ধক্ষেত্র।

দু-মাইল দূরের পাহাড়ে বিদ্রোহীদের ঘাঁটি থেকে প্রতিদিন ভোরে মৃত্যু এসে হানা দেয় মহানগরীর এই মানুষগুলোর দরজায়। শক্তিশালী বিস্ফোরকের

কালো ধোঁয়া আর ক্ষতবিক্ষত গ্রানাইটের কটু গন্ধই হলো মৃত্যুর গন্ধ। তবু কেন তারা পড়ে আছে এর মাঝে? কেননা এটাই তাদের শহর, এখানেই তাদের ঘরবাড়ি, কাজকর্ম। এ-সবের জন্যই তাদের যুদ্ধ—মানুষ হিশেবে মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার বজায় রাখবার যুদ্ধ।'[১১]

ইভেন্স-এর হাতে তথ্যচিত্রের দিগন্তবিস্তারকে অবশ্য সবাই খুব ভালোভাবে খোলামনে নিতে পারেননি, বিশেষ করে কাহিনীচিত্রে অভ্যস্ত সমালোচকেরা। কথা উঠেছিলো, ইভেন্স এ-ছবিতে শস্তা প্রচারের কাজে নেমেছেন, শিল্পসৃষ্টিতে নয়। কারো-কারো মতে, এ-ছবি সাধারণ দর্শকের কাছে 'তিক্ত, ভয়াবহ এবং পাশবিক' এক অভিজ্ঞতা। ইভেন্স-এর সমর্থকেরা অবশ্য বলেছেন ঠিক উলটো কথাটাই। তাঁদের মূল্যায়ন-অনুযায়ী, ইভেন্স রাজনীতির বিষয়কেই উন্নীত করেছেন শিল্পের স্তরে। 'পথপ্রদর্শক, বিপ্লবী ছবি'—এ-ই হলো 'দ্য স্প্যানিশ আর্থ' বিষয়ে তাঁদের অভিধা।

ইভেন্স এবং তাঁর সহকর্মীরা অবরুদ্ধ মাদ্রিদের আশেপাশেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন তাঁদের অনুসন্ধান কার্যকলাপ। কিন্তু রাশিয়া থেকে আসা রোমাঁ কারমেন এবং বরিস ম্যাকাসেয়েভও ঘুরে বেড়িয়েছেন গণতন্ত্রী স্পেনের আনাচে-কানাচে। নিজেদের জীবন বিপন্ন করে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তাঁরা ছবি তুলেছেন দিনের পর দিন। দুজনেই ছিলেন ঝিগা ভের্তভ-এর ছাত্র। ফলে প্রত্যক্ষ-নির্ভর সত্যানুসন্ধানে ক্যামেরার ভূমিকা সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন। এই মানসিকতা থেকেই তাঁরা স্পেনে কাজ করেছেন প্রায় দু-বছর। এবং যেহেতু সদ্যোজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রের মতাদর্শগত শিক্ষায় তাঁরা ছিলেন উদ্বুদ্ধ, সরাসরি এই যুদ্ধের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতটিকে প্রকাশ করেছেন স্পষ্টভাবে। তাঁদের তোলা কয়েক হাজার ফুট নেগেটিভ অতি সন্তর্পণে, গোপন পথে পাচার হয়েছে রাশিয়ায়। তারপর মস্‌ফিল্ম স্টুডিও-তে বিখ্যাত সম্পাদক এস্‌থার শুব-এর তত্ত্বাবধানে গ্রন্থিত হয়েছে স্পেনের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কিত সোভিয়েত তথ্যচিত্র 'এস্পানিয়া' (১৯৩৯)। কারমেন-ম্যাকাসেয়েভের সরবরাহ করা উপাদানই এ-ছবিতে মুখ্য হলেও, শুব এখানে ব্যবহার করেছেন আর্কাইভ ফুটেজ, ফ্রাঙ্কোপন্থীদের কাছ থেকে উদ্ধার-করা তথ্যচিত্র, এমনকী 'দ্য স্প্যানিশ আর্থ' ছবিরও দৃশ্যকল্প। মতাদর্শগত উদ্দেশ্যে তথ্যচিত্র সংগঠনে মন্তাজ-পদ্ধতি কী পরিমাণ সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়, তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে আছে এই ছবি।

'দ্য স্প্যানিশ আর্থ' ছবির খরচখরচা জুগিয়েছিলেন আমেরিকার প্রগতিশীল মানুষের এক সংগঠন, কন্টেম্পোরারী হিস্টোরিয়ানস্‌ ইন্‌কর্পোরেটেড, যার সদস্যরা

অনেকেই ছিলেন ফিল্ম অ্যাণ্ড ফোটো লীগ-এর প্রাক্তন কর্মী। আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের প্রতি প্রগতিশীল আমেরিকাবাসীদের আস্থার আরো নিদর্শন আমরা পাই স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্রন্টিয়ার ফিল্ম গ্রুপ-এর কার্যকলাপে। সমাজতন্ত্রী এবং কমিউনিস্টদের নিয়ে তৈরি এই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হার্বার্ট ক্লাইন-এর নেতৃত্বে স্পেনে গিয়েছিলেন হাঙ্গেরির চলচ্চিত্রকার গীজা কারপাথি এবং বিখ্যাত ফরাসি ক্যামেরাম্যান আঁরি কার্তিয়ে-ব্রেসঁ। স্পেনে গণতন্ত্রীদের জন্যে যুদ্ধকালীন চিকিৎসাব্যবস্থা সংগঠনে স্বনিয়োজিত ক্যানাডার নাগরিক ড. নর্ম্যান বেথুন-কে অনুসরণ করেছেন তাঁরা। যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের চিকিৎসায় কী প্রচণ্ড অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম ব্যয় করতেন ড. বেথুন, তারই পুঙ্খাণুপুঙ্খ বিবরণ তাঁরা ধরে রেখেছেন সেলুলয়েডের বুকে। তাঁরা বিশেষ জোর দিয়েছেন রক্তসঞ্চয় প্রকল্প (ব্লাড ব্যাঙ্ক) সংগঠনে যে-তাত্ত্বিক, সাংগঠনিক এবং বৈজ্ঞানিক ভূমিকা বেথুন পালন করেছেন তারই ওপর। স্পেন থেকে যত নেগেটিভ ক্লাইন পাঠিয়েছিলেন নিউ-ইয়র্কে, পল স্ট্র্যাণ্ড আর লিও হার্উইজ সে-সব সম্পাদনা করে তৈরি করলেন 'হার্ট অব স্পেন' এবং 'রিটার্ন টু লাইফ' (দুটিই ১৯৩৬)।

কার্তিয়ে-ব্রেসঁ অবশ্য স্পেনে আর-একটু বিশদ অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন সেখানকার চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে। বিশেষ করে সে-দেশের হাসপাতালগুলি ছিলো তাঁর কৌতূহলের বিষয়। ফলে ফ্রন্টিয়ার ফিল্ম গ্রুপ-এর কাজ শেষ হওয়ার পরেও তিনি স্পেনে থেকে গেলেন, ঘুরে বেড়ালেন গণতন্ত্রী সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের হাসপাতালগুলিতে। তাঁর সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নির্যাস পাওয়া যাবে বিস্মৃতপ্রায় একটি তথ্যচিত্রে: 'ভিক্ট্রি অব লাইফ' (১৯৩৭)। তাছাড়া 'কনফেদারেসিওঁ নাসিওনাল দেস্ ত্রাভেলিয়র্স্' স্পেনের সংগঠন 'আইবেরিয়ান অ্যানার্কিস্ট ফেডারেশন'-এর সহযোগিতায় কুড়ি মিনিটের একটি ছবি তৈরি করেছিলেন 'এ কল টু আর্মস্' নামে। গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষেরা যাতে আরো বেশি সংখ্যায় সশস্ত্র প্রতিরোধে সামিল হন, সেই আহ্বান ছিলো এ-ছবিতে।

বিদেশীদের উদ্যোগে স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে সবচেয়ে বেশি তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছিলো ব্রিটিশদের তৎপরতায়। এ-ব্যাপারে পথিকৃৎ আইভর মণ্টাগু। সংঘর্ষ শুরু হওয়ার তিনমাসের মাথায় মণ্টাগু হাজির হলেন মাদ্রিদে এবং প্রত্যক্ষ করলেন ফ্র্যাঙ্কোর বিমানবাহিনীর অবিরাম বোমাবর্ষণের মধ্যেও কী প্রচণ্ড ধৈর্য আর সাহসের সঙ্গে শহরবাসীরা সংগঠিত করেছেন তাঁদের প্রতিরোধ। 'ডিফেন্স অব মাদ্রিদ' (১৯৩৬) নামের এই ছবিটি মণ্টাগু উৎসর্গ করলেন ব্রিটেনে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যগঠনের লক্ষ্যে। এছাড়া মণ্টাগু গণতন্ত্রী অঞ্চলের বিভিন্ন

প্রতিরোধ-ক্ষেত্র ঘুরে-ঘুরে জার্মান ও ইতালীয় যুদ্ধবন্দীদের ছবি সংগ্রহ করেছিলেন, যে-দলিলের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিলো আরো দুটি ছবি 'প্রিজনার্স প্রুভ ইন্টারভেনশন ইন স্পেন' এবং 'টেস্টিমনি অব নন-ইন্টারভেনশন' (দুটিই ১৯৩৬ সালের)। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত 'নিরপেক্ষ অবস্থান'-এর যে-কুফল ফলছিল স্পেনের মাটিতে, তার জীবন্ত সাক্ষী হয়ে আছে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দুটি। স্পেন-সম্পর্কিত সমসাময়িক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রগুলির প্রত্যেকটিতে মণ্টাগু এই ছবি দুটি পাঠিয়েছেন, আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠনের উদ্দেশ্যে। ব্রিটেন-এ ফিল্ম অ্যাণ্ড ফোটো লীগ-এর উত্তরসূরি প্রগ্রেসিভ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট-এর উদ্যোগে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে গণতন্ত্রী সরকার পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তৈরি হয়েছিলো 'স্প্যানিশ এ বি সি' এবং 'বিহাইণ্ড দা স্প্যানিশ লাইন' (দুটিই ১৯৩৮ সালের)। ইওরোপীয় মহাদেশে সবচেয়ে অনগ্রসর শিক্ষাব্যবস্থার অধিকারী এই স্পেনে—যেখানে জনসংখ্যার ৫২ শতাংশই নিরক্ষর—অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারের যে-উদ্যম নিয়েছিলেন গণতন্ত্রী সরকার, যুদ্ধ তাকে ব্যাহত করেছিলো, বন্ধ করতে পারেনি। গণতন্ত্ররক্ষার সংগ্রামের চেয়ে যে কোনো-অংশেই কম নয় শিক্ষাপ্রসারের সংগ্রাম, ছবি দুটি এই উপলব্ধিতেই পৌঁছে দেবে দর্শককে।

বহিরাগতদের এই উৎসাহ-উদ্দীপনা অবশেষে সঞ্চারিত হলো স্থানীয় চলচ্চিত্র-কর্মীদেরও মনে, যদিও প্রথমদিকে তাঁরা প্রচারের ব্যাপারটিতে তেমন গুরুত্ব দেন নি। তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী আলভারেজ দেল ভায়ো-র ভাষায়: 'প্রচারের কাজকর্ম তেমন সন্তোষজনক ছিলো না।...স্পেনীয় সংগ্রামের উৎস এবং সে-দেশে বিদেশী হস্তক্ষেপ তথা আগ্রাসনের তথ্যগুলো গণতন্ত্র-সমর্থক একজন সাধারণ স্প্যানিয়ার্ডের কাছে এতই পরিষ্কার এবং পরিচিত ছিলো যে সে বুঝতেই পারেনি এমন স্পষ্ট, সংশয়াতীত ব্যাপারটি বিশ্ববাসীকে বোঝানোর জন্যে কেন আমাদের বিপুল পরিশ্রম করতে হবে।'[১২] কিন্তু বিদেশী তথ্যচিত্রগুলি জনমত সংগঠনে যে-ভূমিকা পালন করেছিলো, তাই দেখে ব্যাপারটা তাদের বোধগম্য হলো। সরকারি পর্যায়ে মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন্‌স্ এবং বেসরকারি পর্যায়ে লায়া ফিল্ম্‌স্ নামে দুটি প্রতিষ্ঠানের ওপর ভার পড়লো তথ্যচিত্র নির্মাণের ব্যবস্থাদি গ্রহণের। অবশ্য স্প্যানিয়ার্ডদের তৈরি তথ্যচিত্রগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছিলো সংবাদ হিশেবে বিভিন্ন ঘটনার গুরুত্ব। তথ্যধর্মিতায় উজ্জ্বল আর শিল্পবৈশিষ্ট্যে ভাস্কর হয়ে উঠেছিলো যে-সব ছবি, সেগুলি হলো 'নো পাসারান' (১৯৩৬), 'নিউ স্পেন' (১৯৩৮) আর 'মাদ্রিদ ১৯৩৬' (১৯৩৮)। মণ্টাগু যে-বিষয় নিয়ে ছবি

করেছিলেন, মোটামুটি সেই একই বিষয়, অর্থাৎ ফ্রাঙ্কোবাহিনীর বিরুদ্ধে মাদ্রিদ-বাসীদের মরণপণ প্রতিরোধ সংগ্রাম, হলো প্রথম ছবির উপজীব্য। 'নো পাসারান' হলো সেই সময়কার একটি জনপ্রিয় স্লোগান, অর্থ 'আমরা ওদের যেতে দেব না'। এই স্লোগান মুখে নিয়ে কয়েক লক্ষ মাদ্রিদবাসী প্রায় দু-বছর ধরে শহরের উপকণ্ঠে ঠেকিয়ে রেখেছিলো ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনীকে। অবিরাম বোমা এবং গোলাবর্ষণ তাদের টলাতে পারেনি। অবরুদ্ধ শহরের সেই দিনগুলোকে সেলুলয়েডে অমর করে রেখেছেন অনামা স্পেনীয় চলচ্চিত্রকারের দল। স্পেনীয় গণতন্ত্রীদের মর্যাদা-বোধ এবং অনমনীয়তার প্রতীক হয়ে আছে এই ছবি।

শেষ দুটি ছবিতে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান করেছিলেন লুইস বুনুয়েল কার্যকরী প্রযোজকের ভূমিকায়। ১৯৩৩-৩৪ সালের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকা-প্রবাসী হয়েছিলেন বুনুয়েল। কিন্তু সেখানকার চলচ্চিত্রজগতের ব্যবসায়িকতার সঙ্গে আপোস করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তিনি চলে আসেন পারী শহরে। গৃহযুদ্ধের শুরুতে বুনুয়েল আত্মনিয়োগ করলেন স্পেনে গণতন্ত্রের সপক্ষে বিশ্বজনমত সংগ্রহের কাজে। গণতন্ত্রী সরকার পরে তাঁকে একাজে আনুষ্ঠানিক-ভাবে নিযুক্ত করেছিলেন। উল্লিখিত দুটি ছবিতে সরকারের কাছে বুনুয়েল তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। ছবি দুটিতে বর্ণনা করা হয়েছে ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এক বছরের ঘটনা। প্রথম ছবিতে বিশ্লেষণ করা হয় গণতন্ত্রী সরকারের আমলে শিল্পবাণিজ্যের রূপান্তর, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সাম্যবাদী রাজনীতি বিষয়ে জনগণের সচেতনতাবৃদ্ধির বিষয়গুলি। ফ্যাসিস্ট-বাহিনীর ধ্বংসলীলা আর মাদ্রিদে জনগণের প্রতিরোধ এবং রাজনৈতিক সচেতন-তায় জনগণের পক্ষাবলম্বন, এই হলো দ্বিতীয় ছবির বিষয়। সামগ্রিক তত্ত্বাবধান ছাড়া ছবি দুটির ধারাভাষ্য রচনার মাধ্যমে সৃষ্টিশীল ভূমিকাই পালন করেছিলেন বুনুয়েল। পরাবাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিল্পীজীবন শুরু করে এইসব ছবির-সূত্রেই বাস্তববাদে এসে পৌঁছলেন তিনি।

রাজনৈতিক তথ্যচিত্র এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধ যেন এক নিবিড় সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। অথচ সমসাময়িক সেই উন্মাদনার পরিপ্রেক্ষিতটিকে উপেক্ষা করেই আন্দ্রে মালরো তৈরি করেছিলেন একটি কাহিনীচিত্র 'এসপোয়া' (১৯৩৯)—এটি তাঁর জীবনের একমাত্র ছবি। মালরো স্পেনে গিয়েছিলেন 'এ কল টু আর্মস' ছবির কাজে। কিন্তু ঘটনাচক্রে এত বেশি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে একটি নিটোল কাহিনীই রূপ পেলো তাঁর চৈতন্যে। সাধারণ স্পেনীয় নাগরিকেরা কীভাবে বৈমানিকের ভূমিকায় গণতন্ত্ররক্ষার সংগ্রামে নেমেছেন, সেই পটভূমিতে তিনি

তুললেন এই ছবি, যার ভিত্তিতে তিনি পরে রচনা করবেন তাঁর এক বিখ্যাত উপন্যাস 'লা স্পোয়া'। সাহিত্য রূপ পায় চলচ্চিত্রে, এই হলো আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা। বিপরীত এই উদাহরণের সূত্রে মালরো আমাদের জন্যে রেখে গেছেন এক বিরল অভিজ্ঞতার স্বাদ।

...

সফল হয়নি স্পেনে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ফ্রাঙ্কো-বাহিনী শেষ করলো তাদের গণতন্ত্রনিধনযজ্ঞ। কিন্তু প্রতিরোধ-সংগ্রামের মহত্ব, ব্যাপ্তি এবং তীব্রতা স্থায়ী সম্ভ্রমের আসন নিয়েছে গণতন্ত্রপ্রিয় প্রতিটি মানুষের মনে। এবং সেখানে বাসা বেঁধেছে ব্যর্থতাজনিত ক্ষোভও। উদ্দীপনা এবং সংক্ষোভের এই মিশ্রণ তারপর মাঝে-মাঝেই মানুষকে বাধ্য করেছে পেছনে তাকিয়ে ফেলে-আসা সেই দিনগুলোর মর্মোদ্ধার করতে। বিশেষ করে ষাটের দশকের শুরুতে, স্পেনে গৃহযুদ্ধের পঁচিশ বছরের মাথায়, সে-তাড়না প্রবল হয়েছিলো। চলচ্চিত্রকারেরাও ছিলেন না সেই অনুভূতির ব্যতিক্রম।

১৯৬২ সালে পুরোনো দলিলচিত্র উদ্ধার করে, তার সঙ্গে নতুন করে তোলা ছবির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ফরাসি পরিচালক ফ্রেডরিক রোসিফ তৈরি করলেন 'টু ডাই ইন মাদ্রিদ'। ইতিহাসের আনুপূর্বিক অনুসরণ করেননি অবশ্য রোসিফ। কিন্তু তাঁর রূপকল্প সংগঠন, তথ্য পরিবেশণ তথা আবহ রচনায় ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার যথেষ্ট পরিচয় তিনি রেখেছেন। মাদ্রিদ-অবরোধের সেই অন্ধকার দিনগুলোকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি কি অন্য-কিছুর ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলেন? অসম্ভব নয়, কারণ সে-সব ছিলো আমেরিকা-রাশিয়ার 'ঠাণ্ডা লড়াই'য়ের যুগ। রোসিফ হয়তো পৃথিবীর মানুষকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা / নিরপেক্ষতার বিষয়ে—কারণ তথাকথিত 'গণতন্ত্রী' সরকারগুলির এক আপাত নিরপেক্ষতার পটভূমিই স্পেনে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেছিলো। একই সময়ে তৈরি পূর্ব-জার্মানির তথ্যচিত্র 'আনটেমেব্‌ল্‌ স্পেন' (১৯৬২) অবশ্য ইঙ্গিতে নয়, গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিকে সরাসরি দায়ী করলো, স্পেনে গণতন্ত্রের বিপর্যয়ের জন্যে। রোসিফ ব্যবহার করেছিলেন মূলত পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া দেশগুলিতে প্রাপ্ত উপাদান; পূর্ব-জার্মানির ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছিলো মূলত সোভিয়েত উৎস থেকে পাওয়া উপাদান এবং কিছু পরিমাণে নাৎসি জার্মানির সংগ্রহশালা থেকে উদ্ধার করা তথ্য।

ফ্রাঙ্কো-সরকার এই ছবি দুটির উত্তরে তৈরি করিয়েছিলো *Morir en España* (১৯৬৫), যার মূল বক্তব্য, গৃহযুদ্ধের সময়ে জেনারেল ফ্রাঙ্কো জার্মানি এবং ইতালি থেকে কোনোরকম সাহায্য তো নেয়ইনি, উপরন্তু নাৎসি মতবাদের

সমর্থক হলেও জার্মানি বা ইতালিতে প্রবর্তিত উগ্র জাতীয়তাবাদ তথা পরমত-অসহিষ্ণুতাকে ফ্রাঙ্কো প্রশ্রয় দেয়নি।

এই একবারই ফ্রাঙ্কো সরকার প্রচারের কাজে চলচ্চিত্র মাধ্যমের ব্যবহার করেছিলো ! অবশ্য আরো তিনটি তথ্যচিত্রের নাম আমরা পাচ্ছি, যেগুলো ফ্রাঙ্কো-আমলের একেবারে গোড়ার দিকে ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট বন্ধুদের উদ্যোগে তৈরি—*Helden in Spanien* (জার্মানি-স্পেন সহযোগিতায়, ১৯৩৯), '*L'assedis dell' Alcazar* (ইতালি ১৯৩৯) এবং *Im Kampf gegen den Weltfeind* (জার্মানি ১৯৩৯)।

হতে পারে, ফ্রাঙ্কোও আচ্ছন্ন ছিলো সেই স্পেনীয় মানসিকতায়, যার বিষয়ে দেল ভায়ো আমাদের জানিয়েছেন এই ভাষায় : 'দৃঢ়তার সঙ্গে বিপরীত মতের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং যুক্তির সাহায্যে নিজের মত প্রতিষ্ঠায় স্প্যানিয়ার্ডদের আছে চিরাচরিত অনীহা, এটাই তাদের স্বভাব।'[১৩]

ঘটনা এই যে, এই 'প্রচারবিমুখতা' সত্ত্বেও ফ্রাঙ্কো তার ফ্যাসিবাদী শাসন বজায় রেখেছিলো চল্লিশ বছর ধরে, যেখানে প্রচারযন্ত্রের ওপর তার একচ্ছত্র আধিপত্য এবং সে-সবের অবিরাম ব্যবহার সত্ত্বেও তার ফ্যাসিবাদী পৃষ্ঠপোষকদের রাজত্বের আয়ু ছিলো মাত্র এক দশক। এবং তথ্য হিশেবে এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে গণতন্ত্রী সরকারের সপক্ষে অবিশ্রান্ত প্রচার চালিয়েও রোধ করা যায়নি তার পরাজয় এবং পতন।

যে-কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও সূক্ষ্ম বিচারে রাজনৈতিক বিবর্তন আর দ্বন্দ্বের শেষ ফলাফল প্রচার-নিরপেক্ষ এক প্রক্রিয়া। তবু কোনো রাজনৈতিক আলোড়নের সূত্রে প্রচারের নতুন প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে উদ্যমী মানুষ খুলে দিতেও পারে শিল্পের নতুন দিগন্ত—স্পেনের গৃহযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক তথ্যচিত্রের দ্রুত বিকাশ এবং পরিণতিলাভ আমাদের এনে দাঁড় করায় সেই উপলব্ধিরই সামনে।

উল্লেখপঞ্জি :

১. 'সিনেআস্তে' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় (শরৎ ১৯৭৯) প্রকাশিত জর্জ সেমপ্রাঁ-র সাক্ষাৎকার থেকে—বাংলা অনুবাদ : প্রবীর ভট্টাচার্য; 'চিত্রকল্প—২৫' (কলকাতা, সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা); দ্র.—পৃ. ১৬।

২. 'দ্য স্প্যানিশ আর্থ' ছবির ধারাভাষ্যের নির্বাচিত অংশ থেকে—রোসালিণ্ড ডেল্‌মার : 'জরিস ইভেন্স—ফিফ্‌টি ইয়ার্‌স্ অব ফিল্ম-মেকিং' (১৯৭৯ ; লণ্ডন, বৃটিশ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট), পৃ. ৭৪ ।

৩. রবার্ট পেইন : 'দ্য গ্রেট চার্লি' (১৯৫২) বইতে উদ্ধৃত চ্যাপলিন-এর বক্তব্য ।

৪. ভিক্টর ক্যাসস-এর 'লাস্ উর্দেস : ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' প্রবন্ধে উদ্ধৃত লুইস বুনুয়েল-এর বক্তব্য—জোয়ান মেলেন সম্পাদিত : 'দ্য ওয়ার্ল্ড অব লুইস বুনুয়েল' (১৯৭৮ ; নিউইয়র্ক, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস), পৃ ১৮০ ।

৫. 'লাস্ উর্দেস' ছবির ধারাভাষ্য—অনুবাদ : গাস্ত রবের্জ এবং প্রবীর মিত্র ; 'পটভূমি' (শারদসংখ্যা ১৩৯১ ; আসানসোল, ফিল্ম স্টাডি সেণ্টার), পৃ. ৩৫ ।

৭. 'লাস্ উর্দেস' ধারাভাষ্য—'পটভূমি' (১৩৯২), পৃ. ৩৫ ।

৭. 'লাস্ উর্দেস' ধারাভাষ্য—'পটভূমি' (১৩৯২), পৃ. ৩৬ ।

৮. 'লাস্ উর্দেস' ধারাভাষ্য—'পটভূমি' (১৩৯২), পৃ. ৪০ ।

৯. বুনুয়েল-এর বক্তব্য—জোয়ান মেলেন সম্পা° (১৯৭৮), পৃ. ১৮৪ ।

১০. 'লাস্ উর্দেস' ধারাভাষ্য—'পটভূমি' (১৩৯২), পৃ. ৪০ ।

১১. 'দ্য স্প্যানিশ আর্থ' ধারাভাষ্য—রোসালিণ্ড ডেল্‌মার (১৯৭৯), পৃ. ৭৪ ।

১২. হোসে আলভারেজ দেল ভায়ো : 'ফ্রীডম্‌ল্' (১৯৪২ ; নিউইয়র্ক, আলফ্রেড এ. নফ্‌)—উদ্ধৃতি দিয়েছেন জরিস ইভেন্স ; ইভেন্স : 'দ্য ক্যামেরা অ্যাণ্ড আই' (১৯৭৪ ; নিউ-ইয়র্ক, ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স), পৃ. ১০৭ ।

১৩. জরিস ইভেন্স (১৯৭৪), পৃ. ১০৭

স্পেনে ত্রিশের দশকের সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট বিষয়ে ছবি

১৯৩২ 'লাস উর্দেস'—র‍্যামন আসিন, স্পেন [৩৫ মি. মি , ৩০ মিনিট]

১৯৩৬ 'ডিফেন্স অব মাদ্রিদ'—প্রগ্রেসিভ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট, ব্রিটেন [১৬ মি মি., ৪৫ মিনিট, ভাষ্যহীন] ।

'হার্ট অব স্পেন'—ফ্রন্টিয়ার ফিল্মস্ গ্রুপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ।

'রিটার্ন টু লাইফ'—ফ্রন্টিয়ার ফিল্মস্ গ্রুপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ।

'দ্য স্প্যানিশ আর্থ'—কণ্টেম্পোরারি হিস্টোরিয়ান্‌স্, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র [৩৫ মি. মি., ৫০ মিনিট] ।

'স্পেন ইন ফ্রেম্‌স্' — নিউ-ইয়র্ক ফিল্ম অ্যালায়েন্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

'বার্সিলোনা নিউজরীল' — লায়া ফিল্মস্, [১৬ মি. মি/৩৫ মি. মি., ১০ মিনিট]।

'নো পাসারান' (দে শ্যাল নট পাস) — মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, স্পেন [১৬ মি. মি./৩৫ মি. মি, ৩২ মিনিট]।

'রিফিউজিস্ ফ্রম কাতালোনিয়া' — প্রগ্রেসিভ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট, ব্রিটেন।

'ভিক্‌ট্রি অব লাইফ' — ফ্রান্স।

১৯৩৭ 'নিউজ ফ্রম স্পেন' — প্রগ্রেসিভ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট, ব্রিটেন [১৬ মি. মি./ ৩৫ মি. মি, ৪০ মিনিট]।

'নিউজ ফ্রম স্পেন/১' — লায়া ফিল্মস্, স্পেন [৩৫ মি. মি, ১৩ মিনিট]।

'নিউজ ফ্রম স্পেন/২' — লায়া ফিল্মস্, স্পেন [৩৫ মি. মি., ১০ মিনিট]।

'নিউজ ফ্রম স্পেন/৩ — লায়া ফিল্মস্, স্পেন [৩৫ মি. মি., ১০ মিনিট]।

'নিউজ ফ্রম স্পেন/৪' — লায়া ফিল্মস্, স্পেন [৩৫ মি. মি, ১০ মিনিট]।

'আ কল্ টু আর্মস্' — কনফেদারেসিওঁ নাসিওনাল দেস্ ত্রাভেলিয়র্‌স্, ফ্রান্স এবং আইবেরিয়ান অ্যানার্কিস্ট ফেডারেশন, স্পেন [১৬ মি. মি, ২০ মিনিট]।

'ক্রাইম এগেন্‌স্ট মাদ্রিদ' — কনফেদারসিওঁ নাসিওনাল দেস্ ত্রাভেলিয়র্‌স্, ফ্রান্স এবং প্রগ্রেসিভ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট, ব্রিটেন [১৬ মি. মি, ৩০ মিনিট]।

'এয়ার বম্বিং অব মাদ্রিদ' — মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন, স্পেন [১৬ মি. মি./৩৫ মি. মি, ৯ মিনিট, ভাষ্যহীন]।

'আলকোয়েজার' — স্পেন [১৬ মি. মি., ১৫ মিনিট, ভাষ্যহীন]।

'মাদ্রিদ নাউ' — প্রগ্রেসিভ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট, ব্রিটেন [১৬ মি. মি., ২০ মিনিট]।

'মাদ্রিদ টু-ডে' — মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন, স্পেন [১৬ মি. মি./ ৩৫ মি. মি., ৮ মিনিট]।

'মডার্ন অর্ফ্যান্‌স্ অব দা স্টর্ম' — ন্যাশনাল জয়েন্ট কমিটি ফর স্প্যানিশ রিলিফ, ব্রিটেন এবং রিয়ালিস্ট ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট, ব্রিটেন [৩৫ মি. মি., ১০ মিনিট]। — এ-ছবির ১৬ মি. মি. সংস্করণের নাম 'বাস্ক চিলড্রেন'।

'নন্-ইন্টারভেনশন' — প্রগ্রেসিভ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট, ব্রিটেন [৩৫ মি. মি., ১০ মিনিট]।

'টেস্টিমনি অব নন্-ইণ্টারভেনশন'—প্রগ্রেসিভ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট, ব্রিটেন [১৬ মি. মি./৩৫ মি. মি., ৩৩ মিনিট]।

'প্রিজনার্স প্রুভ ইণ্টারভেনশন ইন স্পেন'—প্রগ্রেসিভ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট, ব্রিটেন [৩৫ মি. মি, ৫ মিনিট]।

'স্পেন ১৯৩৬-৩৭'—ফিল্ম অ্যাণ্ড ফোটো লীগ, ব্রিটেন [১৬ মি. মি., ২০ মিনিট, ভাষ্যহীন]।

'ইণ্টারন্যাশনাল বিগ্রেড'—প্রগ্রেসিভ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট, ব্রিটেন [১৬ মি. মি., ১০ মিনিট]।

'রিটার্ন অব দ্য ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড'—অ্যাসোসিয়েশন অব সিনে-ম্যাটোগ্রাফ টেক্‌নিশিয়ান্‌স্, ব্রিটেন [১৬ মি. মি, ভাষ্যহীন]।

'ইণ্টারন্যাশনাল কলাম'—প্রগ্রেসিভ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট, ব্রিটেন [১৬ মি. মি., ৩০ মিনিট, ভাষ্যহীন]।

১৯৩৮ 'স্প্যানিশ এ বি সি'—প্রগ্রেসিভ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট, ব্রিটেন [১৬ মি. মি./৩৫ মি. মি, ২০ মিনিট]

'বিহাইণ্ড দা স্প্যানিশ লাইন্‌স্'—প্রগ্রেসিভ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট, ব্রিটেন [১৬ মি. মি./৩৫ মি. মি., ২০ মিনিট]।

'ব্রিটেন এক্‌স্‌পেক্ট্‌স্'—প্রগ্রেসিভ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট, ব্রিটেন [১৬ মি. মি./৩৫ মি. মি., ২০ মিনিট]

'দ্য হেল্‌থ্ অব স্পেন'—ফিল্ম পপুলার, স্পেন [৩৫ মি. মি., ১৫ মিনিট]।

'হেল্‌প্ স্পেন'—ন্যাশনাল জয়েণ্ট কমিটি ফর স্প্যানিশ রিলিফ, ব্রিটেন [১৬ মি. মি, ৪০ মিনিট]

'মাদ্রিদ ১৯৩৬'—মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন, স্পেন, [১৬ মি. মি./৩৫ মি. মি., ৩৫ মিনিট]।

'মি. অ্যাটলি ইন স্পেন'—মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন, স্পেন [৩৫ মি. মি., ৫ মিনিট, ভাষ্যহীন]।

'নিউ স্পেন'—মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন, স্পেন [৩৫ মি. মি., ৩৫ মিনিট]।

'সানশাইন ইন শ্যাডো'—ফিল্ম পপুলার, স্পেন [৩৫ মি. মি., ১২ মিনিট]।

১৯৩৯ 'ইস্পানিয়া'—মস্‌ফিল্ম, সোভিয়েত ইউনিয়ন।

'এস্‌পোয়া' (কাহিনীচিত্র)—ফ্রান্স [৩৫ মি. মি., ৯০ মিনিট]।

'*Helden in Spanien*'—জার্মানি-স্পেন।

'*L'assedio dell' Alcazar*'—ইতালি।

'*In Kampf gegen den Weltfeind*'—জার্মানি।

'টু ডাই ইন মাদ্রিদ'—আন্‌সিনেক্স, ফ্রান্স [৩৫ মি. মি., ৯০ মিনিট]।

'আনটেমেব্‌ল্‌ স্পেন'—পূর্ব জার্মানি।

'*Morir en España*'—স্পেন।

'টু মেমরীজ'—

'দ্য স্পিরিট অব দা বী-হাইভ' (কাহিনীচিত্র)—স্পেন।

লুইস বুনুয়েল

গৃহযুদ্ধের দিনগুলি

১৯৩৬-এর জুলাইতে ফ্রাঙ্কো তার মরোক্কোর সেনাবাহিনী নিয়ে স্পেনে পৌঁছেছিল—তার দৃঢ় অভিপ্রায় ছিল রিপাবলিককে উচ্ছেদ ক'রে দিয়ে "শৃঙ্খলা"র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। একমাস আগেই আমার স্ত্রী ও ছেলে পারী চ'লে গিয়েছিলেন, মাদ্রিদে শুধু আমিই ছিলাম একা। একদিন ভোরবেলায়, খুব ভোরে, একঝাঁক বিস্ফোরণ আর কামানের আওয়াজে আমি আঁৎকে জেগে উঠেছিলাম; একটি রিপাবলিকান বিমান মোনতানিয়ার ফৌজি ব্যারাকে বোমা ফেলছে।

সে-সময়ে, স্পেনের সমস্ত ব্যারাকই সৈন্যসামন্তে গিশগিশ করছে। একদল ফালান্‌গিস্ত মোনতানিয়ায় গোপন আস্তানা গেড়েছিল, কয়েকদিন ধ'রেই এই-ওই জানলা থেকে গুলি চালাচ্ছিল, অনেক নাগরিকও তাকে জখম হ'য়ে ছিলেন। জুলাই ১৮-র সকালে, একদল শ্রমিক—আজানিয়ার রিপাবলিকপন্থী গুপ্ত হামলাদল তাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ক'রে সমর্থন জানাচ্ছিল—ব্যারাকগুলিতে গিয়ে চড়াও হ'লো। বেলা দশটার মধ্যেই সব শেষ: বিদ্রোহী অফিসার ও ফালান্‌গিস্তরা খতম। যুদ্ধ শুরু হ'য়ে গিয়েছে।

বিশ্বাস করা খুব শক্ত ছিল। আমার ব্যালকনি থেকে দূরের মেশিনগানের আওয়াজ শুনতে-শুনতে, আমি দেখতে পেলাম নিচের রাস্তা দিয়ে একটা শ্নাইডার কামান গড়িয়ে যাচ্ছে—জনাদুই শ্রমিক আর কয়েকজন জিপসি সেটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যে-বিপ্লব এত বছর ধ'রে ভেতরে-ভেতরে শক্তি সঞ্চয় করছিল ব'লে আমরা অনুভব করছিলাম, আমি যা নিজে ব্যক্তিগতভাবে এত উৎসাহভরে চাচ্ছিলাম, এখন সে আমার চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করছে। আমি শুধু একটা মস্ত ঝাঁকুনি খেলাম।

দু-হপ্তা পরে, এলিয়ে ফাউরে—বিখ্যাত শিল্প ঐতিহাসিক এবং রিপাবলিকান পক্ষের একান্ত উৎসাহী সমর্থক—কয়েকদিনের জন্যে মাদ্রিদ এলেন। একদিন সকালে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তাঁর হোটেলে গিয়ে হাজির হলাম—এখনও আমার চোখে ভাসছে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর জানলায়, পরনে লম্বা অন্তর্বাস, তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছেন নিচে রাস্তায় লোকের জমায়েৎ. লোকজনের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দেখে তাঁর চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল পড়ছিল। একদিন, আমরা

দেখতে পেলাম শো-খানেক চাষী কুচকাওয়াজ ক'রে চলেছে, প্রতি সারিতে চার-জন, কারু-কারু কাছে শিকারী বন্দুক আর রিভলভার, অনেকের হাতেই কাস্তে, মাশেতে, কুড়াল। শৃঙ্খলা রাখবার জন্যে তারা খুবই চেষ্টা করছে, খুবই চেষ্টা করছে সার বেঁধে কুচকাওয়াজ ক'রে যেতে। ফাউরে আর আমি দুজনেই কেঁদে ফেললাম।

মনে হয়েছিল কিছুই আর এমন গভীর-প্রোথিত জনশক্তিকে পরাস্ত করতে পারবে না, কিন্তু যে-আনন্দ আর উৎসাহ সেই গোড়ার দিকের দিনগুলিকে বর্ণময় ক'রে রেখেছিল, শিগগিরই তা বদ্‌লে গেল তর্কাতর্কি, সংগঠনবিহীন বিশৃঙ্খলা আর অনিশ্চয়তায়—আর এইভাবেই চলেছিল নভেম্বর ১৯৩৬ অব্দি, যখন আস্তে-আস্তে দক্ষ, সুশৃঙ্খল ও সক্ষম এক রিপাবলিকপন্থী সংগঠন ফুটে উঠতে থাকে। ১৯৩৬-এ আমার দেশের বুক যে-গভীর ক্ষতয় চিরে গিয়েছিল আমি তার কোনো গভীর বিবরণ দেবার দাবি করছি না। আমি ঐতিহাসিক নই, আর আমি নিরপেক্ষও নই মোটেই। আমি শুধু সে-কথাই বলবার চেষ্টা করতে পারি যা আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং যা আমার এখনও [১৯৮২] মনে আছে। তবে, মাদ্রিদের সেই গোড়ার দিকের চার মাস আমি এখনও স্পষ্টভাবে চোখে দেখতে পাই। কাগজে-কলমে, মাদ্রিদ তখনও রিপাবলিকপন্থীদের দখলে ছিল; কিন্তু ফ্রাঙ্কো এর মধ্যেই এসে পৌঁছেছিল তোলেদোয়, সালামানথা আর বুর্গোসের মতো ক-টি শহর দখল ক'রে নেবার পর। মাদ্রিদের মধ্যে, ফাশিস্তপন্থীদের চোরাগোপ্তা গুলি অনবরত চলছিল। যাজকরা আর ধনী জমিদারেরা—ঘুরিয়ে বলতে গেলে, যাদের মধ্যে ছিল রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব—সবসময় ভয়ে-ভয়ে ছিল কখন রিপাবলিকানপন্থীরা এসে তাদের প্রাণদণ্ড দেয়। যে-মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হয়, অ্যানার্কিস্টরা (নৈরাজ্যবাদীরা) সব রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিল এবং তক্ষুনি তাদের সবাইকে কনফেদারাসিওন নাসিওনাল দে ত্রাবাহোর দলভুক্ত ক'রে নেয়—সরাসরি যাকে নিয়ন্ত্রণ করত অ্যানার্কিস্ট সংগঠন। এই সংগঠনের কয়েকজন সদস্য এমনই উগ্রপন্থী ছিল যে কারু ঘরে এমনকী সামান্য-কোনো ধর্মীয় মূর্তি দেখলেই তাকে তক্ষুনি বিনাবাক্যব্যয়ে কাসা কাম্পোয় নিয়ে-যাওয়া হত, শহরের ঠিক বাইরেই যে-পার্কটায় বিচার ও প্রাণদণ্ড সম্পন্ন হত। রাত্তিরে যাদের গ্রেফতার করা হত তাদের সবসময়েই বলা হত, 'বাইরে একটু হেঁটে আসি, এসো'।

বুদ্ধির কাজ হত প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলবার সময় সবসময় অন্তরঙ্গ "তুমি" ব্যবহার করা, সেই সঙ্গে কোনো অ্যানার্কিস্টের সঙ্গে কথা বলবার সময় সোৎসাহে

বলা উচিত হত "কোম্পানিয়েরো" আর কোনো কমিউনিস্টকে বলতে হত "কামারাদা"। বেশির ভাগ গাড়ির ওপরই বাঁধা থাকত গোটা-দুই জাজিম যাতে চোরাগোপ্তা গুলির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কোন দিকে মোড় ঘুরছি সংকেত দেবার জন্যেও গাড়ির জানলা থেকে হাত বার-করা বিপজ্জনক ছিল—যদি এই মুদ্রাকে ফাশিস্ত অভিবাদন ব'লে কেউ ভুল ক'রে বসে—এবং তক্ষুনি তো এক-দফা দ্রুত গুলির ঝাঁক ছুটে আসবে। যারা "সেনিওরিতো", অর্থাৎ তথাকথিত "ভদ্র" পরিবারের ছেলে, তারা পরত পুরোনোটুপি আর নোংরা জামা যাতে যতদূরসম্ভব তাদের শ্রমিক ব'লে মনে হয়—ওদিকে, অন্যদিকে, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি বলেছিল ধবধবে শাদা জামা আর নেকটাই পরতে।

আমার এক বন্ধু ছিল ওনৃতানিওন, নামকরা চিত্রকর; একদিন সে এসে বললে সায়েন্থ দে এরেদিয়া নাকি গ্রেফতার হয়েছে। সে এক চলচ্চিত্র পরিচালক, সে আমার সঙ্গে 'লা ইহা দে হুয়ান সিমোন' আর 'কিয়েন মে কিয়েরে আমি' ছবি দুটোয় কাজ করেছিল। সায়েন্থ ছিলো প্রিমো দে রিভেরার খুড়তুতো ভাই, পার্কে-পার্কেই বেঞ্চে ঘুমুত কেননা বাড়ি যেতে ভয় পেত, কিন্তু তার এত-সব সতর্কতা সত্ত্বেও তাকে একদল সোশিয়ালিস্ট ধ'রে ফেলেছে, তার ভয়ংকর পারিবারিক সম্বন্ধের জন্যে এখন সে অপেক্ষা করছে কখন তার মৃত্যুদণ্ড হয়। আমি যখন পুরো ব্যাপারটা শুনলাম, আমি সঙ্গে-সঙ্গে রোৎপেন্থে স্টুডিওতে চ'লে গেলাম, গিয়ে দেখলাম কর্মীরা সেখানে—অন্য অনেক সংগঠনের মতোই—একটা পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তাদের একটা সভা হচ্ছে। যখন আমি জিগেশ করলাম সায়েন্থ কেমন আছে, তারা সবাই বললে, 'ভালো', "ওর বিরুদ্ধে" তাদের কোনো বক্তব্য নেই। আমি তাদের অনুনয় ক'রে বললাম আমার সঙ্গে যাবার জন্যে কয়েকজন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে, যাতে ওকে যেখানে আটকে রাখা হয়েছে, সেই কাইয়ে দে মার্কেস দে রিস্কাল-এ সোশিয়ালিস্টদের ঠিক এই বক্তব্যটাই জানিয়ে আসতে পারি: রাইফেলধারী কয়েকজন এ-প্রস্তাবে রাজি হ'লো, কিন্তু আমরা গিয়ে দেখি শুধু একজন পাহারাদার ফটকে যেন-কিছুই-হয়নি এমনি ভঙ্গি ক'রে রাইফেল কোলে ব'সে আছে। যতদূর-সম্ভব ভারিক্কি গলা ক'রে আমি তার উর্ধ্বতন অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম—সে দেখা গেল এক লিউটেনান্ট, যার সঙ্গে ব'সে আমি গত রাত্রেই ডিনার খেয়েছি।

'এই-যে, বুনুয়েল,' সে শান্ত গলায় বললে, 'তুমি এখানে কী করছ?'

আমি ব্যাখ্যা ক'রে বললাম যে আমরা তো আর সবাইকেই প্রাণদণ্ড দিতে পারি না, আমরা সবাই জানি যে প্রিমো দে রিভেরার সঙ্গে সায়েন্থ-এর

আত্মীয়তা আছে, কিন্তু এই চলচ্চিত্রকার সবসময়েই সুষ্ঠু ও নিখুঁত ব্যবহার করেছে। স্টুডিওর প্রতিনিধিদলও তার পক্ষেই ওকালতি করলে, এবং অবশেষে তাকে ছেড়ে দেয়া হ'লো—এবং ছেড়ে দেবামাত্র সে গোপনে সটকে পড়ল্ ফ্রান্সে এবং পরে ফালান্গেদের সঙ্গে যোগ দিল। যুদ্ধের পর সে আবার সিনেমা তুলতে শুরু করে, এমনকী ফ্রাঙ্কোর গুণকীর্তন ক'রে একটা ছবি অব্দি সে তুলেছিল। তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল ১৯৫০এ কান্ চলচ্চিত্র উৎসবে। এ-সময়ে সান্তিয়াগো কার্‌রিওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুতা হয়েছিল, সে ছিল সংযুক্ত সমাজবাদী যুব সমাজের সচিব। যে-শহরে সবাই সবাইকে সবদিক থেকে গুলি করছে, সেই শহরে নিজেকে নিরস্ত্র ও নিঃসহায় দেখে আমি একদিন কার্‌রিওর সঙ্গে দেখা ক'রে একটা আগ্নেয়াস্ত্র চাই।

'আর একটাও নেই,' সে তার ফাঁকা দেরাজ খুলে দেখালে। অনেকক্ষণ নাছোড় খোঁজাখুঁজির পর আমি অবশেষে একজনকে আবিষ্কার করলাম যে আমাকে একটা রাইফেল দিলে। মনে আছে একদিন যখন আমি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে প্লাথা দেলা ইন্‌দেপেন্‌দেনসিয়ায় গিয়েছি হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হ'লো। লোকে বাড়ির ছাত থেকে, জানলা থেকে, গাড়ির আড়াল থেকে এলোমেলো গুলি চালাচ্ছে। সে এক উন্মাদ হুলুস্থুল, আর আমি কিনা তারই মধ্যে একটা গাছের আড়ালে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছি, কোনদিকে কাকে তাগ ক'রে যে গুলি ছুঁড়ব তা-ই জানি না। তাহ'লে আর এ-সব বন্দুক-টন্দুক দিয়ে কী হবে, আমি ভাবলাম, এবং পরক্ষণেই ছুটে গিয়ে বন্দুকটা ফেরৎ দিয়ে এলাম।

সবচেয়ে খারাপ ছিল প্রথম তিনটি মাস, তার প্রধান কারণ কারুই কোনো-কিছুর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। যে-আমি, চিরকাল এত একাগ্রভাবে অন্তর্ঘাতের কথা ব'লে এসেছি, যে-আমি চিরকাল চেয়েছি প্রতিষ্ঠিত সমাজ্-ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে, এখন আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম এক অগ্নিগিরির ওপর ব'সে আছি এবং আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। যদি কোনো-কোনো দুর্ধর্ষ অভিযানকে আমার যুগপৎ উদ্ভট আর মহীয়ান ব'লে মনে হ'য়ে থাকে—যেমন একবার একদল শ্রমিক একটা ট্রাকে উঠে একদিন সোজা চ'লে গিয়েছিল সেক্রেড হার্ট অভ জিসাসের মূর্তির কাছে—আর জিশুর মূর্তিকে গুলি ছুঁড়ে ঝাঁঝরা ক'রে দিয়েছিল—তবু আমার পক্ষে কিছুতেই দুমদাম খতমকাজ, লুঠতরাজ, অপকর্মগুলো সহ্য করা কঠিন হ'য়ে উঠছিল। জনগণ একযোগে উঠে যেই ক্ষমতা ছিনিয়ে নিলে, অমনি তারা বিভিন্ন দলে টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেল আর নিজেদেরই

ছিঁড়েখুঁড়ে মারতে লাগল। এই উন্মাদ এবং নির্বিচার শায়েস্তাবাদ সকলকে প্রায় যেন ভুলিয়েই দিয়েছিল যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী।

প্রতি রাতে আমি 'অ্যাসোসিয়েশন অভ রাইটার্স অ্যাণ্ড আর্টিস্টস ফর দা রেভোলিউশন'এর সভায় যেতাম—যেখানে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হত—রাফায়েল আলবের্তি, বেরগামিন, সাংবাদিক কোর্পু'স ভারগা, কবি আল্তোলাগিররে (সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করত এবং পরে [১৯৫১] আমার 'মেক্সিকান বাস-রাইড' ছবির প্রযোজনা করেছিল)। সারাক্ষণ এরা উদ্দীপ্ত ও তপ্তভাবে একবারও না-থেমে তর্ক ক'রে যেত—যার একটা আলোচ্য বিষয় ছিল আমরা কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করব না নিজেদের সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত করব। যথারীতি আমি টানা-পোড়েনে ভুগছিলাম—একদিকে আছে নৈরাজ্যের প্রতি আমার বুদ্ধিজৈবিক (এবং আবেগময়) আকর্ষণ—অন্যদিকে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্যে ভেতরের এক মৌল টান। আর আমরা কিনা সেখানে—জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে—ব'সে-বসে শুধু তত্ত্ব গ'ড়েই আমাদের সময় কাটিয়ে দিচ্ছি।

ফ্রাঙ্কো এগুতেই থাকল। কতগুলি মফস্বল শহর ও নগর রিপাবলিকপন্থীদের প্রতি অনুগত থেকে গিয়েছিল, কিন্তু অন্যরা প্রায় বিনা যুদ্ধেই তার কাছে আত্ম-সমর্পণ করছিল: ফাশিস্ত অত্যাচার ছিল দয়ামায়াহীন; কারু মধ্যে কোনো উদার মনোভাব আছে সন্দেহ হ'লেই তাকে বিনা বিচারে খুন করা হচ্ছিল। কিন্তু কোনো পালটা সংগঠন করার বদলে আমরা শুধু তর্কাতার্কি ক'রে চললাম—আর অ্যানার্কিস্টরা পুরুৎ দেখলেই খতম করতে লাগল। এখনও আমি সেদিনকার চীৎকার শুনতে পাই: 'নিচে এসে ছাখো, রাস্তায় এক পাদ্রি ম'রে প'ড়ে আছে।' যে-আমি প্রচণ্ডভাবে চার্চের বিরুদ্ধে, সেই-আমি পর্যন্ত এ-ধরনের হত্যাকাণ্ড সমর্থন করতে পারছিলাম না।—যদিও এটাও ঠিক চার্চের লোকরা খুব নির্দোষ দর্শকমাত্র ছিল না। তারাও সকলের মতো অস্ত্র হাতে নিয়েছিল এবং তাদের ঘণ্টাঘরের মিনার থেকে যথেষ্ট এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়েছিল। আমরা এমনকী কামান সমেত দোমিনিকান পাদ্রিদেরও দেখেছিলাম। সামান্য কয়েকজন যাজকই যোগ দিয়েছিল রিপাবলিকানদের পক্ষে, কিন্তু প্রায় সবাই চ'লে গিয়েছিল ফাশিস্ত পক্ষে। যুদ্ধ কাউকে রেহাই দেয়নি, নিরপেক্ষ থাকা সত্যি অসম্ভব ছিল, 'তেরসেরা এস্পানিয়া'র স্বপ্নরাজ্যের পক্ষে আনুগত্য ঘোষণা না-ক'রে উপায় ছিল না।

মাঝে-মাঝে, আমার ভীষণ ভয় করত। আমি থাকতাম দারুণ একটা বুর্জোয়া অ্যাপার্টমেণ্টে, মাঝে-মাঝেই ভাবতাম বন্য একদল অ্যানার্কিস্ট এসে যদি আমার বাড়িতে চড়াও হয় তবে কী হবে—হয়তো গভীর রাত্রে এসে বলবে, 'চলো, একটু

হেঁটে আসি'। আমি কি তখন বাধা দেবো? কী ক'রে বাধা দেবো? কী বলতে পারি আমি তাদের?

মাদ্রিদ তখন মিথ্যায় গুজবে-জনরবে উত্তাল; প্রত্যেকেরই একটা গল্প শোনাবার আছে। একবার শুনেছিলাম মাদ্রিদের এক কনভেন্টের একদল নান তাদের চ্যাপেলে যাবার পথে শিশু জিশু-কোলে কুমারীর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একটা হাতুড়ি আর বাটালি দিয়ে মাদার স্যুপীরিয়র শিশু জিশুর মূর্তি কোলে ক'রে চ'লে গিয়েছিল।

'আবার আমরা ওকে ফিরিয়ে আনব,' কুমারীমূর্তিকে সে বলেছিল, 'এ-যুদ্ধ জিতে নেবার পর।'

রিপাবলিকানপন্থীদের শিবির অসন্তোষে মতবিরোধে ঝাঁঝরা হ'য়ে যাচ্ছিল। কমিউনিস্ট আর সোশিয়ালিস্টদের কাছে প্রধান লক্ষ্য ছিল যে-ক'রেই হোক এ-যুদ্ধ জিততে হবে; কিন্তু অ্যানার্কিস্টরা ধ'রে নিয়েছিল যুদ্ধ তারা কবেই জিতে গিয়েছে—এখন শুধু আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার ওয়াস্তা।

'তোর্‌রেলোদোনেস-এ আমরা একটি কমিউন বানিয়েছি,' শ্রমিকদের মুখপত্র 'এল্ সিনদিকালিস্তা'র সম্পাদক জিল বেল একদিন আমায় কাফে কাস্তিইয়াতে বললে। 'এর মধ্যেই কুড়িটা বাড়ি আছে আমাদের—লোক ভর্তি। তোমারও সেখানে একটা বাড়ি নেয়া উচিত।'

রাগে-বিস্ময়ে আমি নিজেকে ভুলে যেতে বসেছিলাম। এ-সব বাড়ি ছিল তাদের যাদের হত্যা করা হয়েছে বা যারা বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে তাদের। আর শুধু তা-ই যেন যথেষ্ট নয়, তোর্‌রেলোদোনেস জায়গাটা সিয়েরা দে গুয়াদার্‌রামার তলায়, ফাশিস্ত সীমান্ত থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে। ফ্রাঙ্কোর বাহিনার গোলাগুলির পাল্লার মধ্যে ব'সে অ্যানার্কিস্টরা নিরুদ্বেগে তাদের স্বপ্নরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে!

আরেকবার, আমি একটা রেস্তোরাঁয় সংগীতশিল্পী রেমাচার সঙ্গে ব'সে লাঞ্চ খাচ্ছি—রেমাচা ছিল ফিল্মোফোনো স্টুডিওর অন্যতম পরিচালক, যেখানে আমি আগে কাজ করেছি। রেস্তোরাঁমালিকের ছেলে ক-দিন আগেই ফালান্‌গিস্তদের সঙ্গে সিয়েরা দে গুয়াদার্‌রামায় লড়াই ক'রে ভীষণভাবে জখম হয়েছে। হঠাৎ, কয়েকজন সশস্ত্র অ্যানার্কিস্ট ফেটে পড়ল রেস্তোরাঁয়: 'সালুদ, কোম্পানিয়েরোস।' আর মদ চেয়ে হাঁক পাড়ল। ক্ষিপ্ত হ'য়ে, আমি তাদের বললাম এক ভালো-মানুষের ছেলে যখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে, তখন তাঁর মদের ভাঁড়ার ফাঁক ক'রে না-দিয়ে তাদের এখন পাহাড়ে গিয়ে লড়াই করা উচিত। চট

ক'রে তারা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল এবং রেস্তোরাঁ ছেড়ে চ'লে গেল—অবশ্যি মদের বোতলগুলো সঙ্গে নিয়েই।

রোজ সন্ধ্যায়, অ্যানার্কিস্টদের আস্ত-আস্ত বাহিনী পাহাড় থেকে নেমে আসত হোটেলের মদের ভাঁড়ার লুঠ করতে। তাদের এ-সব ব্যবহার আমাদের সকলকেই কমিউনিস্ট ক'রে তুলেছিল। যুদ্ধের শুরুতে তাদের সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না, কিন্তু দিনগুলো যত এক-এক ক'রে কাটে কমিউনিস্টদের সংখ্যা ততই বাড়তে লাগল। সংগঠিত, সুশৃঙ্খল, শুধু যুদ্ধের ওপরই সমস্ত মনোযোগ, আমার কাছে তখন তারা—এবং এখনও—সমস্ত অভিযোগের উর্ধ্বে ব'লে মনে হচ্ছিল। ব্যাপারটা দুঃখের হ'লেও পরম সত্য যে অ্যানার্কিস্টরা তাদের ফাশিস্তদের চাইতেও ঢের বেশি ঘৃণা করত। এই কলহ শুরু হয়েছিল যুদ্ধের আগেই, যখন ১৯৩৫-এ, ফেদেরাসিওন আনার্কিস্তা ইবেরিয়া (FAI) রাজমিস্ত্রিদের একটা ধর্মঘট ঘোষণা করেছিল। অ্যানার্কিস্ট রামোন আসিন, যে 'লাস্ উর্দেস' তোলবার টাকা দিয়েছিল, আমাকে বলেছিল থেবার একদল কমিউনিস্ট প্রতিনিধি ধর্মঘটীদের সঙ্গে দেখা করতে যায়।

'তোমাদের মধ্যে পুলিশের খোচর আছে,' তারা বলেছিল, নাম ক'রে-ক'রে।

'তো কী?' অ্যানার্কিস্টরা চ্যাটাং ক'রে জবাব দিয়েছিল, 'ও-সব কথা আমরা সবাই জানি। কমিউনিস্টদের চাইতেও পুলিশের খোচর আমাদের বেশি পছন্দ।'

অ্যানার্কিস্টদের সঙ্গে আমার তাত্ত্বিক সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও আমি কিছুতেই তাদের গোঁড়ামি, উগ্রতা আর বিশৃঙ্খল কাজ-কারবার সহ্য করতে পারছিলাম না। মাঝে-মাঝে এমনও হত, কেউ-একজন ইনজিনিয়ার অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পেয়েছে শোনবামাত্র তাকে কাসা কাম্পোতে পাকড়ে নিয়ে-যাওয়া হত। ফাশিস্তদের অগ্রগতি দেখে যখন রিপাবলিকান সরকার তাদের সদর দপ্তর মাদ্রিদ থেকে বার্সেলোনায় সরিয়ে নিয়ে যায়, অ্যানার্কিস্টরা কুয়েনথায় এক ব্যারিকেড তৈরি করেছিল—একমাত্র যে-রাস্তাটা ফাশিস্তরা তখনও দখল করেনি। বার্সেলোনাতেও তারা এক মেটালারজি কারখানার ডিরেক্টর আর ইনজিনিয়ারদের সাবাড় ক'রে দেয় এটাই প্রমাণ করতে যে শ্রমিকরাই কারখানাটাকে সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে চালাতে পারবে। তারপরে তারা একটা ট্যাঙ্ক তৈরি ক'রে সগর্বে এক সোভিয়েত প্রতিনিধিকে দেখায়। (যখন সে একটা পারাবেলাম চেয়ে নিয়ে তাকে তাগ ক'রে গুলি করল, ট্যাঙ্কটা ভেঙে পড়ল।)

অন্য অনেক অনুমান যা-ই বলুক না কেন, অনেকেই বিশ্বাস করে যে দুরুত্তির মৃত্যুর জন্যে অ্যানার্কিস্টরাই দায়ী।—কাইয়ে দে লা প্রিনথেসায় গাড়ি থেকে

নামবার সময় কারা তাঁকে গুলি ক'রে মারে, তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছিলেন অবস্থা সামলাতে, যেটা তখন ছিল শত্রুর দখলে। এরা এমন ধরনের উগ্রতাবাদী ও গোঁড়া যে এরা নিজেদের মেয়ের নাম রাখত আক্রাসিয়া (ক্ষমতার অনুপস্থিতি) বা চোদ্দই সেপ্টেম্বর, এবং সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্যে দুরুতিকে এরা কখনও মাফ করতে পারেনি।

POUM (পার্তিদো ওব্রেরো দে য়ুনিফিকাসিওন মার্ক্সিস্তা)-কেও আমরা ভয় পেতাম—এরা ছিল ট্রটস্কিপন্থী—যা-খুশি তা-ই ক'রে বেড়াত। পৌম-এর সদস্যরা, ফাই-এর অ্যানার্কিস্টদের সঙ্গে মিলে, ১৯৩৭-এর মেতে বার্সেলোনার রাস্তায় রিপাবলিকান বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যারিকেড গড়েছিল—যাদের তখন নিজেদের মিত্রদের সঙ্গে লড়াই ক'রে বার্সেলোনায় ঢুকতে হয়েছিল।

আমার বন্ধু ক্লাউদিও দে লা তোরুরে মাদ্রিদের বাইরে একটা বিচ্ছিন্ন বাড়িতে থাকত। তার ঠাকুরদা ছিলেন ফ্রিমেসন, ফাশিস্তদের চোখে তার চাইতে জঘন্য আর-কিছু হ'তে পারে না। সত্যি-বলতে কমিউনিস্টদের ফ্যাশিস্টরা যত ঘৃণা করত, ফ্রিমেসনদেরও ততটাই। দারুণ এক রাঁধুনি ছিল ক্লাউদিওর—তার বাগ্‌দত্তা অ্যানার্কিস্টদের দলে ভিড়েছিল। একদিন আমি তার বাড়িতে লাঞ্চ খেতে গেছি, বাড়িটা খোলামেলায়, হঠাৎ এক পৌম-এর গাড়ি এসে হাজির। আমি ভারি নার্ভাস হ'য়ে পড়েছিলাম, কারণ আমার সঙ্গে যা-সব কাগজপত্তর ছিল সব সোশিয়ালিস্ট আর কমিউনিস্টদের দেয়া, পৌম-এর কাছে তার কোনো দামই নেই। গাড়িটা দরজায় এসে থামল, চালক জানলা দিয়ে মাথা বার করলে…আর তারপর দিক নির্দেশ চাইলে। ক্লাউদিও তক্ষুনি তাকে রাস্তাঘাট-গুলো ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিলে, তারপর সে গাড়ি ছুটিয়ে চ'লে যেতেই আমরা দুজনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

সব মিলিয়ে, প্রধান অনুভূতিটা ছিল নিরাপত্তার অভাব ও বিশৃঙ্খলার মিশোল, দরজার গোড়ায় ফ্যাশিবাদের আতঙ্ক সত্ত্বেও, সেটাকে আরো হতাশ ক'রে যাচ্ছিল অন্তহীন দলবাজি আর দিগ্‌ভ্রান্ত সব প্রবণতা। ভেবেছিলাম বিপ্লব সফল হবে, কিন্তু সারাক্ষণ যা অনুভব করছিলাম তা এক অন্তহীন বিষাদ।

আর তারপর একদিন আমি জানতে পেলাম ফেদেরিকো গার্থিয়া লোরকার খুন হবার খবর—এক রিপাবলিকানপন্থীর কাছে, যে কোনোরকমে শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে। 'আঁ সিয়েঁ আন্দালু'-র কিছুদিন আগে, লোরকা আর আমার মধ্যে একটু মন কষাকষি হয়েছিল ; পরে, সে যেহেতু রোগা-

পটকা আন্দালুসীয়, সে ভেবেছিল (কিংবা ভাববার ভান করেছিল) যে ছবিটা বুঝি তার উদ্দেশেই আমার ব্যক্তিগত আক্রমণ।

'বুন্যুয়েল একটা ছোট্ট ছবি বানিয়েছে, এইটুকুনি,' আঙুল দিয়ে মাপ দেখাতো সে। 'তার নাম "আন্দালুসিয়ার এক কুকুর"—এবং আমিই সেই কুকুর!'

১৯৩৪ নাগাদ, অবশ্য, আবার আমাদের মধ্যে গভীর বন্ধুতা হয়েছিল, যদিও আমি মাঝে-মাঝে অবস্তি বোধ করতাম যে সে বড্ড বেশি লোকের বাহবা চাচ্ছে। অনেক সময় কাটাতাম আমরা একসঙ্গে! উগার্তের সঙ্গে আমরা পাহাড়ে গাড়ি চালিয়ে যেতাম, এল পাউলারের গথিক স্তব্ধতায় কয়েক ঘণ্টা নিরুপদ্রবে কাটাতে। সবটা ভাঙাচোরা, কিন্তু ভেতরে কয়েকটা স্পার্টান ঘর ছিল ফাইন আর্টস ইনস্টিটিউটের লোকজনদের মধ্যে। যদি স্লিপিংব্যাগ নিয়ে আসো তবে তুমি রাতটাও ওখানে কাটাতে পারবে। যখন যুদ্ধ গরজাচ্ছে চারপাশে কবিতা বা চিত্রকলা সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করা কঠিন ছিল। ফ্রাঙ্কোর আবির্ভাবের চারদিন আগে লোরকা আচমকা ঠিক করলে সে গ্রানাদা যাবে—তার নিজের শহরে।

'ফেদেরিকো,' আমি অনুনয় করেছিলাম, তার এই সংকল্প থেকে তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। 'বীভৎস সব কাণ্ড হচ্ছে। এখন তুমি ওখানে যেতে পারবে না—বরং এখানেই অনেকটা নিরাপদে থাকবে।'

আমাদের কোনো কথাতেই সে পাত্তা দেয়নি, খানিকটা ভীত ও উৎকণ্ঠিত ভাবেই পরদিন গ্রানাদা চ'লে গিয়েছিল। তার এই খুন হবার খবর একটা ভয়ংকর ঝাঁকুনি দিলে আমাদের। সারা জীবনে যত মানুষ আমি দেখেছি, ফেদেরিকো ছিল তাদের সকলের সেরা! শুধু তার নাটক বা কবিতার কথা বলছি না—মানুষ হিশেবে, ব্যক্তি হিশেবে তার তুলনা হয় না। পিয়ানোতে ব'সে শপাঁর নকলই করুক, কিংবা উদ্ভাবন করুক কোনো মূকাভিনয় কিংবা নাটকের কোনো দৃশ্য একাই অভিনয় ক'রে দেখাক, সে ছিল অপ্রতিরোধ্য। কবিতা পড়ত চমৎকার, আর তার ছিল আবেগ, সংরাগ, যৌবন আর আনন্দ। রেসিদেনসিয়ায় যখন প্রথম তার সঙ্গে দেখা হয় আমি ছিলাম গেঁয়ো, অপরিশীলিত, শুধু খেলাধুলোর দিকে ঝোঁক। সেই আমাকে পুরোপুরি রূপান্তরিত ক'রে আমাকে সম্পূর্ণ নূতন একটা জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সে ছিল আগুনের শিখা।

তার মৃতদেহ কোনোদিনই আর খুঁজে-পাওয়া যায়নি তার মৃত্যু সম্বন্ধে রং চড়ানো সব গুজব ছড়াচ্ছিল চারপাশে—কেউ-কেউ ইঙ্গিত করছিল সমকামীদের

কারু ঈর্ষাই বুঝি কারণ। আসল কথা হ'লো লোরকা খুন হয়েছে কারণ সে ছিল কবি। 'বুদ্ধিজীবীদের খতম করো', যুদ্ধের সময় ফাশিস্তদের এটা ছিল প্রিয় জিগির। গ্রানাদায় গিয়ে সে সম্ভবত কবি রোসালেস-এর সঙ্গে ছিল—রোসালেস ফালানৃগিস্ত কিন্তু লোরকার পরিবারের সঙ্গে তাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমার ধারণা লোরকা ভেবেছিল রোসালেসদের বাড়িতে সে নিরাপদে থাকবে, কিন্তু আচমকা একদল লোক আলোন্‌সো ব'লে একজনের নেতৃত্বে একরাতে উদয় হয়, তাকে গ্রেফতার করে, এবং কয়েকজন বন্দী মজুরের সঙ্গে তাকে নিয়ে ট্রাক চালিয়ে উধাও হ'য়ে যায়। ফেদেরিকো কষ্ট আর মৃত্যুকে ভীষণ ভয় পেত। (মনে আছে তার বুলফাইটার বন্ধুর মৃত্যুকে তার 'বিলাপ' ?) আমি অনুমান করতে পারি কী সে অনুভব করেছিল তখন—নিশুত রাত্রে, একটা ট্রাক ছুটে চলেছে জলপাইবনের দিকে, সেখানে তাকে গুলি ক'রে মারা হবে। এই মুহূর্তটা এখনও মাঝে-মাঝেই আমাকে হানা দেয়।

অনুবাদ : কিশোর মিত্র

বেরটোল্‌ট ব্রেখ্‌ট

সেনিওরা কারারের রাইফেল

[১৯৩৭ সালে এপ্রিলের এক রাত্রিতে, আন্দালুসীয় অঞ্চলের এক জেলের বাড়ি। চুনকাম-করা দেয়ালের এককোণে একটা কালো রঙের বড়ো ক্রুশবিদ্ধ জিশুখ্রিস্টের মূর্তি। বছর চল্লিশ বয়সের জেলেবৌ তেরেসা কারার রুটি সেঁকছেন। খোলা জানলার কাছে তাঁর পনেরো বছর বয়সের ছেলে হোসে একটা জালের কাঁটা লাগাচ্ছে। দূরে কামানের আওয়াজ।]

মা : এখনও হুয়ানের ডিঙিটা দেখতে পাচ্ছিস ?

ছেলে : হ্যাঁ।

মা : ওর বাতিটা এখনও জ্বলছে ?

ছেলে : হ্যাঁ।

মা : আর-কোনো ডিঙি ওদিকে যাচ্ছে ?

ছেলে : না।

[চুপচাপ]

মা : অবাক ব্যাপার। আর-কেউ বাইরে নেই কেন ?

ছেলে : কেন, তা তো তুমি জানো।

মা : (শান্তভাবে) জানি না ব'লেই জিগেশ করছি।

ছেলে : হুয়ান ছাড়া আর-কেউ বাইরে নেই, কেননা ওদের মাছ ধরা ছাড়াও অন্য-কিছু করার আছে।

মা : ও।

[চুপচাপ]

ছেলে : নিজের মতে চলতে পারলে বোধহয় হুয়ানও বাইরে যেতো না।

মা : ঠিক। ও নিজের ইচ্ছেমতো চলছে না।

ছেলে : [জোরে-জোরে কাঁটা লাগাতে-লাগাতে] না।

[মা লেচিটা রুটি সেঁকার উনুনে দিয়ে হাত দুটি ধুয়ে নিলেন তারপর জোড়া দেবার জন্যে একটা জালকে সামনে আনলেন।]

ছেলে : আমার খিদে পেয়েছে।

মা : কিন্তু তোর দাদা মাছ ধরুক, তুই তা তো চাস না।

ছেলে : না। চাই না। ও-কাজটা আমিও পারি। আমি মাছ ধরলে দাদা লড়াইয়ে যেতে পারে।

মা : আমি ভেবেছিলাম তুইও লড়াইয়ে যেতে চাস।

[চুপচাপ]

ছেলে : জাহাজ-ভরা খাবার অবরোধ ভেঙে আসবে ব'লে ?

মা : এই শেষ রুটিটুকু হ'য়ে গেলো, ঘরে আর-একটুও আটা নেই।

[ছেলেটি জানলা বন্ধ করে]

মা : জানলা বন্ধ করলি কেন ?

ছেলে : এখন নটা বেজেছে।

মা : তাতে কী ?

ছেলে : নটায় কুকুরটা আবার রেডিওতে চ্যাচাবে, আর পেরেসরা যন্তরটা চালিয়ে দেবে।

মা : [অনুরোধের স্বরে] এখন জানলাটা বরং খুলে দে। ভেতরকার আলোতে শার্শিগুলো চকচক করলে তুই পরিষ্কার দেখতে পাবি না।

ছেলে : কেন আমি সবসময় এখানে ব'সে পাহারা দেবো ? সে তো আর এখনই তোমার কাছে ছুটে আসছে না। তোমার শুধু ভাবনা যে সে লড়াইয়ে যাচ্ছে।

মা : অত বাহাদুরি দেখাসনে। এখনও তোদের খবরদারি করতে হয়।

ছেলে : তোদের মানে ?

মা : তোর দাদার চেয়ে তুই একচুলও বেশি ভালো নোস, বরং আরো খারাপ।

ছেলে : সত্যি, ওরা ওদের রেডিও কেবল আমাদের জন্যেই চালায়। আজ তৃতীয় সন্ধ্যা। কাল আমি দেখেছি কীভাবে ওরা নিজেদের জানলা খুলে দিলো, যাতে আমরা শুনতে বাধ্য হই।

মা : ভালেনসিয়া যারা দখল করেছে এই বক্তৃতাগুলো তাদের ছাড়া আর-কারু নয়।

ছেলে : তাহ'লে বলো, তারাই বেশি ভালো।

মা : তুই জানিস যে আমি তাদের বেশি ভালো বলি না। কেন আমি জেনা-রেলদের পক্ষে যাবো ? যাতে রক্ত পড়ে, খুনজখম হয়, আমি তার বিরোধী।

ছেলে : খুনজখম শুরু করেছে কে ? আমরা বুঝি ?

[মা চুপ। ছেলেটি আবার জানলা খুলে দিয়েছে। দূর থেকে রেডিওতে

ভাষণ শোনা যাচ্ছে : 'হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার! এখন বলছেন মাননীয় জেনারেল কুয়াইপো দে ইয়ানো।' তারপর রেডিওতে জেনারেলের উচ্চ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, তিনি এস্পানিদের উদ্দেশে তাঁর সান্ধ্য ভাষণ শুরু করলেন।]

জেনারেলের কণ্ঠস্বর : বন্ধুগণ, আজকালের মধ্যেই আপনাদের সামনে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলতে হবে। আর এ-কথাটা যখন মাদ্রিদ থেকে আমরা বলবো, আমরা এখন মাদ্রিদ ঘিরে রেখেছি, তখন খুব-সম্ভব মাদ্রিদকে আর মাদ্রিদ ব'লে চেনাই যাবে না ; এবং ক্যানটারবেরির আর্চবিশপ যথার্থই তাঁর কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করবেন। আমাদের বীর মূরবাহিনী সব দেনা হাতেনাতে শোধ ক'রে দেবে।

ছেলে : শুয়োরের বাচ্চা।

জেনারেলের কণ্ঠস্বর : বন্ধুগণ, ব্রিটিশদের তথাকথিত পৃথিবী-জোড়া সাম্রাজ্য, যে-রাক্ষসের পা মাটি দিয়ে তৈরি, তা এই বিকারগ্রস্ত জনতার রাজধানীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। জাতীয় স্বার্থে সেই বাধা অগ্রাহ্য করা হবে। আমরা এই বদমাশগুলোকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবো।

ছেলে : মা! তার মানে আমাদের!

মা : আমরা বিদ্রোহী নই, আর কাউকে অগ্রাহ্যও করিনি। তোরা নিজেদের মতে চললে সম্ভবত ঐ ধরনের কিছু করতিস। তুই আর তোর দাদা—তোদের স্বভাবটাই হালকা। এই স্বভাব তোরা পেয়েছিস তোদের বাবার কাছ থেকে। তোরা অন্যরকম হ'লেও হয়তো আমার ভালো লাগতো না। কিন্তু ঠাট্টা নয়, ওদের কামানের শব্দ শুনতে পাচ্ছিস? আমরা হলাম গরিব, আর গরিবরা লড়াই চালাতে পারে না।

[দরজার ধাক্কার আওয়াজ। একজন শ্রমিকের প্রবেশ। তেরেসা কারারের ভাই পেদ্রো সাকুরাস। সে অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে এসেছে ব'লে তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।]

শ্রমিক : কী খবর?

ছেলে : পেদ্রোমামা!

মা : কী ক'রে এলে, পেদ্রো?

[মা তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন]

ছেলে : তুমি কি মোন্‌ত্রিল থেকে আসছো? ওখানকার খবর কী?

শ্রমিক : খুব ভালো নয়। এখানে কেমন আছো ?

মা : [ঠাণ্ডা গলায়] এই একরকম।

ছেলে : তুমি কি আজকেই ওখান থেকে এলে ?

শ্রমিক : হ্যাঁ।

ছেলে : প্রায় চার ঘণ্টার ঝামেলা, না ?

শ্রমিক : বেশি, কেননা আলমেনিয়ার দিকে যাচ্ছে এসন-সব ঘরহারাদের ভিড়ে রাস্তা ভর্তি।

ছেলে : কিন্তু মোন্‌ত্রিল, সে তো এখনও টিঁকে রয়েছে।

শ্রমিক : আজ কী হয়েছে জানি না। কাল রাতেও আমরা টিঁকে ছিলাম।

ছেলে : তাহ'লে তুমি চ'লে এলে কেন ?

শ্রমিক : যুদ্ধের জন্যে আমাদের সবাইকেই চাই। ভাবলাম, তোমাদের একবার দেখে আসি।

মা : এক চুমুক মদ খাবে ? [তিনি মদ আনলেন] আর আধঘণ্টার মধ্যে রুটি তৈরি হ'য়ে যাবে।

শ্রমিক : আচ্ছা, হুয়ান কোথায় ?

ছেলে : মাছ ধরতে গেছে।

শ্রমিক : সত্যি ?

ছেলে : এখান থেকে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে তার লণ্ঠন দেখতে পাবে।

মা : আমাদের তো বেঁচে থাকতে হবে।

শ্রমিক : তা ঠিক। আমি যখন রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, তখন রেডিওতে জেনারেলের ভাষণ শুনতে পেলাম। এখানেও শুনতে পেলাম। এখানে ঐ ভাষণ কে শোনে ?

ছেলে : ঐ উলটোদিকের পেরেস্‌রা।

শ্রমিক : সবসময়েই কি ওরা ঐ ধরনের বজ্জাতি বাজায় ?

ছেলে : না। ওরা ফ্রাঙ্কোর লোক নয় ; ওরা নিজেদের জন্যে এ-সব করে না, তুমি ভুল ভাবছো।

শ্রমিক : তাহ'লে ?

মা : এখন আবার তোর দাদার দিকে একটু নজর রাখবি ?

ছেলে : [অনিচ্ছা সত্ত্বেও জানলায় ফিরে গেলো] শান্ত হও। নৌকো থেকে ও হারিয়ে যাবে না। [পেদ্রো মদের জালা নিয়ে তার বোনকে জাল মেরামতে সাহায্য করতে লাগলো।]

শ্রমিক : হুয়ানের বয়স এখন ঠিক কত ?

মা : এই সেপ্টেম্বরে একুশ হবে।

শ্রমিক : আর হোসে ?

মা : এখানে আসার আগে আশপাশে কিছু দেখলে ?

শ্রমিক : না, বিশেষ-কিছু নয়।

মা : অনেকদিন তুমি এখানে আসোনি।

শ্রমিক : দু-বছর।

মা : রোসা কেমন আছে ?

শ্রমিক : বাতে ভুগছে।

মা : তোমরা একবার আমাদের দেখতে আসবে ভেবেছিলাম।

শ্রমিক : কার্লোসের অন্ত্যেষ্টির ব্যাপারে রোসা সম্ভবত একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলো। তার মতে, তোমরা আমাদের খবর দিতে পারতে, আর তাহ'লে নিশ্চয়ই আমরা তোমার স্বামীর অন্ত্যেষ্টিতে আসতাম।

মা : এত তাড়াতাড়ি ঘটনাটা ঘটলো।

শ্রমিক : কী ক'রে হ'লো ?

[মা চুপ]

ছেলে : ফুশফুশে গুলি লেগেছিলো।

শ্রমিক : [অবাক হ'য়ে] কিন্তু কেন ?

মা : কেন মানে ?

শ্রমিক : মানে এখানে তো দু-বছর আগেও সব শান্ত ছিলো।

ছেলে : কিন্তু ওভিদোতে বিদ্রোহ হয়েছিলো।

শ্রমিক : কিন্তু সেখানে কার্লোস কী ক'রে গেলো ?

মা : গিয়েছিলো।

শ্রমিক : এখান থেকে ?

ছেলে : হ্যাঁ, খবরকাগজে বিদ্রোহের খবর বেরুতেই।

মা : [তেতো স্বরে] যেমন অনেকে সবকিছু খুইয়ে দারুণ ঝুঁকি নিয়ে আমেরিকা যায় আর বোকা বনে।

ছেলে : [দাঁড়িয়ে ওঠে] তুমি কী বলতে চাও, বাবা বোকা ছিলো ?

[মা কোনো কথা না-ব'লে কাঁপা হাতে জালটা একপাশে রেখে বাইরে গেলেন]

শ্রমিক : মৃত্যুটা ওর খুব লেগেছে। কী বলো ?

ছেলে : হ্যাঁ।

শ্রমিক : আর কার্লোসের দেখা পাবে না জেনে ও কি খুব কষ্ট পেয়েছিলো ?

ছেলে : দেখা তো পেয়েছিলো। বাবা তো ফিরে এসেছিলো। তবে সেটাই ছিলো সবচেয়ে দুঃখের। দেখলে আস্তরিয়ান ব'লে মনে হয় এমনভাবে সেজে বাবা একটা ট্রেনে এখান অব্দি এসেছিলো, বুকের ওপর জামার তলায় একটা হালকা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে। দু-বার তাঁকে ট্রেন বদল করতে হয়েছিলো, আর তারপর এখানে স্টেশনে এসে তার মৃত্যু হয়। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় এখানে দরজাটা খুলে গিয়েছিলো। এমনভাবে পড়শিরা ভেতরে এসেছিলো যেন একজন মাতালকে নিয়ে এসেছে, চুপচাপ যেন দেয়ালে হেলান দিয়ে ইংরেজদের কায়দায় বিড়বিড় ক'রে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিলো। তারপর ওরা তাকে একটা কাপড়ের ওপর মেঝেতে শুইয়ে দিয়েছিলো। তারপর থেকেই মা চার্চে যাচ্ছে আর যাঁকে আমরা রেড সিস্টার ব'লে ডাকি তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে।

শ্রমিক : ও কি এখন সত্যি ধর্মকর্ম করছে ?

ছেলে : [মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললো] হুয়ানের মতে আসলে ওটা হয়েছে আশ-পাশের লোক যার সম্পর্কে কানাঘুষো করতো ব'লে।

শ্রমিক : কী কানাঘুষো করতো ?

ছেলে : মা নাকি বাবাকে পরামর্শ দিয়েছিলো।

শ্রমিক : দিয়েছিলো বুঝি ?

[ছেলেটি কাঁধ ঝাঁকালে। মা ফিরে এলেন, রুটির দিকে একবার তাকালেন, তারপর আবার জাল নিয়ে বসলেন]

মা : [ভাইকে, তাকে সাহায্য করতে চাচ্ছেন] আরে, আগে ভালোভাবে মদটুকু খেয়ে নাও আর একটু জিরিয়ে নাও। সেই ভোর থেকেই তো হাঁটছো।

[শ্রমিক তাঁর গেলাশ নিয়ে টেবিলে ফিরে গেলেন]

মা : রাতটা এখানেই কি আজ কাটবে ?

শ্রমিক : না, আমার অত সময় নেই, আমাকে আজই ফিরতে হবে। কিন্তু আমি মুখ হাত ধোবো। [বেরিয়ে যায়]

মা : [ছেলেটির দিকে যেতে-যেতে] কেন এসেছে কিছু বললো ?

ছেলে : না।

মা : সত্যি বলছিস ?

[শ্রমিক একটা গামলা আর গামছা নিয়ে এসে মুখ-হাত ধুতে লাগলেন]

মা : বুড়ো লোপেস কি এখনও বেঁচে আছে ?

শ্রমিক : শুধু সে-ই আছে। [ছেলেকে] এখান থেকে অনেকে ফ্রন্টে গেছে, তাই না ?

ছেলে : তারা এখনও ওখানেই রয়েছে।

শ্রমিক : ক্যাথলিকদের একটা বড়ো অংশ আমাদের সঙ্গে আছে।

ছেলে : এখান থেকেও কেউ-কেউ গেছে।

শ্রমিক : ওদের সবাইকার কি রাইফেল আছে ?

ছেলে : না। সকলের নেই।

শ্রমিক : এটা মোটেই ভালো কথা নয়। অস্ত্রের দরকারই এখন সবচেয়ে বেশি। গাঁয়ে তোদের কাছেও কি অস্ত্রশস্ত্র নেই।

মা : [তাড়াতাড়ি] না !

ছেলে : এখনও এখানে অনেক লোক আছে, যারা অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে— আলুর মতন মাটিতে পুঁতে রেখেছে।

[মা তার দিকে তাকালেন]

শ্রমিক : বটে !

[ছেলেটি আস্তে-আস্তে জানলা থেকে স'রে পেছনের পটের সামনে এসে দাঁড়ায়।)

মা : কোথায় যাচ্ছিস ?

ছেলে : কোথাও না।

মা : জানলার কাছে গিয়ে বোস !

[ছেলেটি একগুঁয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে]

শ্রমিক : ব্যাপার কী ?

মা : জানলা থেকে স'রে এলি কেন ? আমার কথার জবাব দে ?

শ্রমিক : বাইরে কেউ আছে নাকি ?

ছেলে : [তপ্ত স্বরে] না।

[বাইরে বাচ্চাদের গলা শোনা গেলো]

বাচ্চারা : মাছ ধরবার ছুতোয় হুয়ান জলে ভাসায় না'—
হুয়ান যুদ্ধে যাবে না।
যুদ্ধে যাবার কথায় যে তার ডরে কাঁপে গা—
হুয়ান কিন্তু দেশের কথা কিচ্ছু ভাবে না।
হুয়ান যুদ্ধে যাবে না।

[জানলায় তিনটি বাচ্চার মুখ দেখা গেলো]

বাচ্চারা : [টিটকিরি দেয়] দুয়ো-দুয়ো ! [তারা স'রে গেলো]

মা : [দাঁড়িয়ে উঠে জানলায় গিয়ে] যদি তোদের একবার ধরতে পারি, মেরে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে দেবো, নোংরা বিচ্ছুর দল ! [ঘরের দিকে মুখ ক'রে] এটাও পেরেস্‌দের কীর্তি।

[চুপচাপ]

শ্রমিক : আগে তো তুই তাশ খেলতিস, হোসে। এখন একহাত হবে নাকি ?
[মা জানলার কাছে বসলেন। ছেলেটি তাশ নিয়ে এলো আর তাদের তাশ খেলা শুরু হ'লো]

শ্রমিক : এখনও হাতসাফাই করিস ?

ছেলে : [হেসে] তখন করতাম নাকি ?

শ্রমিক : আমি করতাম। তখন আমি প্রত্যেক দানেই তাশ কাটাতে চাইতাম। অন্যরাও কাটাতে দিতো। যুদ্ধে সবকিছুই চলে। কী বলিস ?
[মা সন্দেহভরা চোখে তাকালেন]

ছেলে : ওভাবে জেতা খারাপ।

শ্রমিক : তবু ভালো যে তুই এ-কথা আমায় বললি।—আহা, এখনি তুই তুরুপ করছিস ! ও, তুই আমায় ধাপ্পা দিয়েছিস কিন্তু একটু বেশি মাশুল দিতে হ'লো না ? তুই আমার বড়ো কামানগুলো বন্ধ ক'রে দিয়েছিস আর এখন আসছে আমার খুদে সাংঘাতিকগুলো। [সে তাশ ফ্যালে] ওর ওপর এইটে ! চালাকি ভালো। তুই তো এর মধ্যেই বেশ চালাক হ'য়ে উঠেছিস, তবে এখনো দূরদৃষ্টি আসেনি।

ছেলে : ঝুঁকি না-নিলে কেউই জেতে না।

মা : এই ধরনের কথা এরা ওদের বাবার কাছ থেকে শিখেছে। যেমন "বুদ্ধিমানেরাই ঝুঁকি নেয়", তাই না ?

শ্রমিক : হ্যাঁ, কার্লোস জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলো। ফেরান্তের দোন মিগেল একবার এক কর্নেলের সঙ্গে জুয়া খেলে তার সত্তর জন ভূমিদাসকে হারায়। সব হারিয়ে গরিব হয়ে যায় আর বাকি জীবনটা মা ওর মাত্র বারো জন চাকর নিয়ে কাটাতে বাধ্য হয়। সে আসলে ফাঁকা দহলার চাল দিচ্ছিলো।

ছেলে : আমিও ঐভাবেই খেলেছি। (সে সজোরে তাশ ফ্যালে) এটাই ছিলো আমার শেষ সুযোগ।

মা : এরা এইরকমই। এর বাবা জাল ফেলার সময় নৌকোর ওপর লাফাতো।

শ্রমিক : বোধহয় তার বেশি জাল ছিলো না !

মা : তার অনেকগুলো জীবনও ছিলো না।

[দরজায় একজন আসে। গায়ে সৈন্যের উর্দি, মাথায় ব্যাণ্ডেজ, শ্লিংয়ে হাত ঝুলছে]

মা : আরে, পাবলো যে, ভেতরে এসো।

জখম : আপনি বলেছিলেন আমাকে ব্যাণ্ডেজের জন্যে আবার হয়তো ফিরতে হ'তে পারে।

মা : শেষ অব্দি ফিরলে তো। [ভিতরে গেলেন]

শ্রমিক : কোথায় হ'লো ?

জখম : মোন্তে সালুভেতে।

[মা একটা জামা নিয়ে ফিরে এলেন আর সেটা ফালি-ফালি ক'রে ছিঁড়লেন। নতুন ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে লাগলেন কিন্তু সবসময়েই টেবিলে রাখা ফালিগুলোর দিকে নজর রেখে]

মা : যাই হোক, তুমি আবার খাটাখাটি করেছো।

জখম : শুধু ডান হাত দিয়ে।

মা : কিন্তু তা যে করা চলবে না এ-কথা কেউ বলেনি ?

জখম : হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুনছি, আজ রাতে শত্রুরা হামলা চালাবে। আমাদের আর কোনো উপায় নেই। আচ্ছা, এ কী সম্ভব যে এরই মধ্যে শত্রুরা আমাদের প্রতিরোধ ভেঙে দিয়েছে ?

শ্রমিক : [অস্থির] না, তা আমি বিশ্বাস করি না। তাহ'লে কামানের আওয়াজে নিশ্চয়ই বোঝা যেতো।

জখম : ঠিক কথা।

মা : লাগছে ? লাগলে বোলো। আমি পাশ-করা নার্স নই। যতটা পারি আস্তে এটা বেঁধেছি।

ছেলে : মাদ্রিদের আগে তারা প্রতিরোধ ভেঙে আসছে না।

জখম : কেউ তা বলতে পারে না।

ছেলে : সবাই অন্তত তাই আন্দাজ করে।

জখম : হবেও বা। কিন্তু মা, আপনি সত্যি একটা আস্ত জামা ছিঁড়েছেন ! এটা উচিত হয়নি।

মা : তবে কি একটা গোটা চাদর দিয়ে তোমাকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধবো না কি ?

জখম : কিন্তু তাহ'লেও সেটা এত গুরু হ'তো না।

মা : যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দিচ্ছি। তোমার অন্য হাতটার জন্যে তাই হয়তো যথেষ্ট থাকবে না।

জখম : [হেসে] তাহ'লে পরের বারই বিষয়টা বিবেচনা করবো। [দাঁড়িয়ে উঠে শ্রমিককে] দেখি, কুকুরগুলো এখনও যদি প্রতিরোধ ভেঙে না-দিয়ে থাকে। [চ'লে যায়]

মা : এই কামানের আওয়াজগুলো—উঃ !

ছেলে : আর আমরা এখনো মাছ ধরছি!

মা : তোদের গায়ে এখনও আঁচড় লাগেনি ব'লে খুশি থাক।

[বাইরে গান আর গাড়িচলার আওয়াজ উঠে মিলিয়ে গেলো। শ্রমিক আর ছেলেটি জানলায় গিয়ে বাইরে তাকায়]

শ্রমিক : ওরা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাহিনী। ওদের এখন মোত্তিইয়ের দিকে লড়াইয়ে পাঠানো হচ্ছে।

("Thalmannkolonne" কোরাস বেজে উঠল : ডি হাইমাট ইস্ট ভাইট্)

শ্রমিক : এরা জার্মান।

[লা মার্সাঈ-এর ছন্দ শোনা গেলো।]

শ্রমিক : ফরাশি।

[ভার্শাভাইস্কা]

শ্রমিক : পোল।

[বান্দিয়েরা রোস্সা]

শ্রমিক : ইতালিয়ান।

[হোল্ড দ্য ফোর্ট]

শ্রমিক : মার্কিন।

[লোস কুয়াত্রোস হেনেরালেস]

শ্রমিক : আর এটা হচ্ছে আমাদের।

[গাড়ি চলা আর গানের শব্দ মিলিয়ে গেলো। শ্রমিক আর ছেলেটি টেবিলে ফিরে আসে।]

শ্রমিক : আজ রাতের জন্যেই ভাবনা। আমাকে সত্যি এখুনি যেতে হবে। এটাই শেষ দান, হোসে।

মা : [টেবিলের দিকে আসতে-আসতে] তাহ'লে কে জিতলো ?

ছেলে : [গর্বিতভাবে] ও।

মা : তোমার জন্যে বিছানা পাতবো না তো ?

শ্রমিক : না, আমাকে যেতে হবে। [কিন্তু সে ব'সেই থাকে]

মা : রোসাকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো। সে যেন মনে কোনো রাগ না-রাখে। এর পরে যে কী হবে তা কেউ বলতে পারে না।

ছেলে : আমি তোমার একটা লাঠি এনে দি।

শ্রমিক : না, তার কোনো দরকার নেই।

[মা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকান]

মা : হুয়ানের সঙ্গে দেখা হলে বোধহয় খুশি হও ?

শ্রমিক : হ্যাঁ। তবে সে বোধহয় এত তাড়াতাড়ি ফিরবে না, কী বলো ?

মা : একটু দূরে গেছে। প্রায় অন্তরীপের কাছাকাছি। [ঘরে ফিরে এসে] আমরা তাকে ধ'রে রাখতে পারতাম।

[দরজার একটি তরুণীর আবির্ভাব]

ছেলে : এই-যে, মানুয়েলা। [শ্রমিকের দিকে চেয়ে, আস্তে] এ হচ্ছে হুয়ানের বান্ধবী মানুয়েলা। আর এ হচ্ছে পেদ্রোমামা।

মানুয়েলা : হুয়ান কোথায় ?

মা : হুয়ান কাজে গেছে।

মানুয়েলা : আমরা ভেবেছিলাম আপনি তাকে কিণ্ডারগার্টেনে বল খেলতে পাঠিয়েছেন।

মা : না, ও মাছ ধরতে গেছে। হুয়ান হচ্ছে জেলে।

মানুয়েলা : ও কেন স্কুলের সভায় যায়নি ? সেখানে জেলেরাও ছিলো।

মা : তাতে তো ওর কিছু ক্ষতি হয়নি।

ছেলে : কীসের সভা ?

মানুয়েলা : ওখানে ঠিক হয়েছে যে, যারা-যারা যেতে পারে, তারা সব্বাই আজ রাতে লড়াইয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা তো জানতে সভাটা কেন হচ্ছে। আমরা তো হুয়ানকে সব জানিয়েছিলাম।

ছেলে : এ হ'তে পারে না। তাহ'লে হুয়ান কিছুতেই মাছ ধরতে যেতো না। না কি, মা, ওরা তোমায় বলেছিলো কথাটা ?

[মা চুপ। তিনি পেছনের উনুনের কাছে গুঁড়ি মেরে রয়েছেন]

ছেলে : মা আসলে ওকে খবরটা দেয়নি। [মাকে] এখন আমি বুঝতে পারছি কেন তুমি ওকে মাছ ধরতে পাঠিয়েছো।

শ্রমিক : তোমার এতটা করা উচিত হয়নি, তেরেসা।

মা : [সিধে হ'য়ে দাঁড়িয়ে] ভগবান মানুষকে পেশা দিয়েছেন। আমার ছেলে হচ্ছে জেলে।

মানুয়েলা : আপনি কি আমাকে কেবল হাসির খোরাক করতে চান ? যেখানেই যাবো লোকে আমার দিকে আঙুল দেখাবে। হুয়ানের নামে আমার এখনই জর আসছে। এখানকার লোকেদের চোখে তোমরা শেষ অব্দি কোথায় নামলে ?

মা : আমরা গরিব মানুষ।

মানুয়েলা : রাইফেল হাতে লড়াইয়ে যোগ দেওয়ার জন্যে সরকার সমস্ত সমর্থ মানুষকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনি তা পড়েননি বলবেন ?

মা : পড়েছি। সেখানকার সরকার আর এখানকার সরকার। আমরা কশাইয়ের হাতে পড়েছি—কিন্তু তাই ব'লে আমি কোনোমতেইই স্বেচ্ছায় নিজের ছেলেদের ঠেলাগাড়ি চাপিয়ে কশাইখানায় নিয়ে যেতে পারি না।

মানুয়েলা : না। অপেক্ষা করুন যতক্ষণ-না তাদের দেয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়। এমন আকাট ব্যাপার আমি জীবনে দেখিনি। ব্যাপারটা যে অ্যাদ্দুর গড়িয়েছে, আর ইয়ানোর মতো শুয়োরের বাচ্চারা যে আমাদের বক্তৃতা দিতে সাহস করছে, সে জন্যে আপনার মতো লোকেরাই দায়ী।

মা : [ক্ষীণস্বরে] আমি চাই না যে কেউ আমার বাড়িতে এই ধরনের কথা বলুক।

মানুয়েলা : [পাশের দিকে] ইনি কি এখন জেনারেলদের পক্ষে ?

ছেলে : [কিছুটা অধীর] না। তবে মা চান না যে আমরা লড়াই করি।

শ্রমিক : নিরপেক্ষ, তাই না ?

মা : আমি জানি, তোমরা আমার বাড়িতে একট ষড়যন্ত্র করতে চাও। হুয়ানকে গুলি খেয়ে মরতে দেখার আগে তোমাদের শান্তি নেই।

মানুয়েলা : আর আপনার সম্পর্কে বলা হয় যে, যখন তিনি ওভিয়েদোতে যান, আপনি আপনার স্বামীকে সাহায্য করেছিলেন।

মা : [মৃদুস্বরে] মুখ সামলে কথা বোলো। আমি আমার স্বামীকে সাহায্য করিনি। ও-রকম কোনোকিছুই করিনি। আমি জানি যে লোকে আমার ওপর দোষ চাপায়, কিন্তু সবই মিথ্যে। জঘন্য মিথ্যে ছাড়া আর কিছু নয়। যে-কেউ সাক্ষী দেবে।

মানুয়েলা : ও-কথা ব'লে সবাই আপনার ওপর দোষ চাপায় না। কেবল প্রবল শ্রদ্ধা নিয়েই লোকে ও-কথা বলে। এ-তল্লাটে আমরা সবাই জানতাম

যে কার্লোস কারার একজন বীর। কিন্তু তাঁকে যে সেজন্যে বাড়িতে চোরের মতো থাকতে হ'তো তা এখন জানলাম।

ছেলে : বাবাকে বাড়িতে চোরের মতো থাকতে হ'তো না, মানুয়েলা।

মা : চুপ কর, হোসে।

মানুয়েলা : আপনার ছেলেক জানিয়ে দেবেন, আমি আর তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না, আর এর পর সে যদি কখনও কোনো ওজুহাতে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় তখন আমি তাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করবো যে যেখানে তার থাকার কথা, সেখানে সে ছিলো না কেন?

[চ'লে যায়]

শ্রমিক : মেয়েটাকে তোমার এভাবে চ'লে যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি। এমন তো তুমি আগে করতে না, তেরেসা।

মা : আমি চিরকাল যেমন ছিলাম, তেমনি আছি। হয়তো মেয়েটা বাজি ফেলেছে যে সে হুয়ানকে লড়াইতে নিয়ে যাবে। আমি তাহ'লে এখন তাকে নিয়ে আসি। নয়তো, হোসে, যা, তুই বরং ওকে নিয়ে আয়। না, দাঁড়া, আমি নিজেই যাই। কিন্তু আমি এখুনি ফিরে আসবো।

[চ'লে যায়]

শ্রমিক : এখন বলো, হোসে—তুমি তো আর বোকা নও যে, সব কথা বিশদভাবে খুলে বলতে হবে। তাহ'লে বলো ওগুলো কোথায়?

ছেলে : কী?

শ্রমিক : রাইফেলগুলো।

ছেলে : বাবার?

শ্রমিক : সেগুলো নিশ্চয়ই এখানেই আছে। এখান থেকে যাওয়ার সময় কার্লোস নিশ্চয়ই ওগুলো রেখে ক'রে নিয়ে যায়নি।

ছেলে : তুমি কি ওগুলো নিতেই এসেছো?

শ্রমিক : তাছাড়া কী?

ছেলে : মা ওগুলো কাউকে দেয়নি। ওগুলো মা লুকিয়ে রেখেছে।

শ্রমিক : কোথায়?

[ছেলেটি ঘরের একটা কোণ দেখিয়ে দেয়। শ্রমিক সেদিকে যাবে, এমন সময় পায়ের শব্দ শোনা যায়]

শ্রমিক : [তাড়াতাড়ি ব'সে পড়ে] চুপ।

[মা এলেন। সঙ্গে গ্রামের পাদ্রি। মস্ত একজন জোয়ান মানুষ। পরনে খুব পুরোনো কোট]

পাদ্রি : কেমন আছো, হোসে ? [শ্রমিককে] নমস্কার।

মা : এ হচ্ছে আমার ভাই পেদ্রো, মোন্তিইয়ে থেকে এসেছে।

পাদ্রি : আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। [মা-র দিকে] আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, কেননা আবার আমি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি। আপনি কি কাল দুপুরে একবার তুরিলোদের দেখতে যেতে পারবেন ? ওখানে বাচ্চাগুলো এখন একা রয়েছে, ওদের মা লড়াইয়ের ময়দানে তাঁর স্বামীর কাছে গেছেন।

মা : নিশ্চয়ই যাবো—

পাদ্রি : [শ্রমিককে] আপনি কেন এখানে এলেন ? আমি শুনেছি মোন্তিইয়ে থেকে এখান পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা নাকি খুবই খারাপ হ'য়ে গেছে।

শ্রমিক : এখানটা এখন অব্দি সত্যি বেশ শান্ত আছে, তাই না ?

পাদ্রি : কী বললেন ? হ্যাঁ।

মা : উনি তোমাকে যা জিগেশ করলেন আমিও তাই ভাবছি, পেদ্রো। তুমি এখানে কেন এসেছো ?

শ্রমিক : ভাবলাম, বোনকে একবার দেখে যাই।

পাদ্রি : [উৎসাহ দিয়ে] এ তো খুব ভালো কথা যে আপনি আপনার বোনকে দেখতে আসবেন, তবে আপনি যেভাবে কথাটা বললেন সেটা বোধহয় উনি হালকাভাবে তা গ্রহণ করছেন না।

শ্রমিক : আশা কবির ওকে আপনি একটা ভালো ছেলের তদারকির ভার দেবেন।

মা : আপনাকে কিন্তু এক গেলাশ মদ খেয়ে যেতে হবে। যে-বাচ্চাগুলোর বাপ-মা লড়াইয়ে গেছে, তাদের জন্যে আপনাকে ভাবতে হচ্ছে। নিশ্চয়ই আপনি সারাদিনই এদিক-ওদিক ঘুরেছেন। [তিনি পাদ্রিকে এক পাত্র মদ দিলেন]

পাদ্রি : [বসলেন, পাত্রটা নিলেন] আমার বদলে আপনি ঘোরাঘুরি করবেন জেনে আমি খুশি। [এই সময় পেরেস্‌দের রেডিওটা আবার বেজে উঠলো। মা উঠে জানলাটা বন্ধ করতে চাইলেন]

পাদ্রি : জানলাটা খোলা রাখুন, সেনিওরা কারার ! ওরা আমাকে এখানে আসতে দেখেছে, আমি যে ব্যারিকেডে যাইনি এটা ওরা খারাপভাবে নিয়েছে। আর তাই এই ধরনের ভাষণ শোনাচ্ছে।

শ্রমিক : খুব বিরক্তি লাগছে বুঝি আপনার ?

পাদ্রি : সত্যি-বলতে কী, হ্যাঁ। তবু জানলাটা খোলা থাক।

জেনারেলের গলা :

কিন্তু লোকে সত্যিই এই সব জঘন্য অসত্যের স্বরূপ চিনেছে, যা দিয়ে এরা আমাদের জাতীয় স্বার্থকে কালিমালিপ্ত করবার চেষ্টা চালাচ্ছে। হয়তো লালনিশানওলাদের মতো অত ভালোভাবে আমরা ক্যানটার-বেরির আর্চবিশপের পাওনা মিটিয়ে দিতে পারিনি, কিন্তু সেইজন্যে আমরা তাঁর প্রাণের বন্ধুরা যাদের গলা কেটেছে, তাঁকে দশহাজার মৃতকে পাদ্রি ব'লে জানিয়ে দিয়েছি। এই সেনিওর আর্চবিশপকে ব'লে দেওয়া উচিত যে, জাতীয় বাহিনী বোমা-কামান নিয়ে তাদের বিজয় অভিযানে থাকার সময় কোথাও একজনও জীবিত পাদ্রিকে দ্যাখেনি। (শ্রমিক পাদ্রিকে তাঁর সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেয়। যদিও পাদ্রি সিগারেট খান না তবুও তিনি হেসে একটা সিগারেট তুলে নিলেন।) এটা ভালোই হ'লো যে, এই সেনিওর আর্চবিশপকে ছাড়াই, ন্যায় ও আদর্শ বিমানের সাহায্যে জয়যাত্রায় এগুতে শিখেছে। জেনারেল ফ্রাঙ্কো, জেনারেল মেলা—
[বেতার হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে যায়]

পাদ্রি : [উদারভাবে] ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে পেরেস্‌রা এ-বিষয়ে আর বেশিকিছু আমাদের শোনাতে পারলো না। আমার মতে এমনতর ভাষণ কোনো সঠিক ধারণা দিতে পারে না।

শ্রমিক : আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে, ভাটিকান থেকে এমনতর অসত্য গোটা পৃথিবীতে ছড়ানো হচ্ছে।

পাদ্রি : তা আমি জানি না। [অস্বস্তিভরে] আমার মতে চার্চের উদ্দেশ্য শাদাকে কালো আর কালোকে শাদা বানানো নয়।

শ্রমিক : [ছেলেটির দিকে চেয়ে] নিশ্চয়ই নয়।

মা : [তাড়াতাড়ি] আমার ভাই মিলিশিয়ার হ'য়ে লড়েছে।

পাদ্রি : কোন ফ্রন্ট থেকে আপনি এসেছেন ?

শ্রমিক : মালাগা।

পাদ্রি : ওখানে খুব অবস্থা ভয়াবহ, তাই না ? [শ্রমিক চুপচাপ সিগারেট ফোঁকে]

মা : আমার ভাই আমাকে একজন সাচ্চা এস্পানি মেয়ে ব'লে মনে করে না। তার মতে আমার হুয়ানকে ফ্রন্টে যেতে দেয়া উচিত ছিলো।

ছেলে : আর আমাকেও। ওটাই আমাদের জায়গা !

পাদ্রি : আপনি জানেন, সেনিওরা কারার, আমি আমার বোধবুদ্ধিমতো আপনার মনোভাবকেই ঠিক ব'লে মনে করি। অনেক জায়গায় তলার দিককার যাজকরা আইনি সরকারের সমর্থন করছেন। আঠারোটি চার্চের মধ্যে প্রায় সতেরোটি ঐ সরকারের পক্ষে! আমার মতো পাদ্রি যাঁরা যুদ্ধের কাজ করছেন তাঁরাও সংখ্যায় কম নন। এর মধ্যেই অনেকে মারা গেছেন। কিন্তু আমি কোনোরকম যোদ্ধা নই। ঈশ্বর আমাকে সে-গুণ দেননি যাতে আমি খোলাখুলি আমার ধর্মপুত্রদের [তিনি উপযুক্ত কথা হাৎড়ালেন] কোনোভাবে লড়াইয়ে ডাকতে পারি। আমার জন্যে প্রভুর ঐ কথাটাই ঠিক : 'কাহাকেও হত্যা করিও না'। আমি ধনী নই, কোনো চার্চেরও মালিক নই, আর অন্যান্য পাদ্রিদের সঙ্গে যোগাযোগও যৎসামান্য। হয়তো এরাই একমাত্র উপায় যা এমন সংকটের সময় আমার বক্তব্যকে জোরদার করতে পারবে।

শ্রমিক : নিশ্চয়ই ; তবে একটা প্রশ্ন আছে : আপনি তো-যোদ্ধা নন তবু, আমার কথাটা একটু বুঝুন। ধরুন একজন লোক, যাকে এখনই হত্যা করা হচ্ছে অথচ যে আত্মরক্ষা করতে চায়, তাকে মুরগির মতো জবাই হবার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আপনি 'কাহাকেও হত্যা করিও না' কথাটা ব্যবহার করবামাত্র আপনিও মোটের ওপর এই লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করলেন, মানে আপনার নিজস্ব ধরনে। ক্ষমা করবেন, যা ভাবছি তা ব'লে ফেললাম ব'লে।

পাদ্রি : আপাতত আমি খিদের ব্যাপারেই উৎসাহী।

শ্রমিক : আপনি কি মনে করেন যে আমরা আবার রুটি রোজগার করতে পাবো, যার জন্যে আপনি জগদ্‌পিতাকে ধন্যবাদ দেন ?

পাদ্রি : তা আমি জানি না, আমি শুধু ধন্যবাদই জানাতে পারি।

শ্রমিক : তাহ'লে এ-খবরটা আপনার কাছে চিত্তাকর্ষক ঠেকবে যে ঈশ্বর কাল রাত্রে খাদ্যবাহী জাহাজটিকে ফিরে যেতে দিয়েছেন।

ছেলে : সত্যি ? মা জাহাজটা ফিরে গেছে।

শ্রমিক : হ্যাঁ, এরই নাম নিরপেক্ষতা। [সঙ্গে-সঙ্গে] আপনিও তো আসলে নিরপেক্ষ ?

পাদ্রি : এ-কথা কেন ?

শ্রমিক : এই নন-ইনটারভেনশনের নীতি—এরা এর মধ্যে নাক গলাতে চায় না—তার মানে, জেনারেলের দল স্পেনের লোককে যে রক্তস্নান করাচ্ছে এরা তত্ত্বগতভাবে তার সবকিছুই মেনে নিচ্ছে।

পাদ্রি : [আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত তুলে] আমি তা মানছি না।

শ্রমিক : [আধবোজা চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে] আপনার দু-হাত আরেকবার ওপরে তুলুন। এই ভঙ্গিতে বাদায়োজে আমাদের পঞ্চাশ হাজার লোক ভাঙাচোরা সব বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলো। ঠিক ঐ অবস্থাতেই তাদের গুলি ক'রে মারা হয়।

মা : কী ক'রে এমন কথা বলতে পারছো, পেদ্রো ?

শ্রমিক : আমি লক্ষ করছিলাম তেরেসা, ক্রোধের ভঙ্গিকে কী ভাবে আত্মসমর্পণের ভঙ্গির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে। প্রায়ই পড়ি, যে অনেক লোক যারা চার্চের জলে হাত ধোয়, তারাও এই রক্তারক্তি করছে—তাদের হাতে এখন রক্তের ছাপ।

মা : পেদ্রো !

পাদ্রি : ওকে বলতে দিন, সেনিওরা কারার। এ অবস্থায় মেজাজ তেরিয়া থাকে। এ-সব শেষ হ'য়ে যাবার পর আমাদের সবাইকেই ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে।

শ্রমিক : ভাবছি, শেষটায় কি আমাদের বিকৃত রুচির মানুষ ব'লে পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়া হবে ?

পাদ্রি : এ-সব কথা কে বলেছে ?

শ্রমিক : রেডিওর গাঁক-গাঁক-জেনারেল। আপনি কি এর আগে এ-কথা শোনেননি ? আপনি বড্ড কম রেডিও শোনেন।

পাদ্রি : [অগ্রাহ্য করার স্বরে] ও, ঐ জেনারেলটা···

শ্রমিক : 'ও, ঐ জেনারেলটা !' বলবেন না। ঐ জেনারেল স্পেনের সকল উঁচু-তলার মানুষদের সমর্থন পেয়েছে, যাতে পৃথিবীর বুক থেকে আমাদের একেবারে মুছে ফেলা যায়, তা তার মধ্যে জার্মান. ইতালিয়ান বা মুর যেই পড়ুক না কেন।

মা : এটাও দারুণ লজ্জার বিষয় যে তারা এদের এখানে ভাড়া ক'রে এনেছে, এরা শুধু টাকার জন্যেই কাজ করে।

পাদ্রি : অন্তপক্ষে যে সৎ আদর্শবান মানুষ থাকতে পারে, এ-কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন না ?

শ্রমিক : আমি এটা বুঝতে পারছি না, কোত্থেকে ওরা এই গালভরা আদর্শনিষ্ঠা পেতে পারে ? [চুপচাপ]

পাদ্রি : [ঘড়ি বের ক'রে] আমাকে আরেকবার তুরিলোদের দেখতে যেতে হবে।

শ্রমিক : আপনি কি মনে করলেন না যে, নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদ, যাতে সরকারের এতটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তা সততার সঙ্গে নিয়মতন্ত্রকেই মেনে চলতে চায় ?

পাদ্রি : বিশ্বাস করি।

শ্রমিক : আমি আগেই বলেছি বাঁচতে চাচ্ছে এমন-কারু হাত বেঁধে ফেলে—আমি আক্ষরিক অর্থেই বলছি,—কেননা আমাদের খালি হাত ছাড়া বাড়তি বিশেষ-কিছু নেই···

মা : [বাধা দিয়ে] ও-বিষয়ে ফের শুরু করার কোনো মানে হয় না।

পাদ্রি : মানুষ যে খালি হাতেই জন্মে থাকে, আমরা সবাই জানি। ঈশ্বর তাকে মায়ের পেট থেকেই বন্দুক হাতে ক'রে বের হ'তে দেন না। যে-মত অনুসারে পৃথিবীতে সব দুর্দশার মূল হচ্ছে জেলে কিংবা শ্রমিকদের—আপনিও তো একজন শ্রমিক—যাদের খালি হাতে জীবিকা অর্জনের সংগ্রাম চালাতে হয়, আমি সেই মতবাদের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু কোথাও কোনো পুঁথিতেই এটা লেখা নেই যে এই পৃথিবী ক্রটিহীন। বরং এ হচ্ছে দুর্দশা, পাপ আর নিপীড়নে ভরা। যে এই দুর্দশাভরা পৃথিবীতে নিরস্ত্র অবস্থায় এসে, কোনোসময়েই হাতে অস্ত্রশস্ত্র না-তুলে চ'লে যেতে পারে, সেই ধন্য।

শ্রমিক : সুন্দর বলেছেন। আর সুন্দর কোনোকিছুর বিরুদ্ধে আমি কিছু বলতেও চাই না। শুধু এটাই চাই এই ভাষণ যেন জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে কিছুটা প্রভাবিত করে; কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, যাঁর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অব্দি সশস্ত্র, সেই জেনারেল ফ্রাঙ্কোর এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার ব্যাপারে মোটেই কোনোই আগ্রহ নেই। আমরা তাঁকে স্পেনের সমস্ত অস্ত্রই দিয়ে দিতে পারতাম যদি কেবল তিনি এই পৃথিবী থেকে স'রে পড়তেন। তাঁর বিমান থেকে আমাদের কাছে যে-প্রচারপত্র ফেলা হয়েছে, আমি আজ মোত্তিইয়ের রাস্তার ওপর তা পেয়েছি। [সে পকেট থেকে একটা প্রচারপত্র বের করে। পাদ্রি, মা আর ছেলেটি সেটি দ্যাখে।]

ছেলে : [মাকে] দেখছো, এখানে আবার ওরা বলছে যে ওরা সবকিছু ধ্বংস ক'রে দেবে।

মা : [পড়তে-পড়তে] এ-কাজ ওদের দ্বারা মোটেই সম্ভব নয়।

শ্রমিক : তবু সম্ভব হয়েছে। পাদ্রি কি বলেন ?

ছেলে : হ্যাঁ।

পাদ্রি : [বিচলিত] আমার মনে হয় যে হয়তো এই পরিস্থিতিতে নিছক-একটা কৌশল হিশেবে এ-সব করা হচ্ছে। কিন্তু আমি যদি সেনিওরা কারারের কথা ঠিকমতো বুঝে থাকি তাহ'লে তিনি বোধহয় বলতে চান যে, এটা তাদের পক্ষে বিমানের প্রশ্ন নয়। তারা এখানে এইভাবে প্রচারপত্রের মারফৎ ভয় দেখিয়ে, জনসাধারণের চোখের সামনে পরিস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরতে চাচ্ছে। তবে সামরিকভাবে সত্যি এই ধরনের বিভীষিকা সৃষ্টি করা হ'লে আলাদা ব্যাপার।

শ্রমিক : আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।

ছেলে : আমিও না।

পাদ্রি : [এখনও বিচলিত] আমার তো মনে হয় আমি প্রাঞ্জল ক'রেই বলেছি।

শ্রমিক : আপনার কথা অতীব প্রাঞ্জল—কিন্তু আপনার বক্তব্য আমার অথবা হোসের কাছে পরিষ্কার নয়। আপনি কি মনে করেন যে তারা বোমা ফেলবে না ?

পাদ্রি : আমি তাকে একটা দুঃস্বপ্ন ও বিভীষিকা ব'লে গণ্য করবো।

শ্রমিক : যা এখনও হয়নি ?

পাদ্রি : না।

মা : আমি যা পড়লাম, তাতে তাদের বিরুদ্ধে হাত ওঠানোর ব্যাপারে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে রক্তারক্তি এড়িয়ে যেতেই চেয়েছে।

ছেলে : জেনারেলরা রক্তপাতকে এড়িয়ে চলবে !

মা : [দেরি ক'রে প্রচারপত্রটি দিতে-দিতে] যাই হোক, এখানে তারা লিখেছে, যারা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দেবে তারা রেহাই পাবে।

শ্রমিক : তাহ'লে, পাদ্রি, আমি আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই : আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, যারা অস্ত্র ফেলে দেবে তারা সত্যি রেহাই পাবে ?

পাদ্রি : [চারদিকে সাহায্যের জন্য তাকাতে-তাকাতে] শুনি তো যে, জেনারেল ফ্রাঙ্কো নাকি সবসময় জোর দিয়ে বলেন যে তিনি সৎ খ্রিস্টান।

শ্রমিক : তার মানে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখবেন ?

পাদ্রি : [তাড়াহুড়ো ক'রে] আপনাকেও এটা মানতে হবে সেনিওর সাকুরাস ?

মা : যে-লড়াই করছে না তার কিছুই হবে না।

শ্রমিক : [মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে পাদ্রিকে]…আমি আপনার নাম জানি না।

পাদ্রি : ফ্রানসিস্কো।

শ্রমিক : [আবার শুরু করে] সেনিওর ফ্রানসিস্কো, আপনাকে আমি ঠিক সেই প্রশ্ন করতে চাচ্ছি না যে জেনারেল ফ্রাঙ্কো সম্পর্কে আপনার মত কী। আমার জিজ্ঞাস্য তিনি কী করবেন ব'লে আপনি মনে করেন ? আমার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন।

পাদ্রি : হ্যাঁ।

শ্রমিক : শুনুন, আমি আপনার সামনে একজন খ্রিস্টান হিশেবে, কিংবা বলতে পারেন, একজন মানুষ হিশেবে প্রশ্ন তুলছি আপনার কথা অনুযায়ী যাঁরা কোনো চার্চের মালিকানা নেই আর যিনি জীবন এবং মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ে সত্য কথা ব'লে থাকেন তাঁর কাছে জানতে চাচ্ছি…

পাদ্রি : [খুব অস্থিরভাবে] আমি আপনার কথা বুঝেছি।

শ্রমিক : আপনাকে মালাগার ঘটনা মনে করিয়ে দিলে হয়তো আপনার উত্তর দিতে সুবিধে হবে।

পাদ্রি : আপনি কী ভাবছেন, আমি বুঝেছি। কিন্তু আপনি কি ঠিক জানেন যে মালাগায় কোনো প্রতিরোধ করা হয়নি ?

শ্রমিক : আপনি জানেন যে পঞ্চাশ হাজার নারীপুরুষশিশু দুশো বিশ কিলোমিটার লম্বা রাস্তা বরাবর আলমেনিয়ার দিকে পালাচ্ছিলো, তাদের জাহাজ থেকে কামানের গোলা আর ফ্রাঙ্কোর বিমানবাহিনী থেকে বোমা আর মেশিন-গান চালিয়ে নির্মূল করা হয়েছে ?

পাদ্রি : তাহ'লে এ তো ভয়ানক খবর !

শ্রমিক : গুলি ক'রে পাদ্রিদের খুন করার মতো ?

পাদ্রি : হ্যাঁ, গুলি ক'রে পাদ্রিদের খুন করার মতো।

শ্রমিক : তারাও কি এ-ফলে মরছে না ? [পাদ্রি চুপ ক'রে থাকেন]

শ্রমিক : সেনিওরা কারার আর তার ছেলেরা জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধ হাত তোলেনি। সেনিওরা কারার আর তার ছেলেরা কি তাহ'লে নিরাপদ ?

পাদ্রি : মানবিক বিচার অনুসারে…

শ্রমিক : হ্যাঁ, বলুন—মানবিক বিচার অনুসারে—

পাদ্রি : [উত্তেজিত] তাঁরা তো চান না যে আমি তাঁদের একটা রক্ষাকবচ একটা নিশ্চয়তা দেবো।

শ্রমিক : না, তারা শুধু আপনার খাঁটি মতটাই জানতে চায়, বলুন, সেনিওরা কারার আর তার ছেলেরা কি নিরাপদ ?

[পাদ্রি চুপ]

শ্রমিক : মনে হচ্ছে আপনার উত্তর পেয়ে গিয়েছি। সত্যি, আপনি ভারি সৎ মানুষ।

পাদ্রি : [হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন] আচ্ছা, সেনিওরা কারার, তাহ'লে আমি ধ'রে নিতে পারি যে, আপনি তুরিলোদের বাচ্চাগুলোকে দেখাশুনো করবেন ?

মা : [একইভাবে খুব বিমূঢ়] সঙ্গে খাবারও নিয়ে যাবো। আপনি যে দেখা ক'রে গেলেন, সেজন্যে ধন্যবাদ। [শ্রমিক আর ছেলেটির দিকে মাথা নেড়ে বিদায় জানিয়ে পাদ্রি বাইরে চ'লে যান। মা তাঁর সঙ্গে যান।]

ছেলে : এখন তো শুনলে মার চিন্তাভাবনা কী রকম। কিন্তু রাইফেলগুলো না-নিয়ে যেন যেয়ো না।

শ্রমিক : ওগুলো কোথায় ? তাড়াতাড়ি—[তারা পেছনের দিকে যায়, একটা বাক্স ঠেলে সামনে আনে আর তার ঢাকাটা খুলে ফ্যালে]

ছেলে : মা কিন্তু এখুনি ফিরে আসবে।

শ্রমিক : আমরা রাইফেলগুলো জানলার সামনে রাখবো। ওখান থেকে পরে ওগুলো সরাবো। [তারা তাড়াতাড়ি রাইফেলগুলো বার করে। একটা ছোটো পুরোনো নিশান, যা দিয়ে ওগুলো জড়ানো ছিলো, মাটিতে প'ড়ে গেলো]

ছেলে : এখানে তখনকার একটা ছোটো নিশানও রয়েছে। এমন তাড়াহুড়োর সময় তুমি কী ক'রে এমন নিশ্চিন্তে ব'সে আছো দেখে আমার অবাক লাগছে।

শ্রমিক : রাইফেলগুলো আমাকে নিতেই হবে। [দুজনে অস্ত্রগুলো তুলে পরীক্ষা করছে। হঠাৎ ছেলেটি বাক্সটার খোপ থেকে একটা টুপি টেনে তোলে মিলিটারির টুপি, আর সেটাকে বিজয়ীর মতো প'রে নেয়] এটাকে কোত্থেকে পেলে ?

ছেলে : ভেতরে ছিলো। [একটু ভয়ে-ভয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে আবার টুপিটাকে পকেটটার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে]

মা : [আবার ভেতরে ঢুকে] রাইফেলগুলো রেখে দাও। তুমি কি ঐজন্যেই এসেছো ?

শ্রমিক : হ্যাঁ, এগুলো আমাদের, তেরেসা। আমরা খালি কিছুতেই হাতে জেনারেলদের রুখতে পারবো না।

ছেলে : অবস্থা যে কী, তা তো এইমাত্র পাদ্রির মুখ থেকেই শুনলে।

মা : তুমি যখন কেবল এই রাইফেলগুলো নেবার জন্যেই এখানে এসেছো, তখন আর তোমার এখানে অপেক্ষা করার দরকার নেই। আর তোমরা যদি আমাদের এই বাড়িতে শান্তিতে থাকতে না-দাও তাহ'লে আমি আমার ছেলেদের নিয়ে এখান থেকে পালাবো।

শ্রমিক : আচ্ছা, তেরেসা, তুমি কি কখনও আমাদের দেশের মানচিত্র দেখেছো ? আমরা একটা ভাঙা রেকাবির মতো জায়গায় বাস করি। ভাঙা-ভাঙা জায়গাগুলোয় আছে জল, আর রেকাবির ভাঙা কানায় সাজানো রয়েছে কামান। আর আমাদের মাথার ওপর উড়ছে বোমারু বিমান। ঐ কামানগুলোর মুখে পড়া ছাড়া তুমি আর-কোথায় পালাতে চাও ? [মা কাছে গিয়ে রাইফেলগুলো হাত থেকে কেড়ে নেন—হাতে ক'রে তুলে আনেন]

মা : এই রাইফেলগুলো তোমরা পাবে না, পেদ্রো।

ছেলে : মা, ওগুলো তুমি ওকে দিয়ে দাও। এখানে মিছেমিছি কেবল মরচে ধ'রে নষ্ট হবে।

মা : কথা বলবি না, হোসে ! তুই কী জানিস ? [শ্রমিক আবার তাঁর চেয়ারে গিয়ে বসে আর সিগারেট ধরায়]

শ্রমিক : তেরেসা, কার্লোসের রাইফেলগুলো রাখার তোমার কোনো অধিকার নেই।

মা : [রাইফেলগুলোকে বাক্সে তুলতে-তুলতে] অধিকার থাক কিংবা নাই থাক, আমি দেবো না। আর তোমরা আমার বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতেও পারবে না, আর আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু নিয়ে যেতেও পারবে না।

শ্রমিক : সেটা বাড়ির ভেতরে কী আছে তার ওপর নির্ভর করে। আমি তোমাকে ছেলেবেলার সে-সব কথা বলতে চাই না—তার কিছু-কিছু এখনও আমার মনে আছে ; কিংবা তোমার স্বামী আজ বেঁচে থাকলে কী ভাবতে, সে-কথাও তুলতে চাই না। সে লড়াই ক'রে মরেছে। ধ'রে নিচ্ছি যে, ছেলেদের জন্যেই উদ্বেগে তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। কিন্তু তাই ব'লে আমরা নিশ্চয়ই তোমার কথায় মাথা গরম করবো না।

মা : তার মানে ?

শ্রমিক : তার মানে, রাইফেলগুলো না-নিয়ে আমি কিছুতেই যাবো না—এটা তুমি ঠিক জেনো।

মা : তাহ'লে আগে আমায় খুন করো।

শ্রমিক : আমি তো জেনারেল ফ্রাঙ্কো নই। আমি শুধু হুয়ানের সঙ্গে কথা বলবো। তাহ'লেই ওগুলো পাওয়া যাবে।

মা : [তাড়াতাড়ি] হুয়ান ফিরে আসবে না।

ছেলে : তুমি তো ওকে নিজেই ডাকলে।

মা : ডাকিনি। পেদ্রো, আমি চাই না, হুয়ানের সঙ্গে তোমার দেখা হোক।

শ্রমিক : আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু আমারও তো একটা গলা আছে। আমি জলে নেমে তাকে ডাকতে পারি। একটা কথাই যথেষ্ট, তেরেসা ; আমি হুয়ানকে চিনি, সে ভীরু বা ডরপোক নয়, আর তুমি তাকে আটকেও রাখতে পারবে না।

ছেলে : আর আমিও সঙ্গে যাবো।

মা : [খুব শান্তভাবে] আমার ছেলেদের শান্তিতে থাকতে দাও, পেদ্রো। আমি তোমাদের বলছি, যদি ওরা যায় তবে আমি গলায় দড়ি দেবো। জানি আত্মহত্যা পাপ আর তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু এছাড়া আমার আর অন্য-কোনো উপায় নেই। যখন কার্লোস মারা গেলো, অন্য-কেউ হ'লে হয়তো তখনই গলায় দড়ি দিতো। আমি জানতাম আমি পাপী। যদিও তার বিশ্বাস ছিলো হিংসায়, আর এতটাই গায়ের জোর দেখাতো যে তাকে আরো-খারাপ বলতে। এই জীবনের ভার ভালোভাবে বা সহজভাবে ব'য়ে বেড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কিন্তু হিংসায় কোনো লাভ নেই, পেদ্রো। যখন ওরা ওকে এখানে নিয়ে এলো আর আমার সামনে মেঝেতে শুইয়ে দিলো, তখনই সব বুঝতে পারলাম। আমি জেনারেলদের পক্ষে নই, আর এটাই লজ্জা যে এ-কথাটাও আমাকে নিজের মুখে বলতে হচ্ছে। কিন্তু যদি ওদের বিরোধিতা না-করি, হিংসাত্মক কাজে যোগ না-দিই তাহ'লে হয়তো ওরা আমাদের রেহাই দেবে। এটাই সহজ হিশেব শুধু এইটুকু আমি চাই। এই নিশানটা আর আমি দেখতে চাই না। আমরা যথেষ্ট দুর্ভাগা। [মা শান্তভাবে নিশান ছিঁড়ে ফ্যালেন। তারপর ছেঁড়া ফালিগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ব্যাগে ভরেন]

শ্রমিক : তেরেসা, তুমি গলায় দড়ি দিলেই আরো ভালো হ'তো। [দরজায় ধাক্কা। সেনিওরা পেরেসের প্রবেশ। বৃদ্ধা, পরনে কালো পোশাক।]

ছেলে : [শ্রমিককে] পেরেসদের বুড়িমা।

শ্রমিক : [নিচু স্বরে] কেমন লোক ?

ছেলে : ভালো। ওদেরই রেডিও রয়েছে। গত হপ্তায় এঁর মেয়ে লড়াইয়ে মারা গেছে।

বুড়ি : জানেন, পাদ্রি না-যাওয়া অব্দি আমি অপেক্ষা ক'রে ছিলাম। আমি ভাবলাম, আমার বাড়ির লোকদের ব্যবহারের কৈফিয়ৎ দিতে একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। আপনাদের মতামতের জন্যে তারা আপনাদের ওপর যে-ধরনের উপদ্রব করে, তা আমি উচিত ব'লে মনে করি না। এটাই আমি জানাতে চাচ্ছিলাম। [মা চুপ]

বুড়ি : [ব'সে প'ড়ে] আপনার তো ছেলেদের জন্যে উদ্বেগ। আজকালকার দিনে ছেলেপিলেকে মানুষ করা ভারি কঠিন। আমার তো সাতটা হয়েছিলো। [তিনি একবার শ্রমিকের দিকে মুখ ফেরান, তার সঙ্গে এখনও তাঁর পরিচয় হয়নি] অবশ্য ইনেস মারা যাবার পর আর অতগুলো রইলো না। দুটোর বয়েস তো পাঁচও পেরোয়নি। তখন ছিলো আটানব্বুই-নিরেনব্বুই সাল, দুর্ভিক্ষের বছর। আন্দ্রে যে কোথায় তাও জানি না। তার শেষ চিঠি এসেছিলো রিও থেকে—সেটা দক্ষিণ আমেরিকায়। তবে মারিয়ানা মাদ্রিদে আছে। বড্ড ভুগছে। কোনোকালেই তো স্বাস্থ্য ভালো ছিলো না। অবশ্য আমাদের মতন বুড়োহাবড়াদের কাছে কেউ দেখা করতে এলেই মনে হয় যেন সে একটু রোগা আর কাহিল হ'য়ে পড়েছে।

মা : কী, আপনার ফের্নান্দো তো রয়েছে।

বুড়ি : হ্যাঁ।

মা : [অপ্রতিভ] মাপ করবেন, আপনাকে আঘাত দিতে চাইনি।

বুড়ি : [শান্ত গলায়] মাপ চাইবার কিছু নেই। আমি জানি আপনি আমায় আঘাত দিতে চাননি।

ছেলে : [আস্তে, শ্রমিককে] ও ফ্রাঙ্কোর দলে রয়েছে।

বুড়ি : ফের্নান্দোর কাছ থেকে আর-কোনো খবর পাইনি। [একটু চুপ থেকে] জানেন, ইনেস মারা যাওয়ায় আমাদের কতটা দুঃখ হয়েছে সেটা না-বুঝলে আপনি আমার বাড়ির লোকদের বুঝতে পারবেন না।

মা : ইনেসকে আমরা সবাই খুব ভালো বাসতাম। [শ্রমিককে] সে হুয়ানকে পড়াতো।

ছেলে : আমাকেও।

বুড়ি : আপনাদের সম্পর্কে লোকে ভাবে আপনারা দলে আছেন। তবে এ-

সম্বন্ধে আমার বরাবরই মতটা অন্যরকম। গরিব আর বড়োলোকের তফাৎ তো বুঝি।

মা : আমি চাই না যে আমার ছেলেরা সৈন্য হোক। তারা তো আর বলি দেবার পাঁঠা নয়।

বুড়ি : জানেন, সেনিওরা কারার, আমি সবসময়ে বলি : গরিব মানুষের জীবনে কোনো নিরাপত্তা নেই। তার মানে, তাদের ওপর বারে-বারে আঘাত আসে। আঘাত যারা পায় তাদেরই ঠিক গরিব ব'লে চেনা যায়। আর গরিবরা এমনিতে সাবধানী হয় না। আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে ইনেসই ছিলো সবচেয়ে বেশি সাবধানী। তার সাঁতার শেখার সময় আমার স্বামীকে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'তো।

মা : আমার মনে হয় ইচ্ছে করলে সে বেঁচে থাকতে পারতো।

বুড়ি : কী ক'রে ?

মা : আপনার মেয়ে শিক্ষিকা হ'য়েও, রাইফেল হাতে নিয়ে জেনারেলদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছিলো কেন ?

শ্রমিক : যে-জেনারেলরা পরমপিতার পবিত্র ঠিকাদারদের কাছ থেকে টাকা পাচ্ছে !

বুড়ি : সে বলতো সে শিক্ষিকাই থাকতেই চায়।

মা : তাহ'লে কেন সে মালাগায় তার স্কুলে শিক্ষিকা হ'য়েই রইলো না ? এ-পক্ষেও জেনারেল, ও-পক্ষেও জেনারেল ?

বুড়ি : এ-নিয়ে আমরা তার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তার বাবাকে সাত বছর তামাক খাওয়া বন্ধ রাখতে হয়েছিলো, আর তার বোনের একফোঁটা দুধও জোটেনি ; তবেই না সে শিক্ষিকা হ'তে পেরেছে ! তবু ইনেস বলেছিলো যে, তার পক্ষে দুই আর দুইয়ে পাঁচ কিংবা জেনারেল ফ্রাঙ্কো ঈশ্বর-প্রেরিত দূত—এ-সব শেখানো সম্ভব নয়।

মা : হুয়ান যখন আমার কাছে এসে বললে যে জেনারেলদের রাজত্বে তার পক্ষে আর মাছ ধরা সম্ভব হবে না, তখন আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে-ছিলাম। জেনারেলদের কর্তৃত্ব এলে মাছের আড়তদারেরা তো আর আমাদের ছাল ছাড়িয়ে নেবে না, কী বলেন ?

শ্রমিক : আমাদের হাতে অস্ত্র থাকলে ওরা হয়তো বেশ মুশকিলে ফেলবে।

মা : আবার অস্ত্রের কথা ? ব্যাপারটা তো চুকেই গিয়েছে।

শ্রমিক : কে ও-কথা তুলছে ? হাঙর ধরার সময় কি কেউ নিজে ইচ্ছে ক'রে জাল টানে ? আমরা কি মাদ্রিদের দিকে এগুচ্ছি, না জেনারেল মোলা পাহাড়

ডিঙিয়ে আমাদের কাছে এসেছে ? দু-বছর ধ'রে বেশ আলো ছিলো। অবশ্য অল্পই আলো, তবে অন্ধকার নয়। কিন্তু এখন আবার রাত্রি এসে গেছে। আর কখনও এ-রকম হয়নি। শিক্ষিকাদের আর দুই আর দুইয়ে চার হয় শেখাতে দেওয়া হবে না, বরং সে-কথা বললে তাদের সমূলে উপড়ে ফেলা হবে। আজই সন্ধ্যায় ওদের বলতে শুনলে না, আমাদের পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়া হবে ?

মা : শুধু ঐ রাইফেলগুলো হাতাবার জন্যে ! আমাকে আর ও-সব কথা বলবার দরকার নেই। আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে চ্যাঁচাতে পারবো না। আমার ছেলেরা আমার দিকে এমনভাবে তাকায়, যেন আমি পুলিশের লোক। যখন আটার জালা খালি হয় তখন তাদের মুখ দেখে বুঝতে পারি তারা আমাকে দোষ দিচ্ছে। বিমানহানার সময় তারা এমনভাবে তাকায় যেন আমিই বিমান পাঠিয়েছি। পাদ্রি কোনো কথা না-ব'লে চুপ ছিলেন কেন ? যখন বলি যে জেনারেলরাও মানুষ, কিন্তু খুবই খারাপ ধরনের—তবে একেবারেই কথা বলা চলে না এমন সৃষ্টিছাড়া কিছু নয়,—তখন লোকে এমনভাবে আমার দিকে তাকায় যেন আমার মাথা খারাপ। আপনি কেন আমার ঘরে ব'সে রয়েছেন, সেনিওরা পেরেস্ আর এইসব কথা আমাকে শোনাচ্ছেন ? আপনি কি মনে করেন যে আপনি কী বলবেন তা আমি জানি না ? আপনার মেয়ে তো মারা গিয়েছে, এখন কি আমারগুলোর পালা ! আপনি কি তা-ই চান ? বলুন ? আপনি আমার বাড়িতে যেন খাজনা আদায় করতে ঢুকেছেন। কিন্তু আমি তো পাওনা চুকিয়ে দিয়েছি।

বুড়ি : [দাঁড়িয়ে] সেনিওরা কারার, আমি আপনাকে রাগাতে চাই না। আমার স্বামীর মতো আমি মনে করি না যে, কোনোকিছুর জন্যে আপনার ওপর জোর করা উচিত। আপনার স্বামী সম্পর্কে আমাদের খুবই ভালো ধারণা, আর আমার বাড়ির লোকজন আপনাকে বিরক্ত করেছিলো ব'লে ক্ষমা চাচ্ছি। [তিনি শ্রমিক আর ছেলেটির দিকে ঘাড় নেড়ে চ'লে যান। চুপচাপ।]

মা : সবচেয়ে খারাপ হ'লো এই যে, এদের এই একগুঁয়েমির ফলে অনেকে না-বুঝেই বড়ো-বড়ো কথা বলতে শেখে। কিন্তু তাহ'লেও আমি ইনেসের বিরোধী নই।

শ্রমিক : [রেগে] হ্যাঁ, তুমি ইনেসের বিরোধী ! তুমি তো এখুনি বললে যে তুমি

জেনারেলদের দলে নও। তুমি বোঝো আর নাই বোঝো, এ-কথাটাও সত্যি নয়। যেহেতু তুমি তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করোনি, তার মানে তুমি তাদের দলে। নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়, তেরেসা!

ছেলে : [হঠাৎ মায়ের কাছে এসে] দ্যাখো না! [শ্রমিককে] এমনভাবে মা রাইফেলের বাক্সটার ওপর ব'সে আছে যেন আমরা না-নিতে পারি। ওগুলো দিয়ে দাও, মা!

মা : ও-কথা মন থেকে মুছে ফ্যাল, হোসে।

ছেলে : আমি পেদ্রোমামার সঙ্গে যেতে চাই, মা! কখন লোকে এসে আমাদের শুয়োরের মতো খুঁচিয়ে মারবে, ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করতে আমি রাজি নই। তুমি বলতে পারো না যে, তামাক খাবার মতো লড়াই করাও আমার বারণ। ফেলিপো, যে কিনা ভালো করে ঢিলও ছুঁড়তে পারে না, সেও লড়াইয়ে গেছে, আর আন্দ্রে, যে আমার চেয়েও এক বছরের ছোটো, সে তো ফ্রণ্টে মারাই গেলো। আস্ত গাঁয়ের কাছে আমি হাসির খোরাক হ'তে চাই না।

মা : হ্যাঁ, বুঝেছি। যদি তাকে ফ্রণ্টে নিয়ে যাওয়া হয়, খুদে পাবলো কেবল মালগাড়ির ছুঁচো শিকার করবে, এটা সত্যি হাসির ব্যাপার।

শ্রমিক : এটা হাসির ব্যাপার নয়।

ছেলে : এরনেস্তো ক্ররিলোকে বোলো, সে আমার ছোট্ট নৌকাটা নিতে পারে। এসো, পেদ্রোমামা—
[সে যেতে চায়]

মা : তোকে থাকতে হবে, হোসে!

ছেলে : না, আমি যাবো। তুমি বলতে পারো হুয়ানকে তোমার দরকার। সে রইলো। কিন্তু আমাকেও তোমার কী দরকার?

মা : হুয়ান আমার জন্যে মাছ ধরতে গেছে, তাই আমি তাকে আটকাইনি। কিন্তু তোকে আমি যেতে দেবো না! [তিনি ছুটে তার কাছে গিয়ে তার হাত ধরেন] না-হয় তুই একলা মাছ ধরতে যাস, কিংবা তোর বাবার নৌকো ব্যবহার করিস, তাহ'লেও আমি কিছু বলবো না।

ছেলে : আমায় ছেড়ে দাও, মা।

মা : তোকে এখানে থাকতে হবে।

ছেলে : [ছাড়াবার চেষ্টা করতে-করতে] না, আমি যাবো! তাড়াতাড়ি, মামা! রাইফেলগুলো নিয়ে নাও!

মা : ওহ্ ! [তিনি ছেলেকে ছেড়ে দেন আর সাবধানে পা ফেলে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ফেরেন]

ছেলে : কী হ'লো ?

মা : আমার কী হ'লো না-হ'লো তাতে তোর কী ? তুই যা, তোর কাছে তোর মা হেরে গিয়েছে।

ছেলে : [অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে] আমি তো মারামারি করিনি। তোমার কিছুতেই লাগতে পারে না।

মা : [গায়ে হাত বোলান।] না, চ'লে যা !

শ্রমিক : আমি একটু মালিশ ক'রে দেবো ?

মা : না, চ'লে যাও ! আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও ! তুমিই তো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে আমার ছেলেদের তাতিয়ে দিয়েছো !

ছেলে : [রেগে] আমি তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি ! [সে রেগে পেছনের দিকে চ'লে যায়]

মা : তুই একটা আস্ত গুণ্ডা হ'য়ে উঠেছিস। আর কেন ? এবার উনুন থেকে সব রুটিগুলো নিয়ে নে, আর আমাকে দড়ি দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফ্যাল। তোরা তো দুজন আছিস।

শ্রমিক : শেষটায় সত্যি-সত্যি প্রলাপ বকতে শুরু করলে ?

মা : হুয়ানও তো গোঁয়ার, কিন্তু কই সে তো কখনো তার মায়ের ওপর গায়ের জোর দেখায় না। আসুক, সে তোদের মজা দেখাবে। হুয়ান ! [হঠাৎ কী ভেবে তিনি দাঁড়িয়ে ওঠেন আর ছুটে জানলার কাছে যান। তিনি খোঁড়াতে ভুলে গিয়েছেন আর তাঁর ছেলে রেগে উঠে তাঁর পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখেছে]

ছেলে : পা যে হঠাৎ সেরে গেলো !

মা : [বাইরের দিকে চেয়ে হঠাৎ] বুঝতে পারছি না, হুয়ানের লণ্ঠনটা কেন আর দেখা যাচ্ছে না।

ছেলে : [থমথমে মুখে] কী ক'রে নিভলো ?

মা : না, সত্যি নিভে গেছে। [ছেলেটি জানলায় গিয়ে বাইরে তাকায়]

ছেলে : [অবাক স্বরে] হ্যাঁ, লণ্ঠনটা নিভে গেছে। শেষবারে সে ছিলো অন্তরীপের কাছাকাছি। যাই, দৌড়ে গিয়ে একবার দেখে আসি [সে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো]

শ্রমিক : ও নিশ্চয় এখন নৌকো ফিরিয়েছে।

মা : তাহ'লেও লণ্ঠনটা দেখতে পেতাম।

শ্রমিক : তাহ'লে আর কী হ'তে পারে ?

মা : কী হয়েছে আমি জানি। মেয়েটা নিশ্চয়ই নৌকো ক'রে ওর কাছে গেছে।

শ্রমিক : কে ? ঐ মেয়েটা ? হ'তেই পারে না !

মা : যাই বলো, ঐ মেয়েটাই ওকে পাকড়াও করেছে। [ক্রমেই উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন] এটা একটা ষড়যন্ত্র, ওরা সব একজোট হ'য়ে করেছে। ওদের একজন সমস্ত সন্ধেটা এখানে অন্যজনের খোঁজ করেছে, যাতে আমি নজর রাখতে না-পারি। ওরা খুনে। আস্ত খুনে।

শ্রমিক : [খানিকটা মজা আর খানিকটা বিরক্তিতে] পাদ্রিটাকে তারাই পাঠায়নি তো ?

মা : পাছে ছাড়াছাড়ি হয়, তাই মেয়েটা এখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করেনি।

শ্রমিক : তা ব'লে তুমি নিশ্চয়ই হুয়ান ফ্রণ্টে গেছে ব'লে ভাবছো না ?

মা : ওরা নিজেরাই নিজেদের খুন করেছে ; ছেলেটা কিন্তু মেয়েটার চেয়ে মোটেই বেশি ভালো নয়। চুপি-চুপি চোরের মতো রাত্তিরে পালিয়ে গেলো। আর আমি ওর মুখ দেখতে চাই না।

শ্রমিক : আমি তোমার কথা ভালো ক'রে বুঝতে পারছি না, তেরেসা। তুমি কি জানো না, তুমি ওকে লড়াইয়ে যেতে বাধা দিয়ে যে কষ্ট দিয়েছো তাঁর চেয়ে বেশি কষ্ট অন্য আর-কোনোভাবে দেয়া সম্ভব নয় ? নিশ্চয়ই এজন্যে সে তোমাকে ধন্যবাদ দেবে না।

মা : [আনমনাভাবে] আমি তো ওকে লড়াই করতে বারণ করিনি।

শ্রমিক : আমাদের দলে লড়াই করতে বলোনি, তেরেসা। বলেছো, না, লড়াই করবে না। কিন্তু জেনারেলদের দলে লড়াই করতে বলেছো।

মা : যেমন আমাকে না-মেনে লড়াইয়ে গেছে, তেমনি আমি ওকে অভিশাপ দেবো। ওরা যেন ওদের বোমারু বিমান নিয়ে ওদের মুখোমুখি হয়। ট্যাঙ্ক নিয়ে যেন ওদের ছারখার ক'রে দেয়। যেন ও বুঝতে পারে যে ঈশ্বর রংতামাশা সহ্য করেন না, আর গরিবরা জেনারেলদের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে পারে না দেশের অন্যান্য ভাইদের ওপর মেশিন-গান চালাবে ব'লে আমি ওকে পেটে ধরিনি। পৃথিবীতে যা-কিছু অন্যায়, তাতে অংশ গ্রহণ করতে আমি ওকে শেখাইনি। কোনো-দিন ফিরে এসে যদি ও বলে যে জেনারেলদের হারিয়ে দিয়েছে, শুধু তা

হ'লেই আমি তার জন্যে আমার দরজা খুলে দেবো না। আমি তাকে বন্ধ দরজার ওপার থেকেই জানিয়ে দেবো যে, আমি এমন-কাউকে বাড়ির মধ্যে পেতে চাই না, যার হাত রক্তে রাঙানো, ঘায়েপচা পায়ের মতোই আমি তাকে কেটে বাদ দেবো। হ্যাঁ, তাই করবো। ও ভাবে, ওর কপালে সৌভাগ্য লেখা আছে। কিন্তু আমাদের কপালে কোনো সৌভাগ্যই নেই। জেনারেলদের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ হওয়ার আগে তোমরা এ-কথা বুঝতে পারবে না। একবার যারা তরোয়াল ধরে, তরোয়ালের ঘায়েই তারা মরে। [দরজার সামনে গুঞ্জন। দরজা খুলে গেলো আর তিনজন মহিলা ভেতরে এলেন, বুকের ওপর হাত ভাঁজ করা। বিড়বিড় ক'রে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করলেন। তাঁর দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন আর খোলা দরজা দিয়ে দুজন জেলে রক্তমাখা নৌকোর পাল জড়িয়ে হুয়ান কারারের মৃতদেহ নিয়ে এলো। পেছনে হোসে। মুখ মড়ার মতো শাদা, তার হাতে হুয়ানের টুপি। জেলেরা মৃতদেহ মেঝেতে রাখলে। একজনের হাতে হুয়ানের লণ্ঠন। মা তখন পাথরের মতো ব'সে আছেন আর মহিলারা সরবে প্রার্থনা ক'রে যাচ্ছেন। তখন জেলেরা অস্ফুটস্বরে শ্রমিককে ঘটনাটা জানালো]

প্রথম জেলে : মেশিনগান লাগানো ওদের একটা গানবোট যাচ্ছিলো। পাশ দিয়ে যাবার সময় সোজাসুজি গুলি ক'রে মেরেছে।

মা : এ হ'তে পারে না। এ ভুল। ও তো শুধু মাছ ধরছিলো। [জেলেরা চুপ। মা প'ড়ে যাচ্ছিলেন, শ্রমিক তাকে তুলে ধরলে]

শ্রমিক : ও আর কোনোকিছুই অনুভব করতে পারছে না।

[মা মৃতের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন]

মা : হুয়ান! [কিছুক্ষণ মহিলাদের প্রার্থনার গুঞ্জন শোনা যায় আর দূরে কামানের চাপা গুমগুম আওয়াজ]

মা : তোমরা একে ঐ বাক্সটার ওপর শুইয়ে দাও। [শ্রমিক আর জেলেরা মৃতদেহ তুলে পিছনে বাক্সের ওপর নিয়ে এলো। পালটা প'ড়ে রইলো। মহিলাদের প্রার্থনার শব্দ ক্রমশ জোরালো আর স্পষ্ট হয়। মা হোসের হাত ধ'রে মৃতদেহের কাছে আসেন।]

মা : [জেলেদের উদ্দেশে] ও কি একা ছিলো? আশপাশে অন্য-কোনো নৌকো ছিলো না?

প্রথম জেলে : না। তবে এ তীরের কাছেই ছিলো [সে আঙুল তুলে দ্বিতীয় জেলেকে দেখিয়ে দেয়]

দ্বিতীয় জেলে : তারা ওকে একবারও কিছু জিগেশ করেনি। সার্চলাইটের আলো ফেলে গুলি চালিয়েছে। তারপরেই লণ্ঠনটা নৌকোর ওপর প'ড়ে যায়।

শ্রমিক : কিন্তু তারা নিশ্চয়ই দেখেছিলো যে ও শুধু মাছ ধরছে।

দ্বিতীয় জেলে : হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই দেখেছে।

শ্রমিক : হুয়ান চেঁচিয়ে ওদের কিছু বলেনি ?

দ্বিতীয় জেলে : না, তাহ'লে আমি শুনতে পেতাম। [মা হোসের কাছ থেকে হুয়ানের টুপিটা নিয়ে সামনে আসেন]

মা : [সহজভাবে] টুপিটার জন্যেই এ-রকম হ'লো।

প্রথম জেলে : কেন ?

মা : এটা যা নোংরা। কোনো ভদ্রলোক এ-রকম টুপি পরে ?

প্রথম জেলে : কিন্তু নোংরা টুপি-পরা লোকদেরই তো আর সবসময়ে গুলি লাগছে না।

মা : যাই বলো, ওরা মানুষ নয়, কোনো মানুষ এ-কাজ করতে পারে না। ওরা হচ্ছে কুষ্ঠ আর কুষ্ঠের মতোই ওদের পুড়িয়ে শেষ করতে হবে। [প্রার্থনারতা মহিলাদের দিকে] আপনারা এখন আসুন। আমার অনেকগুলো কাজ রয়েছে। তাছাড়া আমার ভাই তো পাশেই রইলো। [তাঁরা চ'লে যান]

প্রথম জেলে : নৌকোটা আমরা ঘাটে বেঁধে এসেছি। [সবাই চ'লে যাবার পর মা পালটা তুলে নিয়ে ভাখেন।]

মা : আগে একটা নিশান আমি ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করেছি। তোমরা আবার আমার কাছে আরেকটা এনে হাজির করলে। [পালটাকে টানতে-টানতে পেছনে নিয়ে গিয়ে তিনি মৃতদেহটা ঢেকে দেন—এই সময় কামানের নিনাদ বেড়ে ওঠে। হঠাৎ যেন অনেক কাছের আওয়াজ ব'লে মনে হয়।]

ছেলে : [নিরুৎসুক গলায়] কী হচ্ছে বাইরে ?

শ্রমিক : [দ্রুত দেখতে যায়] ওরা ঢুকে পড়েছে। আমাকে যেতে হবে।

মা : [সামনে থেকে পেছনের উনুনের কাছে যান] রাইফেলগুলো বার করো। হোসে, তৈরি হ'য়ে নে। রুটিও তৈরি হ'য়ে গেছে। [শ্রমিক যখন বাক্স থেকে রাইফেলগুলো নিচ্ছে, মা রুটিগুলো দেখতে থাকেন। তিনি

সেগুলো উনুন থেকে বার করেন, একটা রুমালে বাঁধেন, তারপরে দুজনের কাছে আসেন। একটা রাইফেলকে মা শক্ত ক'রে ধরেন।]

ছেলে : তুমিও কি তাহ'লে আমাদের সঙ্গে আসতে চাও ?

মা : হ্যাঁ, হুয়ানের জন্যে।

[সবাই দরজার দিকে এগোয়]

অনুবাদ : সুখময় বসু

মার্চ ১৯৩৭

এই নাটকের শেষটুকু ব্রেখ্‌ট দু-ভাবে লিখেছিলেন।

বিষ্ণু দে

ফরাসি প্রতিরোধ ও সাহিত্য

জর্মান্‌ নাৎসিরা ও তাদের ফরাসি বন্ধুরা যখন ফ্রান্সের বুকে চেপে, তখন সে-দম-বন্ধ অত্যাচারে ফ্রান্সের জনসাধারণ হার মানেনি, সমুদ্রের মতো মৌন অসহযোগে মুক্তির প্রস্তুতি নির্মাণ করে গেছে। এবং ফরাসি লেখকেরা, শিল্পীরা, সংগীতকারেরা কী ভাবে গেস্টাপোর মারণমন্ত্রের মধ্যেই বই লিখেছেন, ছেপেছেন, হাতে-হাতে বিলি করেছেন, ছবির প্রদর্শনী করেছেন, সংগীত রচনা করে, গোপনে রেকর্ড করেছেন, সে-সব কাহিনী উপন্যাসের মতো রোমাঞ্চকর আর স্বদেশপ্রেমের ও মানবমর্যাদার অক্ষয় প্রমাণ।

তথাকথিত উঁচ্‌কপালে অবজ্ঞা যদি কেউ প্রকাশ করেন, তাহলে স্মরণ করাতে হয় যে উঁচ্‌কপালে ফ্রান্সের চরম উঁচ্‌কপালে সাহিত্যিক-শিল্পীরা এই আন্দোলনে সবাই কোনো-না-কোনো দিক থেকে কর্মব্রত নিয়েছিলেন—হয়তো এক সেলিন, মরাঁ, মঁতেরঁলা, বেনোয়া, মোরা ছাড়া। মঁতেরঁলার মতো নামকরা লেখকের পক্ষে দেশদ্রোহের অপরাধের সাফাইটা অতি করুণ—তিনি বলেন, লেখকেরা সব নেহাৎ অর্বাচীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং তিনি নিজে লেখকমাত্র। কিন্তু লেখক-বিচার সমিতির মধ্যে দুআমেল, ভিলদ্রাক প্রভৃতির মতো প্রবীণ সর্বমাননীয় লেখকেরা কি লজ্জাকর এই অপবাদে ভোলেন? সারা দেশ যে-ব্রত নিয়েছিল, সেখানে অনাচার অসহ্য।

আঁদ্রে মোরেলের ভাষায়:

মহাব্রত, ত্যাগের ঘোষণা
রুদ্রব্রত, প্রচণ্ড শোচনা
নবজন্ম চড়কে করাল

প্রভু! এ কী দুরন্ত আকাল
ছেড়েছি তো সবকিছু মোরা
ফুলফল জীবনপসরা
ছেড়েছি তো মাধুরী, পুলক
ছেড়েছি তো মায়া, দয়া, শোক
ছিন্ন ভিন্ন শান্তির নির্মোক

দীর্ঘ হল আমাদের ব্রত
সুদীর্ঘ বিবস্ত্র অনাহার
তবু প্রভু কি জানি তোমার
কিবা সাধ রাখি অনাহত !

এ-ব্রতে বৃদ্ধ আঁদ্রে জিদ্-ও ভিশিতে বসে গোপনে কাজ করে যান, আমেরিকায় বসে কাথলিক ভাবুক মারিতঁ্যা লেখনীর অস্ত্রধারণ করেন এবং বিখ্যাত উপন্যাসকার জিরোদু জর্মান্ আস্তানার বুকেই স্বদেশের গুপ্তচর ব্রত গ্রহণ করেন। কঠিন সে-ব্রত, দেশের লোক জানত তিনি বিশ্বাসঘাতক, এদিকে জর্মান্‌রা সত্যটা জানতে পেরে তাঁকে বিষ খাইয়ে মারল। শিল্পীশ্রেষ্ঠ পিকাসোর ফ্যাশিস্টবিরোধের গল্প আমরা আগেই শুনেছি: প্যারিসে ব'সে তিনি অসহযোগী ধৈর্যে ছবির পরে ছবি এঁকে গেলেন। আর কী-রকম শীতের মধ্যে জর্মান্‌রা যখন তাঁকে কয়লা দিতে চাইল, তখন তাঁর সে একান্ত মূল্যবান দান প্রত্যাখ্যান। তাঁর স্টুডিওতে একদিন এক কমাণ্ডাণ্টুর এল—স্পেনের ফ্যাশিস্টবর্বরকর্তৃক গের্নিকা ধ্বংসের বিখ্যাত ছবিটির কপি দেখে যখন লোকটা বললে, এটা কার ছবি? তখন পিকাসোর জবাব এল, তোমাদের। এই ফ্যাশিস্টবিরোধেরই পরিণতি হল পিকাসোর কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদানে।

কিন্তু, উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এ-প্রতিরোধে সর্বদলের একতা। তাই লেৎর্ ফ্রঁাসেস-বিখ্যাত পত্রিকায় কাথলিক ঔপন্যাসিক ফ্রঁাসোয়া মোরিয়াক্ লেখেন; দুআমেলের সঙ্গে কম্যুনিস্ট আরাগঁ, এল্যুয়ার, ভেরকরও নিয়মিত লেখক। গোপনপ্রকাশক এদিসিওঁ দ মিনুই-তে তাই আরাগঁ-র সঙ্গে হাত মেলান মারিতঁ্যা, বঁদা, কামু, ভেরকর্, মোরিয়াক্। লেৎর্ ফ্রঁাসেসর প্রস্তাবনায় তাই সম্মিলিত ইস্তাহার বেরোয়া —মোরিয়াক, দুআমেল্, আরাগঁ, এল্যুয়ার, ভিলদ্রাক্ গেএনো, মার্‌তঁ্যা দু গার্, বঁদা সকলেরই নামে। অর্ঘ্যদান করেন গেস্টাপোনিহত স্যা-পল-রু এবং মাক্স জাকব্-কে। লেৎর্-ফ্রঁাসেস-এর প্রতিষ্ঠাতা জাক্ দেক্‌র-কেও জর্মান-রা হত্যা করে। এলুয়ারের তথাকথিত কাব্যলক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা-র অক্ষম অনুবাদ এখানে প্রাসঙ্গিক :

অগ্নিময় পাঞ্চজন্যে জেগে ওঠে বন
হৃদয় শিহরে, গুঁড়ি হাত পত্রপুটে
চরম চরম সুখ ব্যূহ-ঘন-মিলে,
আলো ছোটে দিকে দিকে, তরল মাধুরী,
সারাটা বন যে এক মিতালির বন,
মিলেছে সবাই যেথা সবুজ নির্ঝরে,
জ্বলন্ত বনের আর জীবন্ত সূর্যের।

গার্থিয়া লোর্কা-কে তারা চড়িয়েছে শূলে।

একটি কথায় গাঁথা যেন সারাবাড়ি
জীবন-সর্বস্ব মিলে মেলে ওষ্ঠাধর,
সুকুমার শিশু এক অশ্রুহীন চেয়ে,
অনাবৃষ্টিদগ্ধ তার চোখের তারায়
দীপ্তি পায় ভবিষ্যৎ অক্ষয় ভাস্বর,
বিন্দু বিন্দু ছেয়ে যায় প্রতিটি মানুষ
কানায় কানায় প্রতি চোখের পাতায়।

স্যা-পল-রূ-কে তারা চড়িয়েছে শূলে,
মেয়ে তাঁর প্রাণহীন নৃশংস হত্যায়।

কৈলাসের কোণ যেন তুহিন শহর,
স্বপ্নে সেথা ফল দেখি ফুলের মুকুলে,
সারা আকাশের আর সারা পৃথিবীর
অসহায় বস্ত্রহীন কুমারীর দশা,
কোন্ দ্যূতক্রীড়া এ যে কোথা এর শেষ,
প্রাচীন পথের ভাঙা নিস্তব্ধ দেয়াল,
জুরে রাখি তোমাদের হাসির প্রসাদে,

দেকুর-কে চড়িয়েছে শূলে।

দেকুর একটি পত্রিকা স্থাপনে ক্লান্ত হননি, লা পঁসে লিব্‌র্ বা স্বাধীন চিন্তা নামক পত্রটিও তিনি দুটি বন্ধুর সঙ্গে শুরু করেন। সে-বন্ধুদুটিও জর্মান্ গুলিতে মারা যান। কিন্তু এই কেন্দ্র থেকেই লেখকসমিতি গড়ে ওঠে এবং এদিসিঅঁ দ মিনুই-র হয় সূত্রপাত। দেবু-ব্রিদেল ও লেস্‌কুর্ হলেন মুখ্য কর্মী—লেস্‌কুরের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃতিতে অবস্থা বোঝা যাবে: আরেকযুগে লোককে শাস্তি পেতে হয়েছে রাসীনের চেয়ে য়ুরিপিদিস্‌কে বেশি পছন্দ করায়।···আজ আবার আইন্‌-স্টাইনের ফিসিক্‌স্, ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব, সলোমানের গান নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ হয়েছে পুনর্মুদ্রণ মেরেডিথের বই; টমাস হার্ডি, ক্যাথরিন্ ম্যান্‌সফিল্ড্, ভর্জিনিয়া উল্‌ফ্, হেন্‌রি জেম্‌স্, ফকনর আমাদের প্রিয় সব লেখকের বই···ইত্যাদি। তাই প্রশ্নটা হয়ে ওঠে 'মানুষের মনের শুচিতা রক্ষার, যদিচ সে শুচিতার পথ হয়ে ওঠে আরো দুরূহ।'

এই গ্রন্থমালাতেই ভের্‌কর্‌ প্রকাশ করলেন তাঁর প্রথম গল্প 'সমুদ্রের মৌন'। বইটি শেষ হয় ১৯৪১-এর অক্টোবরে এবং ছাপা হয় বিয়াল্লিশের ফেব্রুয়ারিতে। বিয়াল্লিশের শেষদিকে বইটির সমুদ্রযাত্রা, তারপরে কাম্যিএর দ্যু সিল্‌স্‌ বা মৌনায়ন গ্রন্থমালার প্রথম প্রকাশ এই 'সমুদ্রের মৌন'। মোরিস দ্রুও ভূমিকায় লিখেছেন কী করে জেল এড়িয়ে, পুলিশের তোয়াক্কা না-রেখে, সৈন্যদলের মুখে তুড়ি দিয়ে, সীমান্ত প্রহরীকে নাজেহাল করে, এইসব মৌনব্রতের পুঁথি আসত। যে কাগজ জোগাত, যে ছাপত, যে লিখত সবাই জানত মৃত্যু যে-কোনো মুহূর্তে উঁকি দিতে পারে, তবু বই-এর পরে বই বেরিয়েছে। স্বনামে ও বেনামে বিখ্যাত ও সাহিত্যজগতে সদ্য-আগত সব লেখক। ফরে নাম নিয়েছিলেন ফ্রঁাসোয়া মোরিয়াক্‌, দেবুত্রিদেলের নাম হয়েছিল আর্‌গন। আরাগঁ-র স্ত্রী, মায়াকভস্কির আত্মীয়া এল্‌সা ত্রিয়োলে, প্রতিরোধের বিষয়ে সহৃদয় এক উপন্যাস লেখেন লোরঁা দানিয়েল নামে। কাব্যেও এ-প্রবল প্রাণের বন্যা আরাগঁ ও এল্যুয়ার প্রভৃতির কবিতায় ফরাসি কাব্যের বাঁধা আবেগে মুক্তি এনে দিলে। এল্যুয়ার কবিদের সম্মান নামে যে-চয়নিকা প্রকাশ করেন, তাতে আশ্চর্য কবিতাগুলির লেখকরা সংখ্যায় একুশ।

সারা ফ্রান্সেই এ-আন্দোলন চলেছিল। মধ্য দেশের ও দক্ষিণের ঐশ্বর্য বিস্ময়কর। এল্যুয়ারের জনপ্রিয় মায়াবী কবিতা "স্বাধীনতা" দক্ষিণের কাগজেই প্রথমে বেরোয়। আর একটি কাগজ আরাগঁর এক কবিতা প্রকাশের পরে ভিশির নজরে পড়ে উঠে যায়। পোয়েসি ৪০-নামে চয়নিকায় তা সত্ত্বেও এল্যুয়ার আরাগঁর সঙ্গে জর্মানহৃত গী মকে-র লেখাও ছিল। উত্তর-দক্ষিণের যোগাযোগ করতে গিয়েই দ্যুদাক্‌ মারা যান। তারপরে এল সোজা আইন উড়িয়ে সাহিত্য। লিওঁতে বেরোল লেসোতোয়াল্‌ টাইপ করা কাগজ, যেখানে যায় সেখানে পাঁচটা করে কাপি হয় : দেখতে-দেখতে সারাদেশে ছড়িয়ে গেল—আরাগঁ, এল্যুয়ার, কাস্যু এঁদের লেখা হাতে-হাতে মুখে-মুখে ছড়াতে লাগল।

প্রত্যক্ষ প্রতিরোধে আরাগঁর ছিল সব কঠিন কঠিন কাজ—কারণ তিনি কম্যুনিস্ট। কিন্তু সেইসব বিশ্রামহীন মরণান্তিক কাজের মধ্যেই আরাগঁর বহু শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্ম, প্রবন্ধ, উপন্যাসেরও। তাঁকে ঘিরেই দক্ষিণের লেখকসংঘ গড়ে উঠল। নাৎসিনিহত প্রেভস্ত, এল্‌সা ত্রিয়োলে, আঁদ্রে মালরো, মার্ত্যাঁ দ্যু গার সবাই এ-সংঘে জড়িত। এঁরা শুধু নিজেদের সাহিত্য রচনা ছাপিয়েই ক্ষান্ত হননি। নিষিদ্ধ ভেরলেনের কাব্যসংকলন এঁদের একটি প্রকাশ, ফ্রান্সে জর্মান্‌ কারাগারের মনোবিকার বিষয়ে একটি তথ্যপূর্ণ ডাক্তারি বই আর-একটি।

মাল্‌রো এই সময়ে মুক্ত ফরাসিবাহিনীর কর্নেল ছিলেন, তুলুসে নাৎসি তাঁবুতে বন্দী হয়ে দুঃসাহসী পালান এবং আবার বাহিনীতে যোগদান করেন—তাঁবুতে নাকি নাৎসিরা তাঁর অনেক খাতাপত্র নষ্ট করে দেয়। তবু তাঁর বিরাট উপন্যাসের প্রথম খণ্ড বেরিয়ে গেছে—লা লুৎ আভেক ল'াজ্—'দেবতার বিরুদ্ধে লড়াই'। অনেকের মতে এর পরে চীনের, স্পেনের, বিশ্বব্যাপী ফ্যাশিস্ট-বিরোধের এই যোদ্ধা-লেখককেই বর্তমানের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলতে হবে, মানুষের ইতিহাসের চরম ক্ষণগুলি তাঁর দৃষ্টিকেন্দ্র আর বর্তমান মানুষের মনের জটিলতম আবেগ তাঁর উপজীব্য। ব্যক্তিত্ব কেন সমাজ ছাড়া সম্পূর্ণ নয়, ইচ্ছাশক্তি ও কর্মৈষণার দ্বন্দ্ব কেন জীবনকে জটিল করে, ভিতর ও বাহির কেন মানব-মর্যাদাকে ভিন্ন-ভিন্ন করেও দিশেহারা হয় এইসব প্রশ্ন মাল্‌রোর বিপ্লবী পটভূমিতে কণ্টকিত হয়ে ওঠে।

এ-প্রশ্ন ফ্রান্সের প্রতিরোধক্ষেত্রেও যে উঠেছিল তা আরাগঁর কাব্যে দেখি।...জুল সুপারভিয়েই-র কবিতাতেও নিঃসঙ্গ কিন্তু ঐক্যবদ্ধ দেশপ্রেমের মধ্যে তার একটা প্রকাশ :

আমরা যে আত্মহারা প্রব্রজ্যায়,
বাহুতে যে প্রতিষ্ঠ স্বদেশ,
প্রত্যেকে ধরেছি ইষ্ট সঙ্গোপনে,
ভাবি কেউ পায় না উদ্দেশ

দুর্লভ প্রেয়সী হাতে, কি উদ্বেগ
জন্ম মৃত্যু মুহূর্তে উচ্ছসি'—
আবির্ভূ'তা—এ কী সেই জন্মভূমি
স্বর্গাদপি সেই গরীয়সী ?

প্রত্যেকে ধরেছি মূর্তি—যথাশক্তি ;
প্রত্যেকের বাহুর তর্পণে
প্রত্যেকে আপন বিশ্ব দেখি বুঝি
অনন্ত সে অতল দর্পণে।

এই দর্পণে ভের্‌কর্‌ও দেখেন ফ্রান্সের অন্তরাত্মা। এন্‌গ্রেভার হয়ে উঠলেন প্রথমশ্রেণীর গল্পলেখক, পলাতকা দেশসেবিকা স্ত্রীও জানতেন না যে 'সমুদ্রের মৌন' তাঁর স্বামীর রচনা। শুনেছি ভের্‌করের আসল নাম নাকি ব্রুলে! কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় বইও তাঁর বিখ্যাত nom de plume, nom de guerre—কলমী

নামে যুদ্ধের নামেই বেরিয়েছে। ভের্‌করের সাহিত্য তথা প্রতিরোধের মুক্তি আজকে শান্তিতেও অনাহত রয়েছে—আরাগঁর মতো, এল্যুয়ারের মতো। ভবিষ্যতে তাই তো এঁদের চোখ, যাতে অতীত ভ্রান্তি আবার সর্বনাশের পথে দেশকে, বিশ্বকে না-টানে। তাই তো আরাগঁ শান্তিপর্বের পরে ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে বক্তৃতা দেন :

'এবার যে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আমরা—তোমরা ও আমরা—গিয়েছি, সে যেন বৃথাই না-যায়। বিপদের মুখে, শাসানির সামনে আমরা যেন আর চোখ বুজে না-থাকি, কী লণ্ডন কী প্যারিস বিপদে সে একই।...শুধু অশ্রুপাতে কিছু লাভ নেই, ভাঙা হৃদয় তাতে কারো জোড়া লাগে না, ছারখার বাড়ি কারো আর ফিরবে না। লণ্ডন যে আমার কত প্রিয় তাও আবার জেনেছি: লণ্ডনেই হোক বা প্যারিসেই হোক, আমাদের অশ্রু আজ মিশেছে পুণ্য ক্রোধে, ঘৃণায়। কিন্তু, আমার ইংরেজ বন্ধুগণ, তোমরা যারা ১৯৪০-এ আমার কথা বিশ্বাস করোনি, ১৯৪৫-এ আমার কথা শুনবে কি, বিশ্বাস করতে পারবে কি আমার কথা, যখন বলি যে আমরা কোনো মতেই ক্ষমা করতে পারব না, কখনোই করব না?'

১৯৪৫